জাহ্নবী

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী সম্পাদিত।

চতুর্থ বর্ষ

১৩১৫

কলিকাতা

২ নং শঙ্কর ঘোষের গলি হইতে

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সহকারী সম্পাদক,

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শুদ্ধিপত্র।

আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত (৯৯ পৃঃ)—"মুর্শিদাবাদের কতিপয় গ্রামে কাহিনী" প্রবন্ধ-লেখকের নাম শ্রীযোগীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য স্থলে শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র মুদ্রিত হইয়াছে।

অগ্রহায়ণ সংখ্যার প্রথম ফর্ম্মার পৃষ্ঠাগুলি ভুল মুদ্রিত হইয়াছে। ২৯৯ পৃষ্ঠা আরম্ভ না হইয়া ২৯৩ হইতে আরম্ভ হইবে।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

অ

অন্ধ কে ? (কবিতা)	শ্রীরসময় লাহা ...	১২৯
অমর কণ্টক	শ্রীমতী সরলাবালা দে ...	২৯৮

আ

আত্মতৃপ্তি (কবিতা)	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ...	৩৯৩
আনত-আননা (ঐ)	৺ ধ্রুবলাল দত্ত ...	৯৯
আমিষ ও নিরামিষ	শ্রীলালাকুঞ্জবিহারী বৈশ্য ...	৩২৫
আশা (কবিতা)	শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৩১২

উ

উৎসব	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এ	২
উত্তরবঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে [illegible]ভ্যর্থনা বক্তৃতা	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ...	৯৪
উদ্ভি[illegible] আহার	শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্, এ,	৩৮২
উদ্ভিদের দুষ্টামি	শ্রীশশধর রায় এম্, এ, বি, এল	২৬৯

ঊ

ঊর্দ্ধে ([illegible])	শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	২২

ক

কখন্ পোহাবে রাতি ? (কবিতা)	শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৩২৪
কর্ত্তব্য লঙ্ঘন (গল্প)	শ্রীনলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এ,	১৫
কন্যাদায় (গল্প)	শ্রীমতী সরলাবালা দাসী ...	৫৮
কাল্পনিক কথা	শ্রীমাখনলাল সেন বি, এ, ...	৪২১,৪৩৯
কাব্য ও দর্শনের সমস্যা	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি, এল্	২৯৩,৪০১
কুমারি-সম্ভব (সমালোচনা)	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ...	৪০০
কৃত্রিম সুবর্ণ	শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী ...	২৪৯

খোকাবাবু (কবিতা)

চীন-পরিব্রাজকদিগের বঙ্গ-বিবরণ

দ্বিতীয় বেহালা (গল্প)
দুঃখিনী (উপন্যাস)

ধর্ম্ম-বিক্রয় (গল্প)

নব-বসন্তে (কবিতা)
নবীনচন্দ্র (ঐ)
নিরুপাধি (ঐ)
নূতন (ঐ)

পরশ পাথর (গাথা)
পল্লীলক্ষ্মী (কবিতা)
পানীকুণ্ড বা অমরকুণ্ড
পুনর্জ্জীবন (কবিতা)
প্রতীক্ষা (ঐ)
প্রত্যাখ্যাত (ঐ)
প্রাচীন ভারতের প্রেম
প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় উৎকল শব্দের সমাবেশ
প্রার্থনা (কবিতা)

ফলশ্রুতি (সমালোচনা)
ফলিত রসায়ন

খ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন এম্, এ ... ১৬৪

চ

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ ১

দ

শ্রীনলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় বি,এ ৭৪৩
শ্রীজলধর সেন ২৮, ৭৬, ১১৩, ২০০ ২৪১, ২৭৫, ৩১৭, ৪২৭, ৪৫৩

ধ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ তালুকদার ... ২৫৯

ন

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ... ৪৩২
শ্রীরসময় লাহা ... ৩৭৫
সম্পাদিকা ... ১২৪
শ্রীঅকিঞ্চন দাস ... ২৬৩

প

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বি, এ ... ১০৯
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ... ৩২৩
শ্রীযোগীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... ১৫৪
শ্রীরসময় লাহা ... ৩৪৩
শ্রীমতী সরলাবালা দাসী ... ২২৫
ঐ ... ১৪
শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ ... ১১১
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ... ৪৫
শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী দাসী ... ৩৯১

ফ

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ... ২৭১
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ ৪১

ভক্তের দান (গাথা)
ভগবানের প্রতি (কবিতা)
ভারতের প্রাচীন আর্য্যসমাজ

মাখন
মিলন (কবিতা)
মুর্শিদাবাদের কতিপয় গ্রামের প্রাচীন কাহিনী
মেঘের দেশে
মৌ

যাত্রায় আবৃত্তি

রমণী (কবিতা)
রমণীর সাহস (গল্প)
রুচি

বঙ্গভাষায় প্রাচীনত্ব ও প্রাদেশিকত্ব
বঙ্গরাজ দেবখড়্গের তাম্রশাসন
বঙ্গীয় শব্দসিন্ধু (সমালোচনা)
বরকুমার ব্রত
বর্ষ-বন্দনা (কবিতা)
বহরমপুর প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলন
বারভূঞা
বাঙ্গালার অন্তঃপুরে আবৃত্তির আদর
বাঙ্গালীর ইতিহাস
বিক্রমপুরের কয়েকটি প্রাচীন স্থান
বিক্রমপুরের মেয়েলি বারব্রত
বিজয়াদশমী (কবিতা)

ভ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ ... ১৫০
শ্রীমতী মানকুমারী বসু ... ১৮১
শ্রীসত্যবন্ধু দাস ... ৪৩৩

ম

শ্রীজগদানন্দ রায় বি, এ ... ১৮
শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্, এ ৪১
শ্রীযোগীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... ৯৭
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ... ২২৭
শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় ... ২৩

য

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ... ৩৩৪

র

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ ... ৪০৯
শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ১০১
শ্রীমতী রত্নমালা দেবী ... ১৫৯

ব

শ্রীচিত্তসুখ সান্ন্যাল ... ৮৫
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ... ৪৪৮
শ্রীচিত্তসুখ সান্ন্যাল ... ৩৪৪
শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী দাসী ... ৩৩৮
শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ ... ১
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ... ১২৫
শ্রীআনন্দনাথ রায় .. ৬
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ... ৭১
শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল্ ২০৭
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ... ৫১
ঐ ... ২৮১
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি, এ, ২৬৮

বিদায় (কবিতা)
বিষ্ণুপ্রিয়ার বিদায়-দান (কবিতা)
বেণী বন্ধন (ঐ)
বোকাইনগরের ইতিবৃত্ত
বোধন (কবিতা)
ব্যর্থ (ঐ)
ব্রাহ্মণ চাঁদ রায়

শাখীনামা

শিখ-বীর (কাহিনী)
শেষ-কাজ (গল্প)

সমালোচন
সমালোচনা
সম্পদ্‌নারায়ণ ব্রত
সম্পাদিকার পত্র (সমালোচনা)
সংসারীর ব্রহ্মজ্ঞান (গল্প)
স্থবির (কবিতা)
স্বদেশে (কবিতা)
স্বপ্ন
স্বপ্ন-প্রসঙ্গ
স্বপ্ন-প্রসঙ্গে
স্বপ্ন-শেষে (কবিতা)
সায়র-উল্ মুতাখরীণ (সমালোচনা)
সাবিত্রী (কবিতা)
স্নেহের ব্যথা (গল্প)

হৃদয়-শঙ্খ (কবিতা)
হেমন্তের পল্লী-ছবি

শ্রীচ—
শ্রীমতী সরলাবালা দাসী ... ৪৪
শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ ... ২
শ্রীসৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৩৫
শ্রীমতী চম্পকলতা দেবী ... ২০
শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ ৪৫৩
শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২৬৩

শ

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪,৮২,
১২১,১৯৩,২২০,২৫৭,৩১৩,৩৪১,৪২৪
ঐ ... ৩৭৮
শ্রীনিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্, এ, ৪১১

স

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ, ... ৫৫৭
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ... ৪৬০
শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী দাসী ... ৩০৮
সম্পাদিকা ... ৩৯৪
শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত ... ১৮২
শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত ... ১৯২
শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বি, এ, ৪৩৭
শ্রীউমাকান্ত কাব্যতীর্থ ... ১৪৬
শ্রীঅমলেন্দু গুপ্ত ... ৫৩১
শ্রীমতী রত্নমালা দেবী ... ১০৮
শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ ... ৩০৬
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ... ২০৩
শ্রীরসময় লাহা ... ৩৪৩
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ... ২১৫

হ

শ্রীঅক্ষয় কুমার বড়াল ... ৮০
শ্রীললিত কৃষ্ণ ঘোষ .. ২৯০

জাহ্নবী।

ধারা হিমাদ্রিকুহরাদিব জাহ্নবীয়া
ভক্তিঃ স্বজন্মভুবি শাশ্বতপুণ্যপূর্ণা।
বাধা বিধূয় রভসাপি গিরিপ্রমাণাঃ
প্রত্যেকলোকহৃদয়াৎ প্রবহত্বজস্রম্॥

চতুর্থ বর্ষ ; ১৩১৫।

বর্ষ-বন্দনা।

১৩১৫

হে রুদ্র, হে দিব্য-দীপ্ত, হে দেব বিরাট!
স্বাগত! এসেছ আজি নবরূপ ধরি';
চন্দ্র-চন্দনের রেখা চিত্রিত ললাট,
ভাস্থ-কোহিনুর জ্বলে কিরীট উপরি!
স্বর্ণ-পীত উত্তরায়,—স্বর্ণ-পীতবাস,
জ্যোতিষ্ক-কমলমালা কণ্ঠে আন্দোলিত;
অঙ্গে অঙ্গে অগ্নিবর্ণ লাবণ্য উচ্ছ্বাস,
প্রণবের সুধা-মন্ত্রে দিগন্ত কম্পিত!
এনেছ কি যজ্ঞহবিঃ—সমিধ্ সম্ভার?
নাচিছে তাণ্ডব নৃত্যে দৃপ্ত উদ্দীপনা,
সংক্ষুব্ধ জীবন-সিন্ধু;—মন্থনে এবার
পারিবে কি আহরিতে সুধা এক কণা?
জ্বাল বহ্নি,—ঢাল হবিঃ, এ শ্মশান-শিখা
হোক্ পুণ্য হোমানল—যাক্ বিভীষিকা!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

উৎসব।

মানবের প্রকৃতি এই যে, সে নিরবচ্ছিন্নতার মধ্যে বাস করিতে চাহে না। অনন্ত প্রবহমান কালকে সে তাই শতভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়াছে ;—যুগ, বর্ষ, মাস, দিন ও তিথি ; কিন্তু এই নিরবচ্ছিন্ন যুগবর্ষের অনুবৃত্তি তাহার চিত্তরঞ্জনের পক্ষে যথেষ্ট নহে ; তাই তাহাদের মধ্যে সে এক একটিকে বিশেষত্ব দান করিয়াছে ; এই বিশেষত্ব-দান হইতেই উৎসবাদির প্রতিষ্ঠা।

উৎসবাদির মূলে আনন্দ যে নিহিত আছে, সে কথা বলা বাহুল্যমাত্র। দুঃখশোকজর্জ্জরিত সংসারে আনন্দ অপেক্ষা মানবের নিকট আর কিছু অধিক ভালবাসার সামগ্রী নাই। রোগী ও ভগ্নস্বাস্থ্যকে চিকিৎসক আনন্দই একমাত্র ঔষধির ব্যবস্থা করেন। আনন্দই জীবন। যে জাতি যত আনন্দপ্রিয়, সে জাতি তত জীবনময়! ইতিহাসের পানে চাহিলে দেখিতে পাই—অসভ্য জাতি হইতে অতি সুসভ্য জাতি সকলের মধ্যে উৎসব প্রচলিত আছে। অসভ্য ব্রিটনজাতির মধ্যে পূর্ব্বে নানারূপ কৌতুককর উৎসব প্রচলিত ছিল,সভ্য গ্রীক রোমক, চীন ও আর্য্যজাতির মধ্যে উৎসবের সংখ্যা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। বড় বেশী দিনের কথা নয়, অধীনতার নাগপাশে বদ্ধ আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ দিগের মধ্যেও 'বারমাসে তেরো পার্ব্বণ' ছিল ক্রমশঃ তাহা লোপ পাইয়া বসিয়াছে। এই উৎসবের রীতি ও অনুষ্ঠান হইতে জাতীয় চরিত্রের ইতিহাস সংগৃহীত হয়। আর্য্যজাতি ধর্ম্মপ্রাণ, তাহার উৎসবাদিও ধর্ম্মমূলক। রোমক জাতি বিলাস-প্রবণ—তাই তাহার উৎসবেও বিলাস ;—এমন কি ঘোর নৃশংসতা লক্ষিত হয়। আমাদিগের সামরিক ক্ষত্রিয়গণের মধ্যেও মৃগয়া প্রভৃতি ব্যবস্থা ছিল। খৃষ্টিয়ান জাতির মধ্যে যখন ধর্ম্মভাব প্রবল ছিল, তখন তাহাদের মধ্যে, মাসের একদিন না একদিন কোনও মহাত্মার নামে Saint's Day বলিয়া উৎসৃষ্ট থাকিত।

যখন বৈষ্ণবধর্ম্ম পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইয়াছিল, তখন নানা উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। আজ অমুক প্রভুর আবির্ভাব, অমুক প্রভুর তিরোভাব এইরূপ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া একটি ধর্ম্মসমাজ সজীবতায় লালিত হইত—হায়! এখন সেই সরল উদার ধর্ম্মানুষ্ঠান কেবলমাত্র পাতলা কাগজে পঞ্জিকা পৃষ্ঠায় নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে!

বাঙ্গালার কোন প্রতিভাশালী লেখক বলিয়াছেন,—

"পাল পার্ব্বণ যাত্রা গান কথকতা এ সমস্ত ক্রমে মরা-নদীর মত শুকাইয়া আসাতে, বাঙ্গলা গ্রামের পল্লীগ্রামে যেখানে রসের প্রবাহ নানা শাখায় বহিত সেখানে শুষ্ক বালু বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে বয়স্ক লোকদের মন কঠিন স্বার্থপর এবং বিকৃত হইবার উপক্রম হইতেছে।"

বাস্তবিক, আমরা বাঙ্গালী জীবনের বিশেষত্ব—সেই সরল সহজভাব হইতে ক্রমশঃ বঞ্চিত হইতেছি। আমাদের জীবনে, যেখানে স্নিগ্ধ সরলতার মন্দাকিনী প্রবাহিত হইত, তাহার স্থলে একটা বিসদৃশ নীরস কঠিন সভ্যতার উসর ভূমি হাহাকার করিতেছে! আমাদের প্রাণে আর সে আনন্দের প্রাচুর্য্য নাই, জীবনে সে উদার প্রীতি নাই, ক্রমশঃই স্বার্থ-সঙ্কীর্ণ আত্ম-পরিপুষ্টির বন্ধনে হৃদয়কে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিতেছি! বৈচিত্র্যহীন দৈনন্দিন ব্যাপারে আমরা এতদূর আপনাদিগকে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছি যে, আমাদের প্রাণ এতটুকু বিমল স্ফূর্ত্তির আস্বাদ হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্রমশঃ জড়তাগ্রস্ত হইতেছে! আমাদের এখনকার আনন্দ পূর্ব্বের ন্যায় ব্যাপক নহে, তাহা অতি ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ ; বহুকালব্যাপী নহে,—তাহা ক্ষণস্থায়ী; পরার্থপর নহে, তাহা স্বার্থসঙ্কীর্ণ ; বাস্তবিক, আমাদের হৃদয় যেরূপভাবে বিকারপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, আর কিছু কাল এই ভাবে চলিলে, আমরা শেষে এক একটা ব্যষ্টি ভিন্ন আর কিছু থাকিব না! তখন পিতামাতা-ভাইভগ্নী-স্ত্রীপুত্র-কন্যা-গঠিত বাঙ্গালীর আদর্শ পরিবার কয়েকটি স্বতন্ত্র স্বাধীন পরিবারে পরিণত হইবে।

আন্তরিকতার অভাব আমাদের মধ্যে এমন বিষের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে যে, আমরা হয় ত অচিরে আমাদের দেব-দত্ত হৃদয়ও হারাইয়া ফেলিব!

'সার্টার রেসার্টসে' কার্লাইল একস্থলে বলিয়াছেন ; "No man who has once heartily and wholly laughed can be altogether irreclaimably bad. How much lies in laughter! The cipher key, wherewith we decipher the whole man!.....The man who cannot laugh is not only fit for treasons, stratagems, and spoils ; but his whole life is already a treason and a strtagem."

বাস্তবিক বাঙ্গালী-জীবন হইতে হাসির সরল উচ্ছ্বাস শুকাইয়া গিয়াছে! সে হাসি বলিতেছি না, যে হাসি ওষ্ঠ ও অধরের সঙ্কোচক স্নায়ুর ভাবান্তর মাত্র সে হাসি বলিতেছি না যে হাসি হৃদয়হীনতাকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য

সৃক্কণি প্রসারিত করিয়া অস্ফুট ধ্বান করে! কিন্তু আমরা বলিতেছি, সেই হাসি, যাহা বিমল, গভীর সহানুভূতি হইতে উৎসারিত হইয়া অধরে ওষ্ঠে কপোলে নয়নে উচ্ছ্বসিত হইয়া আর একটি হৃদয়কে দিব্য পুলকস্পর্শে অভিষিক্ত করিয়া দেয়! হায় কোথায় আজি সেই হাসি! সেই স্বর্গীয় পিতামহগণের মজলিসি হাসি ; সেই উচ্চরবে প্রাণ খুলিয়া হাসি,যাহা খাঁটি হৃদয় হইতে উদ্ভূত হইয়া অন্য হৃদয়কে মাতাইয়া তুলিত। প্রাণ খুলিয়া প্রাণের পরিচয় প্রদান করিত! তাহার স্থলে আজ আছে কি? অতি পরিমিত বিন্যাসচটুল মুখভঙ্গি, যাহা অধরের কোণে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে মিলাইয়া যায়! হায় সে দিন! এখন আমরা হাসিব কি? সে হৃদয় নাই, সে খাঁটি প্রাণ নাই,—আর নাই সে প্রাণে প্রাণে মিলিইবার আগ্রহ! এখন হাসি নাই, তাই মানুষ নাই! কাজেই মানুষে মানুষেও সে মিল নাই!

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাহাই হউক, সামাজিক ক্ষেত্রে দেখিতেছি—বাঙ্গালীর জীবন ক্রমশঃ একটা মস্ত 'ট্র্যাজিডি'র দিকে গড়াইয়া চলিয়াছে! "There hath passed a glory form this Earth." ওয়ার্ডসওয়ার্থের এই মর্ম্মস্পর্শী সখেদ উক্তি হয়ত ব্যক্তিগত মানবজীবনের একটা 'ট্রাজেডি'র কথা হইতে পারে ; কিন্তু সমষ্টিগত বাঙ্গালী-জীবনে ক্রমশঃ একটা বিসদৃশ ভাবের সৃষ্টি হইতেছে! বাস্তবিক আপনারা ভাবিয়া দেখুন বঙ্গের দুর্গোৎসব আর সেরূপ আছে কি? সে অসীম আনন্দ সে দিব্য আনন্দ! সে উপভোগতৃপ্তি! সে গভীর ভাবের উদ্বোধন! আর আছে কি? কোন্ উৎসবে আজ বাঙ্গালী যথার্থ উৎসবের অমৃত আস্বাদ পাইতেছে!

দার্শনিক বলিবেন ; আমাদের ধর্ম্মভাব লোপ পাইয়া তাহার স্থলে জাতীয় ভাবের সৃষ্টি হইতেছে! - বেশ, তাহা স্বীকার করি। পুরাতন উৎসবের কথা ছাড়িয়া নূতন উৎসবের কথা আলোচনা করা যাউক। বিংশ বৎসর পূর্ব্বকার কথা,—উপস্থিত প্রবীণ ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন কি—পূর্ব্বে কেশবীয় যুগে ও মহর্ষির যুগে মাঘোৎসব যেরূপ ছিল, এখন ঠিক সেইরূপ আছে? গভীর হৃদয়ে তাঁহারা কি বলিবেন না—There hath passed a glory from these festivities.' আজ কালকার প্রতাপাদিত্য উদয়াদিত্য ও বীরাষ্টমী উৎসব! সে কি আর আজ উৎসব আছে! সে ত এখন কয়েকজন বালক ও যুবকের রঙ্গমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে—ইহাই আক্ষেপের বিষয়! কিন্তু আজ এ উৎসব-তিথিতে সে সকল অন্ধকারময় বিষাদ বিস্তারের

প্রয়োজন নাই! জানি, বাঙ্গালীর দৈন্য, বুভুক্ষু-রাক্ষসের ন্যায় তাহার সজীব সুখগুলি গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে! জানি, দেশব্যাপী রোগশোকবিপৎপাতে বিলাপধ্বনি উত্থিত হইতেছে! কিন্তু এই ঘনান্ধকারে আমরা আনন্দের দিব্যালোকের সন্ধান না করিয়া চিরন্তন অন্ধকারসাগরে নিমগ্ন হইতে থাকিব? না, অসীম দৈন্যদুঃখের রুদ্ধ-মন্দিরে আনন্দ-দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়া ধন্য হইব! আজ আমরা মনে করিব,—সহস্র দুঃখের মধ্যে এখনো সুখের অবশেষ আছে! কবির কথায় বলিব,—

We will grieve not, rather find.
Strength in what remains behind.

এখন এস হে নববর্ষ, ধরণীগৃহে হে নবীন অতিথি, আশার বাণী লইয়া আজ আমাদিগকে সম্ভাষণ কর! যদিও তোমাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য বাঙ্গালার গৃহদ্বারে মঙ্গল-কলস স্থাপিত হয় নাই, সহকার-পল্লবে বাঙ্গালী তাহার তোরণদ্বার শোভিত করে নাই, পুরনারী শঙ্খরোলে তোমার আগমনবার্ত্তা দিগ্বিদিকে ঘোষিত করিতেছে না, তথাপি আক্ষেপের কারণ নাই, কারণ আজ বাঙ্গালীর মন ফিরিয়াছে, সে আবার পুরাতনের আদর করিতে শিখিয়াছে—এখন সে আর নির্লজ্জ ভাবে New Year's Dayর সম্মান-রক্ষার জন্য বন্ধুবান্ধবকে কার্ড পাঠাইয়া, প্রীতিভোজ দিয়া, উদ্দাম আনন্দে আপনার জাতীয়তা বিসর্জ্জন দিবে না। আমাদের এই দীন আয়োজন তাহারই একটি সামান্য নিদর্শন! এই বাঙ্গালার একটি নিভৃত কোণে, আজ, হে নববর্ষ, তোমার সম্বর্দ্ধনার জন্য যে ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান—বিধাতার আশীর্ব্বাদে অচিরে তাহা সমধিক প্রসারতা লাভ করিয়া জাতীয় উৎসবে পরিণত হউক! তখন এই নববর্ষোৎসব শুধু ব্যবসায়ীর নূতন খাতার উৎসব মাত্র না হইয়া, ধনীর সৌধভবন এবং দরিদ্রের কুটীর তুল্যরূপে উৎসবানন্দে মুখরিত করিয়া তুলুক! *

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

* ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতি-অনুষ্ঠিত নববর্ষোৎসবে পঠিত।

বারভূঞা।

যোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গদেশে কতকগুলি ভূম্যধিকারী, একমতাবলম্বী হইয়া দিল্লীশ্বরের অধীনতা হইতে, আপনাদিগকে বিমুক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। সাধারণতঃ তাঁহারা বারভূঞা নামে প্রসিদ্ধ। আজিও বারভূঞার নাম বঙ্গদেশ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই, ইঁহাদের কীর্ত্তির ও কার্য্যকলাপের কোন কোন ভগ্নাংশ বর্ত্তমান থাকিয়া অদ্যাপি সেই সেই মহানুভবগণের প্রাচীন লুপ্ত স্মৃতি জনগণের মনে ক্ষণস্থায়ী তড়িৎ সদৃশ সময় সময় একটা আভাস প্রদান করিয়া থাকে।

বারভূঞার নাম লইয়া বড়ই গোলযোগ; কিন্তু প্রবাদ-বাক্যানুসারে তন্মধ্যে জনকয়েক নির্ব্বিবাদে দখলিসত্ব বজায় রাখিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের পরিচয় এইরূপ জানা যায়; যথা—১ম—যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য, ২য়—চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্প রায়, ৩য়—বিক্রমপুরের কেদার রায়, ৪র্থ—ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য, ৫ম—সাতৈলের রামকৃষ্ণ, ৬ষ্ঠ—ভূষণার মুকুন্দ রায়, ৭ম—ভাওয়ালের ফজল গাজী, ৮ম—চাঁদপ্রতাপের চাঁদগাজী ৯ম—সোণারগাঁর ঈশা খাঁ মসনদাইয়ালি ইঁহারাই প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন কেহ কেহ দিনাজপুরের, পুঁটীয়ার,তাহেরপুরের রাজবংশীয়দিগকেও ভূঞা সংজ্ঞার মধ্যে ধরিয়া দ্বাদশজন পূর্ণ করিয়া থাকেন; কিন্তু শেষ তিনটী সম্বন্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণই প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

কেহ কেহ বলেন, সুসঙ্গ দুর্গাপুরের সিংহরাজবংশ এবং "বঙ্গীয়-সমাজ" প্রণেতার মতে ভাওয়ালের ব্রাহ্মণরাজবংশের পূর্ব্বপুরুষও এই বারভূঞার অন্তর্গত; কিন্তু ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া জানা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ভাওয়াল গাজীবংশের করায়ত্ত ছিল। বর্ত্তমান জয়দেবপুর, পুবাইল, গাছা, বলধার জমিদারের পূর্ব্বপুরুষেরা গাজীদের চাকুরি করিয়া পরে ঐ জমিদারি আত্মসাৎ করেন। ঐ লেখক * মহোদয় এবং মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবনীলেখক † এই উভয়েই বিষ্ণুপুরের বীরহাম্বীরকেও বারভূঞার অন্যতম বলিয়া প্রকাশ করেন; কিন্তু আমরা জানিতে পাই তিনি মোগলের পক্ষে থাকিয়া, উড়িষ্যার পাঠানদের হস্ত হইতে মানসিংহের পুত্র

* শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী।

† শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী।

জগৎসিংহকে উদ্ধার করেন। অতএব তিনি বিদ্রোহী ছিলেন না। (১) রাজা গণেশকেও কেহ কেহ বারভূঞার অন্তর্গত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। উহা একেবারেই অযৌক্তিক কথা, কারণ পাঠান-শাসন সময়ে ১৪০৫ খৃঃ অব্দে রাজা গণেশ পশ্চিম বাঙ্গালায় একরূপ স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করিতেন। তাঁহাকে মোগল শাসনের সময়ের বারভূঞার তালিকান্তর্গত করা কখনও সম্ভবপর হয় নাই।

মিঃ বিভারিজ তৎকৃত ইতিহাসের (২) একস্থানে লিখিয়াছেন, পাদ্রী মিঃ সুইট্ ১৫৯৫ খৃঃ অব্দে যখন বঙ্গদেশে আগমন করেন, তৎসময় তিনি স্থানীয় দ্বাদশজন ভূম্যধিকারীর মধ্যে নয় জনকে মুসলমান বলিয়া জানিতে পান। তিনি আরও বলেন, তাঁহারা খৃষ্টিয়ানদিগকে আদর করিতেন এবং তাঁহাদের সহায়তায় খৃষ্টিয়ানেরা গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে উপাসনা করিতে পারিতেন। আমরা তাঁহার কথা সমর্থন করি। কারণ এই সময়ে বহু বিদ্রোহী পাঠানের নামই অবগত হওয়া যায়। অতি অল্পসংখ্যক হিন্দু বাদসাহের প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছিলেন। বিশেষ সমুদয় বঙ্গদেশীয় জনগণ যে বিদ্রোহে লিপ্ত ছিল তাহা নয়, অধিকাংশ স্থান তখনও বাদসাহের শাসনাগত ছিল।

বারভূঞা যে কেবল বারজন ভূম্যধিকারীর সমষ্টি ছিল তাহা নয়; বহু লোকে একত্র হইয়া কার্য্য করিলে যেমন তাহাকে পঞ্চায়েতের কার্য্য বা বারইয়ারীর কার্য্য বলে, উহাও তদ্রূপ ছিল। বিশেষ এইরূপ আধিপত্যশালীর উপর যিনি প্রাধান্য লাভ করিতেন, তিনিই নৃপতি বা সম্রাট্ নামের যোগ্য হইতেন। কবিকঙ্কণ চণ্ডী পাঠ করিয়া আমরা এইরূপ বারভূঞার নাম অবগত হই (৩)। এতদ্ভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থাদিতেও বারভূঞার আভাস প্রাপ্ত হওয়া

(১) আকবরনামা ভঃ ৫ পৃষ্ঠা ৫৬৫। ইলিয়ট ৮৬।৮৭ পৃষ্ঠা।

(২) বাখরগঞ্জের ইতিহাস।

(৩) অভিষেক করাইল বসাইল খাটে। আজি হৈতে কালকেতু রাজা গুজরাটে॥
নিজহস্তে নরপতি টীপ দিলা ভালে। যত ভূঞা মিলিয়া খাটায় তার তলে॥
শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত, ১০০ পৃষ্ঠা।

গুজরাটে কালকেতু খ্যাতাইল রাজা। আর যত ভূঞা রাজা সবে করে পূজা॥
শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত কবিকঙ্কণ চণ্ডী—১০৩ পৃষ্ঠা।

সামন্তের অধিপতি সামন্তের মামা। সভাতে বসিয়া শুনে কোটালের দামা॥ ঐ ৯৪ পৃষ্ঠা।

যায়। * সামন্ত মণ্ডল ভূঞা প্রভৃতি একার্থবোধক। এই ভূম্যধিকারী দলের অভ্যুত্থানের সমকালে বঙ্গদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার কিছু বিবরণ নির্ণয় করা কর্ত্তব্যবোধে আমরা এ স্থানে তৎসময়ের কতিপয় বিবরণ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মোগল বাদসাহের রাজত্ব পর্য্যন্ত, বাদসাহের প্রতিনিধি স্বরূপ মুসলমান নবাব বা সুবেদারের দ্বারা বঙ্গদেশ শাসিত হইত বটে, কিন্তু তৎকাল পর্য্যন্ত সাধারণ প্রজা কিম্বা দেশ রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেশীয় জমিদারগণের উপরেই অধিক পরিমাণে নির্ভর করিত। এইজন্য প্রত্যেক ভূম্যধিকারীর অধীনেই পদাতি,অশ্বারোহী নৌ-সৈন্যের গমনোপযোগী যানসকল সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। আইন-ই-আকবরীগ্রন্থে উল্লেখ আছে—বাদসাহ আকবর সাহের রাজত্ব সময়ে বঙ্গদেশীয় জমিদারেরা ২৩৩৩০ জন অশ্বারোহী, ৮০১১৫০ জন পদাতি, ১৭০টী হস্তী, ৪২৬০টী কামান, ৪৪০০ যুদ্ধপোত,সর্ব্বদা সম্রাটের জন্য প্রস্তুত রাখিতেন। সম্রাট্ যখন আদেশ প্রদান করিতেন,তখনই জমিদারেরা এই সকল সৈন্য, হস্তী ও অশ্বাদি লইয়া তাঁহার সাহায্যে নিযুক্ত করিতেন। আমাদের নিকট এই কথাগুলি অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হইলেও জমিদারেরা যে তৎকালে আধুনিক করদ ও মিত্র মহীপালগণের মত বলসম্পন্ন ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, বর্ত্তমান করদ ও মিত্র রাজগণ রেসিডেণ্ট-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া সময় সময় যেমন "ত্রাহি ত্রাহি" চীৎকারে সুধাধবলিত হর্ম্ম্যাবলীকেও বিদীর্ণ করিয়া থাকেন, তখনকার জমিদারগণ এতদপেক্ষা সুখস্বচ্ছন্দে ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। একমাত্র নির্দ্দিষ্ট রাজকর প্রদান করিলেই তাঁহারা স্বাধীন নৃপতির ন্যায় আপনাপন অধিকারে কার্য্য পরিচালনা করিতে পারিতেন।

পাঠানেরা প্রায় তিনশত বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ শাসন করেন, এই সময় মধ্যে হিন্দুদের সহিত তাঁহাদের অনেকটা মেশামিশি হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষতঃ এই রাজভক্ত জাতি রাজকার্য্যে প্রবেশলাভ করিয়া ক্রমে তাঁহাদের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময় তাতারের মোগলেরা তাঁহাদের হস্ত হইতে ভারত-সিংহাসন কাড়িয়া লন। পাঠানশক্তিসম্পন্নগণ তৎ-

* মণ্ডলং দ্বাদশ রাজকং ইতি মেদিনী। সম্রাট যেন রাজসূয়েন ইষ্টং। যে মণ্ডলস্যেশ্বর আজ্ঞায়া রাজ্ঞঃ শাস্তি যঃ, ইত্যমরঃ। রাজসূয় শ্চক্রবর্ত্তি সাধ্যো যাগ বিশেষঃ। তেন যেন ইষ্টং যাগঃ কৃতঃ। যো মণ্ডলস্য দ্বাদশ রাজমণ্ডলস্য ঈশ্বরঃ ইতি ভরতঃ। শব্দকল্পদ্রুমের মণ্ডল ও সম্রাট্ শব্দ দেখ।

কালে মোগলের বিরুদ্ধে ঘোর ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন এই দেশীয় লোকদিগকে তাঁহাদের পক্ষে না রাখিলে কোন মতেই মোগল অনাকিনীর সম্মুখে তিষ্ঠান যাইতে পারিবে না, তাই হিন্দুদিগকে স্বপক্ষে রাখিবার জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বন করিয়া তাহাতে কৃতকার্য্য হন। এই রাজভক্ত জাতি রাজবংশ পরিত্যাগ করিয়া নূতন রাজার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে বড়ই অসম্মত হইয়া দাঁড়াইল; যদিও অনেকে এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া মোগলের শরণাগত হন; কিন্তু শাসনকর্ত্তাদের কার্য্যকলাপে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারা স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, পরিণামে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন।

এই সময়ের শাসনকর্ত্তাদের চরিত্র-সম্বন্ধে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তদীয় চণ্ডীগ্রন্থে যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই আমাদের কথার কতকটা সত্যতা উপলব্ধি হইতে পারিবে। যথা—

"ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদে যে বা ভৃঙ্গ
গৌড়—বঙ্গ উৎকল মহীপ।
রাজা মানসিংহ কালে, প্রজার পাপের ফলে
ডীহীদার মামুদ সরিপ॥
উজীর হইলা রায় জাদা, বেগারিরে দেয় খেদা
ব্রাহ্মণের বৈষ্ণবের হ'ল অরি।
কোণে কোণে দিয়া দড়া. পনর কাঠার কুড়া,
নাহি শুনে প্রজার গোহারি॥
সরকার হইলা কাল, খিলভূমি লেখে লাল
বিনা উপকারে খায় ধূতি (খতি)
পোদ্দার হইল যম, টাকায় আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি॥
ডীহীদার অবোধ খোজ, কড়ি দিলে নাহি রোজ
ধান্য গরু কেহ নাহি কেনে।
প্রভু গোপীনাথ নন্দী, বিপাকে হইলা বন্দী
হেতু কিছু নাহি পরিমাণে।
জমিন্দার প্রত্যীত আছে, প্রজারা পালায় পাছে
দুয়ারে চাপিয়া দেয় থানা।
প্রজা হইল ব্যাকুলি, বেচে ঘরের কুড়ালি
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা।"

প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের এইরূপ অত্যাচার জন্যই তৎকালে বঙ্গবিহার-বাসীরা বিদ্রোহী হইয়া উড়িষ্যার পাঠানদের সহিত যোগদান করিয়াছিল। এই বিপ্লবে জমিদার, তালুকদার প্রজা কাহারও অব্যাহতি ছিল না। তালুকদার গোপীনাথ নন্দী বন্দী হইতে এবং কবিকঙ্কণ জন্মস্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এইরূপ ঘটনা তৎসময় বহু পরিমাণে ঘটিয়াছিল।

মিঃ ফারুণেনডের লিখিত বিবরণীতে,আরাকান, শ্রীপুর, চণ্ডীখান (যশোহর) এই তিনটি প্রবল পরাক্রান্ত রাজ্যের নাম অবগত হওয়া যায়। তন্মধ্যে আমরা শ্রীপুর ও চণ্ডীখানের রাজাদিগকে হিন্দু বলিয়া জানিতে পারি। রালফ্ ফিসের ভ্রমণবিবরণীতে উল্লিখিত তিনটী রাজা ভিন্ন বাকলার রাজার নামও প্রাপ্ত হই, অতএব আমরা তিনজন হিন্দু ভূঞা প্রাপ্ত হইলাম। অতঃপর ফতেয়াবাদের মোরাদ খাঁর মৃত্যুর পর মুকুন্দরাম জমিদার প্রথমে বাদসাহের বশ্যতা স্বীকার করিয়া পরে বিদ্রোহী হন। এই উপলক্ষে চারিজন বিদ্রোহী হিন্দু পূর্ব্ববঙ্গে স্থিরীকৃত হইয়াছেন। ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক্যের যে পরিচয় পাই, তাহা ততদূর সন্তোষপ্রদ নয়; তথাপি আমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না; কারণ বঙ্গীয় পূর্ব্বোক্ত তিনজন কায়স্থ রাজার সহিত তদীয় ঘটনাবলীর এত ঘনিষ্ঠতা রহিয়াছে যে, আমরা তাঁহাকে এ প্রবন্ধে স্থান-দান না করিয়া পারি না। সা-তৈলের রামকৃষ্ণের স্ত্রী সর্ব্বাণী নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠার সমসাময়িক, অতএব তাঁহাকে কিরূপে আমরা আকবর বাদসাহের সমকালীন লোক বলিয়া নিরূপণ করিতে পারি, লক্ষ্মণ মাণিক্য সম্বন্ধেও এইরূপ কষ্টকল্পনা হইয়া পড়ে। তবে আমরা যে বংশাবলী প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা যদি ভুল হয় তবে একরূপে গোলযোগের মীমাংসা হইতে পারে। যাহা হউক আমরা উল্লিখিত হিন্দুদিগকেই বারভূঞার অন্তর্গত বলিয়া লিপিবদ্ধ করিব। তবে বর্দ্ধমানের উত্তর কোকরার জমিদার মধুসিংহ ভূমী (ভূঞা) বিষ্ণুপুরের হামীর বা হাম্বীর মল্ল এবং কুতল খাঁর পুত্রের সহিত সুজন নামক একজন হিন্দু বিদ্রোহীর পরিচয় পাই। তাঁহারা সম্ভবতঃ বারভূঞা দলের অন্তর্গত হইবেন। আরাকানের ও ত্রিপুরার রাজা ইঁহাদের সহায়তা করিতেন। এ কথার প্রমাণ আমরা, মানসিংহ কেদার রায়ের নিকট যে লিপি প্রেরণ করেন, তাহা হইতে জানিতে পাই; যথা—"ত্রিপুর, মঘ বাঙ্গালী, কাক কুলী, কাচিলী" ইত্যাদি।

উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গ এবং উড়িষ্যা, বিদ্রোহী ভূঞাগণের প্রধানতম লীলাক্ষেত্র

ছিল। গঙ্গার পূর্ব্বোত্তর তট হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর সমুদ্র তীর ধরিয়া উড়িষ্যা পর্য্যন্ত উহার ব্যাপ্তি ছিল। (১) তৎকালে বঙ্গীয় ভূম্যধিকারীরা যেরূপ দলবল সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয় উঁহারা মোগলের গ্রাস হইতে স্বদেশ উদ্ধার করার আশাটা তত অসম্ভব কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন না; তবে বিধাতা চিরকাল যাহাদের প্রতি বিমুখ, যে দেশ চিরকাল স্বদেশদ্রোহী দ্বারা পরিবৃত, ভ্রাতৃহিংসা পর্য্যন্ত যাহাদের নিয়ত কার্য্য, সে দেশের কল্যাণ আর কিরূপে হইতে পারে? ভূঞারা বহু চেষ্টা করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কতিপয় স্বদেশদ্রোহী স্বজনের হিংসা ও পরশ্রীকাতরতায় তাঁহাদের সে আশা শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও যখন আর কূল কিনারা পাইলেন না, তখন আত্মাহুতি প্রদান করিয়া, জন্মভূমির নিকট চির বিদায় গ্রহণ করিলেন। স্বদেশদ্রোহীরা তাঁহাদিগকে ধিক্কার দিতে লাগিল বটে, কিন্তু মায়ের সুসন্তানের জন্য সহৃদয় দুই চারিজন ব্যক্তি দুই বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া রাজপুরুষগণের ভয়ে অলক্ষিতে তাহা আবার মুছিয়া রাজার 'জয় জয়কার' দিতে লাগিল।

আকবর বাদসাহের রাজত্বকালে প্রথমতঃ হোসেনকুলী খাঁ, ২য় মুজাফর খাঁ ও ৩য় রাজা তোডড়মল বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। এই সময়ে প্রাদেশিক গোলযোগ বঙ্গদেশে বড় ছিল না, কেবল পাঠান সর্দ্দারেরা উড়িষ্যায় কেন্দ্রস্থান করিয়া, বাদসাহের প্রতিকুলাচরণ করিতে থাকে। তোডড়লমলের সময় বঙ্গদেশ যে একরূপ নিরুপদ্রব ছিল, তাঁহার কৃতকার্য্য বন্দোবস্ত দ্বারাই উহা প্রমাণিত হয়।

তোডড়মলের পর আজিজ খাঁ আজম ও তৎপর সাহাবাজ খাঁ

---

(১) মিঃ কল ও মিঃ উইলফোর্ড এ সম্বন্ধে যে বিবরণী লিখিয়াছেন তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ভাগীরথী ও পদ্মা এই দুই নদীর মধ্যগত গঙ্গার "ব" দ্বীপা-কৃতি বিস্তৃত ভূভাগ যাহা বর্ত্তমান আছে তন্মধ্যে দ্বাদশ ভূম্যধিকারিগণ রাজ্যসংস্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা কিন্তু এই কথার অনুমোদন করিতে পারিতেছি না। বিক্রমপুর, ভাওয়াল, সোণারগাঁ পদ্মার পূর্ব্বে ও মেঘনার পশ্চিম, এতদ্ভিন্ন ভুলুয়া মেঘনারও পূর্ব্বতটে সংস্থাপিত। তবে "ব" দ্বীপাকৃতি স্থানে মাত্র যশোহর, চন্দ্রদ্বীপ, ভূষণা এই তিনটী পরগণা বিদ্যমান।—এশিয়াটীক রিচার্স, ভঃ ১৪ পৃষ্ঠা ৪৫১।

শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আসেন। শেষোক্ত সুবেদার বড়ই দুরন্ত ছিলেন। তিনি বাঙ্গালী কেন—স্বীয় দলস্থ আমীরদিগকেও অবহেলা করিতেন। আজিজ তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম বদ্‌মেজাজী হইলেও বাঙ্গালীদিগকে ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করিতেন। সাহাবাজের উদ্ধত প্রকৃতিতে তদধীন সামন্তেরা পর্য্যন্ত উত্যক্ত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বাদসাহ সদনে চলিয়া যায়, বাদসাহ স্থিরবুদ্ধিতে অন্য আমীরওমরা প্রেরণ ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই বিবেচনায়, তদুপায়ই অবলম্বন করেন। এই নূতন সহকারী প্রাপ্ত হইয়া সাহাবাজ কতকটা কৃতকার্য্য হন বটে, কিন্তু তাঁহার বহু পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পরিচালন সত্ত্বেও সম্যক্ বিদ্রোহ নিরাকৃত হয় নাই। উড়িষ্যার কুতল খাঁ ও বাঙ্গালার মাসুম্ কাবুলী ও ঈশা খাঁ মসনদই আলী তাঁহাকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাঁহারা রণে পরাজিত হইয়াও হার মানে নাই। কতবার বিরক্ত হইয়া সাহাবাজ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দিল্লী গমন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু দূরদর্শী বাদসাই এইরূপ অকৃতকার্য্যাবস্থায় তাঁহাকে কোন মতেও বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিবার সুযোগ প্রদান করেন নাই। পরে সাহাবাজ অসুস্থ হইয়া পড়িলে তৎস্থানে উজির খাঁ নিযুক্ত হন। তিনি কয়েক মাসমাত্র রাজকার্য্য সম্পাদন করেন। এই সময়ে বঙ্গদেশে ও উড়িষ্যার বিদ্রোহিগণের প্রবল প্রতাপ বাড়িয়া উঠে, এজন্য বাদসাহ আর স্থির থাকিতে না পারিয়া অম্বরাধিপতি রাজা মানসিংহকে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন। মানসিংহ ১৫৮৭ খৃঃ অব্দ হইতে ১৬০৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার শাসনকার্য্য করেন বটে, কিন্তু এই দীর্ঘকাল বঙ্গদেশেই অতিবাহিত করেন নাই, মধ্যে একবার স্বদেশে গমন করিয়াছিলেন। পরে যখন ১৬০১ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যার ওসমান, বাঙ্গালার মাসুম, ঈশা খাঁ, কেদার রায় প্রভৃতি হিন্দু ও মুসলমান একত্র হইয়া বিদ্রোহের প্রসার বর্দ্ধিত করিয়া তুলেন, তৎ সময় পুনরায় বাদসাহের আদেশে বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করেন।

১৬০৫ খ্রীঃ অব্দে বাদসাহ-কুলতিলক জালাল উদ্দীন আকবর প্রাণ পরিত্যাগ করেন। এই বৎসর তৎপুত্র জাহাঙ্গীর সাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন বাঙ্গালায় ঘোর বিদ্রোহ দাবানল জ্বলিয়া উঠে। একে ত তৎ সময় পর্য্যন্ত গোগল শাসন-পক্ষে কেহই অনুকূল ছিল না, তৎপর রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াই জাহাঙ্গীর এমন একটী কার্য্য সম্পাদন করেন, যাহাতে সমুদয়

বঙ্গবাসীর চক্ষে সে সময় তিনি নরপিশাচ বলিয়া প্রদর্শিত হন তখন তাঁহার উপর আর কাহারও আস্থা রহিল না।

মহাত্মা আকবরের রাজত্ব সময়ে যদিও বঙ্গদেশ বিদ্রোহীপূর্ণ ছিল, তথাপি অধিকাংশই তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া চলিত ; কিন্তু জাহাঙ্গীর বাদসাহের সহিত তাঁহাদের ততটা সম্মিলন ঘটিল না। কেন এই মনোমালিন্য ঘটিল, কাহার জন্য ভূম্যধিকারীরা বাদসাহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল, তাহার বিবরণ অনুসন্ধান করিতে গেলে বোধ হয় যে, তৎকাল পর্য্যন্ত যদিও মোগল বাদসাহ বাঙ্গালার অধিপতি ছিলেন ; তথাপি পাঠানেরা তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষেই অবলোকন করিত ; এমন কি সময় সময় তাঁহাদের আধিপত্য স্বীকার করিতে চাহিত না। বিশেষতঃ যদি তাঁহারা বুঝিত, মোগলেরা তাঁহাদের স্বশ্রেণী কোন ব্যক্তির প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিয়াছেন বা করিতেছেন, তখন তাঁহারা আত্মহারা হইতেন। আপনাদের পূর্ব্বল ও অধিকার মনে ভাবিয়া তাঁহাদের শিরায় শিরায় শোণিত উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। তখন ভালমন্দ বিবেচনা তাঁহাদের অন্তঃকরণে আর স্থান পাইত না। কেবল প্রতিহিংসা ও পূর্ব্বাধিকারের পুনরভ্যুদয় তাঁহাদিগের স্মৃতিতে জাগরিত হইয়া তাঁহাদিগকে মোগল বাদসাহগণের প্রতিকূলে উত্তেজিত করিয়া তুলিত, ভবিষ্যৎ ভাবিবার আর সময় থাকিত না। সের আফগানের পরিণীতা বনিতা অসামান্য রূপ-লাবণ্যবতী মেহের উন্নেসাকে অন্যায়রূপে আত্মসাৎ করায় বাদসাহের প্রতি আর কাহারও বিশ্বাস বা ভক্তি ছিল না। অথচ এইরূপ রাজার অবিচার সত্ত্বেও একজন মুসলমান ঐতিহাসিক এতৎ সম্বন্ধে বাঙ্গালার জমিদারগণকেই দোষী স্থির করিয়া স্বীয় লেখনী পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা এই স্থানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"জাফর খুলনাৎ উৎ তওয়ারিখ" নামক পারশ্য ভাষায় লিখিত পুস্তক অবলম্বনে লক্ষ্ণৌ-নিবাসী সোর আলিজাফর "আরশ-ই-মহামিন্দ" নামক যে উর্দ্দূ গ্রন্থ ১৮০৫ খ্রীঃ অব্দে অনুবাদ করেন। তাহাতে জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা) সম্বন্ধে এইরূপ লেখা হইয়াছে, "বাঙ্গালার জমিদারেরা নিতান্ত উদ্ধত ও অভদ্র হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় বাদসাহ সরকারে রাজস্ব দেয় না, উহারা তাহার প্রতিফলও পাইয়াছে।" বলা বাহুল্য উহা ভূঞাদলের পতনের পর মুসলমান-লেখক কর্ত্তৃক বিরচিত হয়। জেতা জেতৃর উপর যতদূর ঝাল ঝালিতে পারেন, গ্রন্থকর্ত্তাও সেই সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই। ঐরূপ প্রথা

পূর্ব্বেও যেরূপ ছিল, এখনও তদ্রূপ আছে, চিরকাল একই ভাবে পরিচালিত হইবে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিলে এ প্রহেলিকা-ভেদের আর অধিক চেষ্টা করিতে হয় না। মুসলমান ইতিহাসলেখক হিন্দু ও পাঠান জমিদারগণ সম্বন্ধে, যতই অভদ্র শব্দ প্রয়োগ বা ততোধিক বিশেষণে বিশেষিত করুন না কেন, কিন্তু তৎকালের প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তারাই যে, সকল গোল-যোগের মূল ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনর্থক জেদ বজায় রাখিতে যাইয়াও অনেক শাসনকর্ত্তা নিরীহ প্রজাগণকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়া-ছিলেন। মোগলগণের প্রথম আগমনে, হিন্দু এবং মুসলমান পাঠান উভয়েই উহার ফল সমানভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীআনন্দনাথ রায়।

প্রত্যাখ্যাত।

মন্দিরের দ্বারে তব দাঁড়াইনু আসি
দেখিলাম রুদ্ধ সে দুয়ার,
তোমার করুণা-উৎস প্লাবিছে জগত
মোর শুধু নাহি অধিকার!

হে নাথ, করুণাসিন্ধু, হোক্ তাই হোক্!
জানি আমি নহি অধিকারী,
সাধ করি হারায়েছি অমূল্য রতন
তাই আজি পথের ভিখারী।

ধূলায় রহিনু পড়ি তীব্র রৌদ্রতাপে,
ঘুমাইয়া দেখিনু স্বপন,
ধূলি সে অমৃতময় চরণের ধূলি
রৌদ্র তব রূপের কিরণ।

শ্রীমতী সরলাবালা দাসী।

কর্ত্তব্য-লঙ্ঘন।

(১)

তুরী বাজিয়া উঠিল। বৃদ্ধ মাতা কম্পিত হৃদয়ে অশ্রুপূর্ণলোচনে আপনার দুই পুত্রকে রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া গৃহের বাহির হইতে দেখিলেন। হায় হায়—তাঁহার এই মাত্র সম্বল! রাজা দুইটিকেই সৈনিক-বিভাগে ডাকিয়া লইয়াছেন! একটিকেও যদি ছাড়িয়া দিতেন! বিশেষতঃ পিটার ছেলে মানুষ—মার বড় আদরের, সে কোনরূপ কষ্ট সহ্য করে নাই। তাহাকেও যদি মার কাছে থাকিতে দিতেন! অশ্রুধারা বাধা মানিল না—গণ্ড বহিয়া ধীরে ধীরে পড়িতে লাগিল। বড় ছেলে চার্লস্‌কে ডাকিয়া মা বলিলেন, "চার্লি, তোমার জন্য তত ভাবি না, তুমি চিরকালই সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু! কিন্তু পিটার ছেলে মানুষ—যুদ্ধস্থলে কত বিপদ! তাহার প্রাণ রক্ষা করিও! বিপদ এবং তাহার মধ্যে দাঁড়াইও।" চার্লস্ হঠাৎ কেমন একটু ব্যথা পাইল 'পিটারকে রক্ষা করিও'—"মা আমি কি তোমার ছেলে নই? আমাকে কে রক্ষা করিবে মা?" এইরূপ একটা উদ্দাম চিন্তা তাহার হৃদয়কে ক্ষণেকের জন্য আলোড়িত করিল; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই অন্যকে রক্ষা করিবার শক্তি আছে বলিয়া যে গর্ব্ব এবং গৌরব তাহা তাহার মার উপর কাতর মানসিক অভিমানটুকুকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল! সৈনিকোচিত দর্পের সহিত সে প্রতিজ্ঞা করিল—পিটারকে রক্ষা করিবেই।

(২)

গভীর নিশীথে কারাগারের দ্বারের সম্মুখে একজন প্রহরী ধীরপদসঞ্চারে পাহারা দিতেছে। একজন সৈনিক দলত্যাগ করিয়াছিল। এক্ষণে ধৃত হইয়া বন্দীকৃত হইয়াছে, কাল তাহার বিচার হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রাণদণ্ডই ব্যবস্থা—সকলেই তাহা জানে। তবে একটা বিচারের অনুষ্ঠান চাই। দ্বার-রক্ষক ওষ্ঠের উপর দন্ত চাপিয়া আপন মনে মৃদুস্বরে কহিল, "পিটার তুমি একাজ করিলে! মরিলে না কেন? সৈনিকের মর্য্যাদা বুঝিলে না, আত্মসম্মান, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই বুঝিলে না? স্বীয় নিষ্কলঙ্ক অস্ত্রের অবমাননা করিলে।" তাহার পর ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। বোধ হয় তাহার অর্থ এইরূপ—আমার উপর তার রক্ষার ভার না দিলেই ভাল ছিল; কিন্তু তাহার পরই দৃঢ়পদে এদিক ওদিক সঞ্চরণ করিতে

লাগিল। বোধ হয় সঙ্কল্প করিল, "সৈনিকের কর্ত্তব্য করিয়া যাইব। কার কথা কাল আছে। প্রহরী—চার্লস না হয় পিটারের প্রাণদণ্ড হইয়া গেলে আপনি আত্মহত্যা করিয়া মরিব, কিন্তু তাই বলিয়া ভাইয়ের জন্য কর্ত্তব্য ভুলি কিরূপে?" চার্লস তাহার দেশের কাজের কাছে নিজের তুচ্ছ স্বার্থ বলিদান দিয়াই সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিয়াছে! আজি ভাইয়ের প্রাণরক্ষা করিয়া—আপনার সে সম্মান – সৈনিকের সে মর্য্যাদা হারাইতে চাহে না!

এই সময়ে চার্লসের মার কথা মনে পড়িয়া গেল—সেই যে বিদায়কালে রুদ্ধস্বরে মা বলিয়াছিলেন,—"বিপদ এবং পিটারের মধ্যে সর্ব্বদা দাঁড়াইও।" সেই কথাটা বেশী করিয়া চার্লসের মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। সে কিছুতেই ঠিক করিতে পারিল না—যে কি করা যায়। মনে মনে তুলাদণ্ড দ্বারা মাতৃ-আজ্ঞা এবং সৈনিকের কর্ত্তব্য তুলনা করিয়া কাহারও অধিক গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিল না। বার বার চিন্তা করিল, কোন্‌টি মাননীয় কোন্‌টি লঙ্ঘনীয় তাহার নিরূপণ হইল না। সে অসংযত চিত্তে দ্রুতপাদ-চারণা করিতে লাগিল। তাহার মনের মধ্যে মাতৃ-আজ্ঞা এবং সৈনিকের কর্ত্তব্যের মহাদ্বন্দ্ব বাধিয়া গিয়াছে। অবশেষে মাতৃ-আজ্ঞারই জয় হইল।

ধীরে ধীরে কারাদ্বার খুলিয়া চার্লস্ কহিল, "পিটার, শীঘ্র পালাও!"

কম্পিত স্বরে পিটার কহিল, "আর তুমি?"

"আমার অন্যত্র যাইবার অনুমতি নাই; আমি এইখানেই থাকিব। তুমি শীঘ্র পালাও!" বলিয়া সে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ভয়ে পিটার বাহিরে আসিল। চার্লস্ তাহার হাত ধরিল—রুদ্ধস্বরে কহিল—"ভাই পিটার"—চার্লস্ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। পিটার তাহার মুখের দিকে চাহিল, কহিল—"ছাড় না চার্লি!"

"যাও পিটার, শীঘ্র পালাও—মা'কে বলো চার্লি মাতৃ-আজ্ঞা পালন করেছে—চার্লিকে আশীর্ব্বাদ করতে বলো।" চার্লস পিটারের হাত ছাড়িয়া দিল।

প্রাণদণ্ডের হস্ত হইতে একেবারে হটাৎ মুক্তির পথে পড়িয়া, চার্লসকে যে কি বিপদের মাঝে ফেলিয়া গেল পিটার তাহা ভাবিবারও অবসর পাইল না। চার্লসের সজ্জিত অশ্ব নিকটেই একটি বৃক্ষে বাঁধা ছিল, তাহাতে আরোহণ করিয়া পিটার সতর্কতার সহিত পলায়ন করিল। চার্লস্ পূর্ব্বস্থানে শূন্য কারাগারের দ্বারে তেমনি করিয়া পাহারা দিতে লাগিল।

(৩)

প্রভাত হইল দশজন সশস্ত্র সৈন্য-পরিবৃত হইয়া সেনাপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কারাদ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া সবিস্ময়ে চার্লস্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "প্রহরি বন্দী কোথায়?"

চার্লস্ ধীরভাবে বলিল, "পলাইয়াছে!"

"পলাইয়াছে? কেমন করিয়া পলাইয়াছে?"

নির্ভীক হৃদয়ে চার্লস্ উত্তর করিল "আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি!"

সেনাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন ছাড়িয়া দিলে?"

চার্লস্ উত্তর করিল "সে আমার ভাই হয়।"

সেনাপতির মুখ রক্তবর্ণ হইল। সমভিব্যাহারে আনীত সৈন্যগণের উপর চার্লস্‌কে বন্দী করিয়া বিচারের জন্য স্বীয় শিবিরে লইয়া যাইবার জন্য ভার প্রদান করিলেন। চার্লস্ কোনরূপ ভয়ের লক্ষণ না দেখাইয়া আত্মসমর্পণ করিল এবং যথাসময়ে যথাস্থানে আনীত হইল।

সেনাপতি দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বলিতে চাও? কেন বন্দীকে ছাড়িয়া দিলে?"

অকম্পিতভাবে চার্লস্ কহিল, "মা বলিয়াছিলেন—'বিপদ এবং পিটারের মধ্যে দাঁড়াইয়া পিটারকে রক্ষা করিও।' পিটার ছেলে মানুষ, তাই তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি।"

"আর কিছু বলিবার আছে?"

"না!"

সেনাপতি কঠোর ভাবে আদেশ দিলেন—"বিশ্বাসঘাতককে তোপের মুখে উড়াইয়া দাও।"

চার্লস্‌কে বাহিরে মুক্ত বায়ুতে আনা হইল। তখন বৃক্ষাবলীর মধ্য দিয়া স্নিগ্ধ রবির আলো চারিধারে মৃদুভাবে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। মাথার উপর দু' একটি ছোট পাখি উড়িতেছিল এবং অদূরস্থ শিবির মধ্য হইতে রণোন্মত্ত সৈন্যগণের আনন্দধ্বনি শোনা যাইতেছিল।

একটা প্রাচীরের সম্মুখে চার্লস্ উন্নত মস্তকে সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া রহিল—তাহার ভ্রূরেখা এতটুকু কুঞ্চিত হয় নাই! ঠিক তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া চারিজন সৈনিক বন্দুক উঠাইয়া তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া আছে।

সেনাপতি ইঙ্গিত করিলেন—চারিটা বন্দুকেই একেবারে আওয়াজ হইল—

চারিধার মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইল! ধূম অপসারিত হইলে দেখা গেল চার্লসের প্রাণহীন দেহ মৃত্তিকায় লুটাইয়া পড়িয়াছে।

হায়! ইহজগতে মানব-সেনাপতি যাহাকে ক্ষমা করিতে পারিলেন না, পরজগতে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পতি কি তাহার এই কর্ত্তব্য-লঙ্ঘনের অপরাধটুকু ক্ষমা করিবেন না? *

শ্রীনলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়।

মাখন।

প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বেকার একটা ক্ষুদ্র ঘটনার কথা আজ মনে পড়িয়া গেল। আমাদের বাড়িতে এক গোপবধূ নিয়মিত দুগ্ধ জোগাইত। দুধ বেশ ভালই পাওয়া যাইত, কিন্তু কয়েকদিন ধরিয়া হঠাৎ দুধ খারাপ হইতে লাগিল। দুধে আর সেরকম মাখন উঠিল না এবং সে রকম পুরু হইয়া সরও পড়িল না। গোপজাতির সততার উপর সাধারণের বিশ্বাস বড়ই কম। আমারও খুব অধিক বিশ্বাস ছিল না। গোপবধূকে ডাকাইয়া এক-চোট্ খুব বকিয়াছিলাম; মনে করিলাম এই শাসনের ফলে পরদিন ভাল দুগ্ধ পাওয়া যাইবে; কিন্তু দুগ্ধ ভাল হইল না। গোপবধূ নানাপ্রকারে জানাইল যে, তাহার দুগ্ধ খাঁটি এবং গাভিবিশেষের দুগ্ধে কখন কখন মাখন উঠে না। বলা বাহুল্য আমি তাহার কথায় একটু বিশ্বাস করিলাম না। অর্থব্যয় করিয়া জল কিনিতে আর প্রবৃত্তি হইল না। পরদিবসই গোপবধূর হিসাব মিটাইয়া স্থানান্তরে দুগ্ধ লইবার ব্যবস্থা করিলাম।

দুধে সর পড়ে নাই ও মাখন উঠে নাই বলিয়াই গোপবধূকে এত লাঞ্ছনা-ভোগ করিতে হইয়াছিল এবং সেই কারণেই আমাদের বাড়ীতে তাহার প্রবেশাধিকার রহিত হইয়াছিল। আজ একখানি পুস্তকে পড়িতেছিলাম কেবল মাখন ও সরের পরিমাণ হইতে দুগ্ধের ভালমন্দ বিচার করা চলে না। তাই আজ কঠোর বাক্যে জর্জ্জরিত গোপবধূর অবনত মুখ মনে পড়িয়া গেল।

* ইংরাজী হইতে অনুদিত।

হয় ত তাহার সততায় অবিশ্বাস করিয়া আমি একটা অবিচার করিয়াছিলাম।

যদি কয়েকবিন্দু দুগ্ধ লইয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করেন, তবে পাঠক দেখিবেন, দুগ্ধ জিনিষটা জল বা তৈলের ন্যায় একটা সমঘন (homogeneous) বস্তু নয়। ইহার সর্ব্বাংশে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষাকার সাদা জিনিস ভাসিয়া বেড়ায়। ইহারাই দুগ্ধকে শ্বেতবর্ণ প্রদান করে। জলসাগুর ভিতরকার সাগুদানাগুলিকে আরো ক্ষুদ্র কল্পনা করিলে জিনিসটা যে প্রকার হয়, অনুবীক্ষণে দুধকে কতকটা সেই প্রকার দেখায়। এই সূক্ষ্ম জিনিসগুলিকে ঘৃতকোষ বলে। ইহার প্রত্যেকটিই ঘৃতে পূর্ণ। আমরা যখন মাখন প্রস্তুত করি, তখন দুধের জলীয় অংশকে বর্জ্জন করিয়া এই কোষগুলিকেই সংগ্রহ করি এবং ঘৃত প্রস্তুত করিবার সময় তাপ-সাহায্যে সেই কোষগুলিকেই ফাটাইয়া ভিতরকার ঘৃত বাহির করি। তা'ছাড়া দুগ্ধ-ব্যবসায়ী যখন নির্ম্মল ভাবে খাঁটি দুধে জল ঢালে, তখন সেই শ্বেত ঘৃতকোষগুলিই দূরবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে বলিয়াই তাহার স্বাভাবিক রং রক্ষা করা দায় হইয়া উঠে।

বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, একশত ভাগ দুধে মোট সাড়ে তিন ভাগ ঘৃতকোষ থাকে এবং অবশিষ্ট সাড়ে ছেঁয়ানব্বুই ভাগের মধ্যে ঊননব্বুই ভাগে জল ও বাকি কয়েক ভাগে অপর কয়েকটি জিনিস মিশানো থাকে।

কিছু দুধ্ একটি পাত্রে রাখিয়া ঝাঁকাইতে থাকিলে ঘৃতকোষগুলি তাহার সর্ব্বাংশে ছড়াইয়া পড়ে; কিন্তু ইহাকেই আবার কিয়ৎকাল অচঞ্চল অবস্থায় রাখিয়া দিলে, কোষগুলি একে একে উপরে উঠিয়া জমিতে আরম্ভ করে। জলে তৈল মিশাইয়া সমস্ত মিশ্র পদার্থকে ঘোলাইলে তৈল যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় বিভক্ত হইয়া জলের সর্ব্বাংশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, ঘৃতকোষগুলিও ঠিক সেই প্রকারে দুগ্ধের সর্ব্বাংশে ব্যাপ্ত থাকে এবং কোন প্রকারে আলোড়িত না করিলে উদাহৃত তৈলকণার ন্যায়ই সেগুলি দুগ্ধের উপরে আসিয়া জমা হয়। এই জমাট ঘৃতকোষগুলিকেই আমরা অবস্থা বিশেষে কখন সর এবং কখন মাখন বলি।

দুগ্ধ খাঁটি হইলেও কোন দুগ্ধ হইতে অল্প এবং কোন দুগ্ধ হইতে অধিক মাখন পাওয়া যায় কেন, এখন দেখা যাউক। পাঠক অবশ্যই জানেন যে, সকল জিনিসের ওজন ঠিক সমান আয়তনের (Volume) জলের ওজন

অপেক্ষা লঘু, তাহাদিগকে কোনক্রমে জলে ডুবাইয়া রাখা যায় না। একখণ্ড কাষ্ঠকে জলে ডুবাইয়া ছাড়িয়া দাও,—কাঠের নীচে চাপ দিয়া জল তাহাকে ভাসাইয়া দিবে। হিসাব করিলে দেখা যায়, জিনিস ডুবিয়া যতটুকু জল স্থানান্তরিত করে, তাহারি ভাবের অনুরূপ একটা ঠেলা পাইয়া নিমজ্জিত বস্তু মাত্রেই ভাসিতে চেষ্টা করে। কাঠ ও সোলা প্রভৃতির ভার সম-আয়তন জলের ভার অপেক্ষা লঘু, তাই এগুলি জলে ভাসে। ধাতুপিণ্ডের ভার সমান আয়তন জলের ভার অপেক্ষা গুরু, তাই সেই জলের ঠেলা তাহাকে ভাসাইবার পক্ষে প্রচুর হয় না। কাজেই ধাতুপিণ্ড ভাসিতে চেষ্টা করিয়াও ভাসিতে পারে না। ঘৃতকোষগুলি আপনা হইতেই দুধের উপরে আসিয়া ভাসে, সুতরাং এগুলি যে দুধের জলীয় অংশ অপেক্ষা লঘু তাহা আমরা অনায়াসেই অনুমাণ করিতে পারি।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, ঘৃতকোষমাত্রই যদি তাহার পার্শ্বস্থ জলীয় অংশ অপেক্ষা লঘু হয়, তবে কোন কোন দুগ্ধ হইতে মাখন উঠানো অসাধ্য হয় কেন? ঘৃতকোষের অভাবকে ইহার কারণ বলা যাইতে পারে না। খাঁটি গো-দুগ্ধ মাত্রকেই বিশ্লেষ করিল শতকরা সাড়ে তিন ভাগ ঘৃতকোষ পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকগণ ইহার অন্য প্রকার উত্তর দিয়া থাকেন। ইহাঁরা বলেন সকল দুগ্ধের ঘৃতকোষের আকার সকল সময় সমান থাকে না; বিশেষ বিশেষ সময়ে একই গাভির দুগ্ধে ঘৃতকোষ কখন বৃহৎ এবং কখন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইয়া দাঁড়ায় এবং পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, কোষ ক্ষুদ্র হইলেই সেগুলি বড় কোষের ন্যায় অল্প সময়ে উপরে আসিয়া জমিতে পারে না। কাজেই ক্ষুদ্র কোষময় দুগ্ধ হইতে মাখন প্রস্তুত করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। কোষের আয়তনের সহিত তাহার ভাসা না ভাসার সম্বন্ধটী ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। এখানে একটি ছোটখাটো গণিতিক কথার অবতারণা আবশ্যক।

কথাটি এই যে, কোন গোলাকার জিনিসের ব্যাস যতই ছোট করা যায় তাহার পৃষ্ঠ ফল (Area of the surface) ও আয়তনের (Volume) অনুপাত ততই বাড়িয়া চলে। মনে করা যাউক একটি গোলকের ব্যাস চারি ইঞ্চি এবং অপর আর একটির ব্যাস দুই ইঞ্চি। হিসাবে বৃহত্তর গোলকটির পৃষ্ঠফল প্রায় ৫০ বর্গ ইঞ্চি এবং আয়তন প্রায় সাড়ে তেত্রিশ ঘন-ইঞ্চি দেখা যায় এবং ঠিক সেই হিসাবে ক্ষুদ্রটির পৃষ্ঠফল ও আয়তন যথাক্রমে সাড়ে বারো বর্গ ইঞ্চি ও সাড়ে চারি ঘন ইঞ্চি হইয়া পড়ে; সুতরাং

দেখা যাইতেছে বৃহত্তর গোলকের পৃষ্ঠফল তাহার আয়তন অপেক্ষা দ্বিগুণেরও কম; কিন্তু দ্বিতীয় গোলকটির পৃষ্ঠফল আয়তনের প্রায় তিন গুণ। গোলকের ব্যাস আরো ছোট থাকিলে তাহার পৃষ্ঠফল যে আয়তন অপেক্ষা আরো বাড়িয়া চলিবে, পূর্ব্বের হিসাব হইতে আমরা তাহা বেশ বুঝিতে পারি। দুগ্ধের সেই ক্ষুদ্র কোষগুলির ভাসিয়া উঠার সহিত তাহাদের এই পৃষ্ঠফলের একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কারণ যে জিনিসের পৃষ্ঠফল তাহার আয়তনের তুলনায় যত অধিক হয়, পার্শ্বস্থ জল তাহার গতিরোধ করিবার ততই সুবিধা পাইয়া যায়। একখণ্ড রাঙ্গের পাতকে জলে ফেলিয়া পরীক্ষা করিলে, সেখানিকে অতি ধীরে ধীরে নীচে নামিতে দেখা যায়; কিন্তু সেই পাত-খানিকেই বর্ত্তুলাকারে জড়াইয়া জলে ফেলিলে, সেটি নিমেষে তলাইয়া যায়। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি দুগ্ধের কোষগুলি যখন ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট হয়, তখন তাহাদের আয়তন যত কমে, পৃষ্ঠফল তত কমে না। কাজেই উদাহৃত রাঙ্গের পাত জলের তলায় নামিতে যে প্রকার বাধা পাইয়াছিল, এখানে কোষগুলিও ঊর্দ্ধাগমনে ঠিক সেই প্রকারই বাধা পাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি। ক্ষুদ্র ঘৃতকোষযুক্ত দুগ্ধ হইতে মাখন না পাওয়ার ইহাই একমাত্র কারণ; সুতরাং দুগ্ধ হইতে মাখন বা সর পাওয়া গেল না বলিয়াই তাহাকে অবিশুদ্ধ মনে করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

যে দুগ্ধে বড় বড় ঘৃতকোষ থাকে তাহা মাখন প্রস্তুত পক্ষে খুব উপযোগী; কিন্তু আজকাল আবার ক্ষুদ্র কোষময় দুগ্ধেরও উপযোগিতা দেখা যাইতেছে। চিকিৎসকেরা এই প্রকার দুগ্ধকে রোগীর সুপথ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কাজেই হাতের গোড়ায় ক্ষুদ্রকোষময় দুগ্ধ না পাইলে, সাধারণ দুগ্ধের বড় কোষগুলিকে ভাঙ্গিয়া ছোট করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে। আমরা এখানে একটীমাত্র উপায়ের কিঞ্চিৎ আভাস দিব। এই প্রক্রিয়ায় সাধারণ দুগ্ধ কাচের পিচ্‌কারির ভিতর রাখিয়া পরে তাহাকে পিচ্‌কারির মুখ দিয়া বাহির করিয়া লওয়া হয়। পিচ্‌কারির মুখের ছিদ্র অতি সূক্ষ্ম থাকে এবং অত্যন্ত বলপ্রয়োগ করিয়া পিচ্‌কারি চালাইতে হয়। দুগ্ধের বড় বড় কোষগুলি যন্ত্রের সংকীর্ণ মুখ দিয়া জোরে বাহির হইবার সময় ভাঙ্গিয়া গিয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারবিশিষ্ট হইয়া পড়ে। সাধারণ দুগ্ধের প্রায় ১৬ হাজার কোষ পর পর সাজাইলে, তবে তাহাদের সমবেত দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চি, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রমুখ-নির্গত দুগ্ধের কোষগুলি এত ছোট হইয়া যায় যে, তাহাদের

অন্যূন পঁচিশ হাজারটি পর পর না সাজাইলে এক ইঞ্চি পূর্ণ হয় না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এই প্রকার দুগ্ধ হইতে কোনক্রমেই মাখন উঠানো যায় না। পৃষ্ঠফলের তুলনায় ইহার সূক্ষ্ম কোষগুলির আয়তন এত ক্ষুদ্র হইয়া দাঁড়ায় যে, লঘু উপাদানে গঠিত হইলেও, তাহারা পার্শ্বস্থ জলীয় অংশের বাধা অতিক্রম করিয়া কোনক্রমে উপরে উঠিতে পারে না। সাধারণ দুগ্ধকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্ষুদ্র কোষসম্পন্ন করা আজকাল আমেরিকা ও য়ুরোপের একটা ছোটখাটো নূতন ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

ঊর্দ্ধে।

কে যেন আমায়, ডাকিছে কেবলি,
ঊর্দ্ধে অনেক দূরে ;
বসি' যেন কোন অচেনা তারায়,
কি জানি কেমন নবীন ভাষায়,
ও যেন গো সদা বাঁশরী বাজায়,
কেমন করুণ সুরে।
কে যেন আমায়, ডাকিছে কেবলি,
ঊর্দ্ধে অনেক দূরে!

বিশ্বপ্লাবিয়া উঠিয়াছে তান,
রবি, শশী, তারা তাহে ভাসমান,
সে গানে পাগল হ'য়েছে পরাণ,
সব গেছে ভেঙ্গে চুরে।

আমাতে গো আর যেন আমি নই,
মিথ্যা এ আমি, আমি তবে কই,
খুঁজিয়া কেবল স্তম্ভিত হই,
বাক্য নাহি স্ফুরে।
কে যেন আমায়, ডাকিছে কেবলি
ঊর্দ্ধে অনেক দূরে!

স্বপ্নের মত কণ্ঠ জড়ায়ে,
কহে,—"দাও প্রাণ বিশ্বে ছড়ায়ে,
জঞ্জাল যত ফেল গো সরায়ে,
আসিতে হ'বে না ঘুরে।"
কে যেন আমায়, ডাকিছে কেবলি,
ঊর্দ্ধে অনেক দূরে!

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মৌ।

পুণ্যরূপিণী প্রাতঃস্মরণীয়া স্বর্গীয়া মহারাণী অহল্যা বাঈএর প্রতিষ্ঠিত ইন্দোর নগরী, মধ্যভারতের একটি প্রধান দেশীয় রাজ্যকেন্দ্র ও ইংরাজদের সিভিল ষ্টেসন। ইহার পূর্ব্বেই "মৌ"। মৌ—মিলিটারী ষ্টেসন। সকল দেশীয় রাজ্যের নিকটে এইরূপ একটী সেনানিবাসপূর্ণ ক্ষুদ্র নগরী থাকিবেই থাকিবে।

মৌ, সুদূরব্যাপী, গগনস্পর্শী বহুদূর-বিস্তৃত বিন্ধ্য পর্ব্বতশ্রেণীর এক বিস্তীর্ণ সমতল উপত্যকার উপর স্থাপিত। মৌএর আশেপাশে চারিদিকে ভগবানের কীর্ত্তি,—উন্নত পর্ব্বতমালা। আর উপত্যকা-মধ্যে বহুল ব্যারাক-বিপণী-বসবাস-পূর্ণ মনুষ্যকীর্ত্তি—ক্ষুদ্র মৌ নগরী।

মৌ এর প্রতিষ্ঠা বেশী দিন নহে। যে সময়ে ইংরাজ-রাজশক্তি মধ্য ভারতে আপনাদের অব্যাহত শক্তি বিস্তার করিয়া কতকগুলি স্বাধীন রাজ্যকে করদের স্তরে নামাইয়াছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক করদ রাজ্যের নিকট একটী করিয়া অশ্বারোহী-পদাতি-গোলন্দাজপূর্ণ ছাউনী স্থাপন করিয়াছেন।

মৌ একটী জলপূর্ণ সহর। অধিবাসীর মধ্যে মারোয়ারির সংখ্যাই বেশী। সহরটীও বড় কম নয়। মারোয়ারীর নিচে পার্শীদের স্থান। বোম্বের অনেক মধ্যবিত্ত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের শাখা মৌ ছাউনীতে পাকা বসবাস করিয়া আসিতেছেন। এই অগ্নি-উপাসকগণের প্রধান লক্ষ্য ব্যবসা-বাণিজ্য। তাহা ছাড়া অনেকে চাকরীও করিয়া থাকেন। মৌএর নিকটেই ইহাদের একটি সমাধিক্ষেত্র বা Tower of Silence.

মৌ এর পার্শী পল্লীগুলি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বড় লোকের কথাই নাই। তাঁহারা বড় বড় বাঙ্গালোতে বাস করেন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের কথাই

বলি। এক একটী বাড়ীতে দুই তিনজন পার্শী বসবাস করেন। ঘরদ্বার-গুলি, আঙ্গিনাগুলি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কোন কোন গৃহদ্বারে মাঙ্গল্য চিহ্ন-জ্ঞাপক, পর্ব্বচিহ্ন-সূচক চিত্রিত গুঁড়ির পদ্ম বা নানাবিধ আলিপনা। রাস্তায় বা প্রশস্ত গলির পার্শ্বেই একটানা পাশাপাশি অনেকগুলি বাড়ী। সকল গুলিতেই মধ্যবিত্ত অবস্থার পার্শীগণ বাস করে। বিবাদ-বিসম্বাদ নাই, কোলাহল নাই, অশান্তি নাই, অপরিচ্ছন্নতা নাই—সকলেই বেশ মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতেছে।

সিমেণ্ট বা প্রস্তর-মণ্ডিত প্রশস্ত, মাটী হইতে ৫।৬ হাত উচ্চ দাওয়ার উপর বেতের মোড়া চেয়ার, বা ক্যাম্বিসের ইজি চেয়ারে বসিয়া প্রবীণা বৃদ্ধা যুবতী পার্শীবাসীগণ খোসগল্প, পুস্তক-পাঠ, বা সূচীকার্য্য করিতেছেন। ইঁহাদের সকলেরই মাথায় একখানি শুভ্র রুমাল বাঁধা। কেহ বা কাজ করিতেছেন—কেহ বা গল্প করিতেছেন, কেহ বা চাকরকে গৃহস্থালী বুঝাইতেছেন, কেহ বা ছোট ছোট ছেলেদের হাত ধরিয়া বেড়াইতেছেন। পার্শীরমণীরা দেখিতে সুন্দরী। সকলে সমান সুন্দরী না হইলেও অধিকাংশই গৌরবরণী।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মৌ পর্ব্বত-মণ্ডিত স্থান। আণ্ডেরা হইতে মৌ আসিতে হইলে নর্ম্মদার এক প্রকাণ্ড সেতু পার হইতে হয়। খালি তাই নয়—এই পথে চারিটী টনেলও অতিক্রম করিতে হয়। টনেলগুলি খুব কাছাকাছি; কিন্তু গাড়ীগুলি যখন হুস্‌হাস শব্দে তাহার অন্ধকারময় বক্ষে প্রবেশ করে তখন মনে হয় বুঝি এই সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যেই আমাদের সমাধি হইবে।

মৌ সহরের রাস্তাগুলি বেশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। এখানে ইংরাজ অধি-বাসীর সংখ্যা বড় কম নয়। দেশী সহরের গায়েই ইংরাজের ছাউনী। ছাউনীর মধ্যে কলিকাতা দুর্গের বড় বড় ব্যারাকের মত দ্বিতল ত্রিতল ও চতুস্তল বাটী। মধ্যে মধ্যে ময়দান ও উন্মুক্ত স্থান ইহারই আশেপাশে মাজিষ্ট্রেট ও মিলিটারী অফিসারদের বসৎ বাঙ্গালা ও আফিস।

মৌ সহরের একটী প্রধান রাস্তা দেশীয় পল্লীর মধ্য দিয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া আশেপাশে আরও অনেক রাস্তাঘাট আছে। রাস্তাগুলির অবস্থান বড় সুন্দর। কোথাও বা রাস্তা চড়াইএর মুখে গিয়া পৌঁছিয়াছে—কোথাও বা ঢালু হইয়া বরাবর নীচে চলিয়া গিয়াছে। নীচু রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলে উপরের রাস্তার বাড়ীগুলি বেশ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু একটা বাঁক

ঘুরিয়া উপরের রাস্তায় উঠিলে, নীচের বড় বড় বাঙ্গলাগুলি উৎরাইএর গভী-রতার মধ্যে ডুবিয়া যায়।

মৌ এ কমিসারিয়েট আফিস, অর্ডিনান্স বিভাগ, গ্যারিসন ইঞ্জিনিয়ারের আফিস প্রভৃতি অনেকগুলি সরকারী কার্য্যালয় আছে। মৌ এ সিভিল কোর্ট নাই। একজন ক্যাণ্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন, তিনি দেওয়ানী ও ফৌজদারি উভয় বিভাগেই শাসন-দণ্ড পরিচালনা করেন। আপীল-আদালত ইন্দোরে। মৌ এ একজন বিখ্যাত পার্শী উকীল মিঃ বেরি ও একজন নামজাদা বাঙ্গালী উকীল—বাবু কুসুমকুমার চট্টোপাধ্যায় এই কোর্টে প্রাক্‌টিস করেন। কুসুম বাবু এখানকার একজন মান্যগণ্য লোক এবং প্রাচীন ও প্রবীণ বাঙ্গালী অধিবাসী। তাঁহার সরলতা ও অমায়িকতায় সকলেই তাঁহাকে সম্মান করে। তিনি আবার এদিকে মিউনিসিপ্যাল কমিটির মেম্বর ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট। আমি ভাগ্যক্রমে তাঁহারই অতিথি হইয়াছিলাম। ওরূপ আদর-যত্ন বোধ হয় নিজ পরিবারের মধ্যেও পাই নাই।

মৌ এ অনেক পদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারী আছেন। ইঁহাদের অনেকে ইন্দোর রেসিডেন্সি ও মিলিটারি বিভাগ-ভুক্ত। একজন কম্যাণ্ডিং অফিসার ও তাঁহার অধীনে অনেক মেজর লেফ্‌টেনাণ্ট আছেন; কিন্তু ইঁহাদের আচার-ব্যবহার বাঙ্গালাদেশের ইংরেজদের অপেক্ষা অনেক উন্নত। দেশীয় লোকের ও ইঁহাদের বাঙ্গলা হয়ত পাশাপাশি ভাবে অবস্থিত। তজ্জন্য ইঁহারা কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করেন না। বরঞ্চ দেশীয়দের সঙ্গে তাঁরা একটু মেশামেশি ভাব দেখাইয়া থাকেন।

মৌএর মেইন ষ্ট্রীটের উপর সাহেবী দোকানসমূহ অবস্থিত। সাহেবী দোকা-নের নাম শুনিয়া কেহ যেন কলিকাতার হোয়াইটএওয়ে এণ্ড লেড্‌ল বা হল আণ্ডারসানের দোকানের চিত্র মনে না করেন। এখানকার সাহেবী দোকানগুলি দেশীয়দের দ্বারাই পরিচালিত অর্থাৎ এদেশীয় লোকেরাই মারোয়ারী শেঠি, হিন্দুস্থানী ও পার্শী দোকানদারেরাই মেমসাহেবদের প্রয়োজনীয় ফ্যান্সি দ্রব্যাদি, নানাবিধ সাটিনের কাপড়, লেস্ প্রভৃতির ব্যবসা করেন। দোকানগুলি আমাদের কলিকাতার বড়বাজারের দোকানের মত। কোন শো-রুম (Show-room) নাই। যে জিনিস খরিদদার চাহিতেছে, দোকানী তাহা বাহির করিয়া দিতেছে।

সকল মিলিটারি ষ্টেসনে "পিল-খানা" থাকে না; কিন্তু মৌ বোম্বে কমা-

গুের একটী প্রধান কেন্দ্র বলিয়া এখানে, একটী পিলখানা আছে। হাতি থাকিবার ঘরগুলি দুইতিন তোলার সমান উঁচু। দুই তিনটী খিলানে— এক একটী পিলখানার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

মৌ এ খাবার জিনিসপত্র যথেষ্ট পাওয়া যায়। সুজন্মার বৎসরে টাকায় ষোল সের আটাও মিলে। ঘৃত টাকায় পাঁচ পোয়া, সময়ে সময়ে দেড় সের। এতদ্ভিন্ন বাজরা, গম, যব, ভুট্টা প্রভৃতি শস্যে বাজার-গৃহগুলি পরিপূর্ণ। শীতকালে কপি কড়াইসুটীও পাওয়া যায়। মাংস খুব সস্তা। উৎকৃষ্ট মটন চারি আনা সের।

খাতেয়া হইতে (ইহাই মহাভারতোক্ত খাণ্ডব বন) যতই রেলপথে অগ্রসর হইয়াছি, ততই দুইধারে মাঠের মধ্যে কাপাসের চাষ দেখিয়াছি। মধ্য ভারতে কাপাসের চাষ কিছুই বেশী। তুলাও বেশ শুভ্র, গাঁটবিহীন হয়। বেশী বিটি থাকে না। কাপাস গাছগুলি ঊর্দ্ধে দুই হাতের বেশী হয় না। যখন সকল গাছগুলিতে তুলার কোষ ফাটিয়া গিয়া দুগ্ধের ন্যায় সাদা তুলা বাহির হইয়া পড়ে, তখন দুই চারি ক্রোশব্যাপী বিস্তৃত কাপাস ক্ষেত্রের দিকে চাহিলে বোধ হয়—কে যেন নিখুঁত সাদা মেঘগুলিকে কাপাসের ক্ষেতের উপর ছড়াইয়া দিয়াছে। এই সকল তুলা মৌ, ইন্দোর, খাণ্ডুয়া, নিমচ, ধার, প্রভৃতি স্থানের বাজারে বিক্রয় ও বোম্বায়ের আহমদাবাদের বড় বড় কলগুলিতে ব্যবহৃত হয়।

মৌ ও ইন্দোরের মধ্যে হোলকার মহারাজের একটী "ডিয়ার পার্ক" (Deer park) বা হরিণ শিকার-ক্ষেত্র আছে। এই ক্ষেত্রটী আট দশ ক্রোশ বিস্তৃত, ইহার মধ্যে নানাজাতীয় হরিণ সুরক্ষিত। হরিণের পাল মহারাজের নিজ সম্পত্তি, তাঁহার অনুমতি ভিন্ন কেহ হরিণ বধ করিলে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়। রাজা সপারিষদ কখন কখন শিকার করিতে আসেন এবং কোন রেসিডেণ্ট গবর্ণর জেনারেলের এজেণ্ট বা লাট সাহেব এসব প্রদেশে আসিলে তাঁহার শিকার-স্পৃহা চরিতার্থের জন্য এই সব পার্কের দ্বার উন্মুক্ত হয়।

মৌ হইতে দুই ক্রোশ দূরে "জামদগ্নি পাহাড়"। দেশী লোকেরা ইহাকে "জাসাপা" পাহাড় বলে। জনশ্রুতি যে, জাসাপা পাহাড়ে জামদগ্নি ঋষি বাস করিতেন। জাসাপা পাহাড়ের অনতিদূরে পাহাড়-বেষ্টিত সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে মহাভারতোক্ত মাহিষ্মতীপুরীর স্থান। স্থানে স্থানে জঙ্গলের মধ্যে প্রস্তর স্তূপ ব্যতীত এই পুরীর কোন চিহ্নই দৃষ্টিগোচর হয় না।

আমরা একদিন জাসাপা-পাহাড়ে জামদগ্ন ঋষির তপস্যা-স্থান দেখিবার

জন্য যাত্রা করি। এখানকার প্রসিদ্ধ উকীল সহৃদয় কুসুম বাবু আমায় সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। তাঁহার একখানি সুন্দর "ডগকাট" ছিল। সেই গাড়ীতে একটী কালরঙ্গের বলিষ্ঠ টাটু। পাহাড়ে-পথে চলিতে দেখিলাম সে ঘোড়াটী খুব অভ্যস্ত। নিম্নশ্রেণীর পশুর সংস্কার সম্বন্ধে অনেক কথা শোনা যায়; কিন্তু সেদিন একটী ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া এ বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হইল। ঘোড়াটী এতক্ষণ বেশ স্ফূর্ত্তির সহিত লাফাইতে লাফাইতে আসিতেছিল; কিন্তু একটী পাহাড়ের ৩।৪ রশী দূরে আসিয়া সহসা দাঁড়াইয়া পড়িল। কুসুমবাবু অনেক চেষ্টায়ও আর তাহাকে অগ্রসর করাইতে পারিলেন না। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য আমরা সেই উপত্যকা-তলে নামিয়া পড়িলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে বড় আতঙ্ক জন্মিল।

নিকটস্থ একটী খাদে দুইটী গরুর মৃতদেহ পড়িয়া আছে। ইহার সন্নিকটে নিশ্চয়ই ব্যাঘ্র আছে। এই আভাগা জীবদ্বয় তাহাদেরই শিকার। তখন সন্ধ্যা হইতে একঘণ্টা বিলম্ব। জাসাপা পাহাড়ে থাকিলে বাঘের মুখে পড়িতে হইবে, এই ভাবিয়া আমরা বাটী প্রত্যাগমনের বন্দোবস্ত করিলাম। ঘোড়াটী এই দুটী মৃত গো-দেহ দেখিয়াই চঞ্চল হইয়াছিল।

এমন সময়ে, একজন জোয়ান ভীল সেইস্থানে আসিল। তাহার হাতে একটী টাঙ্গি। তাহার সঙ্গে আর একটী বালক ছিল। তাহার বয়স ১৩।১৪ বৎসর। সেও বেশ বলিষ্ঠ, তাহার হাতে একটী বর্ষা ও মশাল। ভীলেরা হিন্দী বুঝিতে পারে। সে বলিল—"বাবু, অগ্রসর হইবেন না এখনি গাড়ী ঘোড়া লইয়া পলায়ন করুন। জাপাসা পাহাড়ে দুইটী বড় বাঘ আসিয়াছে। আজই মধ্যাহ্নে তাহারা এই গাই-গরু দুটীকে নষ্ট করিয়াছে। কোতোয়াল বাঘ মারিবার হুকুম পাইয়াছে। আমরা ষোলজন দল বাঁধিয়া বর্ষা, টাঙ্গি ও বন্দুক লইয়া বাঘ দুইটীকে মারিবার চেষ্টা করিতেছি। আজ রাত্রে আমরা পাহাড়েই থাকিব। আমাদের বাঘ-শিকার করিতেই হইবে।"

আমরা সেই দরিদ্র ভীলকে এই সংবাদের জন্য কিছু বক্‌শীস্ করিলাম। সে বড় খুসী হইয়া সেলাম করিল। "যঃ পলায়তি স জীবতি" নীতির অনুসরণে আমরা বাটী ফিরিয়া আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

দুঃখিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মহেন্দ্রপুরে রামসত্য ঘোষ নামে একজন মধ্যবিত্ত লোক বাস করিতেন। তাঁহার সহায়সম্পত্তি বিশেষ কিছু ছিল না, তবে যে সামান্য জমিজমা ছিল তাহা হইতেই কায়ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। গ্রামের মধ্যে নির্ব্বিরোধ লোক বলিয়া রামসত্যের সুনাম ছিল, এই জন্য মধ্যে মধ্যে গ্রামের জমিদার মহাশয় রামসত্যকে ডাকিয়া লইয়া অনেক বিষয়ে কথোপকথন এবং পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। তাঁহার সংসারে স্ত্রী, একটী কন্যা একটী পুত্র এবং তিনি নিজে; বাটীতে চাকর চাকরাণী ছিল না; সমস্ত কার্য্য নিজেরাই করিতেন, বাড়ীতে তিনটী গরু ছিল।

যে বৎসরে রামসত্যের কন্যাটী জন্মে, সে বৎসরে গ্রামে বড় মহামারী উপস্থিত হয় এবং সেই সময়ে রামসত্যের মাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হয়; এই কারণে রামসত্য কন্যাটীর নাম দুঃখিনী রাখিয়াছিলেন। আমরা যে বৎসরের কথা বলিতেছি তখন দুঃখিনীর বয়স পাঁচ ছয় বৎসর এবং রামসত্যের পুত্র রসিকের বয়স তিন বৎসর।

এই সময়ে একদিন রামসত্যের স্ত্রীর জ্বর হইল। গ্রামের খ্যাতনামা কবিরাজ মহাদেব সেন আসিয়া পানের রস এবং মধু দিয়া কি ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তাহাতে জ্বর আরও বৃদ্ধি হইল; কিছুতেই জ্বরত্যাগ হইল না। তৃতীয় দিন সন্ধার সময়ে রামসত্যের স্ত্রী নিজের পুত্র কন্যাকে অগাধ দুঃখ-সাগরে ভাসাইয়া হরিনাম করিতে করিতে সতী স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

রামসত্য এখন ঘোর বিপদে পড়িলেন। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; পুত্র এবং কন্যার লালনপালনের জন্য বড়ই ব্যস্ত হইলেন। কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দিবারাত্রি ছেলেমেয়ে লইয়া বসিয়া থাকিলে দিনান্ন সংস্থান হওয়া কঠিন, অথচ বাটীতেও এমন একটী লোক নাই, যাহার নিকটে শিশু পুত্রকন্যা রাখিয়া যান। রামসত্যের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কুটুম্ব কেহ ছিলেন কিনা তাহা আমরা জানি না, থাকিলেও বোধ হয় তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া কেহই এ সময়ে আত্মীয়তা স্বীকার করিতেন না। রামসত্য চিন্তা করিতে লাগিলেন, যদি স্বজাতীয়া একটী স্ত্রীলোক পান। অনেক অনুসন্ধানে জানিতে

পারিলেন যে তাঁহার পিতার একটী পিস্‌তুতো বিধবা ভগ্নী আছেন; আরও অনুসন্ধানে জানিলেন যে, তাঁহার অবস্থা রামসত্যের অবস্থা অপেক্ষাও শোচনীয়, তাঁহারও অন্ন সংস্থান নাই। রামসত্য সেই পিসিকে আনিবার জন্য তাঁহার বাটীতে গেলেন। পিসিও অনেক দিন পরে ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখিয়া এবং পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইলেন। পিসির আনন্দিত হইবার অনেক কারণ ছিল; প্রথম তিনি মনে করিলেন—হয়ত রামসত্য তাঁহার দুরবস্থার কথা শুনিয়া তাঁহাকে লইতে আসিয়াছে, শেষে মনে করিলেন নিতান্ত পক্ষে যদি লইয়াও না যায়, তবুও, আমার কষ্টের কথা শুনিলে কিছু না কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা অবশ্যই করিবে। রামসত্য হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া পিসির দাওয়ায় বসিলেন। পিসির সবেমাত্র একখানি ঘর, দাওয়ার এক পার্শ্বেই রন্ধন এবং ঘরের মধ্যে শয়নের স্থান, ঘরে মূল্যবান দ্রব্যাদি কিছুই নাই।

পিসি এক্ষণে আস্তে আস্তে রামসত্যের নিকট আসিয়া বসিলেন এবং রামসত্যকে জিজ্ঞাসা-পড়া করিতে লাগিলেন। তাহার পর পিসি যখন শুনিলেন যে, রামসত্যের স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, তখন তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "আজ দাদাই যদি বেঁচে থাকতেন্ তবে কি আমি আর এ সংবাদ পাই না; তোমরা ছেলে মানুষ। আহা! বউ আমার কত কষ্ট পেয়েই মরেছে। আমার যে কত পোড়া কপাল তা তোমরা বুঝবে কি করে। আমি দিবানিশি তোমাদের কথাই ভাবি, তা তোমরাত একবার খোঁজও নেবে না যে, বুড়ী আছে না গঙ্গা পেয়েছে। সে কথা এখন থাক্, এখন ছেলে মেয়ের কি ব্যবস্থা করেছ তাই শুনি।"

রাম। সেই জন্যই ত তোমার নিকট এসেছি, তুমি না গেলে আর আমার সংসার চলে না, আমি ছেলেমেয়ে লয়ে মারা যাই।

পিসি। বালাই, যেঠের বাছা! অমন কথা কি বল্‌তে আছে, তোমার শত্রু যে সে মরুক। আমি বেঁচে থাক্‌তে তোমাদের কষ্ট হবে!

পিসিও তাহাই চান; বিশেষ যদি রামসত্য আজ একবেলা থাকেন তাহা হইলে পিসির পক্ষে আহার যোগান বড় কঠিন,কারণ তিনি একটু বেলা হইলে বাহির হইয়া এঁর বাড়ী এ কাজটুকু, ওর বাড়ী ও কাজটুকু করিয়া দেন। কেহ বা দুটো চা'ল দেয়, কেহ বা একটু লবন দেয়, কেহ বা একটা বেগুন দেয়, তাহাই সংগ্রহ করিয়া দ্বিপ্রহর গত হইলে বাটীতে আসিয়া সে দিনের মত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন; কিন্তু রামসত্যের সহিত একটু কুটুম্বিতা

রিবার জন্য বলিলেন—"বল কি, তাও কি হয়, এখন কি যাওয়া হয়; তদিন পরে এলে, দুটো না খেয়ে গেলে কি হয়।"

কিন্তু রামসত্য কিছুতেই সম্মত না হওয়ায় পিসি আর অধিক জেদ্ করিলেন না এবং তাড়াতাড়ি ঘরের সামান্য জিনিসগুলির একরকম ব্যবস্থা করিয়া, বাড়ীর পাশের গয়লাদের বড় বৌকে তাহার ঘরবাড়ী দেখিবার জন্য বারবার অনুরোধ করিয়া গেলেন।

পিসির বাটী হইতে মহেন্দ্রপুর প্রায় পাঁচ ক্রোশ। বেলা দুইটার সময়ে তাঁহারা উভয়ে মহেন্দ্রপুরে পৌঁছিলেন। রামসত্য বাটী হইতে যাইবার সময় মেয়েটী এবং ছেলেটীকে একজন প্রতিবেশীর বাটীতে রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাহারা প্রথমে খানিকক্ষণ বেশ চুপ্ করিয়াই ছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে যত বেলা বাড়িতে লাগিল, ছেলেটী ততই কাঁদিতে লাগিল। দুঃখিনী একে ছেলে মানুষ, তাহাতে আবার মাতার মৃত্যুতে একরকম হইয়াছিল; সে চুপ্ করিয়া ভাইটীকে কোলের কাছে টানিয়া বসাইতে চেষ্টা করিল; ছেলেটী আরও কাঁদিতে লাগিল। ছয় বৎসরের বালিকা সংসারের কিছুই জানে না, সেও কাঁদিতে আরম্ভ করিল। যে বাড়ীতে রামসত্য তাহাদিগকে রাখিয়া গিয়াছিল, সেটি অধিকারীদের বাড়ী। তাদের একটী মেয়ে আসিয়া উভয়কে সান্ত্বনা করিল এবং ছেলেটীকে কোলে লইয়া খেলা করিতে লাগিল। তাহার ভাইটী যে কান্না ত্যাগ করিয়া খেলা করিতে লাগিল সে একদৃষ্টে তাহাই দেখিতে লাগিল, বালকটী শান্ত হইলে দুঃখিনী বলিল "আয় রসিক! ফুলতলায় যাই, তোকে বড় বড় রাঙ্গা ফুল পেড়ে দেব।"

রসিক আনন্দিত হইয়া, "দিদি, দিদি" বলিয়া তাহার কোলে আসিল। রসিক বড় হৃষ্টপুষ্ট ছেলে, দুঃখিনী বড় রোগা, এইজন্য দুঃখিনী রসিককে বেশীক্ষণ কোলে রাখিতে পারিত না; কিন্তু এখন কায়ক্লেশে, কোন প্রকারে রসিককে কোলে লইয়া বাটীর উঠানের নিকট জবাগাছের তলায় আসিল। রসিক তাড়াতাড়ি দিদির কোল হইতে নামিয়াই বলিল "দিদি, এ'টা।" দুঃখিনী সে ফুলটি হাত দিয়া পাড়িয়া দিল। আবার, "দিদি, ঐটা"; সে ফুলটি একটা উপরের ডালে ছিল। দুঃখিনী বলিল, "ওটা যে উঁচুতে রোয়েচে, আমি নাগাল পাবো না।" রসিক তাহা বুঝিল না, কাঁদিতে আরম্ভ করিল। "তবে আয় আঁক্সি আনি"—এই বলিয়া রসিককে লইয়া বাটীর চারিদিক খুঁজিয়া একখানি বড় অথচ হাল্কা বাঁশ পাইল। "রসিক তুই এই দিকটা খুব কসে

ধর্" এই বলিয়া সেদিক তাহার কাঁধে তুলিয়া দিয়া আর একদিক নিজে ধরিয়া গাছের দিকে যাইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে রামসত্য পিসিকে সঙ্গে লইয়া বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পিতাকে দেখিয়া রসিক ফুলের কথা ভুলিয়া গেল এবং কাঁধ হইতে বাঁশ ফেলিয়া দিয়া "বাবা, বাবা এসেছে" বলিতে বলিতে রামসত্যকে জড়াইয়া ধরিল। দুঃখিনীও যাইয়া বাপের কাছে দাঁড়াইল। কেহই আর পিসির নিকট গেল না। রামসত্য বলিলেন, "দুঃখিনী! তোমার দিদিমা এসেছেন, প্রণাম কর।" দুঃখিনী কথাটি বুঝিল না এবং প্রণামও করিল না, রসিক একবার অপরিচিতার মুখের দিকে চাহিল এবং পরক্ষণেই দুঃখিনীর দিকে চাহিয়া বলিল, "ঐ দিদি।" রামসত্য হাসিয়া বলিলেন, "এও, দিদি"; কিন্তু রসিক সে কথা বড় আমলে আনিল না। পিসি আস্তে আস্তে মেয়েটিকে টানিয়া কোলে করিলেন, দুঃখিনী স্বভাবতঃ কিছু শান্ত সেইজন্য সহজেই পিসির কোলে গেল। কিছুক্ষণ পরে দুঃখিনীকে নামাইয়া দিয়া, পিসি ঘরের মধ্যের সমস্ত দ্রব্য দেখিয়াশুনিয়া লইতে গেলেন।

রামসত্য মনে করিয়াছিলেন পিসির হাতে গৃহস্থালীর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন। ছেলেমেয়ের কোন প্রকার অযত্ন হইবে না। পিসিরও সংসারে আপনার বলিতে কেহ নাই, সুতরাং পিসি এই সংসারের যাহাতে কল্যাণ হয় তাহারই দিকে মনোনিবেশ করিবেন; কিন্তু দুই চারি দিনেই রামসত্যের ভ্রম ঘুচিল; তিনি পিসির স্বভাব বেশ বুঝিতে পারিলেন, দেখিলেন পিসির তেল-টুকু, নুন্টুকু বিক্রী করিয়া পয়সাসংগ্রহের অভ্যাস বেশ আছে; পাড়ার লোকেদের সঙ্গে ঝগ্ড়া বিবাদেও পিসি অনভ্যস্ত নহে। পিসির আরও একটী গুণ আছে তাহা আর এখন বলিয়া কাজ নাই। সময় মত পিসিই সে গুণপনা প্রকাশ করিবেন। যাহা হউক রামসত্য অনন্যোপায় হইয়া পিসির অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিলেন। তিনি মনে করিতেন, তবুও ত ছেলেমেয়ে দুবেলা দুটা রাঁধা ভাত পাইতেছে। পিসি না আসিলে যে তাহাকে বিব্রত হইতে হইত। মনকে প্রবোধ দিলেন, দশদিন থাকিতে থাকিতেই তাঁহার সংসার পিসির নিজের হইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে পাঁচ ছয় বৎসর কাটিয়া গেল। এই পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে বিশেষ কোন ঘটনা হয় নাই। দুঃখিনী এবং রসিক তাহাদের

দিদিমার নিকটেই থাকে ; কিন্তু দিদিমার মুখে তাহারা কোন দিন একটা মিষ্ট কথা শুনিতে পায় নাই। দুঃখিনীর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধিরও পরিপক্কতা জন্মিতেছিল, সে রসিক ব্যতীত আর কিছুই বুঝিত না। যখন তাহার দিদিমা রসিককে মারিত, তখন তাহার চক্ষু দিয়া দর দর ধারে জল পড়িত। দিদিমা স্থানান্তরে গেলেই সে ভাইটীকে সান্ত্বনা করিত, ভাইকে কত কথা বলিত, তাহার গায় হাত বুলাইয়া দিত। দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা এই বয়সেই বুঝিয়াছিল যে, সংসারে মা না থাকিলে কত কষ্ট পাইতে হয়। রসিক অনেক সময়ে মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিত কিন্তু দুঃখিনী সে কথার বড় একটা জবাব দিত না। রসিক নিতান্ত আব্‌দার করিলে বলিত, "সকলেরই কি মা থাকে, কাহারও বা মা থাকে. কাহারও বা বাবা থাকে, কাহারও বা দিদি থাকে। দেখ্‌ দেখি! ও বাড়ীর শ্যামের মা আছে, তার দিদি নাই। তোর দিদি আছে, কাজেই তোর মা নাই। তা তুই দিদি চাস্, না মা চাস্।" রসিক অমনি কাতর হইয়া বলিত, "না না, আমি মা চাই না, দিদি চাই।"

এদিকে রামসত্য দুঃখিনীর বিবাহের জন্য বড়ই চিন্তিত হইলেন। দুঃখিনীর যখন আট বৎসর বয়স,তখন হইতেই তিনি বর খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সহায়সম্পত্তি কিছুই না থাকায় এতদিনের মধ্যেও একটী ভাল ছেলে স্থির করিতে পারেন নাই। অনেক স্থান হইতেই সম্বন্ধ আসিয়াছিল ; কিন্তু রামসত্যের অভিপ্রায় ছিল যে দুঃখিনীকে সৎপাত্রে দান করেন। তাঁহার মনের মত পাত্র না পাওয়ায় তিনি এতদিন দুঃখিনীর বিবাহ দিতে পারেন নাই। বিশেষ দুঃখিনী তাঁহার ঘর ছাড়িয়া যাইবে, এ কথা মনে হইলে তাঁহার প্রাণের মধ্যে হাহাকার ধ্বনি উঠিত। তিনি মনে মনে বলিতেন "মেয়ে এমন কি সেয়ানা হইয়াছে। আরও কিছুদিন থাকনা, দুঃখিনী গেলে আমার রসিকের কি হইবে।' কিন্তু তাঁহার পিসি এক্ষণে জাতি যাওয়ার ভয় দেখাইতে লাগিলেন, কলঙ্কের ভয় দেখাইতে লাগিলেন, আরও কত কথা বলিতে লাগিলেন। রামসত্য ভাল মানুষ, বড়ই ব্যাকুল হইলেন। কি করেন, অগত্যা পূর্ব্বে যে সকল পাত্রকে জবাব দিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্য হইতে একটীকেই মনোনীত করিলেন। মহেন্দ্রপুরের সংলগ্ন উদয়পুর গ্রামেই এ পাত্রটির বাড়ী। উদয়পুরকে সাধারণতঃ লোকে উদিয়পুর বলিত। পাত্রের নাম ভজহরি মিত্র। পাত্রটি বাঙ্গলা লেখাপড়া বেশ জানিতেন, ইংরাজীও দুই চারি খানি বই পড়িয়াছিলেন ; বয়স চব্বিশ পঁচিশ বৎসর, ভজহরির বাপ ছিল না।

কিন্তু অন্যান্য আর সকলেই ছিল। তাহার ছোট তিনটী ভাই এবং দুইটী ভগ্নী ছিল। ভজহরি শ্রীহট্টের বন্দোবস্তী আফিসে আমিনের কাজ করিতেন। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। যখন দুঃখিনী শুনিল তাহার বিবাহ হইবে, তখন তাহার আনন্দ হইল না। ছেলেমেয়েরা বিবাহের কথা শুনিলে বাহিরে না হউক অন্তরে আনন্দিত হয় ; কিন্তু দুঃখিনীর আনন্দের পরিবর্ত্তে ভয় ও দুঃখ হইল। সে নিজের বিবাহের কথা ভাবিতে পারিত না, বিবাহের কথা ভাবিলেই তাহার ভ্রাতার কথা মনে পড়িত। এই অল্প বয়সেই দুঃখিনী সংসারের অনেক কথা বুঝিয়াছিল। অবস্থার গুণে একাদশ বর্ষীয়া বালিকাও চিন্তা করিতে শিখে, সংসারের সব বোঝে। দুঃখিনী বুঝিত—বিবাহ হইলেই পরের ঘর করিতে হয়,ইহার অধিক সে বুঝিত না ; কিন্তু তাহা হইলে রসিককে ফেলিয়া যাইতে হইবে, রসিকের মুখের দিকে তাকাইবার কেহ থাকিবে না। একথা যখন দুঃখিনী ভাবিত, তখনই তাহার মনে কষ্ট হইত ও কাঁদিত। সে ভাবিত আমি ছাড়া রসিকের ক্ষুধার কথা কেহ বুঝিতে পারে না। দিদিমা মারিলে রসিক আমার কাছে আসে, আমি এখানে না থাকিলে রসিক কোথা যাইবে, রসিককে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিব। আরও কত কথা দুঃখিনী ভাবিত।

ক্রমেই বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইল। রসিকের আনন্দ আরও বাড়িতে লাগিল। বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যাহাদের সহিত সাক্ষাৎও হইত না, এখন তাঁহারাও আসিয়া রামসত্যের বাটীতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। কেহ দানসামগ্রীর তালিকা করেন, কেহ আহারের ফর্দ্দ করেন, এ সময়ে সকলেই মুরুব্বি হইয়া বসিলেন। ওপাড়ার ঘোষ মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, রামসত্য তাড়াতাড়ি তামাক সাজিয়া দিলেন। তিনি হুকাটী বামহস্তে ধরিয়া জিনিষের বরাদ্দ দেখিতে লাগিলেন, কোন্ দ্রব্য কম হইল, কোন দ্রব্যের আরও প্রয়োজন ইত্যাদি নানাপ্রকার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।—"আর রামসত্য কবে বা ছেলে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে যে বুঝবে। আমরা থাকতে যদি তার অসৌষ্ঠব হয় তবে বড়ই দুঃখের কথা।" এই প্রকার অনেক অভিভাবক আসিয়া বাহিরে তামাকের শ্রাদ্ধ এবং ভিতরে খরচের বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিলেন।

রামসত্য নিরীহ ভালমানুষ, গ্রামের একটী মহাজনের নিকট হইতে মাত্র তিন শত টাকা খত্‌ দিয়া ধার লইয়াছিলেন এবং উহারই দ্বারা কোন প্রকারে উপস্থিত কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইবেন মনে করিয়াছিলেন ; কিন্তু

পাড়ার মোড়লদের মুরুব্বিগিরিতে অনেক অধিক খরচ হইয়া গেল। যাহা হউক এক প্রকারে বিবাহ-কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। দুঃখিনী বিবাহের পর শ্বশুর বাটীতে গেল, বাটীতে রসিক এবং তাহার দিদিমা থাকিলেন। এদিকে বিবাহ শেষ হইলে রামসত্য হিসাব করিয়া দেখিলেন খরচ সর্ব্বশুদ্ধ—৫৩৪ ৷৶১০ কাজে কাজেই আরও আড়াই শত টাকা ধার করিতে হইল। রামসত্যকে সত্যপ্রিয় ভালমানুষ জানিয়া মহাজন বিনা বন্ধকেই এত টাকা ধার দিয়াছিল।

ক্রমশঃ।

শ্রীজলধর সেন।

শাখীনামা।

সূচনা।

আজকাল শিখেরা অনেকাংশে হৃতগৌরব। কিন্তু এক সময় ছিল, যখন তাহারা ভারত ইতিহাসের একটী প্রধান স্থান অধিকার করিয়া অপূর্ব্ব লীলা করিয়াছে। তাহারা ভারতে একটি নূতন আদর্শ দেখাইয়া দিয়াছে, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। ধর্ম্ম-সম্প্রদায় কি করিয়া সামরিক সম্প্রদায়ে পরিণত হয়, তাহা শিখ-ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে বেশ বুঝা যায়। এই শিখদের কল্যাণে গুরুমুখী ভাষা ও অক্ষরের প্রথম সৃষ্টি হয়। শুনা যায়, দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদই গুরুমুখী অক্ষরের স্রষ্টা। * গুরুমুখী ভাষাতে শিখ ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ আছে। সেগুলির অনুবাদ করিতে পারিলে বাঙ্গালা ভাষার অনেক উপকার হয়। ইংরাজীতে ঐ সব গ্রন্থের কতকগুলি ইতিমধ্যেই অনুদিত হইয়া গিয়াছে। জর্ম্মাণ পণ্ডিত আর্নেষ্ট ট্রাম্প (E. Trumph) ইংরাজীতে আদিগ্রন্থের মূলানুবাদ করিয়া পাশ্চত্য জগতে একটি মহতী কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। আদিগ্রন্থ একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ। গুরুদের গাথাই ইহাতে অন্তর্নিবিষ্ট। আদিগ্রন্থ শিখদের পূজ্য। আদি গ্রন্থে অনেক অপূর্ব্ব ব্যাপার লুক্কাইত আছে। কোন যোগ্যব্যক্তি কি এ পুস্তকখানির বঙ্গানুবাদ করিবার ভার লইবেন না?

আদিগ্রন্থ ছাড়া আর একখানি গ্রন্থ শিখদের পূজ্য। সেটি দশম গুরু গোবি

* Forster's Travel. Part I.

সিংহের কীর্ত্তি। সেটি 'দশবাঁ পাদশাহ্ কা গ্রন্থ' নামে সাধারণ্যে পরিচিত। উহাতে গোবিন্দ সিংহের নিজের জীবনের অনেক কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। আবার আদিগ্রন্থ ও "দশবাঁ পাদশাহ্ কা গ্রন্থ" একত্রে পড়িলে বুঝা যায়, শিখদের আদর্শ দুইশত বর্ষ মধ্যে কতদূর পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল।

শিখদের নবম গুরু তেগ বাহাদুর * স্বীয় আত্মোৎসর্গ দ্বারা শিখ-সমাজের প্রাণে একটি অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ করাইয়া দেন। দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ সেই আকাঙ্ক্ষা জাগরিত ও বর্দ্ধিত করিয়া শিখরাজ্য বিস্তারের পথ পরিষ্কার করেন। শিখ-ইতিহাসে এই দুই গুরুর স্থান অতি উচ্চে। ইঁহারা পঞ্জাবের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তেগ বাহাদুর সুদূর কামাখ্যা পর্য্যন্ত পরিদর্শন করেন। বঙ্গ-পরিভ্রমণের পর যখন তিনি বিহারে গঙ্গা-তীরস্থ পাটনা নগরীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাঁহার ভুবনবিখ্যাত যুগ-পরিবর্ত্তক পুত্র গোবিন্দ সিংহের জন্ম হয়। গোবিন্দ অতি অল্পবয়সে † গুরুপদ পাইয়াছিলেন। তিনি কঠোর সংযম দ্বারা শিখ-সমাজকে নূতন আকারে গঠিত করেন। তিনি পঞ্জাব স্বাধীন করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেশ স্বাধীন করিতে যাইয়া তিনি মোগল-বহ্নিমুখে আপনার চারিটি পুত্র, মাতা ‡ ও স্ত্রীগণকে ভস্মীভূত করেন; আপনিও ফকির হইয়াছিলেন। শেষে মুক্তসরের যুদ্ধে মোগলদের পরাজিত করিয়া স্বীয় রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। এই যুদ্ধের অনতিকাল পরেই ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু ঘটে এবং দিল্লীর সিংহাসন লইয়া রাজপুত্রদের মধ্যে বিষম বিগ্রহ বাধে। এই সময় তিনি বাহাদুর শাহকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বাহাদুর শাহ সম্রাট হইলে গুরু তাঁহার অধীনে পাঁচ হাজার অশ্বের সেনানায়ক হইয়া দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন। সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে (১৭০৮ খৃষ্টাব্দে)।

শাখীনামা তেগ বাহাদুরের ও গুরু গোবিন্দের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। ইহাতে ১২০

* গত অগ্রহায়ণ হইতে "স্বদেশী" পত্রিকাতে 'শিখগুরু' শীর্ষক প্রবন্ধাবলীতে শিখগুরু-গণের জীবনী ও কাহিনী বিবৃত করা হইতেছে। ঐ অগ্রহায়ণ হইতে "ঐতিহাসিক চিত্রে" গোবিন্দ সিংহের বিস্তৃত জীবনী লেখা হইতেছে।

† গত অগ্রহায়ণের 'ঐতিহাসিক চিত্রে' মল্লিখিত গুরু গোবিন্দ সিংহের সূচনাতে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে গোবিন্দ গুরু হন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক মূল প্রবন্ধ দেখুন।

‡ ১৩১৩ সালের চৈত্র মাসের 'স্বদেশী'তে 'বৈরাগী বাঙ্গা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

একশত কুড়িটি শাখী বা বৃত্তান্ত আছে। গুরুমুখী হইতে সর্দ্দার আতর সিংহ ইহার ইংরাজী অনুবাদ করেন। এ পুস্তকখানিতে উক্ত দুই গুরুর বিষয় কিছু কিছু জানা যায়। অধিকন্তু শিখদের আচারব্যবহার সম্বন্ধেও অনেক তত্ত্ব ইহাতে নিহিত আছে। এ গ্রন্থখানির বাঙ্গালা অনুবাদ আজি পর্য্যন্ত বাহির না হওয়ায়, আমরা সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম। 'জাহ্নবীতে' ধারাবাহিক রূপে ইহার বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

শাখীনামা। ❋

গ্রন্থারম্ভ।

শ্রীসৎগুরু লেখককে আশীর্ব্বাদ করুন।

১ম শাখী।

গুরু তেগ বাহাদুর ইচ্ছা করিলেন যে, তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এই অশ্রুময় প্রান্তরের তীর্থযাত্রীদের পাঠ করা উচিত। তাহাতে তাহাদের গমনাগমনের সাহায্য হইবে।

বিশ্বাসী ও ভক্ত শিষ্যদের ইচ্ছানুসারে তিনি তীর্থযাত্রায় বাহির হইলেন এবং দশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া সৈফাবাদে † উপস্থিত হইলেন। এ স্থান পঞ্চবটীর ন্যায় মনোরম। গ্রামের অধিপতি সরিফদ্দিন বেশ সহৃদয় ব্যক্তি। গুরুর আগমন-সংবাদ শুনিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন ও ভাল ভাল ফল প্রভৃতি লইয়া গুরুকে উপহার দেন। সরিফদ্দিন গুরুকে বলিলেন—"গুরো! আপনি (এখানে আসিয়া) আমায় সুখী করিয়াছেন।" গুরু উত্তর করিলেন—"তুমি ঈশ্বরে মতি দিয়াছ; সুতরাং একুশ পুরুষ ধরিয়া তুমি ও তোমার সন্ততিবর্গ সুখে থাকিবে।"

সরিফদ্দিন গুরুকে তাঁহার নিজের প্রাসাদে বাস করিবার জন্য বলিলেন;

* ইহা কবে লিখিত হয়, তাহা জানা যায় না। তবে ঘটনার অনেক পরে যে লিখিত হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। তাহা হইলেও গ্রন্থখানির মূল্য যথেষ্ট।

† পাতিয়ালার দুই ক্রোশ পূর্ব্বে এই স্থান অবস্থিত। এখন ইহাকে বাহাদুর গড় বলে। এখানে একটি পাকা দুর্গ আছে।

কিন্তু গুরু উত্তর করিলেন যে, তিনি ঐখানেই বেশ আছেন। গুরুর সেবার জন্য কয়েকটি দাস রাখিয়া সরিফদ্দিন স্বীয় প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সেখানে তিনি গুরু ও গুরু-পত্নীর জন্য কতকগুলি ঘর পৃথক্ ভাবে প্রস্তুত করাইলেন। বন্দোবস্ত ঠিকঠাক্ হইলে সরিফদ্দিন উদ্যানে যাইয়া গুরুকে সেই সদ্যনির্ম্মিত গৃহে যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া ধরিলেন। গুরু এই উদ্যানেই তাঁবু খাটাইয়াছিলেন।

অনেক পীড়াপীড়ির পর সরিফদ্দিনের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য গুরু অশ্ব-পৃষ্ঠে চড়িয়া প্রাসাদে চলিলেন। সরিফদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে চলিলেন। গুরুপত্নী আচ্ছাদিত পাল্কী করিয়া চলিলেন। সহরে প্রবেশ করিয়াই গুরু একটি মস্‌জিদ দেখিতে পাইলেন। সরিফদ্দিন তখনই বলিলেন যে, উহা তাহাদের মন্দির; কিন্তু তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা আরও কিছু দূরে। গুরু নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে সরিফদ্দিন স্বর্ণ মোহর ও পোষাক উপহার দিয়া গুরুকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার স্ত্রীও গুরুপত্নীকে কতকগুলি পোষাক ও অলঙ্কার দিয়া প্রণাম করিলেন।

এরূপ স্থানে বাটী নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য কি, সরিফদ্দিনকে গুরু তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, সরিফদ্দিন বলিলেন,—এস্থানটি পবিত্র। কারণ একবার যখন তিনি অশ্বারোহণে এস্থান দিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় তিনি দেখিয়াছিলেন কতকগুলি ব্যাঘ্র একটি মেষ ও তাহার সদ্যপ্রসূত শাবককে তাড়া করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের কোন ক্ষতি হয় না, তাহারা উভয়েই রক্ষা পায়। গুরু বলিলেন যে,—বাটীর প্রাচীরগুলি যথেষ্ট পুরু নয়। সরিফদ্দিন তাঁহাকে সেগুলি পুরু করিয়া দিতে বলিলেন; * কিন্তু গুরু বলিলেন যে, ভবিষ্যতে করম সিংহ নামে এক ব্যক্তি এই প্রাচীরগুলি পুরু করিয়া দিবে ও শিখদের সম্মানার্থে এস্থানের নূতন নাম রাখিবে। সহরের ভিতরে বাহিরে উভয়ত্রই দেবমন্দির এবং একটি সৌধও সে নির্ম্মাণ করিবে।

অতঃপর গুরু উদ্যানস্থ শিবিরে ফিরিয়া গেলেন; কিন্তু তাঁহার পত্নী, শ্যালক ও কতকগুলি শিখ সেইখানে রহিলেন।

সরিফদ্দিন একদিন তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলে গুরু বলিলেন

* গুরু এখানে অনেকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তাহা হইলে তিনি বর্ষারম্ভে তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়াছিলেন বলিতে হয়—অনুবাদক।

যে, বর্ষাকাল শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন তিনি যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। সরিফদ্দিন বলিলেন,—'এখানে আপনি অবস্থান করায় আমি যথেষ্ট আনন্দিত হইয়াছি।' গুরু তাঁহাকে ঈশ্বরে মতি দৃঢ় রাখিতে, সাধু-ফকিরদের সেবা করিতে এবং সদা বিনম্র ও নিরহঙ্কার থাকিতে উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন, তাহা হইলেই তিনি সর্ব্বদা সুখে থাকিতে পারিবেন। সরিফদ্দিন সেই দিন হইতে ফকিরের ন্যায় বিরাগী হইয়া নিজ আবাসেই নির্জ্জনবাস করিতে লাগিলেন।

যাইবার সময় সরিফদ্দিন গুরুকে রন্ধন পাত্রাদি, কয়েকটি তাঁবু, একটি উষ্ট্র ও একটি সুন্দর অশ্ব এবং গুরুপত্নীর জন্য একটি যান উপহার দিলেন ও গুরু কোথায় যাইবেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। গুরু বলিলেন যে, তিনি "জঙ্গলদেশে" যাইতেছেন। সেখানে শিখ-কাশী (দমদমাসাহেব) অবস্থিত আছেন। তাহা বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত লোকের অজ্ঞাত আছে। তিনি বলিলেন—'আমি তাহা জগতের নিকট পরিচিত করাইবার জন্য এখন যাইতেছি।' বিশেষ পীড়াপীড়ি করায় গুরু প্রত্যাবর্ত্তন-কালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। সরিফদ্দিন রেকাব ধরিলে গুরু অশ্বপৃষ্ঠে উঠিলেন। সেই দিনই গুরু লঙে * উপস্থিত হইয়া তাঁবু গাড়িলেন।

২য় শাখী।

বাবা গুরুদত্ত শিখদের অলঙ্কার। তিনি আমাদের (শিখদের) জন্য আত্মা ও মন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সর্ব্বদা পূজা করা উচিত।

পাতিয়ালার অন্তর্গত মলবাল গ্রামে উপস্থিত হইয়া গুরু জল চাহিলেন; কিন্তু একটি কূপের নিকটে যে কয়েকজন জমীদার উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, যে জল লবণাক্ত, আর কূপও গাছপালায় পূর্ণ হইয়াছে। সে গাছপালাগুলি দৃঢ় করিয়া জল আনিবার জন্য গুরু তাঁহাদিগকে আদেশ করিলেন। (যথাকালে জল আসিলে মুখ প্রক্ষালন ও পরিষ্কার করিয়া তিনি বলিলেন যে, জল মিষ্ট। সকলেই জানে যে, জল সেই অবধি মিষ্ট হইয়াছে। অতঃপর গুরু আরও বলিলেন যে, তথাকার অন্যান্য কূপ সব কালে বুজিয়া যাইবে; কিন্তু এটি বুজিবে না।) জমীদারেরা এখন এই দেশের প্রতি দশম কূপটি বুজাইয়া দেন।

* পাতিয়ালার পাঁচক্রোশ পশ্চিমোত্তরে লঙ্ অবস্থিত।

গুরু গ্রামের পশ্চিম দিকে শিবির-স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের কথা জানিতে ইচ্ছুক হইলে গোবিন্দ চৌধুরি বলেন যে, গ্রামে সাতজন প্রধান ব্যক্তি আছেন; কিন্তু কেবল একা তিনিই পথিকদের অভ্যর্থনা ও সেবাশুশ্রূষা করেন। গুরু তখন সকল প্রধান ব্যক্তিকেই পাগড়ী দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

তিনি সেখানে নয় দিন অপেক্ষা করিয়াছিলেন। গ্রামবাসীরা বেশ অবিহিত-চিত্ত হইয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিল।

৩য় শাখী।

তারপর দশ ক্রোশ রাস্তা গমন করিলে তাঁহার অনব অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিতে লাগিল। কাজেই তাঁহাকে সেখানে থামিতে হইল। যেখানে তিনি থামিয়াছিলেন, তাহা লোকের নিকট এখনও যথেষ্ট সম্মান লাভ করিতেছে।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

হৃদয়-শঙ্খ।

১

তুচ্ছ শঙ্খ সম এ হৃদয়
পড়ে আছে সংসারের কূলে ;
সুদূর সংসার পানে চাহি'
সতৃষ্ণ নয়ন দু'টী তুলে।

২

আসে যায়—কেহ নাহি চায়
সবাই খুঁজিছে মুক্তামণি,
কে শুনিবে হৃদয়ে আমার
ধ্বনিছে কি অনন্তের ধ্বনি !

৩

হে রমণি, লও তুলে লও,
তোমাদের মঙ্গল উৎসবে ;
একবার ওই গীতগানে
বেজে উঠি সুমঙ্গল রবে।

৪

হে রথি, হে মহারথি, লও,
রণাঙ্গনে ফুৎকার সরোষে ;
বলদৃপ্ত পরস্বলোলুপ
ম'রে যাক্ এ বজ্রনির্ঘোষে।

৫

হে যোগি, হে ঋষি, হে পূজক,
তোমরা ফুৎকার একবার ;
আহুতি প্রণতি স্তুতি আগে
বহে আনি আশীর্ব্বাদ-ভার।

শ্রীঅক্ষয় কুমার বড়াল।

মিলন।

১

নীলাম্বরে শুভ্রদেহ করি আবরণ
দূরে নীল গগন সীমায়,
চেয়ে আছে গৌরীশৃঙ্গ সতৃষ্ণ নয়ন
নীল আঁখি মিশে নীলিমায়।
সৃষ্টি হ'তে ধরণীর, আছে ধীর আছে স্থির
সৃষ্টি হ'তে গতিরুদ্ধ হৃদিবদ্ধ জ্বালা
অনন্ত জীবন ঘেরা তবু সে একেলা।

২

অনন্ত জীবন জাগে অনন্ত আভাষে
অনন্ত ভাবের সিন্ধু ছোটে,
বসে আছে গৌরীশৃঙ্গ সে সবার পাশে
প্রাণে কথা—মুখ নাহি ফোটে।
মহান্, তবু সে দীন, আঁখিজল রসহীন
অপাঙ্গে ঝরিছে বিন্দু নির্ম্মম কঠিন
প্রাণপূর্ণ হিমাচল যেন প্রাণহীন।

৩

সম্মুখে দেখিছে গিরি দূর নীলিমায়
নীল অঙ্গ নীলে মিশাইয়া,
বিলাস বিভোর আসে আলিঙ্গিতে তায়
যেন কোটী বাহু প্রসারিয়া।
আসে আসে যায় ফিরে, পড়ে ধরণীর তীরে
আসে কাঁদে রোদনের নাই অবসান
দেখে সিন্ধু গৌরীশৃঙ্গে বিশাল মহান্।

৪

এ পারে কঠিন প্রাণ ওপারে তরল
মহান্ মহানে দেখে চেয়ে ;
মাঝে মরু বসুন্ধরা শূন্য ফুলফল
কে দিবে রে দুটীরে মিলায়ে।

পরি' চপলার মালা, কাদম্বিনী ল'য়ে ডালা
আসে নিত্য অশ্রুকণা দিতে উপহার
গিরি স্পর্শে প্রাণহীনা তুষারের ভার।

৫

সিন্ধু-বক্ষে প্রতিদিন সুবর্ণের থালা
ভেসে ওঠে নব প্রলোভন ;
কাছে এসে শিরোপরে ঢালে শুধু জ্বালা
দেহ প্রাণে হলো না মিলন।
কোথা আছ শক্তিমান্!—মিলাতে এ দুটী প্রাণ
জীবনের এ সমস্যা করহে পূরণ,
দুটী মহানের আজি কর সম্মিলন।

৬

উঠিল করুণ কণ্ঠ ধরণীর কোলে
কিন্নরে সে বেঁধে নিল গান,
গাহিয়া অনন্ত দিকে ছুটিল সকলে
কই, কোথা আছ শক্তিমান।
ভাঙ্গি তপস্যার গেহ, উত্তর না দিল কেহ
এত শক্তি তবু কিরে শক্তিহীন তারা?
প্রেম-বারিবিন্দুপাতে তিতিল না ধরা।

৭

কাঁদিয়া কিন্নরকণ্ঠ হইল নীরব,
স্বর্ণথালা ডুবে সিন্ধুনীরে,
অন্ধকার আবরিল ধরা-অবয়ব,
আবরিল গৌরীশৃঙ্গ শিরে।
বিষাদে ব্যাকুল হয়ে কল্প এলো নিদ্রালয়ে
ঢাকে বিশ্বে—দেবযক্ষ নিদ্রায় মগন
বুঝি, বুঝে এ অসাধ্য হ'ল না সাধন।

৮

কোন্ দীর্ঘ কল্প-অন্তে মধুর প্রভাতে
একি রে মধুর গীতি শুনি।
জাগে বিশ্ব, দেখে শিশু শুভ্র শঙ্খ হাতে
চলে, পাছে চলে কলধ্বনি।
দেবতা অসাধ্য কাজ কে শিশু করিলি আজ?
বিধাতার কমণ্ডলু উথলিয়া ঝরে।
এত শক্তি অস্থিহীন দেহের ভিতরে।

৯

অনুরাগে কাঁদে গিরি ছোটে শুভ্র ধারা,
অনুরাগে উথলে সাগর,
অনুরাগে ফলফুলে সাজে বসুন্ধরা
সুধাস্রোতে তিতিলা শঙ্কর।
দগ্ধদেহে জাগে প্রাণ কুঞ্জে-কুঞ্জে উঠে গান
সিন্ধু হ'তে কাদম্বিনী লয়ে গেল ডালা
পরে গলে গৌরীশৃঙ্গ মন্দাকিনী মালা।

১০

হে বঙ্গ! তুমি যে সেই ভাগীরথী দান
অমৃতে রচিত তব ঘর।
এ জগতে কেবা আছে তোমার সমান
পুত্র তব অজর অমর।
মূঢ়চক্ষে দীনা তুমি মহীয়সী পুণ্যভূমি
যে বুঝে.সে বুঝে তুমি জীবের উদ্ধারে
দীনতা মাখ মা মুখে—মহত্ত্ব অন্তরে।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

প্রাচীন বাঙ্গালা-ভাষায় উৎকল-শব্দের সমাবেশ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রভৃতি সাহিত্যিক সভার বিশেষ চেষ্টা ও যত্নে আমাদিগের দেশে প্রাচীন বাঙ্গালা-ভাষার আলোচনা আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। আজকাল সকল সাহিত্যসেবীই প্রাচীন বাঙ্গালা-ভাষার আলোচনায় অল্পবিস্তর মনোযোগী হইয়াছেন। ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই ; কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালা-ভাষার আলোচনা বড় সহজ বলিয়া বোধ হয় না, কেন না নানাদিকের নানা ভাষা আসিয়া এই মহাভাষার ভিতরে প্রবেশলাভ করিয়াছে ; সুতরাং প্রাচীন বাঙ্গালা-ভাষা ভালরূপ বুঝিতে হইলে বিবিধ বৈদেশিক ভাষায় অভিজ্ঞতা একান্ত আবশ্যক। হিন্দী প্রভৃতি অন্যান্য ভাষার মত উৎকল-ভাষার অনেক শব্দ আসিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা-ভাষার কলেবর পুষ্ট করিয়াছে। আমরা আজ সেই উৎকল-ভাষা সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি বৈষ্ণব-গ্রন্থে—মণিমা, গুহারী, বাণা, পুঞ্জা, নেত, বুলি, গম্ভীরা প্রভৃতি উৎকল-শব্দ প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ; কিন্তু উক্ত ভাষায় অভিজ্ঞতা না থাকায়, কল্পনার সাহায্যে ঐ সকল শব্দের নানাজনে নানা প্রকার অর্থ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ফলে, অনেকেই অর্থ-সঙ্গতি করিতে না পারিয়া প্রকৃত পাঠেরও বিকৃতি করিয়া ফেলেন। আমরা এস্থলে দৃষ্টান্ত-স্বরূপে ঐরূপ দুই একটী শব্দ প্রদর্শন করিতেছি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা দশম পরিচ্ছেদে একটী উড়িয়া-পদ আছে ; —"জগমোহন পরিমুণ্ডা যাই।" মহাপ্রভু একদিন ৺পুরীধামে প্রেমভরে ঐ পদ গাহিয়া গাহিয়া মহানৃত্য করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ব্যাখ্যাকর্ত্তাগণ কল্পনা প্রভাবে ঐ পদের অনেক প্রকার কল্পিত ব্যাখ্যার সৃষ্টি করিয়াছেন ; কিন্তু বলিতে কি উৎকল-ভাষায় অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন একজনের ব্যাখ্যাও ঠিক হয় নাই ; কেহ বলিলেন—"হে জগমোহন, তোমার বলিহারি যাই।" কেহ বা "যাই" পাঠটীকে "যাউ" করিয়া অর্থ করিলেন—"জগমোহন-

পরি—অর্থাৎ জগমোহনে *, মুণ্ডা অর্থাৎ মস্তক, যাউ—অর্থাৎ গমন করুক।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরা কিন্তু উৎকল-ভাষার আলোচনা করিয়া পদটীর অর্থ অন্যরূপ বুঝিয়াছি। উৎকল-ভাষায় "কপট-পাশা" নামক একখানি গ্রন্থ আছে ; গ্রন্থকারের নাম ভীমাধীবর। দুষ্ট দুর্য্যোধন কুটিলমতি শকুনির সাহায্যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যে কপট পাশায় পরাজয় করিয়াছিল, এই গ্রন্থে তাহাই নানা ছন্দে বর্ণিত। যে সময় পাপাশয় দুঃশাসন কেশাকর্ষণ করিতে করিতে অন্তঃপুরমধ্য হইতে সাধ্বী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে লইয়া আসিল, তখন দ্রৌপদী দেবী কাতরে ভগবানের কাছে করুণা ভিক্ষা করিয়া বলিলেন—

"রক্ষা কর প্রভু জগত-ঈশ্বর করুণাসিন্ধু মুরারি।
তুম্ভে[১] দীনবন্ধু ন রখিলে মোতে অনাথ হইলি নারী হে। হরি।
দুঃশা বলে নেউ অচ্ছি[২] ধরি হে।
কাহা আগে করিবি গুহারি[৩] হে।
এহি সঙ্কটরু কর পার হে॥"

দ্রৌপদী দয়াময় শ্রীহরির কাছে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া শালীনতা রক্ষার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া ব্যস্তসমস্ত ভাবে দুঃশাসনের প্রতি বলিয়া উঠিলেন,—

"দ্রৌপদী বোলন্তি—সভাকু ন নীয় পরিমুণ্ডা তোর যাই রে। বীর।
তোতেঃ শপথ অচ্ছি মোহর[৫] রে।
ভীষ্ম দ্রোণ অচ্ছন্তি সভায় রে।
লজ্জা হইব মোতে[৬] অপার রে।"

আমরা এই উৎকল-পদে "পরিমুণ্ডা" শব্দের প্রয়োগ প্রথম দেখিতে পাই। পদটীর অর্থ এইরূপ,—দ্রৌপদী দুঃশাসনকে বলিতেছেন,—"ওহে বীর আমার দিব্য, তুমি আমায় সভায় লইয়া যাইও না। সভায় ভীষ্মদ্রোণাদি রহিয়াছেন ;

* সাধারণতঃ দেবমন্দিরের বাহিরের দালান বা দরদালানকেই অনেকে "মোহন" বা "জগমোহন" বলিয়া থাকেন ; কিন্তু ৺পুরীধামে জগন্নাথ দেবের "জগমোহন" মূল শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন একটি বিস্তৃত গৃহ-বিশেষ। গরুড়-স্তম্ভ ঐ জগমোহনের অভ্যন্তরেই অবস্থিত। সংস্কৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে এই জগমোহন "জগন্মোহন" নামে অভিহিত হইয়াছে।

১। তুম্ভে=তুমি। ২। নেউ অচ্ছি=লইয়া যাইতেছে। ৩। গুহারি=নালিশ। ৪। তোতে=তোমাতে। ৫। মোহর=আমার। ৬। মোতে=আমাতে।

আমায় বড় লজ্জায় পড়িতে হইবে; আমি তোমার পরিমুণ্ডা যাই—অর্থাৎ তোমার পায়ে মাথা রাখিয়া লুটাপুটি খাইতেছি;—তোমার পায়ে মাথা কুটিতেছি বা খুঁড়িতেছি।"

বিপ্র রামদাস বিরচিত "দার্ঢ্যভক্তিরসামৃত" গ্রন্থেও এই "পরিমুণ্ডা" শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

১। "শ্রীপাদপদ্ম নিত্য ভাবি। বোলে মুঁ পরিমুণ্ডা যিবি ॥"
(ভক্ত রঘু অরক্ষিতের চরিত্র।)

২। "বিজয় ব্রহ্মাণ্ড-গোসাঁই। বোলে মুঁ পরিমুণ্ডা যাই।"
(ভক্ত বালিগাঁ দাসের চরিত্র।)

৩। "উঠি কপালে কর দেই। বোলে মুঁ পরিমুণ্ডা যাই ॥"
(ভক্ত তুলসীদাসের চরিত্র।)

"দার্ঢ্য-ভক্তিরসামৃত গ্রন্থের" যে তিনটী স্থল উদাহরণ-রূপে উদ্ধৃত হইল, সকল স্থানেরই অর্থ ঐ একই। এখন বোধ হয় বুঝিতে পারা গেল, "জগ-মোহন পরিমুণ্ডা যাই" এই উৎকল-পদের প্রকৃত অর্থ কি? অর্থাৎ—হে জগ-মোহন, হে বিশ্ববিমোহন ভগবন্, আমি তোমার পরিমুণ্ডা যাই—তোমার চরণতলে মস্তক রাখিয়া লুটাপুটি খাই। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝা গেল, ভাষা-জ্ঞান না থাকায় কল্পনার বলে আমরা প্রকৃত অর্থ বা প্রকৃত পাঠ কতদূর বিকৃত করিয়া ফেলি।

ভাষা জানা না থাকিলে শব্দের অর্থ যে কতদূর বিগড়াইতে পারে, আমি নিজের গড়া একটী উৎকল-শব্দের অর্থের দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিতেছি। "পশুপালক" একটী উৎকলদেশীয় শব্দ। শ্রীচৈতন্যভাগবতে (৫।১৮।১১) এই শব্দের * প্রয়োগ আছে। আমার সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্ট গ্রন্থে ৬৬ পৃষ্ঠা, ২য় স্তম্ভ ১৯ পংক্তিতে এই শব্দটীর অর্থ লিখিয়াছি—"পশু-পাল—গবাদি পশুর পালক বা রক্ষক।" কল্পনায় ইহা ছাড়া অন্য অর্থ কি-ই বা আসিতে পারে? কিন্তু আমি ৺পুরীধামে অবস্থানকালে সবিশেষ জানিতে পারি যে, শ্রীজগন্নাথজীউর বেশ-রচনাকারী পণ্ডাগণই "পশুপাল" বা "পশু-পালক" শব্দে সম্বোধিত হয়েন। কেহ কেহ ইঁহাদিগকে "শিঙ্গারী" পণ্ডাও বলিয়া থাকেন। এখন দেখুন, শব্দের প্রকৃত অর্থ হইল কোথায় বেশরচনাকারী

* পূজা-পাণ্ডা পশুপাল পড়িছা বেহারা।
অপবিত্র বস্তু কেনে ধরে বা ইহারা ॥
শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ১১ অধ্যায়।

পণ্ডা, আর কল্পনার অর্থ হইল কিনা গবাদি পশুর পালক! প্রাচীন বাঙ্গালা-ভাষার আলোচনা করিতে বসিয়া কল্পনার ছলনা অতিক্রম করা অতীব কঠিন ব্যাপার।

প্রকৃত ভাষা না জানা থাকিলে শব্দের স্বরূপেরও যে কতদূর বিকৃতি ঘটে—চেহারা যে কতদূর বদ্‌লাইয়া যায়, তাহারও একটা দৃষ্টান্ত দেখাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বহুস্থানে একটী শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে,—উপল বা উপল-ভোগ। যথা;—

১। মহাপ্রভু জগন্নাথের উপলভোগ দেখিয়া।
নিজ গৃহে যান এই তিনেরে † মিলিয়া ॥ (মধ্যলীলা, ১ম পরিচ্ছেদ।)

২। উপল লাগিলে করে বাহিরে বিজয়।
হরিদাস মিলি আইসে আপন নিলয় ॥ (মধ্যলীলা, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।)

৩। উপলভোগ দেখি প্রভু হরিদাস দেখিতে।
প্রতিদিন আইসেন প্রভু আইলা আচম্বিতে॥ (অন্ত্যলীলা, ১ম পরিচ্ছেদ।)

৪। হেনকালে প্রভু উপলভোগ দেখিয়া।
হরিদাসে মিলিতে আইলা ভক্তগণ লঞা ॥
(অন্ত্যলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।)

৫। হেনকালে ঈশ্বরের উপলভোগ সরিলা।
ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘরে লঞা আইলা ॥
(অন্ত্যলীলা, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।)

৬। এত বলি প্রভু তাঁসভারে বিদায় দিলা।
উপলভোগ দেখিয়া প্রভু নিজ বাসা আইলা ॥
(অন্ত্যলীলা, ষোড়শ পরিচ্ছেদ।)

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রতিদিন অতি প্রত্যুষেই জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে যাইতেন এবং এই উপলভোগ দর্শন করিয়া, আসিবার পথে, হরিদাস প্রভৃতির সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিতেন।

উপলভোগ শব্দের প্রকৃত অর্থ হইতেছে—উপর-ভোগ—নিয়মিত ভোগের অতিরিক্ত, বাড়্‌তি বা উপরিভোগ। সম্প্রতি এই ভোগ 'ছত্রভোগ' নামেই প্রসিদ্ধ। শ্রীজগন্নাথের ভোগমণ্ডপের মধ্যে দর্পণে প্রতিবিম্ব ধরিয়া এই ভোগ নিবেদিত হইয়া থাকে।

* হরিদাস ঠাকুর আর রূপ-সনাতন।

নীলাচলনাথের নিয়মিত ভোগ তিনটী। (১) প্রথম ধূপ *—ইহাকে প্রাতর্ধূপ কোটভোগ কিম্বা রাজভোগও বলে। (২) দ্বিতীয় ধূপ—ইহার অপর নাম মধ্যাহ্ন-ধূপ বা মধ্যাহ্নভোগ। (৩) তৃতীয় ধূপ—সন্ধ্যা-ধূপ বা সন্ধ্যা-ভোগ নামেও ইহা পরিচিত। এই তিনটী ভোগ দেউলের ভিতর জগন্নাথদেবের রত্নবেদী-সমীপে নিবেদিত হইয়া থাকে।

"ত্রিধূপ ও পঞ্চ অবকাশ" † জগন্নাথে খুব প্রসিদ্ধ কথা। বল্লভভোগ বা বড় শিঙ্গারের পখাল ‡ অন্নভোগ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোগ ভোগের ভিতরেই গণ্য নয়, অবকাশের মধ্যে পরিগণিত।

মহাপ্রভু জগমোহনের ভিতর গরুড়-স্তম্ভের পশ্চাতে রহিয়াই জগন্নাথ-দর্শন করিতেন। গরুড়ের অগ্রভাগে আর অগ্রসর হইতেন না। বোধ হয়, ভক্তি-শিক্ষাগুরু ভক্ত-স্বভাব-সুলভ দীনতা দেখাইবার জন্যই গরুড়ের পশ্চাতেই থাকিতেন। শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি, তথাকার অধিবাসি-গণ জাতাশৌচাদিতেও গরুড়ের পশ্চাতে অবাধে গমন করেন এবং তথা হইতেই জগন্নাথ দর্শন করিয়া থাকেন; কিন্তু অশুচি অবস্থায় গরুড়ের অগ্রে যাইবার নিয়ম নাই। দৈন্যই প্রেম-রাজ্যের প্রধান সম্পত্তি, এমন কি দৈন্য ও প্রেমের পার্থক্য নিরূপণ করা সময়ে সময়ে বড় কঠিন হইয়া পড়ে। বীজ আগে কি অঙ্কুর আগে, তাহা যেমন নিরূপণ করা কঠিন; তেমনি প্রেম আগে কি দৈন্য আগে নির্ণয় করাও সহজ নহে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু "আপনি

---

* আমাদের দেশে ধূপ অর্থে চন্দনকাষ্ঠাদিচূর্ণনির্ম্মিত জ্বালাইবার ধূপই বুঝাইয়া থাকে। ৺পুরীধামে ধূপ-শব্দের অর্থ 'ভোগ'। হিন্দীর আমলে আসিলে ঐ ধূপ-শব্দেরই অর্থ 'রৌদ্র' হয়। ভাষাভেদে অর্থের এতই পার্থক্য।

† আমরা সাধারণতঃ 'অবকাশ' বলিতে অবসর বা ছুটী বুঝিয়া থাকি; কিন্তু ৺পুরী-ধামের 'অবকাশ' সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শ্রীজগন্নাথদেবের শয্যোত্থান বা মঙ্গলারতি, হস্তমুখপ্রক্ষালন ও স্নান, বল্লভভোগ, সন্ধ্যারতি এবং বড় শিঙ্গার এই পাঁচটীই 'পঞ্চ অবকাশ' নামে পরিচিত। সংপ্রতি শ্রীজগন্নাথদেবের হস্তমুখপ্রক্ষালন ও স্নানই প্রধানতঃ 'অবকাশ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে এই 'অবকাশ'কে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—"আচার্য্য! এহি, সহৈব পুণ্ডরীকাক্ষস্য শয়নোত্থানাবকাশং পশ্যাম।" (৬ষ্ঠ অঙ্ক) এখানেও ভাষাগত পার্থক্যে অর্থের কত পার্থক্য দেখুন।

‡ 'পখাল অন্ন' প্রক্ষালিত অন্ন বা পান্তা ভাত। বড় শিঙ্গারের এই পান্তাভোগের সঙ্গে ওটিকতক 'পইড়'—ডাব-নারিকেলও প্রদত্ত হয়।

আচরি ভক্তি জীবেরে শিখায়", তাই তিনি অনন্ত গুণের অফুরন্ত খনি হইলেও দীনতা-বশে দেখাইতেন, যেন তাঁহার কোন গুণই নাই। আর শুচিশুদ্ধ-শিরোমণি হইলেও তিনি দেখাইতেন, যেন তাঁহার মত অশুচি ও অশুদ্ধ দুইটী নাই। এই নিমিত্তই তিনি গরুড়ের পশ্চাতেই অহরহ অবস্থান করিতেন।

ভোগমণ্ডপ গরুড়-স্তম্ভের ঠিক পশ্চাতে। মহাপ্রভু ঐ ভোগমণ্ডপেরই দ্বারে দর্শনার্থ দণ্ডায়মান রহিতেন। অদ্যাবধি ঐ দ্বারের প্রস্তরভিত্তিতে তাঁহার তিনটি অঙ্গুলি-চিহ্ন বিদ্যমান। সেই চিহ্ন দর্শন ও স্পর্শন করিয়া শত শত ভক্ত আজিও নয়ন-জনম সার্থক করিতেছেন।

তিনটী নিয়মিত ভোগ কিম্বা অবকাশের অন্তর্গত বল্লভভোগাদি গরুড়-স্তম্ভ হইতে বহুদূরে দেউলের অভ্যন্তরে রত্নবেদীর নিকটে হইয়া থাকে; সুতরাং সে ভোগ দর্শন করা মহাপ্রভুর কিছুতেই সম্ভবে না। ভোগমণ্ডপের দ্বারদেশেই তিনি সতত অবস্থান করিতেন; সুতরাং ভোগমণ্ডপের ভোগ দর্শন করাই তাঁহার ঘটিয়া উঠিতে পারে। এদিকে, প্রতিদিনই ঐ ভোগ-মণ্ডপে (যাত্রীর তারতম্য অনুসারে কমবেশী) অতিরিক্ত বা উপরি ভোগ লাগিয়া থাকেই থাকে। আমিত এমন দিনই দেখি নাই, যেদিন প্রথম ধূপের ঠিক পিঠোপিঠি ভোগ-মণ্ডপে ভোগ না লাগিয়াছে। মহাপ্রভু ঐ ভোগমণ্ডপের ভোগ দর্শন করিয়াই ভোগদর্শনের সাধ মিটাইতেন।

উৎকল ভাষার "র"র বদলে "ল"র প্রয়োগ বড় বিরল নয়, তাই "উপর" শব্দটী "উপল" হইতে দেখিয়া বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু যাঁহারা কল্পনার তোড়ে গা ভাসাইয়া এই "উপল" শব্দটী বদলাইয়া "উপান" পাঠ খাড়া করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের মনগড়া অর্থের সঙ্গতি করিবেন কি প্রকারে, আমিত তাহা ভাবিয়া কিছু ঠিক করিতে পারি না। তাঁহারা বলেন যে "উপান" ভোগ কি, না অন্ন-ভিন্ন ভোগ অর্থাৎ ফলমূলাদি! যাঁহারা জগন্নাথের সেবা-নিয়মাদির সমাচার রাখিয়া থাকেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, ইদানীং এক বল্লভভোগ ছাড়া জগন্নাথদেবের আর কোন অন্নব্যতিরিক্ত নিয়মিত ভোগ নাই। অথচ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার ষোড়শ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই—

"গরুড়ের পাছে রহি করে দরশন।
দেখেন জগন্নাথ হয় মুরলীবদন॥

* * * *

* * * *

হেনকালে গোপাল বল্লভভোগ লাগাইল।
শঙ্খ ঘণ্টা আদি সহ আরতি বাজিল॥"

ইত্যাদি বলিয়া পরে বলা হইয়াছে—

"উপলভোগ দেখিয়া প্রভু নিজ বাসা আইলা।"

এই অংশ দেখিয়া কি মনে হয় বলুন দেখি ?

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "গোপালবল্লভ ভোগই" এখন "বল্লভভোগ" নামে পরিচিত। কালপ্রভাবে কথার কাটছাঁট কিম্বা অদলবদল হইয়াই থাকে। ঐ বল্লভভোগ ছাড়া জগন্নাথের যখন অন্য কোন অন্নহীন ভোগই নাই, তখন "উপান"—উপান্ন বা অন্নব্যতিরিক্ত ভোগ বলিতে গেলে নাম জানি আর না-ই জানি—নাম বলি আর না-ই বলি, ঐ বল্লভভোগই আসিয়া পড়ে নাকি ? আর যদি তাহাই হইল, অর্থাৎ উপলভোগ আর বল্লভভোগ একই হইল, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উপরে উদ্ধৃত অংশে অভিহিত—বল্লভভোগ দর্শনের পর আবার উপানভোগ দর্শনের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে কি প্রকারে ? সুতরাং বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, শব্দের প্রকৃত অর্থ বোধ না হওয়ায়, একটা যা তা অর্থ লাগাইবার জন্যই "উপল" পাঠের পরিবর্ত্তে "উপান" পাঠের কল্পনা করা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া, উৎকলদেশে অন্ন-ভিন্ন প্রসাদকে "নিসকড়ি" প্রসাদই বলিয়া থাকে। যথা—

* বল্লভভোগ—জগন্নাথের হস্তমুখ-প্রক্ষালন ও স্নানাদির কিছুক্ষণ পরেই এই ভোগ লাগিয়া থাকে। মাখন, মিছরি, সর, ফলমূলাদি ও মুড়কি এই ভোগের উপকরণ। এই বল্লভভোগের পর প্রথম ধূপ, তারপর ছত্রভোগ প্রতিদিনই হইয়া থাকে। বল্লভভোগের মুড়কি প্রসাদের আস্বাদন অতি অপূর্ব্ব। শ্রীমন্দিরের বেড়ার মধ্যেই ঐ প্রসাদ কিনিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃতে যেরূপ ভীমসেনের বদলে ভীম, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বদলে কৃষ্ণ, কিম্বা দ্বৈপায়ন এবং বলরামের বদলে বল কিম্বা রাম প্রভৃতির প্রয়োগ, এখানেও তেমনি "গোপালবল্লভের" বদলে কেবল বল্লভের প্রয়োগ বিস্ময়ের বিষয় নহে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে এই বল্লভভোগই আবার 'হরিবল্লভভোগ' নামে কথিত হইয়াছে। যথা—"গোপীনাথাচার্য্যঃ।—পশ্য পশ্য—'অনুবদনপ্রক্ষালনমভ্যঙ্গস্নানভূষণাদ্যমথ। অনুবালভোগলীলা হরিবল্লভভোগ এষ তৎপশ্চাৎ॥' দৃশ্যতামধুনা প্রাতর্ধূপাখ্যঃ পূজাবিশেষঃ॥" (৬ষ্ঠ অঙ্ক)। আজকাল এই শ্লোককথিত বালভোগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দেখা যায় না। ধূপ বা ভোগের সময় বহুক্ষণ ধরিয়া পূজাও হইয়া থাকে। তাই বোধ হয় নাটকে "প্রাতর্ধূপাখ্যঃ পূজাবিশেষঃ" বলা হইয়াছে।

"বলগণ্ডিভোগের প্রসাদ উত্তম অনন্ত।
নিসকড়ি প্রসাদ আইল যার নাই অন্ত॥"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৪শ পরিচ্ছেদ।)

আমাদের দেশেও অন্ন-ভিন্ন প্রসাদ ঐ "নিসকড়ি" নামেই প্রসিদ্ধ। পানীহাটীর দণ্ডমহোৎসব-প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"নিসকড়ি নানামত প্রসাদ আনিল।
প্রভুরে আগে দিয়া ভক্তগণে বাঁটি দিল॥"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।)

কাজেকাজেই বলিতে হয়, "উপান" শব্দটি বঙ্গ বা উৎকল কোন দেশেরই নহে। শব্দটী খাস কল্পনা-রাজ্যের।

আমরা কিন্তু উপরে "উপল" পাঠের যে প্রকার অর্থ প্রদর্শন করিয়াছি, তাহাতে কোনরূপ অসঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যায় কি ? আর যদি "উপল-ভোগের" এই অর্থই না হয়, তাহা হইলে অন্য অর্থ কি-ই বা হইতে পারে ?

একজন এ-দেশী ভক্ত একদিন বলিয়াছিলেন—"সংস্কৃতে 'উপল' শব্দের অর্থ প্রস্তর বা পাথর। 'উপল ভোগ' কি, না পাথরের উপর অর্থাৎ পাথরের পাত্রের উপর রাখিয়া যে ভোগ, তাহাই 'উপল ভোগ'।"

ভক্তবর কখনই ৺পুরীধামে গমন করেন নাই। শ্রীজগন্নাথের ভোগ-দর্শন তাঁহার ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই। ঘটিলে আর তিনি ওরূপ অর্থ করিতে পারিতেন না। কেন না শ্রীজগন্নাথের ভোগ প্রধানত মৃৎপাত্রেই হইয়া থাকে, ধাতুপাত্রের মধ্যে তিনখানি বড় বড় থালায় ভাত বাড়িয়া, আর টবের মতন কয়েকটী পাত্রে পক্কান্ন রাখিয়া ভোগ লাগাইবার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রস্তরপাত্রের নাম-গন্ধও তথায় দৃষ্টিগোচর হয় না।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এই কয়টী শব্দ লইয়াই আলোচনা করিলাম, সাধারণের আগ্রহ বুঝিলে ভবিষ্যতে অন্যান্য শব্দের আলোচনা করিবারও বাসনা রহিল।

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

বিক্রমপুরের কয়েকটি প্রাচীন স্থান।

আমরা ইতিপূর্ব্বে শ্রীপুরাধিপতি চাঁদরায় ও কেদার রায়ের কীর্ত্তিসমূহের বিষয় জাহ্নবীতে উল্লেখ করিয়াছি, অদ্য আমরা বিক্রমপুরের আরও কয়েকটী প্রাচীন দর্শনীয় স্থানের বিষয় উল্লেখ করিব। একদিন "বঙ্গদেশ" বলিলে যে বিক্রম-

পুরকে বুঝাইত * তাহার প্রাচীন ও আধুনিক কীর্ত্তিসমূহের ভগ্নাংশ যে সমগ্র বঙ্গের ইতিহাসের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় ও আদরনীয় তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন ? এখনও মৃত্তিকা-গর্ভ হইতে নানাপ্রকার স্বর্ণমুদ্রা,অষ্টধাতু ও রজত-নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি, প্রস্তরমূর্ত্তি, অট্টালিকার ভগ্নাবশিষ্ট ইত্যাদি কত যে প্রাচীন গৌরবের সাক্ষিস্বরূপ আপনাদিগকে প্রকাশ করিতেছে, তাহা অনুসন্ধিৎসু প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের দর্শনীয় ও আলোচনার যোগ্য।

রাজাবাড়ীর মঠ।

রাজাবাড়ীর মঠের সম্বন্ধে পূর্ব্বেও কিছু লিখিয়াছিলাম ; কিন্তু ইহার নির্ম্মাণ-সম্বন্ধে যেরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে এবং বিক্রমপুরবাসীর হৃদয়ে যাহা দৃঢ় সত্যরূপে গ্রথিত হইয়া আসিতেছে, সে সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমার কয়েকটী সন্দেহের কারণ হৃদয়ে উদয় হইতেছে। যদি কোনও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ তাহা ভঞ্জন করিতে পারেন, তবে বিশেষ উপকার হয়। প্রথমতঃ ইহার গঠনপ্রণালী বৌদ্ধমন্দিরাদির ন্যায়,—কতকটা বুদ্ধগয়ার বিখ্যাত মন্দিরের অনুরূপ,দ্বিতীয়তঃ ইহা পূর্ব্বদ্বারী, হিন্দুর নির্ম্মিত কোনও মঠমন্দিরাদিই পূর্ব্বদ্বারী হয় না, তবে কি ইহা বৌদ্ধমন্দির ছিল ? (১) এ কথা একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়ার নহে, কারণ এককালে বিক্রমপুরে বৌদ্ধ-প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ যতি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতিষ ৯৮০ খৃষ্টাব্দে বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা সর্ব্বজনবিদিত সত্য। ইনি পালবংশীয় মহারাজ গোবিন্দচন্দ্রের সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, পালবংশীয় নৃপতিগণ যে কিছুদিন বিক্রমপুরে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহাই বা কাহার অজ্ঞাত ? তবে এরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত নহে যে, ইহা পালবংশীয় কোন বৌদ্ধ-নৃপতি কর্ত্তৃক দশম শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নির্ম্মিত হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলেন যে, চাঁদমিঞা নামক

* বঙ্কিম বাবুর বিবিধ প্রবন্ধোক্ত "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার" শীর্ষক প্রথম প্রস্তাব।—লেখক।

(১) তাই কি ?

শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীগোবিন্দ জীউ প্রভৃতির, শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীজগন্নাথদেবের, শ্রীপাট খড়দহে শ্রীশ্যামসুন্দর জীউর এবং আরও অনেক প্রাচীন স্থানের শ্রীমন্দির পূর্ব্বদ্বারী। দুঃখের বিষয়, আজকাল অনেকেই এই সমাচার রাখেন না। "উৎকলে পঞ্চতীর্থ" নামক একখানি গ্রন্থেও দেখিলাম,—"বৌদ্ধগণের প্রথানুসারে জগন্নাথ মন্দিরের প্রধান বা সিংহদ্বার পূর্ব্বমুখীন। হিন্দুদের কুত্রাপি এরূপ দৃষ্ট হয় না।" এ সকল বিষয় বিশেষ সাবধানে লেখা উচিত। স্ব-দেশের দেবালয়-সম্বন্ধে এরূপ অজ্ঞতা অমার্জ্জনীয়।—জাং সম্পাদিকা।

জনৈক খ্যাতিমান মুসলমান হিন্দু-পদ্ধতির অনুকরণে স্বীয় জননীর কবরের উপর ইহা নির্ম্মাণ করেন ;—এ সকলের মধ্যে কোনও ক্ষীণ সূত্র সত্যরূপে বিরাজমান আছে কিনা, এতদিনের পরে কেবলমাত্র কিম্বদন্তীর উপর আস্থা স্থাপন করিয়া তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। রাজাবাড়ী ইহার নামোৎপত্তির সম্বন্ধে কার্য্যতও যে কোন সম্বন্ধ আছে, তাহা নিশ্চিত। এই গ্রামের চতুর্দ্দিকস্থ পরিখা যাহা এখন "রাজাবাড়ীর খাল" নামে পরিচিত, তাহা এবং বৃহৎ বৃহৎ সরোবর, বাঁধান ঘাটের ধ্বংসাবশেষ, রাস্তার চিহ্ন ইত্যাদি দৃষ্টে সহজেই ইহার প্রাচীন কীর্ত্তিগরিমার কাহিনী উজ্জ্বলবর্ণে মানসপটে চিত্রিত হইয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে এস্থানে চাঁদরায় ও কেদার রায়ের প্রমোদোদ্যান ছিল এবং এখানেই মোগল সেনাপতি মানসিংহের সহিত কেদার রায়ের যুদ্ধ হইয়াছিল, কেদার রায়ের উক্ত বাগানবাটী হইতেই রাজার বাড়ী নামের সঙ্গে সঙ্গে উহা এক্ষণে রাজাবাড়ী নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। অনেক সময়ে প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে, কিম্বদন্তীসমূহ উপেক্ষণীয় হয় না বলিয়াই রাজাবাড়ীর মঠ সম্বন্ধে পরে যে সকল কিম্বদন্তী জানিতে পারিয়াছি, তাহার উল্লেখ করিলাম।

বল্লালী-পুল।

বিক্রমপুরস্থ মিরকাদিসের খাল ও তালতলার খাল নামক দুইটি প্রশস্ত খালের উপর বহুদিনের প্রাচীন দুইটি পুল দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, এই পুল দুইটি মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে এই পুল দুইটি প্রায় ৮০০ আটশত বৎসরের প্রাচীন। * মিরকাদিসের খালের উপর যে পুলটি আছে, উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৭৩ ফিট, খালের গর্ভ হইতে ইহা প্রায় ২৮ ফিট উচ্চ। পার্শ্বস্থ খিলানের দুইদিকে যে দুইটি পারিপার্শ্বিক স্তম্ভ বা Span আছে, উহার প্রত্যেকটি ১৭ ফিট উঁচু এবং ৭ ফিট ৩ ইঞ্চি পুরু। এই পুলটি দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর, ইহার গায়ে নানাজাতীয় বন্য বৃক্ষসমূহ জন্মিয়া যাওয়ায়,ইহা এক প্রকার ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। ঢাকার এক পূর্ব্বতন কালেক্টার সাহেব বলিয়াছিলেন যে,

* "It is said to have been built by Raja Ballal Sen before the conquest of Bengal by the Mahammadans." List of Ancient Manuments in the Daeca Division Page 26. Published by Authority.

যদি আট নয় হাজার টাকা ব্যয় করিয়া মেরামত করাইলে ইহা প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়ের নির্ম্মিত পুলের সমতুল্য হইবে।

তালতলার খালের উপরে যে পুলটি আছে, তাহার অবস্থা পূর্ব্ববর্ণিত খালের পুল অপেক্ষা শোচনীয়, ইহার তিনটি স্তম্ভ ছিল, তন্মধ্যে মধ্যের বৃহত্তমটি ইংরেজ রাজত্বের প্রথম সময়ে কলিকাতা হইতে ঢাকায় সংবাদ-প্রেরণের সুবিধার এবং বড় বড় মালবোঝাই নৌকার গমনাগমনের জন্য বারুদ দ্বারা উড়াইয়া ফেলা হইয়াছে। এখনও অতি কষ্টে জনসাধারণ একখণ্ড কাঠের সাহায্যে ইহার উপর দিয়া যাতায়াত করে। প্রাচীন হিন্দু-নৃপতিগণের রাজধানী রামপাল হইতে যে সুপ্রশস্ত রাজপথ বরাবর পশ্চিম দিকে পদ্মা পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহার বক্ষ ভেদ করিয়া যে দুইটি খাল সমান্তরাল ভাবে বর্ত্তমান, এই দুইটি পুলই তাহার উপর অবস্থিত।

আনোয়ারি মস্‌জিদ।

সম্রাট আলমগীর সাহার (ঔরঙ্গজেব) রাজত্ব সময়ে তাঁহার জনৈক আনোয়ারী সভ্য কর্ত্তৃক ১১০২ হিজরায় ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার বাহ্যাকৃতি ৩৪×২০ ফিট। দরোজার উপরে যে প্রস্তরফলক আছে, তাহাতেই ইহার বিষয় সুস্পষ্ট লিখিত আছে। মস্‌জিদের উপরে কেবল একটীমাত্র গম্বুজ আছে, ঢাকার নবাব আসানউল্লা বাহাদুর ইহা মেরামত করাইয়া দেওয়ায় এই মস্‌জিদটির অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে। স্থানীয় মুসলমানগণ ইহাতে দৈনিক উপাসনাদি করিয়া থাকে। শ্রীনগর থানার এলাকাধীন পাথরঘাটা নামক স্থানে ইহা অবস্থিত।

ইদ্রাকপুরের দুর্গ।

বর্ত্তমান মুন্সীগঞ্জ পূর্ব্বে ইদ্রাকপুর নামে পরিচিত ছিল। শতবর্ষ পূর্ব্বেও এই স্থানের পাদদেশ ধৌত করিয়া ইচ্ছামতী নদী প্রবাহিতা হইত; কিন্তু এখন উহা প্রায় এক মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। মগ-দস্যুদিগের অতর্কিত আক্রমণ হইতে বিক্রমপুরের পূর্ব্বপ্রান্ত নিরাপদ করিবার জন্য সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজত্ব সময়ে তৎকালীন ঢাকার শাসনকর্ত্তা মিরজুম্‌লা এস্থানে যে গোলাকার দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে। উহার চতুর্দ্দিকে পূর্ব্বে যে সকল ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইত, এখন সে সমুদয় কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান সময়ে ইহার উপরিস্থিত বাংলোতে

মুন্সীগঞ্জের সব-ডিবিসনাল অফিসারগণ বাস করেন। দূর হইতে এই লোহিতবর্ণের প্রাচীন দুর্গটি দেখিতে বড়ই সুন্দর। দুর্গের পূর্ব্বদিকে একটী ছোট প্রাচীন সরোবর বিদ্যমান আছে, ইহার জল বেশ নির্ম্মল।

ফিরিঙ্গি বাজার।

এক সময়ে এই স্থানটি বিক্রমপুরের ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্বরূপ ছিল; কিন্তু ঢাকা নগরীর শিল্পবাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে-সঙ্গে ইহার নাগরিক সমৃদ্ধি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া বর্ত্তমান সময়ে ইহা একটী সামান্য গ্রামে পরিণত হইয়াছে। ফিরিঙ্গি-বাজার ইচ্ছামতী নদীর তীরে অবস্থিত। নবাব সায়েস্তা খাঁর শাসন সময়ে (১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে) মোগল সেনাপতি হোসেন বেগের পক্ষাবলম্বন করিয়া কতিপয় পর্টুগীজ ফিরিঙ্গি আরাকান-রাজকে পরিত্যাগ করত এস্থানে আসিয়া বাস করে, তাহাদের বাসের সঙ্গে-সঙ্গেই এই স্থানের নাম ফিরিঙ্গি-বাজার হইয়াছে। এখন সে সকল ইফ্রপিদ্রূপের বংশধরগণের সহিত মুসলমান কৃষকগণের কোনও পার্থক্য অনুভূত হয় না। ইহাদের কেহ কেহ ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে, কেহ কেহ এখনও নামে-মাত্র খৃষ্টান রহিয়া প্রতি রবিবারে গির্জ্জায় যায়। ফিরিঙ্গি-বাজারে একটী গির্জ্জাঘর আছে, এখানে একজন রোমান ক্যাথলিক মিশনারি বাস করিয়া থাকেন। এই স্থানের নিকটবর্ত্তী রিকিব-বাজার নামক স্থানে পাঠান-রাজত্ব সময়ে-নির্ম্মিত একটী মস্‌জিদ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা মুন্সীগঞ্জ মহকুমা হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত।

রিকিব-বাজারের মস্‌জিদ।

এই মস্‌জিদটি ইষ্টক-নির্ম্মিত, ইহার বাহ্যাকৃতি ৩৬×৩৪ ফিট এবং প্রাচীর ৪ ফিট পুরু। কর্‌রাণী বংশীয় সুলেমান কর্‌রাণীর রাজত্ব সময়ে (১৫৬৪—১৫৭২ খৃষ্টাব্দে) ইহা মালিক আবদুল মিঞা নামক জনৈক সঙ্গতিশালী মুসলমান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। কাহারও কাহারও মতে ইনি বিক্রমপুরের কাজী ছিলেন, একথা একেবারে অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয় না; কারণ এই মস্‌জিদকে সর্ব্বসাধারণে সাধারণত কাজীর মস্‌জিদ নামে অভিহিত করিয়া থাকে। নিকটবর্ত্তী "আবদুল্লাপুর" গ্রাম ইনি স্থাপন করেন, একথাও বিশ্বাসযোগ্য। এক সময়ে আবদুল্লাপুরের কার্পাস সূত্র বিশেষ বিখ্যাত ছিল। এখনও এস্থানের পথঘাট অতীত গৌরবের নাগরিক সমৃদ্ধিরই পরিচয় দেয়। বলা বাহুল্য, যে এসমুদয় স্থান রামপাল নগরীর শ্মশান-কঙ্কালের অস্থির সাহায্যেই গঠিত হইয়াছিল।

আমরা এখানে আমাদের বর্ণিত মস্‌জিদটির উপরে যে প্রস্তর ফলক আছে তাহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিলাম; বহুভাষাবিদ্ সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত হরিনাথ দে এম্, এ মহাশয় ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। উহাতে নিম্নলিখিত রূপ লিখিত আছে,—"God Almighty says 'The mosques belong to God, worship no one else with Him.' The prophet, on whom be peace, says 'He who builds a mosque in the world will have seventy castles built for him by God in Paradise.' These mosques together with what there is of other buildings (were built) during the reign of the king of the age, his august majesty Miyan, during the month of Zilquadh 976 H. (April 1569)" এই মস্‌জিদটি ব্যবহারোপযোগী, ইহার উপরে কেবল একটি মাত্র গম্বুজ আছে। রিকিব-বাজারের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে বহু প্রাচীন অট্টালিকার ও একটী মস্‌জিদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

লস্কর-দীঘির শিবমন্দির।

বিক্রমপুরান্তর্গত বাঘিয়া গ্রামের পশ্চিম-প্রান্তে একটী প্রকাণ্ড দীঘির খাত বিদ্যমান আছে। উহা ১১১২ সনে রূপরাম লস্কর (গুপ্ত) কর্ত্তৃক খাত হইয়াছিল, রূপরাম নবাবের কর্ম্মচারী ছিলেন এবং তাঁহার লস্কর উপাধি থাকায় এই দীঘির নামও লস্কর-দীঘি হইয়াছে। দীঘিটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয় শত হাত এবং প্রস্থে প্রায় তিন শত হাত হইবে। বর্ষার সময় যখন ইহা জলে পূর্ণ হয়, তখন ইহার সৌন্দর্য্য বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এই সরোবরের পূর্ব্বতটে একটী শিবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়; উহাও রূপরাম গুপ্তই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এরূপ সুন্দর কারুকার্য্যসম্পন্ন ইষ্টকগ্রথিত শিব-মন্দির বিক্রমপুরের আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। দুই শতবৎসর পূর্ব্বে ইষ্টকালয় কিরূপ সুন্দর ও সুগঠিত হইত, এই শিবমন্দিরের প্রত্যেকখানা খোদিত ইষ্টকের মূর্ত্তিসমূহ হইতে তাহা বিশদরূপে অধ্যয়ন করিতে পারা যায়। মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ ইষ্টকগাত্রে নানাবিধ পৌরাণিক ও কাল্পনিক চিত্র বিদ্যমান। কোথাও রণরঙ্গিনী দিগ্‌বসনা লোলরসনা কালিকা-মূর্ত্তি, কোথাও বা মহিষাসুরমর্দ্দিনী দশহস্তে দশপ্রহরণধারিণী শক্তিরূপিনী দেবী ভগবতীর মূর্ত্তি, কোথাও বা কৃষ্ণ বকাসুরকে বধ করিয়া তাহার বদনবিবর হইতে

বহির্গত হইতেছেন; আবার একধারে আভীরপল্লীর চিত্র, গোপবধূগণ গো-দহনে রত, গোপগণ ভাড় কাঁধে করিয়া যাইতেছে, তাহারি পার্শ্বে আবার কোন রমণী প্রসাধনে রত, এক সখী তাহার কেশপাশ বন্ধন করিয়া দিতেছে, আবার একদিকে কে একজন পুরুষ জনৈকা যুবতী স্ত্রীর খোঁপা ধরিয়া টানিতেছে। এরূপ যে কত চিত্র তাহার বর্ণনা করিয়া উঠা সুকঠিন। মন্দিরটির কোন কোন অংশে লোণা" ধরায় সে সে দিকের মূর্ত্তিসমূহ ধ্বংস হইয়াছে। দীঘির তীরে এখন কয়েক ঘর মাত্র মুসলমান বাস করে। চারিদিকে একটা নীরবতা ইহাকে বেড়িয়া রহিয়াছে। এখন মন্দির মধ্যে শিবলিঙ্গ নাই, একদিন যে ছিল তাহার চিহ্ন বিদ্যমান আছে। পল্লীস্থ একটি অভিজ্ঞ প্রাচীন বৃদ্ধ যখন আমাদের নিকট ইহার প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা করিতেছিলেন, তখন সেকালের বিক্রমপুরের সামাজিক-মিলনের সুমধুর চিত্র, শিব-মন্দিরপ্রতিষ্ঠা পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ধর্ম্ম ও পুণ্যকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান,হিন্দুর হিন্দুত্ব ও প্রকৃত লোকহিতকর কাহিনীর সহিত বর্ত্তমান ধনীদের বিলাসকাহিনীর কথা মনে হইয়া যুগপৎ ঘৃণা ও ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল। এই রূপরাম গুপ্ত একজন ধনবান ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু নিজ পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতার দিকে বিন্দুমাত্রও দৃষ্টিপাত না করিয়া নানাবিধ লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে যে ধর্ম্মের ও পুণ্যের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কি অক্ষয় ও অমর নহে?

কথিত আছে যে, কয়েক সহস্র মুদ্রা মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া তদুপরি এই শিব-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহা অবিশ্বাস্য নহে; কারণ সেকালে দেব-মন্দিরাদি নির্ম্মাণ-সম্পর্কে এইরূপ রীতি প্রচলিত ছিল। শ্রীপুরের কোটিশ্বর শিব-মন্দির-সম্পর্কেও এইরূপ জনপ্রবাদ চির প্রচলিত। এই দীঘি ও শিব-মন্দির সম্বন্ধে নানাপ্রকার জনপ্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে অধিকাংশই যে নানাপ্রকার অদ্ভুত কল্পনা-প্রসূত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

চাঁচুরতলা ঠারইন বাড়ী বা সিদ্ধেশ্বরী কালী-মন্দির।

রাজাবাড়ীর মঠের প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে চাঁচুরতলা নামক গ্রামে এক প্রাচীন কালী-মন্দির বিরাজমান আছে; সাধারণতঃ ইহা "ঠারইন" বাড়ী (ঠাকুরুণ) নামে পরিচিত। পদ্মাতট হইতেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। এমন

সুন্দর শান্তিপ্রদ স্থান উত্তর বিক্রমপুরের আর কোথাও বিদ্যমান নাই। প্রাচীন এমন কোনও কাগজপত্র পাওয়া যায় না, যদ্দ্বারা ইহার প্রকৃত প্রাচীনত্ব নির্ণীত হইতে পারে। জনকোলাহল হইতে দূরে একটী খালের পারে (চাঁচুরতলার খাল) সুরম্য তপোবনের ন্যায় বট, তেঁতুল, আম্র প্রভৃতি প্রাচীন মহীরুহরাজির শীতল ছায়ায় শষ্পাচ্ছাদিত প্রান্তরভূমে জগন্মাতা বিক্রমপুরবাসীর স্নেহময়ী রক্ষয়িত্রীরূপে বিরাজিতা। নানা দেশদেশান্তর হইতে প্রতিদিন দেবীকে দর্শনের নিমিত্ত এখানে লোকসমাগম হইয়া থাকে। উত্তর বিক্রমপুরে যেমন চাঁচুরতলার সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ী বিখ্যাত, তদ্রূপ দক্ষিণ বিক্রমপুরের মাঐসার নামক গ্রামের দিগম্বরীর বাড়ী প্রসিদ্ধ। সাধারণে ইহাঁদিগকে দুই ভগ্নী বলিয়া থাকে। ইঁহারা উভয়েই জাগ্রতা দেবী। কথিত আছে যে, সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মাণ্ড গিরি চাঁচুরতলাতে এবং মাঐসারে চাঁদকেদার রায়ের গুরু গোসাঞি ভট্টাচার্য্য সিদ্ধিলাভ করেন। এই উভয় স্থানই সিদ্ধপীঠ। আমরা স্বতন্ত্র-প্রবন্ধে এই দুই মহাত্মার অলৌকিক জীবনীর আলোচনা করিব। সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ীর মাহাত্ম্য সম্পর্কে নানাপ্রকার জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে ; প্রবন্ধ-বিস্তৃতির আশঙ্কায় আমরা সে সব বিষয়ের আলোচনায় ক্ষান্ত রহিলাম। বর্ত্তমান ষ্টিমার ষ্টেসন বহর (রাজাবাড়ী) হইতে সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ী অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত।

কন্যাদায়।

খুব ভোরেই বাড়ীতে পৌঁছিলাম।

সমস্ত রাত্র বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া ভোরের সময় আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। পশ্চিমের আকাশে রেখা চাঁদটুকু এখনও ঊষার কোলে লুকায় নাই।

"বাড়ী" বলিতে গিয়া আজ অনেক দিনের পর বাড়ীর কথা মনে পড়িয়া গেল। সেই লাল রঙ্গের দোতালা বাড়ীখানি, সেই বাড়ীর সম্মুখের ছোট বাগানটী, সেই গেটের ধারের জামরুল গাছ, স্কুলের সঙ্গী ছেলেরা, সেই রান্না ঘর, সেই শয়নের ঘর, সেই খাটের উপর বিছানা, সেই —, কোন

কথাটা বলিব, সেই সমস্তই মনে পড়িয়া গেল। বাবার মৃত্যুর পর হইতে আর তো বাড়ী চোখে দেখি নাই, এখন মামার বাড়ীই আমাদের আশ্রয়। এ আশ্রয় না থাকিলে মা ও আমরা তিনটী ভাইবোন কোথায় দাঁড়াইতাম ভাবিয়া পাই না।

যখন প্রথম মামার বাড়ী আসি চারু তখন কেবল তিন বছরের, তরু সাত বছরের। তরুর নিজের অবস্থা বুঝিবার মত জ্ঞান হইয়াছিল, কিন্তু চারু তো কিছুই বুঝে না, কেবলি বলিল, "মা বাড়ী চল।" মা চারুর কথা শুনিয়া মুখ ফিরাইতেন, আমি বুঝিতে পারিতাম চোখের জল লুকাইবার জন্যই মা মুখ ফিরাইয়াছেন ; কিন্তু চারু তো তাহা বুঝিত না, কেবলই মার আঁচল ধরিয়া টানিত, আর সেই এক কথা "ও—মা, বাড়ী চল।"

যাক্, সে পুরাণ কথা তুলিয়া আর কি হইবে ?

সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি হইয়া শেষ রাত্রে খুব ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল, ঠাণ্ডা লাগিয়া আমার শীত-শীত করিতেছিল, আর একটু একটু ভয়ও হইতেছিল—'যদি জ্বর আসে।' পাঁচ ছয়মাস হইতে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছিলাম। আমাদের পল্লীটী কলিকাতার অন্তর্ব্বর্ত্তী বলিয়া ধরা হইলেও এখানে মিউনিসিপ্যালিটির কোন অস্তিত্ব বুঝা যাইত না। মামার বাড়ীর চারিপাশেই ঝোপঝাপ, বাড়ীখানিতে এক তলায় তিনটী ঘর ও একটি বারণ্ডা মাত্র, তাহাও আবার অনেকদিন হইতে জীর্ণ হইয়া বালিচুণ সমস্তই খসিয়া গিয়াছে ; কেবল জীর্ণ ইষ্টকের কঙ্কাল কয়খানি কোনমতে খাড়া হইয়া আছে। আম, জাম ও নারিকেল গাছ চারিদিক হইতে বাড়ীখানিকে ঢাকিয়া রাখিয়া তাহার লজ্জা নিবারণ করিয়াছে। বাড়ীর পিছনে একটা এঁদো পুকুর, বোধ হয় ম্যালেরিয়ার বাসা সেইখানেই।

বড় মামা সওদাগরী আপিষে কাজ করেন, ত্রিশটি টাকা মাহিনা পান, আর দুটি মামা এখনও পঠদ্দশায়। ইহা হইতেই সাংসারিক অবস্থা অনুমেয়।

আমার পায়ের শব্দ শুনিয়া মা বাহিরে আসিলেন, বোধ হয় আমার জন্য মার সমস্ত রাত্রিই ঘুম হয় নাই। মা বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "অমূল্য, এলি বাবা? অসুখ শরীর নিয়ে অতদূর যাওয়া, আমার মন ভারী উতলা হয়েছিল। কোন অসুখ করে নি তো ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম "মা, 'মানকর' ষ্টেসন যদি তোমার কাছে 'অতদূর'

হয়, তবে কাশী, গয়া, বৃন্দাবন তো পৃথিবীর বাহিরে। তোমার আর কোন-কালে তীর্থ করা হবে না।"

মা বলিলেন, "কে জানে বাছা, কতদূর। জন্মে কখনও রেলগাড়ীতে উঠি নি', পাড়া গাঁ শুন্‌লেই মনে হয় সে কোন তেপান্তর মাঠের ভিতর। তা যাগ্‌গে, তুই আছিস কেমন—বেশী ঠাণ্ডা লাগাস্‌নি তো ?"

আমি। মা, যার জন্য গিয়াছি, সে কথা একবারও জিজ্ঞাসা কর্‌লে না, খালি বাজে বোক্‌ছো। আচ্ছা, আমিও তোমাকে কিছু বল্‌ছিনে।

মা হাসিয়া "আচ্ছা, বলিস্‌নে" বলিয়া গৃহকার্য্যে চলিয়া গেলেন।

এমন সময় বড় মামা বাহিরে আসিলেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "কিরে অমূল্য, ছেলে কেমন দেখে এলি, বাড়ী ঘর কেমন দেখ্‌লি ? কত চায় ?"

আমি। ছেলেটি মন্দ নয়। এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত পড়েছিল, এখন পড়া ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায় কাজে ঢুকেছে। বাড়ী ঘর বেশ ভাল, বাড়ীতে বাগানপুকুরও আছে, ধানী জমীও কিছু আছে, তাতে বেশ ধান হয়—ওদের সম্বৎসরের চাল খরচ চলে যায়।

মামা। এ সব তো ভালই। এখন আসল কথা—চায় কত ?

আমি। তরু যেদিন উমাপদ বাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়েছিল, সেইদিন ছেলে নাকি নিজেই তরুকে দেখেছে। ধরণীবাবু বলিলেন "শুনেছি তোমরা পাঁচশো টাকার বেশী দিতে পার্‌বে না। আমি হাজার টাকার কমে কিছুতেই রাজী হতুম না, তবে মেয়েটী দেখ্‌তে ভাল, সকলেরই পছন্দ হয়েছে, কাজেই পাঁচশোতেই রাজী হতে হলো।"

মামা। পাঁচশো টাকা ? এবার তোর চুল বিকিয়ে যাবে। পাঁচশোর ভিতরই সব তো ?

আমি। হাঁ, সেই রকমই ঠিক হয়েছে, আমি বলে এসেছি এর উপর আমরা আর কিছুই দিতে পার্‌বো না।

মামা। এক রকম শস্তাই বল্‌তে হবে, কিন্তু পাঁচশো টাকা যোগাড় হবে কি করে ? তাইতো।—বলিতে বলিতে বড় মামা স্নান করিবার জন্য চলিয়া গেলেন।

মা তখন কেবল স্নান করিয়া আসিয়াছেন, তরু বঁটি লইয়া রান্নাঘরের দুয়ারের সম্মুখে বারাণ্ডায় বসিয়া কুটনো কুটিতেছে। আমি মার নিকট গিয়া

বলিলাম "মা, তোমার মেয়ের বিয়ে তো ঠিক করে এসেছি, এখন পাঁচশো টাকা আন।"

মা আমার কথা শুনিয়া, একটু ম্লান হাসি হাসিলেন। আমি বলিলাম—"ভুল হয়েছে মা, পাঁচশো নয়, ছশোই দিতে হবে। বরযাত্রী খাওয়ান আছে. বিয়ের রাত্রের খরচ আছে, আর আমরাই বা কি অপরাধ করেছি যে খেতে পাব না।"

মা শূন্যদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, একটী ছোট নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "আমার যথাসর্ব্বস্ব ধন কেবল তুমি আছ, তা ছাড়া আর কিছু নাই।"

"তবে আমাকেই বিক্রী করে টাকা দাও। টাকা না দিলে তো বিয়ে হবে না।" বলিতে বলিতে একবার তরুর দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তরু ক্রমশই ঘাড় হেঁট করিতেছিল, বঁটির উপর উবুড় হইয়া পড়ে আর কি। বাস্তবিক তরুর জন্য ভারী কষ্ট হয়। উঠিতে-বসিতে কথায় কথায় মার কাছে বকুনি খায়। অপরাধ কি ? না, বিয়ে হচ্ছে না। আমি ভাবি, ও বেচারী কি করিবে। বিয়ে করিতে যে ওর অনিচ্ছা আছে, এমন কথা তো কখন বলে নাই। যদিই বা বলে, তাহাতেও কিছু বিয়ে বন্ধ হবে না,বিয়ে বন্ধ হচ্ছে কেবল টাকার জন্য, তাতে ওর দোষ কি ? আর মার কি অন্যায়! তরু খাবার চাহিলে মা হয়তো রাগের মাথায় বলিতেন "থুব্‌ড়ি! বিয়ে হয় না, খেয়ে খেয়ে কেবল হাতি হচ্ছে।" একি আশ্চর্য্য! বিয়ে হয় না বলিয়া সে উপোষ করিয়া থাকিবে নাকি ? আবার না খেলেও বকুনি "বিয়ের চিন্তায় বুঝি মুখে অন্ন রোচে না ?" পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে আর তাহার খেলা করিতে যাইবার যো নাই "এতবড় আইবুড় মেয়ের পাড়া বেড়ানো কি ভাল দেখায় ?" বেচারীর কি কষ্ট! আমি মনে করিতাম "মেয়েগুলো কেন জন্মায় ?" কিন্তু আজ তরু তাড়াতাড়ি উঠিতে গিয়া অসাবধানে এক ঘটি জল ফেলিয়া দিল, মা তবুও তাহাকে বকিলেন না। বোধ হয় বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হইয়াছে দেখিয়া মা তরুর উপর খুসী হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সেদিন ভাত খাইতে বসিয়া আমি কেবল টাকার কথাই ভাবিতেছিলাম। 'ভাবনা'র সঙ্গে আমার তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না, কিন্তু আজকাল তাহার সঙ্গে একটু একটু করিয়া আলাপ হইতেছে। দিদির বিবাহের ভাবনা আমাকে

ভাবিতে হয় নাই, তখন আমি ছোট ছিলাম বলিয়া, মা একাই ভাবনার ভার লইয়াছিলেন; কিন্তু তরুর যে আবার বিবাহ দিতে হইবে, সে কথা বোধ হয় মার মনে ছিল না, তাই যাহা কিছু সম্বল ছিল সমস্ত ঘুচাইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া "বড় ঘরে" দিদির বিবাহ দিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, দিদির শ্বশুররা খুব বড়মানুষ, তাঁহাদের অর্থের অভাব নাই, তবে কেন দরিদ্রের সামান্য সম্বলটুকু গ্রহণ করিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হইল, একথা বুঝিতে পারি না।

ধনী কুটুম্ব করিবার সাধ মার বড়ই প্রবল ছিল, তাহারই ফলে বিবাহের পর দিদি যে একবৎসর বাঁচিয়াছিলেন, সে একবৎসর মা আর তাঁহাকে দেখিতে পান নাই, কেবল তাঁহার পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার দিন লোক-মুখে সংবাদ পাইয়া মা আমাকে সঙ্গে লইয়া একবার শেষ দেখা দেখিবার জন্য উন্মাদের মত ছুটিয়া গিয়াছিলেন। গিয়া যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। লক্ষ্মীপ্রতিমার মত দিদির সেই অচেতন দেহ-খানি অঙ্গণে পড়িয়া আছে, সেই সুন্দর কালো চুলগুলি ভূমিতে লুটাইতেছে। মা দেখিয়াই জ্ঞানহারা হইলেন। আমি দিদির মুখের উপর মুখ দিয়া ডাকিলাম "দিদি", ডাক শুনিয়া দিদি একবার চোখ মেলিয়াছিলেন, সে চোখে তখনও কি করুণ স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি? অস্ফুটস্বরে দিদি কি কথা বলিতেছিলেন, শুনিবার জন্য তাঁহার মুখের কাছে কাণ রাখিলাম, কিন্তু দিদির শাশুড়ী দ্বিতলের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া "এই বেলা হাতের চুড়ি ক'গাছা আর অনন্ত দু'গাছা খুলে নে" বলিয়া চেঁচাইতেছিলেন, তাঁহার সেই চীৎকারে দিদির শেষ কথাটী আর শুনিতে পাইলাম না।

কি কথায় যে কি কথা আসিয়া পড়ে, তাহার ঠিক নাই। দিদির কথা মনে পড়িয়া আমিতো চারুর বিবাহের কথা, টাকার কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু মা আমার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছেন, সেই চিন্তাতেই বুঝি আমি তন্ময় হইয়া আছি। বোধ হয় অনেকক্ষণ মা আমার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন, শেষে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "তুই যে কিছুই খেতে পারলি নে? অমূল্য, অত ভাবিস্‌নে বাবা, ভগবানের যা ইচ্ছা তাই হবে। বন্ধকী বাড়ীটা বিক্রী হলে কি চারশো টাকাও পাওয়া যাবে না? আমার যেমন অদৃষ্ট! দুধের ছেলে তুই, পোনের বছর বয়সেই তোকে বোনের বিয়ের ভাবনা ভাব্‌তে হোল।"

মার কথা শুনিয়া আমি লজ্জা পাইলাম। কেন যে অন্যমনস্ক হয়ে

যাই, ঐ আমার এক বিষম দোষ। মাকে থামাইবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিলাম "না মা, আমি সে সব কিছু ভাব্‌ছি না। তুমি আজ একবার মাসীমাদের বাড়ী যাবে? মাসীমা কিছু টাকা যদি ধার দেন, বলে দেখো।"

"অমোদিনী! সে আবার টাকা দেবে? সে "দিদি" বলে আমার সঙ্গে কথা বল্‌তেই অপমান মনে করে, চারুর বিয়েতে সে টাকা দেবে! তবু মনীন্দ্রবাবুকে ভাল বল্‌তে হয়, সে ভগ্নিপতি, বোনই যখন বোনের দুঃখ বুঝ্‌লে না, তখন ভগ্নিপতিকে আর কি বল্‌বো? টাকা নাই দিক্, বিয়েটাও যদি তার বাড়ী থেকে দিতে দেয়, তা হলেও বাঁচি। এ বাড়ী তো একে ভাঙ্গা, তায় মোটে তিনখানা ঘর। সভাই বা কোথায় হবে, লোকজন বস্‌বেই বা কোথায়?"

আমি মায়ের কথায় আর কিছু উত্তর দিলাম না। কেন না, জানিতাম কথার কথা বাড়িলে ক্রমে পুরাণো কথা উঠিয়া পড়িবে, আর সেই সঙ্গে মার দুঃখ-সমুদ্রও উথলিয়া উঠিবে, শেষে মা কাঁদিতে আরম্ভ করিবেন।

আহার শেষ করিয়াই মাসীমার বাড়ীর উদ্দেশে বাহির হইলাম। পথে এক পস্‌লা বৃষ্টি আসিল, ছাতা ছিল না, বাধ্য হইয়া ভিজিতে হইল।

অদৃষ্ট ও সৌন্দর্য্যের গুণে মাসীমা ধনবানের পত্নী হইয়াছিলেন। মাকে যে তাঁর "দিদি" বলিয়া ডাকিতে লজ্জা করে তাহাতে তাঁহার দোষ কি? একদিন আমার পরিধেয় মলিন ছিন্ন বস্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মাসীমার বাড়ীর নূতন ঝি বলিয়াছিল "ছেলেটী কি মাঠক্‌রুণের আপন বোন্‌পো, না গ্রামস্থবাদে বোন্‌পো?"

তবু,—সেই ময়লা ভিজা কাপড়ে সেই কাদামাখা জুতা পায়েই কার্পেট মোড়া সিঁড়ির উপর দিয়া দ্বিতলে উঠিলাম। মাসিমা তখন আহারান্তে শয়ন-গৃহে সোফার উপর শুইয়া একখানি উপন্যাস পড়িতেছিলেন, মেসো মহাশয় বারাণ্ডার সম্মুখে দুয়ারের কাছে চেয়ারে বসিয়া ধূমপান করিতে করিতে সংবাদপত্র পড়িতেছিলেন, আমাকে দেখিয়া বলিলেন "কিরে অমূল্য, বর দেখে এলি?"

আমি বর-দেখার বিস্তারিত বিবরণ মেসোমহাশয়ের নিকট বলিলাম। মেসোমহাশয় বিষয়ী লোক, তিনি সর্ব্বদাই বলেন, "আমরা খাঁটী বিষয়ী লোক"। খুঁটানাটী সকল দিকেই তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া সমস্ত বিবরণ

সংগ্রহ করিয়া লইয়া অবশেষে মন্তব্যপ্রকাশ করিলেন "সম্বন্ধটা তবে মন্দ নয়।"

আমি বলিলাম "পাড়াগাঁ বলে মার মন একটু খুঁৎ খুঁৎ করছে।"

আমার কথা শুনিয়া মাসীমা একটু মাথা তুলিয়া একবার আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

মেসো মহাশয় হাসিয়া বলিলেন "দিদির ওসব কথা যেতে দাও। এখন কাজের কথা হোক্। টাকার একেবারে ঠিক্‌ঠাক্ হয়ে গিয়েছে?"

"হুঁ। পাঁচশোর ভিতরই সব—এই রকম কথা হয়েছে।"

"কথা তো হয়েছে, কিন্তু তুই ছেলেমানুষ জানিস্ নে, শেষে আবার হয়তো নানান বায়না নিয়ে বস্‌বে। তা সে যা হয় হবে এখন, তোদের বাড়ীটা দু'চার দিনের ভিতর বিক্রী না হলে তো টাকার কোন উপায়ই হবে না। বাড়ী বিক্রী হলে, পাঁচশো না হোক তিনশো সাড়ে তিনশো টাকাও তো পাওয়া যাবে।"

"বাড়ী বিক্রীর ভার তো আপনার উপরেই, এসম্বন্ধে আপনার চেয়ে তো আর কেউ বেশী বোঝে না।"

"বিষয়কার্য্য ভাল বুঝেন" একথা শুনিলে মেসো মহাশয়ের বড়ই আমোদ হইত। মেসো মহাশয় খুসী হইয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন "দেখা যাক্ কি হয়! বিয়ে তো এই মাসেই?"

"না হলে যে আর সময় নাই। সম্মুখেই ভাদ্রমাস, তারপর আবার আশ্বিন কার্ত্তিক দু'মাস বিয়ে হবে না।"

"তবে তো এই মাসে দেওয়া দরকারই বটে।"

এইবার আমি সাহসে নির্ভর করিয়া বলিলাম—"বিয়ে কোন্ বাড়ী থেকে হবে? ও বাড়ীতে মোটে তিনখানা ঘর, কোথায় সভা হবে, কোথায় বরযাত্রী বস্‌বে মা এই কথা বল্‌ছিলেন।"

মেসো মহাশয় বলিলেন "তাইতো,—তা না হয় এবাড়ী থেকেই বিয়ে হবে।"

মাসিমা আবার মাথা তুলিয়া আমাদের দিকে চাহিলেন, তাহার পর একটু শ্লেষের স্বরে মেসোমহাশয়কে বলিলেন "যাদের মোটে তিনখানা ঘর, তারা কি আর মেয়ের বিয়ে দেয় না? সকলেরই কি তোমার মত ভগ্নিপতি থাকে যে তার বাড়ী থেকে বিয়ে দেয়?"

মাসীমার কথা শুনিয়া মেসোমহাশয় খুব হাসিতে লাগিলেন। আমি দুয়ারে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, একবার আমার দিকে আর একবার মার দিকে চাহিয়া নিতান্ত ভাল মানুষের মত আস্তে আস্তে মেসোমহাশয় বলিলেন

"তা তোমার যদি অমত হয়, তবে এবাড়ী আর বিয়ে হয়ে কাজ নাই। তোমার অমতে কি আর আমি কোন কাজ কর্‌তে পারি? তবে বরযাত্রীদের জন্য তো তত ভাবি না, তুমি সে বাড়ীতে গিয়ে বস্‌বে কোথায় সেই ভাবনা হচ্ছে?"

মাসিমা এই কথা শুনিবা-মাত্র উপন্যাস ফেলিয়া দিয়া সশব্দে সোফা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যে রাগ করিয়াছেন তাহা জানাইবার জন্য খুব জোরে জোরে পা ফেলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন, যাইবার সময় বলিলেন "তোমার বাড়ী তুমি যা খুসী তাই কর্‌বে, আমি কেন তাতে কথা কইতে যাবো?"

অনেকক্ষণ ভিজা কাপড়ে থাকিয়া আমার শীত করিতেছিল, এখন হঠাৎ এত শীত হইল যে কাঁপিতে আরম্ভ করিলাম, বেশ বুঝিতে পারিলাম জ্বর আসিবার আর বিলম্ব নাই। পড়িয়া যাইবার ভয়ে খড়্‌খড়িটা একটু শক্ত করিয়া ধরিলাম। মেসো মহাশয় দেখিয়া বলিলেন "একি অমূল্য, তুই শীতে যে নীল হয়ে গিয়েছিস্? এতক্ষণ ভিজা কাপড়ে আছিস্? শীগ্‌গির কাপড় ছাড়।"

আমি অতি কষ্টে বলিলাম "বাড়ী গিয়েই কাপড় ছাড়বো।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অত্যাচারের ফলে এবার আমার জ্বরটা খুব বেশীই হইল, দুইদিন একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিলাম। এ দুইদিন বড়মামা আফিষ কামাই করিয়া দিনরাত আমার মাথার কাছে বসিয়া মাথায় বরফ চাপাইয়াছিলেন।

বড় মামার স্বভাবটী ঠিক করিয়া বুঝা কঠিন। লোকের সঙ্গে মেশা অভ্যাস তাঁহার মোটেই ছিল না, আফিষ হইতে আসিয়াই বিছানার উপর শুইয়া পড়িতেন, নিতান্ত দরকার না হইলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে আর উঠিতেন না। জীবনে কখনও বড় মামার মুখে মিষ্ট কথা শুনিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না। বড় মামার বয়স এখন ছাব্বিশ বৎসর, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে একস্থানে তাঁহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। তখন আমার দিদিমা জীবিতা ছিলেন, বধূমুখ দেখিবার জন্য ছেলের মায়েরা যেমন ব্যাকুল হন, দিদিমা তাহার অপেক্ষা কিছু অধিক ব্যাকুলই হইয়াছিলেন। দিদিমার কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল, মনের ব্যাকুলতায় সৌখীন জিনিস যাহা তাঁহার চোখে পড়িত, ভাবী পুত্রবধূর জন্য তাহাই কিনিতে চাহিতেন। গায়ে-হলুদের তত্ত্ব পাঠাইতে খুঁটীনাটী যাহা

কিছু দরকার দিদিমার সমস্তই গুছানো হইয়া গিয়াছিল ; কিন্তু বড় মামা বিবাহ করিলেন না। যেদিন আমরা আশ্রয়হীন হইয়া তাঁহার গলগ্রহরূপে উপস্থিত হইলাম, সেইদিনই সন্ধ্যার পর দিদিমাকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন "মা,সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দাও আমি বিবাহ করিব না।" বড় মামার কথায় ও কাজে কখন অমিল হয় না একথা দিদিমা ভাল করিয়াই জানিতেন, তথাপি অনুনয়-বিনয় অশ্রু-বর্ষণ আত্মহত্যার ভয় দেখানো সকল উপায়গুলিই একএকবার অবলম্বন করিয়া দেখিলেন—বড় মামা কিছুতেই টলিলেন না। মার জন্যই যে বড় মামা বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক, একথা বুঝিতে পারিয়া দিদিমা মার উপরও বিরক্ত হইলেন, অবশেষে কয়েকমাস পরে ভগ্নহৃদয়ে পরলোকে প্রস্থান করিলেন, পুত্রবধূর মুখ-দর্শনের সাধ আর তাঁহার মিটিল না।

বড় মামার মুখে মিষ্ট কথা কখনও শুনি নাই, কিন্তু কটুকথা অনেক শুনিয়াছি। স্বভাবতঃ তিনি একটু রাগী স্বভাবের, রাগ হইলে বড় উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন। অনেকদিন রাগের মাথায় মাকে বলিতেন—"তুমি আমার বাড়ী থেকে চলে যাও, আমি গরীব মানুষ, এত লোককে কোথা থেকে খেতে দেব ?" মা একটীও উত্তর দিতেন না, নিঃশব্দে তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িত, আমি সে চোখের জল কতদিন দেখিয়াছি। বড় মামা যে মার প্রতিপালনের জন্যই সংসারসুখ ত্যাগ করিয়াছেন, একথাটী মায়ের মনে বড়ই বিঁধিয়াছিল, মা কথায় কথায় প্রায়ই বলিতেন—"ফণিতো আমার জন্যই সন্ন্যাসী হয়ে রইলো। মার কত সাধ ছিল বৌয়ের মুখ দেখা, সে সাধ পূর্ণ হোল না।" আমি উঁহাদের দুই ভাইবোনের আত্মত্যাগ ও চোখের জল দেখিয়া নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিতেছিলাম। অনেক চেষ্টার পর একটা প্রেসের কাজ পাইয়াছি, সন্ধ্যা থেকে রাত এগারটা পর্য্যন্ত খাটিতে হয়। পরীক্ষা দেওয়ার প্রলোভন ছাড়িতে পারি নাই বলিয়া, দিনের কাজ এখনও লওয়া হয় নাই।

এখন সে কথা যাক্। দুই দিনের পর যেদিন আমার সহজ জ্ঞান হইল, সে দিন বড়মামা আর আফিষ কামাই করিতে ভরসা করিলেন না। তাড়াতাড়ি দুটী গরম ভাত নাকেমুখে গুঁজিয়া আফিষে ছুটিলেন। তিনি বাহির হইবার পরক্ষণেই ঘট্‌কী আসিয়া উপস্থিত।

"কর্ত্তা দিন করে পাঠিয়ে দিলেন। পরশু গায় হলুদ, তার পরদিন বে। তোমরা সব এদিক্‌কার গোছগাছ করে নাও।"

মা তো একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন।

"সে কি ? বিয়ের যে এ মাসে ঢের দিন আছে, এই তো মোটে দশই।"

ঘটকী বলিল—"সে সব দিন তত ভাল নয়,তারা এই দিন না হলে 'অদিনে' ছেলের বে দেবেনা। তা তোমাদের তো শুভকাজ, শীগ্‌গির হইলেই ভাল, আর কি-ই বা এমন ঘটা কর্‌বে, যে দুদিনে যোগাড় হবে না।"

মা অতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন "বাড়ীতে লোক তো কেউ নাই, মনীন্দ্র বাবুর কাছে এখন কে যায়? ফণী সেই সন্ধ্যার সময় হয়তো আসবে, দুদিন কামাই করেছে, আজ কি আর সহজে দুটী পারে ? এমনই তার যে শরীর, দুদিন রাত জাগায় আরো যেন ভেঙ্গে পড়েছে, তাকেই বা আর কি বলি ?"

"আমি যাচ্ছি—" বলিয়া আমি বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। মা—"করিস্ কি অমূল্য, ঘুরে পড়ে যাবি" বলিয়া ছুটিয়া আসিলেন ; কিন্তু ততক্ষণে আমি পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছি।

মেসো মহাশয় বারণ্ডার সম্মুখে দুয়ারের কাছে চেয়ারে বসিয়া খড়্‌খড়িতে পা দিয়া খবরের কাগজে মগ্ন ছিলেন, আমাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"একি অমূল্য, তোর না ভারী অসুখ ?"

আমি এক নিশ্বাসে সমস্ত বক্তব্য শেষ করিয়া, মেঝের কার্পেটের উপর বসিয়া পড়িলাম।

মেসো মহাশয় সকল শুনিয়া জমীদারী চালে মাথা নাড়িতে লাগিলেন,—"তাই তো ! দুদিনের ভিতর কি করে হয় ? বাড়ী বিক্রী কি মুখের কথা ? তা আবার বন্ধকী বাড়ী।"

আমি বলিলাম—"আপনি মনে করিলে দু'দিন কেন একদিনের ভিতরই সমস্ত ঠিক হইতে পারে।"

বেশ জানিতাম—মেসোমহাশয়কে খবরের কাগজ ছাড়াইয়া কাজে লাগাইবার এই কথাটীই প্রধান ঔষধ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মাসীমার বাড়ী হইতেই বিবাহ হওয়া স্থির হইল। মাসীমা মাথা ধরায় বিবাহের দিন বিছানা হইতে উঠিতে পারিলেন না।

সন্ধ্যার সময় ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া বরযাত্রী-সহ বর আসিলেন, মেসো মহাশয় যথাবিধি আদর অভ্যর্থনা করিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিলেন।

অবশেষে সম্প্রদান-স্থলে উপস্থিত হইয়াই বিপদ বাধিল। "একি এ, সম্প্রদান-মণ্ডপ যে একেবারে শূন্য? দানসামগ্রী সব কোথায়? ছেলেকে ঘড়ী ঘড়ীচেন দিবার কথা নাই, তাই বলিয়া কি সম্প্রদানের আংটী জোড় বর-কর্ত্তাকে নিজে সঙ্গে করিয়া আনিতে হইবে নাকি? আসন, বসন, ছত্র, পাদুকা না দিলে কি সম্প্রদান হয়? হিন্দুমাত্রই তো ইহা জানে, একি হিন্দুর বাড়ী নয় নাকি?" বরকর্ত্তা তো একেবারে চটিয়া আগুণ হইলেন, মেসো মহাশয় দুটী একটি মিষ্ট কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া কোন সুবিধা না পাইয়া থামিয়া গেলেন। বরকর্ত্তার সেই একই পণ "হয় যথারীতি দানসামগ্রী ইত্যাদি সাজাইয়া দাও, নয় তো নগদ ১০০৲ টাকা ধরিয়া দাও।" কিন্তু কত কষ্টে যে পাঁচশত টাকা সংগ্রহ হইয়াছে, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নয়, আবার একশো দূরে থাকুক, একটি টাকা দিবার ক্ষমতাও এখন আমার নাই।

বাহিরে যেমন অবিশ্রান্ত ঝড়বৃষ্টি, ভিতরেও তাহারই অনুকরণ চলিতে লাগিল। ঝড়বৃষ্টি হইয়া এই সুবিধাটুকু হইল, যে সেই মুষলধারা বৃষ্টি মাথায় করিয়া বরকর্ত্তা বর লইয়া সহসা প্রস্থান করিতে পারিলেন না। বর-বেচারীর মুখ একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে, বেচারীর বিবাহ না করিয়া অমনি অমনি ফিরিয়া যাইতে একেবারেই ইচ্ছা নাই, তাহা তাহার মুখ দেখিয়াই বেশ বোঝা গেল।

বরকর্ত্তার ব্যবহারে বড় মামার রাগে মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে ও কাছা খুলিয়া গিয়াছে। বেশী রাগ হইলে বড় মামা কথা বলিতে পারিতেন না. সেইটীই মঙ্গল ; নহিলে হয়তো কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়া যাইত।

আমি কি করা উচিত কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। পাশের ঘরে গিয়া মেসোমহাশয়ের দেখা পাইলাম। মনের আবেগে তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম "মেসোমহাশয় আপনি টাকা না দিলে আর উপায় নাই।"

মেসোমহাশয় নিতান্ত নির্ব্বিকার ভাবে বলিলেন "আমি টাকা কোথায় পাব? আমার হাতে এখন কিছুই নাই।"

বড়মামা আরক্ত নয়নে মেসোমহাশয়ের দিকে চাহিলেন, জড়িত স্বরে বলিলেন "মনীন্দ্র বাবু, আমার বিষয়টুকু বন্ধক রাখিয়া টাকা দিন।"

"আমি ওসব হাঙ্গামে নাই"—বলিয়া মেসোমহাশয় বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন।

বাড়ীর ভিতরের অবস্থা আরও শোচনীয়। তরু এতক্ষণ চেলী পরিয়া আলিপনা-দেওয়া ধান-বিছানো পিঁড়ির উপর বসিয়া ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া কাঁদিতেছিল, এখন ভয়ে তাহার কান্না বন্ধ হইয়া গিয়াছে। চারু তাহার দিদিমণির পিছনে চুপ করিয়া ছবির মত দাঁড়াইয়া আছে। প্রতিবেশিনীরা যে দুই একজন আসিয়াছেন, তাঁহারা কেহ "হায় হায়" করিতেছেন, কেহ নিস্তব্ধ হইয়া আছেন। মা মাটীতে শুইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছেন, আমাকে দেখিয়া হতাশ ভাবে বলিলেন—"অমূল্য একি হোল রে বাবা! এখন যে জাত যায়।"

গোলমালে মাসীমার মাথা ধরা ছাড়িয়া গিয়াছিল। তিনি তখন চীৎকার করিয়া বলিতেছেন "এ কি বালাই ঘাড়ে করা? আমি এইজন্যই তখন বলে-ছিলেম, তা আমার কথা শুন্‌বে কেন? এখন পরের জঞ্জাল ঘাড়ে করে নিয়ে কি কর্‌বে তা কর।"

মেসোমহাশয় আলমারী খুলিতে খুলিতে বলিলেন "তোমার মেয়ের বিয়েতে এর চেয়েও বেশী জঞ্জাল ভুগ্‌তে হবে।"

তারপর মার দিকে চাহিয়া বলিলেন "দিদি, হয়েছে কি? তোমার এত প্যাণপেনে স্বভাব কেন? এ আর গোলমাল কিসের? গোলমাল নইলে কি বিয়ে হয়, জান তো বিয়ে হতে হলে লক্ষ কথা চাই। এমন কত বিয়ে আমি দেখে এসেছি। আমি যখন ভার নিয়েছি, তখন তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

মেসোমহাশয় আলমারী হইতে ঘড়া, ঘটী, বাটী, থালা ও কার্পেট ইত্যাদি বাহির করিতেছেন দেখিয়া মাসিমা বলিলেন "ও হচ্ছে কি? সুরোর দানের জিনিস বার কর্‌ছো কেন?"

"তরুর দানে দেবো বলে।"

মিনিট কয়েকের মধ্যেই বিবাহ-স্থানে দানের সামগ্রী সাজানো হইয়া গেল, ছাতা জুতা কার্পেট কিছুই বাদ পড়িল না। বরকর্ত্তা আড়চোখে চাহিয়াই বুঝিলেন, জিনিসগুলি জিনিসের মত বটে, খেলো জিনিস নয়। তখন সমস্ত গোল মিটিয়া, অবাধে সম্প্রদান ও বিবাহ শেষ হইল।

পরদিন অতি প্রত্যূষে কন্যাবিদায়। বরকন্যা গাড়ীতে উঠিল, কিন্তু জিনিসপত্রের কোন সন্ধান না পাইয়া বরকর্ত্তা ব্যস্ত হইলেন,—বলিলেন "দানের জিনিসগুলি এই সঙ্গেই দিয়া দিন, ফুলশয্যার সময় পাঠাইতে ভারী হাঙ্গামা হবে।"

মেসোমহাশয়ের গোমস্তা রামলোচন বাবু বরকর্ত্তার পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি যেন বিস্মিতভাবে বলিলেন "সেকি মশায়, দানসামগ্রী আবার কি ? সে সব কিছু দিবার তো কথা ছিল না ?"

"কথা তো ছিল না, কাল দানে যে জিনিস দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো কোথায় গেল ?"

"সে দেখ্‌তে খারাপ দেখাবে বলে, বাবু মণ্ডপ সাজিয়ে দিয়েছিলেন, এখন আবার তুলে রাখা হয়েছে।" বলিয়া গোমস্তা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

বরকর্ত্তার অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। "পাজি, ছোটলোক।" গর্জ্জন স্বরে এই শব্দটী উচ্চারণ করিয়া ছুটিয়া দরজায় গিয়া দেখিলেন, ততক্ষণ বরকন্যার গাড়ী ষ্টেশনে চলিয়া গিয়াছে, তাঁহার জন্য কেবল একখানি গাড়ী উপস্থিত আছে। অগত্যা সেই গাড়ীতে উঠিয়া বরকর্ত্তা ষ্টেশনে রওনা হইলেন।

বরকন্যা বিদায় করিয়া দিয়া মেসোমহাশয়ের আর স্ফূর্ত্তির সীমা নাই। বড় মামার পিঠ্‌ চাপ্‌ড়াইয়া কেবলি বলিতে লাগিলেন "ভায়া, আমাকে কি যেমনতেমন লোক ঠাওরাও ?" মাসীমার কাছে গিয়া বলিলেন "কি ? বড় যে বল বুদ্ধি নাই, বুদ্ধি আছে কিনা দেখ্‌লে ?" মাসীমা সে কথায় কোন উত্তর দিলেন না। বরের হাতের আংটিটী তো খুলিয়া নেওয়া হয় নাই, সেই আংটীর কথা স্মরণ করিয়া মাসীমার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না।

মেসোমহাশয় মাকে বলিলেন "কেমন দিদি, তোমার জাত তো যায় নাই ? মেয়ের বিয়ে হোল তো ?"

মা চোখের জল মুছিতে মুছিতে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মেসোমহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন "তোমার গুণের ধার এ জীবনে শোধ দিতে পার্‌বো না ?" কিন্তু ভবিষ্যতে কি হইবে ভাবিয়া মার মন যে তখনও আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে,তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। মার কথা শুনিয়া মেসোমহাশয় খুব হা হা করিয়া হাসিলেন। হাসি থামিলে বলিলেন "গুণের ধার শোধ না দাও নাই দিও, আংটীর ধারটা কিন্তু শোধ দিতে হবে, না হলে সুরোর মা আর আমার সঙ্গে কথা কইবে না।"

কিন্তু আমার মন কিছুতেই প্রসন্ন হইতে চাহিল না। কেবলি মনে হইতে লাগিল, আমাদের এ জুয়াচুরীর ফল নির্দ্দোষী তরুকেই ভুগিতে হইবে ; কিন্তু এখন ভাবিয়া আর লাভ কি ?

শ্রীমতী সরলাবালা দাসী।

বাঙ্গালার অন্তঃপুরে আবৃত্তির আদর।

গতবর্ষের প্রবন্ধশেষে বলিয়াছিলাম, এবার যাত্রায় ও থিয়েটারে এদেশে যেভাবে আবৃত্তি করা হয়, তাহার আলোচনা করিব,—করিব ; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আরও দু-চারিটা কথা বলিবার আছে।

সামাজিক ব্যবহারের মধ্যে আবৃত্তি বাঙ্গালীর ঘরে এক সময়ে অতি উচ্চ আদর পাইয়াছিল,—আর তাহা পুরুষ-সমাজ অপেক্ষা মহিলা-সমাজে বড় বেশী। আমার অনুমান হয়, আমাদের গৃহলক্ষ্মীরাই আমাদের অপেক্ষা অনেক পূর্ব্বে আবৃত্তিকে অন্তঃপুরে আদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। আমাদের মহিলা-সমাজে তিন প্রকার আবৃত্তির বিষয় ছিল,—ছেলে ভুলানো ছড়া, ঠাকুরমার গল্প ও রূপকথা,—আর ব্রতকথা। সকলগুলিই বর্ষীয়সী গৃহিণীর মুখ হইতে যুবতী ও বালিকাদের মধ্যে আসিয়া পড়িত। 'ছেলে ভুলানো ছড়ার' অর্থ থাকুক আর নাই থাকুক, তাহার আবৃত্তি এমন কৌশলপূর্ণ ছিল যে, কেবল আবৃত্তিগুণেই দুষ্ট ছেলে শান্ত হইয়া বসিত, আব্‌দেরে ছেলে আবদার ভুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িত, কাঁদুনে ছেলে কান্না ভুলিয়া আনন্দ করিত। এ আবৃত্তিতে একটা গীতসুরের ঝঙ্কার অনেক স্থলে থাকিত বটে, কিন্তু সাধারণতঃ কবিতার শেষ চরণের মিলের প্রতি এমন একটা সুন্দর মৃদু আগ্রহ রাখিয়া আবৃত্তি করা হইত যে, তাহাই শ্রোতার মনোযোগকে আকৃষ্ট করিত। এখানে আরও একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। 'ছেলে-ভুলানো-ছড়া'র অনেকগুলি আজকাল ছাপা হইয়াছে। সকলেই তাহাতে দেখিতে পাইবেন যে, সেগুলিতে একটা বর্ণনীয় বিষয়ের গুরুত্ব নাই, বর্ণনীয় বিষয়ের শৃঙ্খলা নাই, অর্থের সুসঙ্গতি নাই, ব্যাকরণ-ছন্দ-অলঙ্কারের কোন ধরা-বাঁধা নাই,—অথচ সেগুলিতে এমন একটা কি মাদকতা আছে, যাহা কর্ণপথে শিশুমনে প্রবেশ করিয়া তাহাকে নেশায় ভোর করিয়া রাখে। আমার মনে হয়, সেটা অন্য আর কিছুই নয়—আবৃত্তির কৌশল ও গুণ। ঠাকুরমার মুখে, মায়ের মুখে,বড়দিদির মুখে ঐগুলির আবৃত্তিতে শিশু এমন একটা কিছু পায়—যাহাতে সে আত্মহারা হইয়া বংশীধ্বনি-শ্রুত সর্পের ন্যায় বা বন্য হরিণের ন্যায় মুগ্ধ হইয়া পড়ে। আমরা সকলেই একদিন শিশু ছিলাম,—পল্লীগ্রামবাসীর তো কথাই নাই—সহরবাসীর শিশু হইয়াও আমাদের কাহারও ভাগ্য এতটা হীন ছিল না যে, দুই চারিটা ছড়া শোনা সে বয়সে অদৃষ্টে ঘটে নাই। এখনও দিবসের

পরিশ্রমের পর অবসন্ন দেহে ক্লান্ত মনে গৃহে ফিরিয়া আমরা সন্ধ্যাকালে যখন পুরস্ত্রীদিগকে ছড়া আওড়াইয়া শিশু-সান্ত্বনায় নিযুক্ত দেখি, তখন দেখিতে পাই, সে আবৃত্তির মধ্যে কোন আড়ম্বর নাই, কোন চেষ্টা নাই, কোন যত্ন নাই, শ্রোতার দিক হইতে কোন আগ্রহও নাই, অথচ তাহার মধ্যে শিশু-সান্ত্বনার উদ্দেশ্যে আবৃত্তিতে যাহা যাহা থাকা আবশ্যক, তাহা সবই আছে,—একটু সুরের ঝঙ্কার আছে,—হাসি আছে, ক্রন্দনের অনুকরণ আছে, শিশুর সহিত একযোগে নানা ক্রিয়ার অভিনয় আছে,—ছড়াবিশেষে "সোনাকুড়ে পড়্‌বি না গুকুড়ে পড়্‌বি"—"ঘুঘু ঘুঘু মেতি সই," "দোল্ দোল্ দোল্—মামী-মায়ের দোল্"—ইত্যাদি সর্ব্বজনশ্রুত ছড়ার পংক্তিগুলির সহিত যে সকল অভিনয়াঙ্গ মিশ্রিত থাকে, তাহাই উহার প্রধান অংশ বলিতে হইবে। তাহারই গুণে শিশু যে বেশী মুগ্ধ হয়—ইহা না স্বীকার করিয়া পারা যায় না; কারণ তাহার ছড়ার অর্থ বুঝিবার সামর্থ্য নাই; তাহার ভাষাজ্ঞান নাই। হাতে-কলমে তাহার সহিত আবৃত্তিকারিণীর খেলাগুলি আর তাহার স্বর-ভঙ্গীর অনেক স্থলে তাহাকে বশীভূত করে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, আবৃত্তির সহিত স্বরভঙ্গী ও অঙ্গভঙ্গীর কতকটা যোগ আছে, আর তাহা একান্ত প্রয়োজনীয়। তাহার পর বালিকারা যে সকল ছড়া আওড়াইয়া নানারূপ খেলা করে, তাহার মধ্যে স্বরভঙ্গী অপেক্ষা অভিনয়াঙ্গ আরও বেশী থাকে। তাহাদের 'নুন টকসাই ভাত বাড়সাই', 'অ বুড়ী তোর এক পা জলে', 'খুড়ো দিলে বুড়োবর' ইত্যাদি ছড়াগুলির সঙ্গে যে খেলাগুলি খেলিতে দেখা যায় বা আবৃত্তির যে ভঙ্গী শুনা যায়. তাহা হইতে আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত স্বরভঙ্গী ও অঙ্গভঙ্গীর যে একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, তাহাও বেশ বুঝা যায়।

ব্রতকথায় আবৃত্তিই অন্তঃপুরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবৃত্তি। ইংরাজীতে যাহাকে Recitation, যাহাকে Reading বলে, ইহা সে ধরণের আবৃত্তি নহে। ইহা ইংরাজীর Story-telling এর শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে। আমাদের রূপকথা বলা, ঠিক Story-telling হইতে পারে না। ইংরাজী Story-telling এ বক্তার একটু মৌলিকত্ব থাকিলে ভাল হয়। ব্রতকথা-বলার মধ্যে বর্ণনীয় বিষয়ে মৌলিকত্ব যোজনা করা চলে না, কিন্তু বলিবার ভঙ্গীতে অনেকটা মৌলিকত্ব প্রকাশ পায়। শাস্ত্রোক্ত যতগুলি ব্রত আমাদের মধ্যে চলিত আছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশের ব্রতকথা এখনও বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হয় নাই, সংস্কৃতেই

আছে, সুতরাং শুনাইবার ভার এখনও পুরোহিত মহাশয়গণের একচেটে হইয়া আছে। আমরা অনেক স্থলে, দুইচারিজন হুঁসিয়ার পুরোহিতকে এই সকল সংস্কৃত কথার বাঙ্গালা ব্যাখা শুনাইতে দেখিয়াছি,—সাবিত্রী, জন্মাষ্টমী রামনবমী, অনন্ত, শিবরাত্রি প্রভৃতি ব্রতের কথাতেই এইরূপ হইয়া থাকে, তুবা মহিলাসমাজে যতগুলি লৌকিক ব্রত প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে ষষ্ঠী, সুবচনী, ইতু, মনসা, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি ব্রতগুলি প্রধান। সত্য-নারায়ণ ব্রতের কথা কিছুদিন হইতে মহিলাধিকার ত্যাগ করিয়া পুরোহিতের অধি-কারে গিয়া পড়িয়াছে। এই সকল ব্রতের কথা, পুরন্ধ্রী-মহলে যিনি প্রধানা—যিনি বর্ষীয়সী, তাঁহারই কহিবার অধিকার। কথা কহিবার সময় সমস্ত পুরমহিলা ও চাকরাণীরাও ব্রতের পূজাস্থানে একত্র হয়। প্রধানা গৃহিণীই অধি-কাংশ স্থলে 'কথা' বলেন, কিন্তু এ নিয়মের যে ব্যতিক্রম হয় না, তাহা নহে। গৃহিণী কথকতায় পটু না হইলে, সহজেই 'কথা'র ভার অন্যের উপর অর্পিত হয়। অনেক স্থলে দেখিয়াছি, এই কথা বলিবার গুণে শ্রোত্রীরা মুগ্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। তাহা যে অনেক স্থলে ফল-শ্রুতির ফলকামনার মোহ নহে বা আরাধ্য-দেবতায় রোষভীতি নহে, তাহা দেখিলেই বুঝা যায়। আমরা অনেক অল্পমতি যুবতীকেও বলিতে শুনিয়াছি—"জেঠাইমা ভাই বেশ বলেন, সব কথা স্পষ্ট স্পষ্ট বেশ বোঝা যায়"—এ প্রশংসাপত্র বিক্রেয় দ্রব্য উপহার দিয়া গৃহীত হয় না, সুতরাং ইহার মূল্য অনেক বেশী। পুরমহিলাদের এই কথা-কহিবার কৌশলমধ্যে আমরা স্বরভঙ্গী ও অভিনয়াঙ্গ অল্প-বিস্তর লক্ষ্য করি। এমন কথয়িত্রী আমরা দেখিয়াছি যে, তাঁহার বলিবার গুণে মহিলারা বেহুলার বিপদে, খুল্লনার দুর্দ্দশায় না কাঁদিয়া থাকিতে পারেন না, লহনার অত্যাচারে তাঁহারা গালি পাড়েন, সত্য-নারায়ণ কথায় বণিক্-দুহিতার অমনোযোগিতায় "হায় হায়" করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ বিপদে আকুল হইয়া উঠেন। আমরাও দু-চারিটা কথার মজ্‌লিসে উপস্থিত থাকিয়া কথয়িত্রীর কথাগুণে ঐরূপ ভাবসকল অনুভব করিয়াছি। বঙ্গরমণীর পক্ষে ইহা সামান্য গুণপনার কথা নহে। এই সকল ব্রতকথার গুণে বাঙ্গালায় কত কবি, কত কাব্যের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। ঠাকুর মা, জেঠাই মা, পিসিমারা যদি পৈতৃক সম্পত্তির মত পুরুষানুক্রমে এই "কথা-গুলি" কালে বধূগণের হস্তে দিয়া না যাইতেন, তাহা হইলে, আজ আমরা কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, রামেশ্বর, কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ, হরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত,

প্রভৃতি বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবি ও তাঁহাদের কাব্য কিছুই পাইতাম না। এই
পবিত্র ন্যস্ত-ভাণ্ডার যে কুললক্ষ্মীগণের কৃপায় এতকাল রক্ষিত ও বিতরিত হইয়া
আসিতেছে, বাঙ্গালী আজ যে জাতীয় সাহিত্যের নাম করিয়া সমস্ত প্রাচীন
জাতির নিকট গৌরব করিতেছেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যাহার সন্ধান
পাইয়া সুবৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকায় তাহার স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপন করিতে কৃত-
সংকল্প হইয়াছেন,—সেই কুললক্ষ্মীরা সমস্ত বাঙ্গালীর নমস্যা নহেন কি? যাক্
তাহার পর যাহা বলিতেছিলাম,—পুরন্ধ্রীরা এই সকল ব্রতকথা নিজের
কহিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, কথয়িত্রীর অভাবে পরিবার হইতে ব্রতলোপ
কথালোপ না হয়, তজ্জন্য সতর্ক থাকিতেন এবং মাঝে মাঝে 'আজ বড় বউম
কথা বল'; 'আজ প্রমদা তুই কথা বল্' বলিয়া বধূকন্যাদিগকে কথা, কথাকথ
ব্রতাদির নিয়ম শিক্ষা ইত্যাদি বিষয় নিজের আগ্রহে ও যত্নে শিখাইতেন। এই
সকল ব্রতকথার আবৃত্তি আজকাল অন্তঃপুর হইতে উঠিয়া যাইতেছে, কার
মহিলারা আর এখন যোষিদ্‌ব্রতগুলিকে আশ্রয় দিতে সম্মত নহেন। বাঙ্গাল
সাহিত্যের প্রচারের বাহুল্যে এই সকল ব্রতাধিষ্ঠাত্রী দেবতারা দিন দিন অন্তঃ
পুরিকাদের ভক্তি হারাইতেছেন, তাঁহারা যে পৌরাণিক দেবতা নহেন, হিন্দু
স্বর্গে যে তাঁহাদের স্থান নাই, তাঁহাদের ব্রতদাস-ব্রতদাসীরা যে কবির কল্পনা-
প্রসূত জীবমাত্র, তাহা মহিলারা জানিতে পারিয়া এই সকলের প্রতি অনাদ
প্রকাশ করিতে শিখিতেছেন; আর দিন দিন আমাদের অন্তঃপুর হইতে ব্রত-
নিয়মাদি দূরে সরিয়া যাইতেছে। আমাদের যাহা কিছু ছিল, তাহা এইভাবে
ধর্ম্মাচারের সঙ্গে গাঁথা ছিল বলিয়া, অবশ্য কর্ত্তব্য এবং ইহকাল ও পরকালের
সুখের মূল বলিয়া ধারণা থাকায় সে সকলগুলিই এক সময়ে অতিমাত্র উন্নতি
পথে উঠিয়াছিল। এই ব্রত-কথার সূত্রে আবৃত্তি-প্রথা আমাদের অন্তঃপুরে যে
ঘনিষ্ঠ ভাবে নিবিষ্ট হইয়াছিল, আজকাল বেথুন, লোরেটো প্রভৃতি কলেজের
সুশিক্ষিতা ছাত্রীর মধ্যে তাহার শতাংশও দেখা যায় না। আজকাল কলেজের
শিক্ষায় শিক্ষিতা সুগায়িকা এবং প্রগল্‌ভা কুমারীর অভাব নাই, কিন্তু সেকালের
জেঠাইমা বা বড়বউ-ঠাকুরাণীর মত আবৃত্তিকারিণীর অভাব যে হইয়াছে
তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এখনও আমাদের অন্তঃপুরে এই প্রথার
যতটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহার প্রতি যদি কোন অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি রাখেন
তিনি আবৃত্তি-প্রথার উপকারিতা, উপযোগিতা এবং আবৃত্তির উপযোগী কি
কি গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা এত স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন যে ততটা স্পষ্ট

ভাবে আজকালকার Inter-collegiate Recitation compelition-ক্ষেত্রে
বকেদের মধ্যেও দেখিতে পাইবেন না। এই আবৃত্তি-প্রথায় আমাদের
অন্তঃপুরে ছোট ছোট বধূকন্যাদের মধ্যে ধর্ম্মভাব, পুরাণের কথা, শাস্ত্রের
থা, পতিব্রতা-মাহাত্ম্য, দেবদ্বিজে ভক্তি, ইত্যাদি অনেক কথা বিনা আয়াসে
শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহলোকে সুখসমৃদ্ধি ও পারলৌকিক মঙ্গলের আশায়
বধূকন্যারা আগ্রহ করিয়া এই সকল ব্রতনিয়ম করিত এবং কথার আবৃত্তি
অভ্যাস করিত। ব্রতগ্রহণ ও ব্রতপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে, সংযম, শুদ্ধাচার, ব্রাহ্ম-
ণাদি ভোজন, ব্রতসহচারিণীকে বস্ত্রালঙ্কার-তৈজসাদি দান, (সুবচনীর ব্রতের
ন্যায় ব্রতে, হিন্দুমুসলমানের অন্তঃপুরের ঘনিষ্ঠতা রক্ষা) ইত্যাদি সদ্ভাব শিক্ষা
হইত। হায়! দিন দিন এ সুকৌশল নষ্ট হইয়া যাইতেছে!

আমরা অন্তঃপুরে যে আবৃত্তির আদরের কথা বলিলাম, যদি কেহ তাহার
পরিস্ফুট মূর্ত্তি দেখিতে চান, তিনি যেন সহর-বায়ুর প্রবাহহীন পল্লীগ্রামে
অনুসন্ধান করেন। এখনও এই জ্যৈষ্ঠমাসে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতের সময়, আষাঢ়
মাসে ষষ্ঠীর ব্রতের সময় গ্রামের ষষ্ঠীতলায় গ্রামস্থ সমস্ত মহিলা জড় হইয়া
পূজাদির পর যখন বসিয়া ব্রতকথা শুনিতে প্রবৃত্ত হয়, সেই সময়ে কথয়িত্রীর
প্রতি লক্ষ্য রাখিলে বুঝিতে পারিবেন, তিনি কেবল ভক্তির দিক্ হইতে
ভাবে গদ্‌গদ হইয়া ব্রতকথা বলিতেছেন না, যাহাতে শ্রোত্রীবর্গ শুনিতে
পায়, বুঝিতে পারে এবং অনুধাবন করিতে পারে, সেই ভাবে আবৃত্তি
করিবার দিকে তাঁহার একটু লক্ষ্য আছে, একটু যত্ন আছে।

অনেক মহিলা নিত্য-পূজাকালে সংস্কৃত স্তবকবচ আবৃত্তি করিয়া থাকেন।
শিক্ষাদোষে এই সকল স্তবকবচ আবৃত্তির অনেকস্থলে সংস্কৃত-শব্দগুলির
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইলেও গুরুপুরোহিতের স্বরানুকরণ করিবার চেষ্টাটা প্রায়
সর্ব্বত্র দেখা যায়; কিন্তু দৈবকীনন্দনের "নাম সঙ্কীর্ত্তন" চৈতন্যমঙ্গলের
"চৈতন্যস্তব" কবিকঙ্কণের "বন্দনামালা" অনেক মহিলাই নিত্য নানারূপ সুর-
সংযোগে আবৃত্তি করিয়া থাকেন। এই বাঙ্গালা কবিতার আবৃত্তিতে অনেককেই
বিশুদ্ধ যতি ও ছন্দ রক্ষা করিয়া আবৃত্তি করিতে শুনা যায়। অনেকে
জয়দেবের "দশাবতার" স্তোত্র এবং "মুকুন্দমালা" প্রভৃতি সরল সংস্কৃত কবিতা
অতি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিতে পারেন। আজকালকার নিত্যনৈমিত্তিক
সাংসারিক ব্যবস্থায় অন্তঃপুর হইতে এই সকল স্তবকবচ-পাঠের প্রথাও
লোপ হইতে চলিয়াছে। ধর্ম্মের আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি আমাদের অন্তঃপুরে

এখনও যে ভক্তি, যে বিশ্বাস, যে শ্রদ্ধাটুকু বর্ত্তমান আছে, তাহা যদি অনুষ্ঠান দ্বারা পরিপুষ্ট না হয়, তাহা হইলে কালে তাহাও লোপ হইবে। ভবিষ্যৎ-চিন্তা ছাড়িয়া দিলেও আমরা দেখিতেছি, আমাদের কি বৈঠকখানায়, কি অন্তঃপুরে কালপ্রভাবে, নূতন শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে যে সকল পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, তাহার অনেকগুলিতেই আমাদের ক্ষতি হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। মুসলমানের পতনের সময় হইতে ইংরাজের রাজ্যলাভের প্রথম যুগ পর্য্যন্ত আমাদের পুরমহিলারা বিদ্যাশিক্ষা করিত না বটে, কিন্তু স্তবকবচ-পাঠ, ব্রতকথা বর্ণন ইত্যাদিতে যেমন অতর্কিত ভাবে আবৃত্তি-প্রথার অনুশীলন করিত, তাহার প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিত, সে চেষ্টা, সে শ্রদ্ধা এই উন্নতির যুগে লোপ পাইতে বসিয়াছে, ইহা কোনক্রমেই অনুমোদন করিতে পারা যায় না।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

দুঃখিনী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দুই তিন বৎসরের মধ্যে দুঃখিনী তিন চারিবার শ্বশুরবাটী গিয়াছিল; কিন্তু অনেক সময়ই মহেন্দ্রপুরে থাকিত, এখন তাহার বয়স ১৫ বৎসর। রামসত্য সমস্ত দিন কাজ করিয়া সন্ধ্যার সময় ঘরের বারান্দায় মাদুর পাতিয়া শুতেন, ছেলে এবং মেয়ে কাছে বসিত, তিনি কত রাজার কথা, উপন্যাসের কথা বলিতেন; রসিক শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িত, কিন্তু দুঃখিনী ঘুমাইত না; কত কথা বাবাকে জিজ্ঞাসা করিত। রামসত্যও সীতার কথা, সাবিত্রীর কথা, দময়ন্তীর কথা বলিতেন; দুঃখিনী শুনিতে শুনিতে অশ্রুত্যাগ করিত আবার শতমুখে প্রশংসা করিত। রামসত্য নিজের অবস্থার কথাও সময়ে সময়ে দুঃখিনীকে বলিত। দুঃখিনীও বাপের সঙ্গে কত পরামর্শ করিত। আজ-কালের মেয়ে যেমন বাপের সঙ্গে অলঙ্কারের পরামর্শ করে, ভাল ঢাকাই সাড়ীর পরামর্শ করে; দুঃখিনী সে প্রকারের পরামর্শ করিত না।

একদিনের কথা বলিলেই পাঠক-পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিবেন। একদিন সন্ধ্যার পরে রামসত্য বসিয়া আছেন; কন্যা দুঃখিনী শ্বশুরবাটী হইতে

আসিয়াছে; তিনি দুঃখিনীর সহিত কথা কহিতেছেন। এমন সময়ে একজন ভদ্রলোক রামসত্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। রামসত্য দেখিয়াই মহাজনকে চিনিলেন এবং সসম্ভ্রমে বসিতে আসন দিলেন। তিনি আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"ঘোষ মহাশয়, টাকাগুলি অনেকদিন হোতে চোল্‌লো, আস্তে আস্তে শোধ করিতে আরম্ভ করুন; তা নইলে আমার পক্ষে বড় অসুবিধা; আপনিও একযোগে এত টাকা দিতে পারিবেন না।"

রাম। তা ত জানি, কিন্তু আমি কোন উপায়ই করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক মহাশয় ভাব্‌বেন না; আমি আপনার টাকা যেমন করিয়াই হউক পারিশোধ করিব।

মহাজন। না তা বোল্‌ছিনে; তবে মাঝে মাঝে মনে কোরে দিতে হয়।

এই প্রকার কথোপকথনের পর মহাজন চলিয়া গেল। তখন দুঃখিনী পিতার নিকট অগ্রসর হইয়া বসিল এবং কত টাকা ধার হইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিল। রামসত্য বলিলেন—"মা! অনেক টাকা প্রায় ছ-শ।"

দুঃখিনী। ছ-শ! বাবা! এত টাকা কিসে লাগ্‌লো?

রাম। মা! ঘর পেতে বাস কোরতে হোলেই লৌকিকতা রক্ষা কোরতে হয়; দশজন লোককে ডাক্‌তেও হয়। আমি তিন শত টাকার মধ্যেই শেষ করিতে চাহিয়াছিলাম; কিন্তু পাড়ার দশজনের মত গ্রহণ না কোরে তো আর কাজ করিতে পারি না, কাজেই এত লাগিল। তা মা, আমার যদি ধর্ম্মে মতি থাকে, আর গুরু সহায় হন, তবে এ ধার থাক্‌বে না।

দুঃখিনী। বাবা! পাড়ার দশজনের তো আর ধারের জন্য ভাব্‌তে হবে না; কাজেই তারা যা হয়, তা কোরে গেল। আমি হ'লে অত টাকা খরচ কোর্‌তাম না। আমার যা সাধ্য তাই কোর্‌বো; তাতে যদি লোক অসন্তুষ্ট হয় বা লৌকিকতা রক্ষা না হয়, নাই হোল।

রাম। মা! তুমি অত কথা বুঝ্‌তে পারবে না; আরও একটু বয়স হোক, দুই একটী ছেলে-মেয়ে হোক, তার পর বুঝ্‌বে। এখন আমার দুঃখ দেখে এ কথা বোল্‌ছো।

দুঃখিনী। না বাবা! ছ-শ টাকা ধার করা ভাল হয় নাই। আমি তো শোধের কোন উপায় দেখি না।

রাম। কেন? তুমি দেবে!

দুঃখিনী। আমি কোথা পাব?

রাম। এমন সোনার ঘরে বে দিলাম, তা আমার দুপয়সা সাহায্যও হবে না?

দুঃখিনী নীরব হইল।

রামসত্য পুনরায় বলিতে লাগিল—"তা মা তোমার চিন্তা কি, আমি শীঘ্র মোর্‌বো না, টাকা শোধ হবেই।"

দুঃখিনী এবারে কিছু দুঃখিত হইল এবং বলিল—"আচ্ছা বাবা! তুমি আমাকে বুঝাও দেখি, কেমন কোরে টাকা শোধ হবে।"

রামসত্য কেমন করিয়া বুঝাইবে; তাঁর কারবার নাই যে টাকা আসিবে! যে কয় বিঘা খামার আছে, তাহাদ্বারা মোটা ভাত, মোটা কাপড় কোন মতে চলে। কাজেই রামসত্য কিছুই বলিতে পারিলেন না; হার মানিলেন।

দুঃখিনী পিতাকে চিন্তিত দেখিয়া বলিল—"বাবা! আমি তোমার কথাই ভাবি; তুমি দশজনের পরামর্শে যে টাকা ধার কোর্‌লে, এখন তা শোধের তো কোন পথই দেখি না। এদিকে রসিক বড় হোল। ভাল কথা বাবা, রসিককে তুমি স্কুলে পাঠিয়ে দিলে না। এখন যদি স্কুলে না দাও, তবে সে বিগ্‌ড়ে যাবে।"

রাম। হাঁ, একটী ভাল দিন দেখে, পুরুত ঠাকুরকে কিছু দক্ষিণা দিয়ে তাকে স্কুলে দেব।

দুঃখিনী। কেন একবার ত পুরুতঠাকুরকে দিয়েছ। আবার কেন? আর ইংরেজী পোড়্‌তে যাবে, তার আর দিন লাগে না। আমি ও বাড়ার মেয়েদের কাছে শুনেছি, ইংরাজী পোড়্‌তে দিন লাগে না, তাদের ছেলেরা এমনি একদিন স্কুলে গিয়াছিল। সে দিন থেকে রোজ রোজ যায়। আমাদের অবস্থা ভাল না; আর সময় নষ্ট করা ভাল নয়, কালই তুমি ওকে সঙ্গে করে স্কুলে নিয়ে যেও।

রামসত্য অগত্যা সম্মত হইলেন, কিন্তু পুরুত ঠাকুরকে কিছু দেওয়া যে দরকার, তাহা তাঁহার মনে তখনও ছিল। পরদিন যথা সময়ে রামসত্য রসিককে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

রামসত্য সেকেলে ধরণে শিক্ষিত, তাই প্রতি কর্ম্মে তাহার মনে শুভদিনের আবশ্যকতা, কল্যাণ-কামনায় ব্রাহ্মণকে দানের আবশ্যকতা জাগিয়া উঠে। দুঃখিনীও হিন্দু কন্যা-হিন্দু ভাবেই পালিতা, তাহার চতুর্দ্দিকেও পাশ্চাত্য ভাবের বিশেষ প্রভাব নাই,—তবু কাল মাহাত্ম্যে অতর্কিত ভাবে তাহার

উপর উহার প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে। 'ও বাড়ীর লোকের কার্য্য তাহার পরিবারের আচারসঙ্গত না হইলেও, তাহাকে যুক্তিসঙ্গত—এরূপ ধারণা তাহার হইয়াছে। অনিচ্ছাক্রমে শতসাবধানতার মধ্যেও পরিবর্ত্তন এমনই করিয়া আসিয়া পড়ে।

তুর্থ পরিচ্ছেদ।

ইতিমধ্যে ভজহরি ১৫ দিনের ছুটী লইয়া বাটীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা যে স্ত্রীকে কর্ম্মস্থানে লইয়া যান; কারণ বন্দোবস্তী আফিসে ছুটী বড় কম, কাজেকাজেই পরিবার সঙ্গে রাখা কর্ত্তব্য। রামসত্য প্রথমে কন্যাকে এতদূর পাঠাইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু পাড়ার দশজন মত দেওয়ায় তিনি আর অমত করিতে পারিলেন না। দুঃখিনীর বড় কষ্ট হইল; কারণ বিবাহের পর যখন সে শ্বশুরবাটীতে ছিল, তখনও দুই একদিন পরেই রসিককে এবং রামসত্যকে দেখিতে পাইত; কিন্তু এখন সে পথ বন্ধ হইতে চলিল। কতদিনের জন্য যাইতেছে, কোথায় যাইতেছে, আর ফিরিয়া আসিতে পারিবে কিনা এই সমস্ত চিন্তায় দুঃখিনী বড়ই কাতর হইল। কয়েকদিন পরে ভজহরি নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমানাথ এবং কাতরা দুঃখিনীকে লইয়া শ্রীহট্ট যাত্রা করিলেন।

সেখানে পৌঁছিয়া দুঃখিনীর আর কিছুই ভাল লাগিত না, সর্ব্বদাই কান্না পাইত। ইচ্ছা করিত পাখী হইয়া উড়িতে পারিলে, একবার রসিককে দেখিয়া আসে। রসিক মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিত। রসিক যতদূর বাঙ্গালা শিখিয়াছিল, তাহাতে সে পত্র লিখিতে পারিত, কিন্তু দুঃখিনী পড়িতে জানিত না; রসিকের হাতের লেখা চিনিত। যখন রসিকের পত্র আসিত, তখনই সেই হাতের লেখা দেখিয়া দুঃখিনী কাঁদিত। রমানাথ তাহাকে পত্র পড়িয়া শুনাইত। রমানাথের বয়স ২০ বৎসর, সে মোটামুটী ইংরাজীবাঙ্গালা শিখিয়াছিল। তাহার চরিত্র দূষিত হওয়াতে স্কুল ছাড়িয়া বাটীতে বসিয়া দাদার অন্নধ্বংস করিত এবং পাড়ায় ইয়ারকি দিয়া, তাসপাশা খেলিয়া সময় কাটাইত। এই জন্য ভজহরি তাহাকে শ্রীহট্টে লইয়া গেলেন, সেখানে তাঁহার আফিসের মধ্যে কর্ম্মকাজ শিখিতে বলিলেন।

দুঃখিনীর বড় ইচ্ছা—আপন হাতে পত্র লেখে এবং রসিকের পত্র নিজে পড়িতে পারে। ভজহরি শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি পুস্তক, কাগজ কলম আনিয়া দিলেন, নিজের অবসর কম, এজন্য রমানাথের উপরেই দুঃখিনীর

পড়ার ভার দিলেন; কিন্তু এক ঝঞ্ঝট হইল। দুঃখিনী রমানাথের সহিত কথা বলিত না। সে ভজহরিকে তাহা বলিল; ভজহরি বলিলেন,—"তা রমানাথের সঙ্গে কথা বলিতে দোষ কি, সে তোমার দেবর; তার সঙ্গে কথা বলায় দোষ নাই। বিশেষ তোমার ব্যারাম বা অসুখ হোলে তো আর কেহ কাছে থাকে না, কাহাদ্বারা সেবা চলিবে?" দুঃখিনী রমানাথের সহিত কথা বলিতে বড়ই নারাজ, কিন্তু পড়ার ইচ্ছা বড়ই বলবতী হইল, কাজেই শেষে রাজী হইতে হইল। ভজহরি রাত্রিকালে অবসর পাইলে পড়া বলিয়া দেন এবং দুঃখিনী যে অল্প সময়ের মধ্যেই পাঠ অভ্যাস করিয়া ফেলে, তাহা দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হন। এক একদিন ভজহরি বলেন "তুমি যে তাড়াতাড়ি পড়া আরম্ভ করিয়াছ. এমন করিয়া পড়িলে দুই বৎসর পরে যে আমাদের আফিসের বড় বাবুও তোমার সঙ্গে পারিবেন না।" দুঃখিনী হাঁসিত, কোন উত্তর করিত না; কারণ ভজহরিকে দেখিলে তাহার মুখ দিয়া কথা সরিত না; দুঃখিনী আজকালের মেয়েদের মত নহে। ভজহরি দুঃখিনীকে বড় ভালবাসিত। দিনের বেলায় দুঃখিনী রমানাথের নিকট পড়িত কিন্তু কয়েক দিন পরেই রমানাথের নিকট পড়া তাহার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রমানাথের স্বভাব বড় ভাল ছিল না, সেই জন্যই ভজহরি তাহাকে শ্রীহট্টে লইয়া যান। এক্ষণে রমানাথ নিজের কুস্বভাবের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে রমানাথ বেড়াইয়া আসিয়া সহরের নূতন খবর বৌয়ের নিকট বলিত; দুঃখিনীও আগ্রহ-সহকারে শুনিত। রমানাথ ক্রমে যে সমস্ত খবর বলা আরম্ভ করিল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে প্রকার হাস্যপরিহাস আরম্ভ করিল তাহা দুঃখিনীর ভাল লাগিল না। দুঃখিনী প্রথম প্রথম রমানাথের ঐ ধরণের বড় একটা কথায় কাণ দিত না। রমানাথ সহুরে বাবুদের নিন্দাবাদ করিত, কোন্ বাবুর কয়টী উপপত্নী, কে দেখিতে কেমন তাহা নানাভঙ্গী করিয়া শুনাইত আর তৎসূত্রে দুঃখিনীর সহিত নানা ঠাট্টাতামাসা করিত কিন্তু দুঃখিনী ইহা ভালবাসিত না। রমানাথও ক্রমে বড়ই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল, এমন কি দুঃখিনীর নিকট হইতে টানাটানি করিয়া পান কি অন্য দ্রব্য লইত এবং তাহাকে নানাপ্রকারে ব্যতিব্যস্ত করিত। কখনও বা দুঃখিনীর নিদ্রাবস্থাতে তাহার মুখে কালী বা চুণ মাখাইয়া রাখিত। দুঃখিনী মনে করিত, একথা স্বামীকে বলে; কিন্তু পাছে ভজহরি মনে করে যে দুঃখিনী ভ্রাতৃবিচ্ছেদ জন্মাইবার জন্য একথা বলিতেছে, এই ভয়ে দুঃখিনী ভজহরিকে

কিছুই বলিতে পারিত না, একদিন ভজহরি মফঃস্বলে জরিপ করিতে গিয়াছেন; বাটীতে কেবল দুঃখিনী এবং রমানাথ আছে। আজ রমানাথ বড়ই বাড়াবাড়ী আরম্ভ করিল; সে যে প্রকার হাসাহাসি আরম্ভ করিল, যে প্রকার ব্যবহার করিল তাহাতে দুঃখিনী আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিল না। দুঃখিনী রাগিয়া একেবারে বাঘিনীর ন্যায় হইল, তাহার চক্ষু হইতে যেন অগ্নি বহির্গত হইতে লাগিল। দুঃখিনী বলিল "দেখ ঠাকুরপো! তোমাকে আমি এতদিন কিছু বলি নাই, কিন্তু আজ বলিতেছি—সাবধান, যদি আজ হইতে তুমি আমার সহিত এ প্রকার ব্যবহার কর, তাহা হইলে তোমার ভাল হইবে না। তুমি মনে কর কি? তুমি বুঝি ভাব, তোমার ভাব কেহ বুঝিতে পারে না। তুমি আজ হইতে আমার সহিত সাবধানে কথা বলিবে।" রমানাথ কিছু বিষণ্ণ হইল; এবং মনে মনে রাগও করিল। সে দুঃখিনীকে যে প্রকৃতির মনে করিয়াছিল, তাহা হইতে ভিন্ন প্রকার দেখিল; কিন্তু দুঃখিনীর প্রতি তাহার ভয়ানক রাগ হইল, কিছু না বলিয়া রমানাথ চলিয়া গেল।

পরদিন ভজহরি বাটীতে আসিলেই দুঃখিনী সমস্ত কথা তাহাকে বলিল—আরও বলিল "যদি বাটী হইতে আর কাহাকেও না আন, তাহা হইলে, আমি এখানে মারা যাইব। তুমি মনে করিও না, তোমার সহিত, তোমার ভাইয়ের বিচ্ছেদের জন্য আমি মিথ্যা কথা বলিতেছি। আমি আর যাহাই করি না কেন, মিথ্যা বলি না।" এই বলিয়া দুঃখিনী কাঁদিতে লাগিল। ভজহরি তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া অনেক কথা বলিলেন। তাহার পরে রমানাথকে আর কিছু না বলিয়া তাহাকে বাটীতে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। রমানাথ যখন শুনিল যে ভজহরি তাহাকে বাটীতে পাঠাইবার সুযোগ খুঁজিতেছে, তখনই বুঝিল যে এ দুঃখিনীর কাজ। কাজেই দুঃখিনীর উপর তাহার রাগ বড় বৃদ্ধি হইল, সে দুঃখিনীকে কষ্ট দিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে আরম্ভ করিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজলধর সেন।

শাখীনামা।

৪র্থ শাখী।

পরদিন গুরু পুনরায় যাত্রা করিলেন ও পাতিয়ালারাজ্যান্তর্গত শেখ নামক গ্রামে আসিলেন। নিকটেই একটি পুরাতন মন্দির ছিল। পূর্ব্বে ইহার চতুর্দ্দিকে বাইশটি গ্রাম ছিল। তাহাতে জোবান্দাবংশীয় জাঠেরা বাস করিত। তুলোক এই বংশের সর্দ্দার ছিল। সে সময় সে অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত তাহার কন্যার বিবাহোৎসবে মগ্ন ছিল। সে জামাতার অনুচরদিগকে বাইশটি ভোজ দিয়াছিল; কিন্তু গুরুর সম্বন্ধে সে কোন খবরই রাখে নাই। সিধ বংশের বা গোত্রের দুর্গু হরসেক গুরুকে বেশ যত্নের সহিত গ্রহণ করিয়াছিল। গুরু তাহার ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করেন; কিন্তু জোবান্দা বংশের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। শুনা যায়, গুরু গোবিন্দ সিংহ এই সময় গুরু তেগ বাহাদুরের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন।

একদিন তুলোক রৌপ্যের কাজ-করা * জুতা পরিয়া বাহির হইয়াছিল। গুরু তাহাকে দেখিতে পান এবং তিনি কে তাহা জানিতে চাহেন। লোকে বলিল,—উহার নাম তুলোক। গুরু বলিলেন—"ও ব্যক্তি মানসিক অন্ধ।" যখন এই কথা বলা হয়, তখন তুলোক বাইশটি গ্রামের অধিপতি ছিল। গুরু হাততালি দিতে দিতে তিনবার বলিলেন—"সব গেল, কি বাইশটা কি তেইশটা কিছুই থাকিবে না।" † জোবান্দারা মহাদেব দাস বৈরাগীর শিষ্য মহাদেবের জামাতা এই গ্রামে বাস করিত। সে পূর্ব্বে এক সময় গুরুর নিকট চাকুরী করিয়াছিল। গুরু এখন তাহাকে জলন্ধর দোয়াবে তাহার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য উপদেশ দিলেন। কারণ, জোবান্দারা 'শ্যালপুর' দের ন্যায় নষ্ট হইতে বসিয়াছে। কাজেই সে সপরিবারে জলন্ধর দোয়াবে চলিয়া গেল।

---

* পঞ্জাব শিল্পকার্য্যের জন্য বিখ্যাত। সাঁচ্চা কাজ সেখানে অত্যন্ত সুন্দর হয়।

† শিখ-গুরুর পক্ষে এরূপ আচরণ নিতান্ত অশোভন বলিয়া মনে হয়। তেগ বাহাদুর এতদূর নাচ প্রকৃতি ছিলেন বলিয়া ইতিহাসে জানা যায় না। ইতিহাসে তিনি উচ্চ মূর্ত্তিতে চিত্রিত। যে ব্যক্তি সত্যের জন্য—ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেন, সে ব্যক্তি এরূপ হীন পারেন? আমাদের বোধ হয়, লেখক গুরুর ক্ষমতা বাড়াইতে গিয়া এরূপ করি ফেলিয়াছেন। গুরুর ক্ষমতা বাড়াইবার ইচ্ছা শিষ্যের পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক। গুরু ঈশ্বরের অবতার ও সর্ব্বশক্তিমান্ সাজাইতে পারিলে শিষ্যের বড় তৃপ্তি হয়।

৫ম শাখী।

অতঃপর গুরু পাতিয়ালার অন্তঃপাতী আদ্দিহায় গ্রামাভিমুখে অগ্রসর হইলেন ও 'তহিল' (Tahil) বৃক্ষাবলীর ঝোপের ভিতর তাঁবু খাটাইলেন। পরে যখন জোবান্দারা শুনিল যে, গুরু তাহাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছেন, তখনই তাহারা তৎপশ্চাৎ দৌড়াইল ও তাঁহাকে পাইয়া বিশেষ মিনতি করিয়া বলিল—'হে দরিদ্রের সহায়! আমাদের ক্ষমা করুন, আমরা বিপথগামী হইয়াছিলাম।' গুরু বলিলেন—'জোবান্দাগণ! তোমরা তোমাদের গ্রামে কোন মতে থাকিতে পাইবে না। অন্য যে কোন স্থানে তোমরা বাস করিবে, সেইখানেই তোমরা উন্নতি করিতে পারিবে।' পাতিয়ালা রাজ্যের অন্তর্গত কুমডারবালের জোবান্দারা দুগ্ধ ও অন্যান্য খাদ্য লইয়া গুরুর নিকট আসিলে, গুরু তাহাদের প্রতি অত্যন্ত প্রীত হন ও বলেন যে, তাহাদের গ্রামের বরাবর উন্নতি হইবে। এসা খাঁর সৈন্যদল পরে জোবান্দাদিগকে আক্রমণ করিয়া বিনষ্ট করিল; কিন্তু কুমডারবালের অধিবাসীরা গুরুর আশীর্ব্বাদের জোরে রক্ষা পাইল। তাহারা গুরুকে একটি অশ্ব উপহার দিয়াছিল। শেখের প্রাচীন মন্দির যেখানে বর্ত্তমান ছিল, তাহার আধ ক্রোশ পশ্চিমে একটি গ্রাম তৈয়ারি হইল। 'হরিকা'র যোগসিংহ জানিত যে, গুরু মলবালে বাস করিতেন; কিন্তু ঠিক্ কোন স্থানে তাহা জানিত না বলিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, একটি পুরাতন জুতা-সেলাইকার করীর (Kareer) গাছ দেখাইয়া দেয়—তাহারই নীচে গুরু পূর্ব্বে তাঁহার খাটিয়া ফেলিয়া শুইয়াছিলেন। যোগসিংহ তথায় একটি মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার সমক্ষে নিয়মিত সময়ে প্রণাম করিত। (ইহাতে) পাঠানেরা তাহার প্রতি শত্রু-ভাবাপন্ন হইয়া উঠিল; কিন্তু তবু সে সেই মঞ্চের সমক্ষে প্রণাম করা বন্ধ করিল না। সে পরে শেখের সর্দ্দার হইয়াছিল, সেখানে তাহার বংশধরেরা এখনও বর্ত্তমান।

আদ্দিহায়ের অধিবাসীরাও গুরুর প্রতি লক্ষ্যই করিল না, তাহাতে গুরু তাহাদের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। গোঠে গুরুর একটি রাখাল ঘোড়া চরাইতেছিল দেখিয়া, একটি কৃষক অত্যন্ত বিরক্ত হয় ও তাহার গলায় গামছা দিয়া টানিয়া মাঠের বাহির করিয়া দেয়। রাখাল গুরুর নিকট তাহার দুর্দ্দশার কথা সমস্ত জ্ঞাপন করিল। ইহার অনতিবিলম্বে ঐ গ্রামের অধিবাসীরা গলা ফুলিয়া মরিতে আরম্ভ করিল। একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর নিকটে তহিল বৃক্ষের ঝোপের নীচে গুরু বাস করিতেন। তাঁহাকে একটি জমীদার

সেবা করিত। সে তাঁহাকে প্রণামান্তর উপবেশন করিয়া, লোকে গলা ফুলিয়া কিরূপে মরিতেছে, তাহা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিল। গুরু বলিলেন যে,—তাহারা নিশ্চয়ই কোন শিখের উপর অত্যাচার করিয়াছে। জমীদার বলিল—'গুরো! ভয়ানক ধ্বংশ হইতেছে। একটি ছেলে, কাল মাত্র তার স্ত্রীকে বাড়ী আনিয়াছিল; আজ সে মরিয়া গিয়াছে।' গুরু বলিলেন যে,—তাহারা এই পুষ্করিণীতে স্নান করিলেই রোগ ভাল হইয়া যাইবে। জমীদার আপত্তি করিয়া বলিল যে, মুচিরা ইহাতে চামড়া ধোয় আর জলও ময়লাপূর্ণ। একথা শুনিয়া গুরু নিজে সেই পুষ্করিণীতে স্নান করিলেন ও খানিকটা মাটি তুলিয়া আনিলেন। জমীদার একথা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র করিয়া দিলে, গ্রামের সমস্ত লোকেরা তাহাতে স্নান করিতে আসিল ও তাহা কর্দ্দমাক্ত করিয়া তুলিল। মারী সে গ্রাম হইতে পলাইল এবং লোকেরাও বেশ স্বাস্থ্যশালী হইল। ভারতের সকলেই জানে যে, এখনও কোন অসুখ হইলে, গ্রামবাসীরা এই জলে স্নান করিয়া থাকে। অধিবাসীরা গুরুর সেবা করিতে লাগিল। গুরু সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তথাকার জমীদারেরা কোন জাতি? তাহারা সারো জাতি শুনিয়া গুরু বলিলেন যে,—গ্রামের উন্নতি হইবে।

৬ষ্ঠ শাখী।

অতঃপর গুরু নাভা রাজ্যের অন্তঃপাতী ধৌলা গ্রামের অর্দ্ধ ক্রোশ মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলে, হঠাৎ তাঁহার ঘোড়া থামিয়া পড়িল ও কোন মতেই আর অগ্রসর হইল না। গুরু অশ্বকে চাবুক মারিলেন, পা দিয়া গুঁতা দিলেন; কিন্তু সে একটুখানি পশ্চাৎ হটিয়া আবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তাহাতে গুরু বলিলেন যে, গ্রামবাসীরা মুসলমানের ক্রীতদাস, তাই অশ্ব অগ্রসর হইতেছে না। * তিনি সোহিবাল গ্রামে ফিরিয়া গেলেন ও সেখানে একটি 'সচেটা' করিলেন।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* তেগ বাহাদুরের আমলেই শিখেরা কতদূর মোগল বিদ্বেষী হইয়াছিল, তাহা এই শাখী হইতে কিছু বুঝা যায়। শিখেরা যে মোগল-বিদ্বেষী হইয়াছিল, তাহার কারণ মোগলের অযথা অত্যাচার। কয়েক জন শিখ-গুরুকে অনর্থক মোগলেরা অত্যন্ত কষ্ট দেয় এবং শিখ-ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য চেষ্টাও পাইয়াছিল। তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল কোথায় যাইবে?—

বঙ্গভাষার প্রাচীনত্ব ও প্রাদেশিকত্ব।

বাঙ্গালা-ভাষার প্রাচীন গ্রন্থসমূহের আলোচনা-পথে কতকগুলি বিশেষ অন্তরায় আছে। সেইজন্য জনকয়েক বিশেষজ্ঞ ব্যতীত এই সকল প্রাচীন গ্রন্থের আলোচনা অন্য কেহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই অন্তরায়গুলি বর্ত্তমান প্রবন্ধে একে একে উল্লিখিত হইবে এবং তাহাদিগের নিরাকরণ-কল্পে কি প্রকার পন্থা অবলম্বন প্রয়োজনীয়, তাহা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিব।

প্রাচীন কবির কাব্য-অধ্যয়ন-কালে কতকগুলি অপ্রচলিত শব্দ আমাদিগের পাঠে পদে পদে রসভঙ্গ করে। ইহাদিগের মধ্যে অধিকাংশেরই মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে; অনেকগুলির চিত্র-সংবলিত ও সটীক সংস্করণও আছে। বহু কৃতবিদ্য টীকাকার হয়তো সেই সকল সংস্করণে নানাপ্রকার অলঙ্কারের ব্যাখ্যা করিয়া বহু রসবিস্তার করিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ স্থলে যেখানেই এই প্রকার অধুনাঅপ্রচলিত শব্দ, মূলে পাইয়াছি, সেইখানেই দেখিয়াছি—টীকাকার মহাশয় নীরব।

বাঙ্গালার যে দু' একখানা অভিধান আছে; তাহাদের ক্রোড়েও এই সকল অধম অসংস্কৃত শব্দসমূহ স্থান পায় নাই। এই শব্দগুলিকে অনার্য্য, প্রাকৃত, গৌড়ীয়, পৈশাচিক, অপভ্রংশভাষা বা অন্য যে কোন নামেই কীর্ত্তিত করা যাউক না কেন, উহারা যে, আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি, আমাদেরই সঙ্গে সঙ্গে এই বাঙ্গালার জল-হাওয়ায় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, পল্লী-সমাজের বহুযুগব্যাপী বিভিন্ন বিপ্লবের ঘাত-প্রতিঘাতে পরিপুষ্ট ও বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থার বিপুল পরিণতির সহায়তা করিয়াছে, এ সকল সত্য, অস্বীকার করিবার উপায় নাই। উহারা এখনও সর্ব্বত্র লুপ্ত হয় নাই। সহরের কলকোলাহল ছাড়িয়া সস্নেহ আগ্রহে গ্রামে গ্রামে ভদ্র ও অশিক্ষিত-মণ্ডলীর মধ্যে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, তাহারা নিভৃত পল্লীক্রোড়ে সাদরে লালিত হইতেছে। প্রাচীন বলিয়া কতক কতক শব্দ লোপ হইয়াছে বটে; কিন্তু অধিকাংশ শব্দই এখনও ব্যবহৃত হইয়া ভাবসমষ্টির পরিপুষ্টি ও নব নব শব্দসম্ভারের সৃষ্টি করিতেছে। এই সকল শব্দ, বিশেষ বিশেষ প্রদেশে আবদ্ধ আছে; তজ্জন্য ইহাদিগকে প্রাদেশিক আখ্যা দেওয়া হয়।

এই প্রাদেশিক শব্দ-সম্ভারে বর্ত্তমান মাতৃভাষা যে, কি প্রভূত পরিমাণে পরিপুষ্টা, এখনও তাহা নির্ণীত হয় নাই; এমন কি, সেই সকল শব্দ একত্র করিবার চেষ্টা আজপর্য্যন্ত হয় নাই। এক প্রদেশের লোকে ভিন্ন প্রদেশের

প্রাদেশিক শব্দের সন্ধান রাখিতে পারেন না ; সুতরাং ভিন্ন প্রদেশের একখানা প্রাচীন পুঁথি, হস্তগত হইলে, তাহার প্রাদেশিক শব্দব্যাখ্যা করিতে বিপন্ন হন ; সুতরাং যেখানে অভিজ্ঞতায় কুলায় না, সেখানে কল্পনার আশ্রয় লইয়া অপরূপ ব্যাখ্যার সৃষ্টি করেন। প্রমাণস্বরূপ দুই একটা উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম—

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত "মহারাষ্ট্রপুরাণ ও কবি গঙ্গারাম"* শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক নিম্নোদ্ধৃত স্থানের "আড়কাট" † শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—আড়াই কোটী। মূলের প্রতিলিপি-কালে লিখিয়াছেন "আড়কাট" (২২৬ পৃঃ) ; কিন্তু সমালোচনাকালে পাঠোদ্ধারের সময় উহাকে "আড়কটি" লিখিয়াছেন (২০০ পৃঃ) এবং টিপ্পনীতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—আড়াই কোটী। বঙ্কিম বাবু এই প্রসঙ্গে "চন্দ্রশেখরে" লিখিয়াছেন ;—"যখন মীর হবিব মুরশীদাবাদ লুঠ করিয়াছিল, তখন সে, জগৎ শেঠের ঘর হইতে দুই কোটি কেবল আরকাটি টাকা লইয়া গিয়াছিল—দেশী টাকার কথায় কাজ কি? সেই দুই কোটী টাকা তাহাদের তৃণ বলিয়া বোধ হয় নাই"—ইহা সংশোধিত সংস্করণে নাই—বঙ্গদর্শন ২য় খণ্ড, ২৭৬ পৃষ্ঠায় আছে।

আড়কাটী টাকা তখন প্রচলিত ছিল ও ব্যবহৃত হইত। প্রবন্ধ-লেখকের প্রাদেশিক জ্ঞানের অভাবই—এই ভুলের কারণ। তৎকাল-প্রচলিত আর ও দুই একটা উদাহরণে আমার কথা দৃঢ় হইবে। যথা—রামপ্রসাদ, বিদ্যা সুন্দরে হীরার বেসাতির হিসাবে —

"প্রথমেতে বণিকের হাতে দিতে টাকা।
টঙ্কারিয়া হাতে নিতে মুখ করে বাঁকা॥
দুটা ছিল গরশাল দুটা ছিল মেকি।
হরদরে বুঝিতে টাকায় নাহি সিকি॥
বাটা বাদে পাইলাম আড়কাট নয়।"

ভারতচন্দ্রে ঐ বিষয়ে আছে ,—

"ভাঙ্গাইয়া আড়কাট এমনি লাগায় ঠাট
বলে শালা আলা টাকা মোর"

* সন ১৩১৩, ৪র্থ সংখ্যা।

† Mendies সাহেবের ১৮২৮ সালে প্রকাশিত অভিধানে "আড়কাট" শব্দের এই অর্থ দেওয়া আছে—The name of a country also of a coin. বোধ হয় Arcot হইতে শব্দটীর উৎপত্তি হইয়াছে।

প্রাচীন সাহিত্যসেবীরা জানেন "ধর্ম্মমঙ্গল"-কারেরা "করতার"শব্দ "কর্ত্তা" অর্থে ধর্ম্মের উদ্দেশে ব্যবহার করেন। যথা—

"নম সত্য সত্য করতার।
নিরঞ্জন নৈরাকার।"—শূন্যপুরাণ।
"কৃত্তিবাসে করতার কন পুনর্ব্বার।
মহারুদ্ররূপে সৃষ্টি করিবে সংহার॥"
—মাণিকগাঙ্গুলী ১০পৃঃ (সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত।"

এখন বঙ্গবাসী-প্রেস হইতে প্রকাশিত ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলের নিম্নলিখিত পদের ব্যাখ্যা, সম্পাদক মহাশয়, কিরূপ করিয়াছেন, দেখা যাউক ;—

এক ব্রহ্ম সনাতন, নিরাকার নিরঞ্জন,
নির্গুণ নিদান শূন্য ভরে।
দেখি সব অন্ধকার, সচিন্তিত কর তাঁর
নাহি সৃষ্টি কেমনে সঞ্চরে॥"—১৪ পৃঃ।

ব্যাখ্যা—কর তাঁর ইত্যাদি—"সৃষ্টির পূর্ব্বে নিরাকার একমাত্র ঈশ্বরের কেবল জ্যোতিঃ বা আভা ছিল। সকলই অন্ধকারময় ছিল। সেই ঘোর অন্ধকার দেখিয়া সেই এক ব্রহ্ম ঈশ্বরের কর অর্থাৎ জ্যোতিঃ, সৃষ্টির নিমিত্ত চিন্তিত হইলেন।" কত কষ্ট-কল্পিত অর্থ। পর পৃষ্ঠায়—

নবীন নীরদ শ্যাম, জিনি কত কোটী কাম
রূপ অনুপম কর তাঁর

ব্যাখ্যা—"তাঁহার উপমাহীন রূপের আভা"। আমার বিশ্বাস "তাঁর" এই শব্দের চন্দ্রবিন্দুটি জোর করিয়া বসানো ; কারণ, ঘনরামের পুস্তকের অন্য কোন স্থানেই এই চন্দ্রবিন্দু নাই। যথা—

"করতারে ভাবিয়া ভরসা ভাবে মনে।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস ভণে॥"—৩১৭ পৃঃ
"তোমারে সদয় না হইল করতার
তোমার যে গতি মাগো সে গতি আমার॥"—১৩২ পৃঃ
"সত্য সত্য সংসারে কেবল করতার।"—৩৯৪ পৃঃ

প্রাচীন পুঁথির পাঠোদ্ধারে আমরা অধুনা যে, এপ্রকার যথেচ্ছাচার অবলম্বন করিয়াছি, এমন নয় ; এ বিষয়ে পূর্ব্বকালের পুঁথির প্রতিলিপিকারগণ আমাদিগের অপেক্ষা অধিকতর সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আমরা পুঁথির স্থানবিশেষে যে রকম পাঠোদ্ধার করি,তাহার একটা অর্থ করিবার জন্য নানাপ্রকার কাল্পনিক ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হই এবং অবশেষে অপারগ হইলে একটি প্রশ্ন

চিহ্ন (?) তাহার পার্শ্বে বসাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকি ; কিন্তু তাঁহারা এ বিষয়ে এতটা চিন্তা দেওয়াও যুক্তিযুক্ত বোধ করিতেন না। যে প্রকার পাঠ বসাইয়া দিলে, তাঁহাদের পক্ষে ঐ স্থানটি সহজ, সরল ও সুবোধ্য হইত—দ্বিতীয় বার চিন্তা না করিয়াই নিঃসঙ্কোচে তাহা বসাইয়া দিতেন। প্রমাণস্বরূপ ময়মনসিংহ হইতে প্রাপ্ত ভারতচন্দ্রের একখানি "বিদ্যাসুন্দর" পুঁথি হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"কড়ি হইতে চিড়া দই, বন্ধু নাহি কড়ি বই
কড়িতে বাঘের দুধ মিলে।"

কৃষ্ণনগরে প্রাপ্ত সম-সাময়িক পুঁথিতে আছে—

"কড়ি ফট্‌কা চিড়া দই বন্ধু নাই কড়ি বই
কড়িতে বাঘের দুধ মিলে।"

ময়মনসিংহের প্রাদেশিক প্রতিলিপিকার দেখিলেন—'ফট্‌কা' কথাটির অর্থ তাঁহার জানা নাই, তৎক্ষণাৎ তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিলেন 'হইতে'। এই 'ফট্‌কা' কথাটির অর্থ বঙ্গবাসী কিংবা বটতলার প্রকাশিত সংস্করণে উল্লেখ নাই। অথচ এ কথাটীর একটি যে অর্থ দেওয়া প্রয়োজনীয়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এ সম্বন্ধে আর একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। ছাপানো পুস্তকে আছে—

শুনি তুষ্ট কবিরায় দশ টাকা দিল তার
দুটী টাকা দিল নিজ রোজ।
টাকা পেয়ে মুটভরা হীরা পরধন-হরা,
বুঝিল এ মেনে আজ বোজ।

পুঁথির পাঠ—

যুনি তুষ্ট কবিরায়, দষ তড়্‌কা দিল তায়
দুই টাকা দিল নিজরোজ।
টাকা পায়া মোট ভরা, হিরা পরধন হরা
বুঝিল এ বড় আজবুজ।

"আজবোজ" শব্দটী ময়মনসিংহের প্রাদেশিক না হইলেও উহার স্থানে অন্য শব্দের প্রয়োগ, প্রতিলিপিকারের বুদ্ধিতে কুলায় না; কিন্তু 'মেনে' জায়গায় 'বড়' বসাইয়া দিলেন। 'টাকার' জায়গায় বসাইলেন "তড়কা"। সুতরাং সুবোধ্য পাঠ করিতে গিয়া কবির ভাষার আমূল পরিবর্ত্তন করিলেন।

আবার ঐ সকল পুঁথি ছাপাইবার সময় বটতলার সঙ্কলনকারীরা এরূপ

পরিবর্ত্তন, অধিক পরিমাণে করিয়াছেন। বটতলায় যে সকল পুস্তক ছাপানো হইয়াছে, হস্তলিখিত পুঁথির সহিত তাহার তুলনা করিলে অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয়। স্থানে স্থানে পাঠপরিবর্ত্তন,—পুঁথির পাঠত্যাগ,—ভাষার পরিবর্ত্তন—এমন কি, নূতন নূতন অধ্যায়ের যোগপর্য্যন্তও করা হইয়াছে ; সুতরাং ছাপানো পুস্তক হইতে যাঁহারা প্রাচীন কবিদিগের ভাষার চর্চ্চা করিয়া নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা করেন, তাঁহাদের অধিকাংশ পরিশ্রমই বৃথা যায়।

এ স্থলে একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ হইতে প্রকাশিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন-সম্পাদিত মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলের শেষ পৃষ্ঠায় পুস্তকের রচনা-কাল-সম্বন্ধে ছাপানো পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে ঃ—

সাফেরিও সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিদ্ধ সহ যুগ দক্ষে যোগ্যতার সনে॥

"সাফেরি"—কি বুঝিতে না পারিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। দৈবাৎ সেদিন সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় লিখিত "ধর্ম্মমঙ্গল" প্রবন্ধ পাঠ করিতে করিতে দেখিলাম—উহা মুদ্রাকর-প্রমাদ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। পাঠ এইরূপ হইবে, যথা—

শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিদ্ধ সহ যুগ পক্ষে যোগ্যতার সনে॥

হয়তো এখনও কত দুর্ভাগ্য সাহিত্যসেবী, ধর্ম্মমঙ্গল-প্রবন্ধকারের এই স্বর্গীয় চাবি না পাইয়া 'সাফেরি'র সন্ধানে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছেন। উক্ত মাণিক গাঙ্গুলীর পুস্তকের একখানা শুদ্ধিপত্র বাহির করিয়া বিতরণ করা, সাহিত্য-পরিষদের উচিত নয় কি ?

তখনকার সময় একশ্রেণীর লোকে তুলোট কাগজ প্রস্তুত করিত এবং পুঁথি নকল করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিত। তাহাদের বিদ্যা, যৎসামান্য হইলেও হস্তাক্ষর পরিষ্কার ছিল ; তাহাদের উপরই প্রাচীন সাহিত্যের বার আনা রক্ষার ভার ছিল ; সুতরাং প্রতিলিপি, সর্ব্বাংশে বিশুদ্ধ হওয়ার সম্বন্ধে অধিকাংশ স্থলেই অসম্ভব হইয়া উঠিত। বিশেষতঃ যদি তাঁহাদের বিদ্যার দৌড় তেমন না থাকিত, তাহা হইলে নকল করিবার সময় কি রকম যথেচ্ছাচার চলিত, যাঁহারা প্রাচীন পুঁথি নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাঁহারাই তাহা জানেন। এই ব্যক্তিগত বিশেষত্বও, প্রাচীন সাহিত্য-চর্চ্চার পক্ষে বিশেষ অন্তরায়। একই পুঁথির বিভিন্ন স্থানের অনেকগুলি প্রতিলিপি, বিশেষ

গবেষণার সহিত মিলাইলে এবং এই ব্যক্তিগত বিশেষত্ব বাদ দিলে, তবে একখানা পুঁথির বিশুদ্ধ সংস্করণপ্রকাশ সম্ভব হয়।

এইসকল অসুবিধা, প্রথমে বিশেষ হৃদয়ঙ্গম করিতে অপারগ হইয়া সাহিত্য-পরিষদ্ কৃত্তিবাসের প্রাচীন পাঠানুযায়ী বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত করিতে সাহসী হন। প্রথম যখন দু' চার খানা পুঁথি হস্তগত হয়, তখন ব্যাপারটি অতি সহজ বোধ হইয়াছিল কিন্তু নূতন নূতন পুঁথির আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক পরিবর্ত্তনের এত প্রকার আসিয়া পড়িল যে, এখন বোধ হয়, কৃত্তিবাসের বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করা, তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ, প্রত্যেক পুস্তক হইতে এই ব্যক্তিগত ও প্রদেশগত বিশেষত্ব বাদ দিয়া পাঠোদ্ধার করা, অতিশয় শ্রমসাপেক্ষ, সময়সাধ্য এবং অনেক স্থলেই ইহা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

প্রমাণ-স্বরূপ ময়মনসিংহ হইতে প্রাপ্ত তৎপ্রদেশীয় প্রতিলিপিকারের হস্তলিখিত ভারতচন্দ্র-প্রণীত বিদ্যাসুন্দরের একখানা পুঁথির আলোচনা করা যাউক। প্রতিলিপিকার, সংস্কৃত জানিতেন না; সুতরাং যে যে স্থলে ভারতচন্দ্রের সংস্কৃতবহুল শব্দ-প্রয়োগ আছে, সেই সেই স্থল, প্রায়ই ত্যাগ করিয়াছেন। স্থানে স্থানে দু' এক লাইন নকল করিতেও ভুলিয়াছেন। এই প্রকার ত্রুটিগুলিকে ব্যক্তিগত বিশেষত্ব বলা যাইতে পারে। এক্ষণে প্রাদেশিক বিশেষত্ব আলোচিত হইতেছে।

মনে করা যাউক যে—ভারতচন্দ্রের অন্য সমস্ত পুঁথি লুপ্ত হইয়াছে ও ছাপানো কোন পুস্তকও নাই। আমার এই ময়মনসিংহে প্রাপ্ত বিদ্যাসুন্দরই প্রথম পাওয়া গেল। এই পুঁথি-দৃষ্টে কবির কাব্য-আলোচনা করিতে হইলে, প্রতি-পদে আমার কত ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা এবং প্রাচীন পুঁথি হইতে সত্য আবিষ্কার করা, কত সুকঠিন—তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। প্রায়ই পুঁথির শেষ পাতাখানি পাওয়া যায় না; সুতরাং কোন্ সনে কোথায় কোন্ মূল-পুস্তক-দৃষ্টে প্রতিলিপি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার উদ্ধার হয় না। এখানেও ঐ প্রকার হইয়াছে, অনুমান করা যাউক।

পুঁথির ভাষা যে, ময়মনসিংহ জেলার—তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হইবে না।

যথা—

(১) রাস্ত দেখি কালীতাকে কহিছে আকাসে।
আইসাছে তোমার বর মাইলানীর বাসে॥

(২) বিদ্যার পহাইল রাতি, অহি কথা দিবারাতি
পুরুষের অষ্টগুণ মাইয়া।

(৩) বিহা দিলে হইত কত ছাইলা।

(৪) সন্ন্যাসী কহেন রাজা কি ভাব অখন।

(৫) হায় কেন মাথা খায়া পড়াইলাম বিদ্যায়।

(৬) কাটিতে উচিত কিন্তু কেমনে কাটিব।
কলঙ্ক করিতে দূর কলঙ্ক হইব॥

(৭) কি জাতি কাহার বেটা বাড়ী কোথা তর।

(৮) গাথিল বরিসে মাছ আর কোথা যায়॥

মাইলানী—মালিনী।	অখন—এখন।
অহি—ঐ।	খায়া—খেয়ে।
মাইয়া—মেয়ে।	হইব—হইবে।
বিহা—বিয়ে।	তর—তোর।
ছাইলা—ছেলে।	গাথিল—গাঁথিলাম।

উপরি-উক্ত শব্দ কয়টিই ময়মনসিংহের প্রাদেশিক কথা। ও-গুলি, ময়মনসিংহ জেলায় প্রচলিত; সুতরাং সিদ্ধান্ত করিব—কবি ময়মনসিংহবাসী।

এখন ভণিতা খুঁজিবার পালা। ইহাতে একস্থানে এই রকম ভণিতা আছে।

যথা—

(১) ভুরসষ্টী পরগণায়, নৃপতি নগেন্দ্র রায়
মুখটী বিখ্যাত দেসে দেসে।
ভারত তনয় তার কালিকামঙ্গলসার
ভণে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেসে॥

(২) চারি সমাজের পতি, কৃষ্ণচন্দ্র মহীপতি
বিক্রমে কেশরী জিনিত।
তাঁর সভাসদ-বর দ্বিজরাজ গুণাকর
ভারতচন্দ্র-রচিত॥

ইহার অন্য কোন বিশেষ ভণিতা নাই; সুতরাং ভারতচন্দ্র যে, একজন রাজার পুত্র, পিতার নাম নগেন্দ্র মুখটী,—রায় তাঁহাদের বংশের উপাধি, এবং ভুরসষ্টী পরগণার রাজা—এ সিদ্ধান্ত সহজেই হইবে। তবে রাজপুত্র, কেন কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশ পাইলেন, তাহার জন্য আমাকে অত্যন্ত গবেষণা করিতে হইবে এবং পরিশেষে পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধে পূর্ব্ববঙ্গে যতগুলি কৃষ্ণচন্দ্র নামক

রাজার নাম শুনিব, তাহার একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া কবি 'কোন্ নম্বর' কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক, তাহা প্রমাণে ব্যগ্র হইব।

হয়তো ভুরসষ্টী পরগণাকে একটী ক্ষুদ্র সমাজ ঠিক্ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে এই প্রকার আরও তিন সমাজের কর্ত্তা ও পূর্ব্ববঙ্গের একজন চারি সমাজের পতি সম্রাট্ প্রমাণ করিব এবং ভারতচন্দ্রকে তাহার এক সমাজের নায়কস্বরূপ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় প্রতিনিধি স্থির করিব। তৎপরে প্রমাণ করিব যে, এ অংশ "কালিকালঙ্গল"-নামক একখানি বৃহৎ পুঁথির অংশবিশেষ। অতঃপর সময়-নিরূপণের পালা। আভ্যন্তরীণ প্রমাণে অর্থাৎ ভাষার দ্বারা সহজেই অনুমিত হইবে, ইহা তিন শত বৎসরের পুঁথি। ভাষার প্রমাণ। যথা—

(১) তারে গুরু মানিঞা মুড়াইব জটাভার।
(২) ভেকেক ভুলায়া পদ্মে ভ্রমর মধু খায়।
(৩) এদেশে আসিয়া এক শুনিল সংবাদ।
আসিয়াছি রাজাক করিতে আশীর্ব্বাদ।
(৪) সেহি পতি বিচারে জিনিবে জেহি জন।
(৫) চোর তভু করে বল—
(৬) এমন প্রতিজ্ঞা যেন নারিয়ে না করে।
(৭) আপনে আসিয়া রতি আইয় হইল তায়।

মানিঞা	...	মানিয়া।	নারিয়ে	..	নারীতে।
ভেকেক	...	ভেককে।	সেহি, জেহি	...	সেই—যেই।
শুনিল	...	শুনিলাম।	তভু	...	তবু।
রাজাক	..	রাজাকে।	আপনে	...	আপনি।
			আইয়	...	এয়ো—ইত্যাদি।

অবশেষে স্থির নির্দ্ধারিত করিব যে, বাঙ্গালায় শৈবপ্রভাবের পর, বৌদ্ধ যুগের অন্তে যখন শক্তিপূজা আরম্ভ হইয়াছে, ইহা সেই সময়কার রচনা। বীরসিংহ রায় বৌদ্ধ ছিলেন, তাঁহাকে কালীভক্ত করাইয়া কালীর প্রতাপ দেখাইয়া কবি, পুস্তক সমাপ্ত করিয়াছেন। কালীভক্তেরই শেষে জয় হইয়াছে।

উপরি-লিখিত কাল্পনিক ব্যাপারটী অপূর্ব্ব নয়। এ প্রকার প্রাচীন গ্রন্থের আলোচনা, মাসিকপত্রিকাগুলির মধ্যে সময়ে সময়ে আমাদের নয়ন-গোচর হয়। এ রকম ভ্রম-সিদ্ধান্তের প্রধান কারণ, প্রাদেশিক শব্দ ও প্রাদেশিক ক্রিয়া-ব্যবহার-বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা। ঐরূপ ব্যবহারে অনভিজ্ঞ

সামালোচক, এই কারণে প্রাদেশিকত্বকে প্রাচীনত্বের লক্ষণ মনে করিয়া কবিকে প্রাচীন প্রমাণ করিতে অগ্রসর হন।

প্রমাণ-স্বরূপ "দুর্গামঙ্গল ও কবি রূপনারায়ণ"-শীর্ষক প্রবন্ধ উল্লেখ করিতেছি। (১৩১৫, ১ম সংখ্যা সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা) পুস্তকের ৩০০ বৎসরের প্রাচীনত্বের প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত শব্দগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে।

সমার	...	সবার।	এমত	...	এমন।
তাথে	...	তাহাতে।	দেখিল	...	দেখিলাম।
ইবা	...	এবা।	তোমাক	...	তোমাকে।
ই	...	এ।			

উপরি-উক্ত শব্দগুলি আদৌ প্রাচীন নয়। ময়মনসিংহ জেলার সর্ব্বত্রই ঐ প্রকার শব্দ, এখনও ব্যবহৃত হয়। লেখকের প্রাদেশিক অনভিজ্ঞতা এ প্রকার ভুল সিদ্ধান্তের কারণ।

প্রসঙ্গ-ক্রমে বলিয়া রাখি যে, কবির 'আর্যত্ব'কে (অর্থাৎ কবি ছন্দের মিল বা অনুপ্রাসের জন্য ভাষার যে পরিবর্ত্তন বা অপকর্ষ করেন,তাহাকেও) প্রাচীনত্বের লক্ষণ বলিয়া অনুমিত হয়। যথা—উক্ত প্রবন্ধে "জিন্" শব্দ ("যিনি" অর্থে ব্যবহৃত) প্রাচীনত্বের লক্ষণ বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে।

এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, তাহা উক্ত লেখক কর্ত্তৃক অন্য স্থানে উদ্ধৃত দুইটী পদ তুলিয়া দিলে সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। যথা ঃ—৮৪ পৃষ্ঠায়

(১) চৈতন্যরূপিণি জিনি, ব্যাপিয়া জগৎ ত্রীণি।
(২) জিনি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা

এই দুই স্থানেই কবি "জিন্" ব্যবহার না করিয়া 'জিনি' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন; সুতরাং "জিন্" শব্দ ব্যবহার, কবির প্রাচীনত্বের লক্ষণ নয়; কবির "আর্যত্বের" লক্ষণ।

পরিশেষে বক্তব্য—প্রাদেশিকশব্দসকল যতদিন না সম্পূর্ণ আলোচিত ও সংগৃহীত হইতেছে, ততদিন প্রাচীন গ্রন্থালোচনা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই শব্দ-সংগ্রহ-বিষয়ে কি প্রকার চেষ্টা এতাবৎ হইয়াছে এবং কি রকম চেষ্টা করিলে সফলকাম হইতে পারা যাইবে, তাহা "প্রাদেশিক শব্দসন্ধানে", নামক প্রবন্ধে আলোচিত হইবে। *

শ্রীচিত্তসুখ সান্যাল।

* বান্ধব-সমিতির চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

রাজার নাম শুনিব, তাহার একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া কবি 'কোন্ নম্বর' কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক, তাহা প্রমাণে ব্যগ্র হইব।

হয়তো ভুরসষ্টী পরগণাকে একটী ক্ষুদ্র সমাজ ঠিক্ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে এই প্রকার আরও তিন সমাজের কর্ত্তা ও পূর্ব্ববঙ্গের একজন চারি সমাজের পতি সম্রাট্ প্রমাণ করিব এবং ভারতচন্দ্রকে তাহার এক সমাজের নায়কস্বরূপ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় প্রতিনিধি স্থির করিব। তৎপরে প্রমাণ করিব যে, এ অংশ "কালিকালঙ্গল"-নামক একখানি বৃহৎ পুঁথির অংশবিশেষ। অতঃপর সময়-নিরূপণের পালা। আভ্যন্তরীণ প্রমাণে অর্থাৎ ভাষার দ্বারা সহজেই অনুমিত হইবে, ইহা তিন শত বৎসরের পুঁথি। ভাষার প্রমাণ। যথা—

(১) তারে গুরু **মানিঞা** মুড়াইব জটাভার।
(২) **ভেকেক** ভুলায়া পদো ভ্রমর মধু খায়।
(৩) এদেশে আসিয়া এক **শুনিল** সংবাদ।
আসিয়াছি **রাজাক** করিতে আশীর্ব্বাদ।
(৪) **সেহি** পতি বিচারে জিনিবে **জেহি** জন।
(৫) চোর **তভু** করে বল—
(৬) এমন প্রতিজ্ঞা যেন **নারিয়ে** না করে।
(৭) **আপনে** আসিয়া রতি **আইয়** হইল তায়।

মানিঞা	...	মানিয়া।	নারিয়ে	..	নারীতে।
ভেকেক	...	ভেককে।	সেহি, জেহি	...	সেই—যেই।
শুনিল	...	শুনিলাম।	তভু	...	তবু।
রাজাক	..	রাজাকে।	আপনে	...	আপনি।
			আইয়	...	এয়ো—ইত্যাদি।

অবশেষে স্থির নির্দ্ধারিত করিব যে, বাঙ্গালায় শৈবপ্রভাবের পর, বৌদ্ধ যুগের অন্তে যখন শক্তিপূজা আরম্ভ হইয়াছে, ইহা সেই সময়কার রচনা। বীরসিংহ রায় বৌদ্ধ ছিলেন, তাঁহাকে কালীভক্ত করাইয়া কালীর প্রতাপ দেখাইয়া কবি, পুস্তক সমাপ্ত করিয়াছেন। কালীভক্তেরই শেষে জয় হইয়াছে!

উপরি-লিখিত কাল্পনিক ব্যাপারটী অপূর্ব্ব নয়। এ প্রকার প্রাচীন গ্রন্থের আলোচনা, মাসিকপত্রিকাগুলির মধ্যে সময়ে সময়ে আমাদের নয়ন-গোচর হয়। এ রকম ভ্রম-সিদ্ধান্তের প্রধান কারণ, প্রাদেশিক শব্দ ও প্রাদেশিক ক্রিয়া-ব্যবহার-বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা। ঐরূপ ব্যবহারে অনভিজ্ঞ

সামালোচক, এই কারণে প্রাদেশিকত্বকে প্রাচীনত্বের লক্ষণ মনে করিয়া কবিকে প্রাচীন প্রমাণ করিতে অগ্রসর হন।

প্রমাণ-স্বরূপ "দুর্গামঙ্গল ও কবি রূপনারায়ণ"-শীর্ষক প্রবন্ধ উল্লেখ করিতেছি। (১৩১৫, ১ম সংখ্যা সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা) পুস্তকের ৩০০ বৎসরের প্রাচীনত্বের প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত শব্দগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে।

সমার	...	সবার।	এমত	...	এমন।
তাথে	...	তাহাতে।	দেখিল	...	দেখিলাম।
ইবা	...	এবা।	তোমাক	...	তোমাকে।
ই	...	এ।			

উপরি-উক্ত শব্দগুলি আদৌ প্রাচীন নয়। ময়মনসিংহ জেলার সর্ব্বত্রই ঐ প্রকার শব্দ, এখনও ব্যবহৃত হয়। লেখকের প্রাদেশিক অনভিজ্ঞতা এ প্রকার ভুল সিদ্ধান্তের কারণ।

প্রসঙ্গ-ক্রমে বলিয়া রাখি যে, কবির 'আর্ষত্ব'কে (অর্থাৎ কবি ছন্দের মিল বা অনুপ্রাসের জন্য ভাষার যে পরিবর্ত্তন বা অপকর্ষ করেন, তাহাকেও) প্রাচীনত্বের লক্ষণ বলিয়া অনুমিত হয়। যথা—উক্ত প্রবন্ধে "জিন্" শব্দ ("যিনি" অর্থে ব্যবহৃত) প্রাচীনত্বের লক্ষণ বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে।

এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, তাহা উক্ত লেখক কর্ত্তৃক অন্য স্থানে উদ্ধৃত দুইটী পদ তুলিয়া দিলে সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। যথা ঃ—৮৪ পৃষ্ঠায়

(১) চৈতন্যরূপিণি **জিনি**, ব্যাপিয়া জগৎ ত্রীণি।
(২) **জিনি** ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা

এই দুই স্থানেই কবি "জিন্" ব্যবহার না করিয়া 'জিনি' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন; সুতরাং "জিন্" শব্দ ব্যবহার, কবির প্রাচীনত্বের লক্ষণ নয়; কবির "আর্ষত্বের" লক্ষণ।

পরিশেষে বক্তব্য—প্রাদেশিকশব্দসকল যতদিন না সম্পূর্ণ আলোচিত ও সংগৃহীত হইতেছে, ততদিন প্রাচীন গ্রন্থালোচনা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই শব্দ-সংগ্রহ-বিষয়ে কি প্রকার চেষ্টা এতাবৎ হইয়াছে এবং কি রকম চেষ্টা করিলে সফলকাম হইতে পারা যাইবে, তাহা "প্রাদেশিক শব্দসন্ধানে", নামক প্রবন্ধে আলোচিত হইবে। *

শ্রীচিত্তসুখ সান্যাল।

* বান্ধব-সমিতির চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

উত্তরবঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে অভ্যর্থনা-বক্তৃতা।

বিগত বর্ষ হইতে চেষ্টা করিয়া রঙ্গপুর-শাখা-সাহিত্য-পরিষদ্, বর্ত্তমান বর্ষে এই উত্তর বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন সংঘটিত করিতে সমর্থ হইলেন। বহু আয়াসার্জ্জিত এই ফললাভে ক্ষুদ্র পরিষদের হৃদয় একেবারে আনন্দপরিপ্লুত; সুতরাং সমাগত প্রতিনিধিগণকে কি বলিয়া অভ্যর্থনা করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না। আর—তাঁহার সে শক্তিই বা কোথায়!

সারস্বত-স্বর্ণকুঞ্জের বহির্দ্দেশে অতিদূরে একটী ক্ষীণায়তনা বাত্যা-বিক্ষোভিতা লতিকা, উঠিতে উঠিতে, বাড়িতে বাড়িতে কুঞ্জাভিমুখে, সভয়ে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছিল; তাহার আগতশীর্ষ ঐ কুঞ্জচারিগণের লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হইবে বলিয়া, সে, স্বপ্নেও ভাবে নাই। কে জানিত, তাহারই প্রতি সাহিত্যিকগণের সকরুণ দৃষ্টি, আজ অচিন্তনীয়রূপে আকৃষ্ট হইবে। উত্তরবঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ইতিহাসে তাহার নাম স্থান পাইবে! যখন তাহার কাতরাহ্বানে আকুলিত হইয়া আপনারা এত শ্রমস্বীকারপূর্ব্বক এই দূরদেশে আসিয়াছেন, তখন ক্ষুদ্র পরিষদের শত অভাবপূর্ণ অভ্যর্থনার ত্রুটি উপেক্ষা করিয়া স্নেহবশে ইহাকে মাটী হইতে তুলিয়া ধূলি কাদা মুছাইয়া পিতৃবৎ ক্রোড়ে ধারণ করুন, উহার বাক্‌স্ফুরণে সহায় হউন। শিশু পরিষদ্ আপনাদিগকে ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি বলিবেন?

যে ভূমিতে আপনারা পদার্পণ করিয়াছেন, তাহা অধুনা পিতৃমাতৃহীন অনাথবৎ প্রতীয়মান হইলেও, তাহার এমন একদিন ছিল যে, গৌরবে পদযুগল মৃত্তিকা স্পর্শ করে নাই; সকলেই সমাদরে অঙ্কে স্থান দিয়াছে। সমাচারদর্পণ, প্রভাকর প্রভৃতি সংবাদপত্রের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে এই ভূমিতেই "রঙ্গপুর-বার্ত্তাবহ" জন্মগ্রহণ করিয়া "প্রভাকরের" সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইয়াছিল। আজিও তাহার কঙ্কালাবশেষ "রঙ্গপুর-দিক্-প্রকাশ"-রূপে বহির্দ্বারদেশে অতীতের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। প্রভাকর-সম্পাদক গুপ্ত কবি "রঙ্গপুর-বার্ত্তাবহে"র জীবনস্বরূপ কালীচন্দ্রের দর্শনাভিলাষে বহু শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক রঙ্গপুরে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বাঙ্গালাভাষা যখন দীনবেশে বঙ্গসন্তানের পাশ্চাত্য শিক্ষানুরাগ-অর্গলিত অন্তঃকরণ-দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে প্রবেশ-

লাভের জন্য সকরুণ আবেদন জানাইতেছিল, এই রঙ্গপুর হইতেই তখন কবি কালীচন্দ্রের রচনায় তাহার জন্য সমবেদনা প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

"আধুনিক যুবা জনে স্বদেশীয় কবিগণে
ঘৃণা করে—নাহি সহে প্রাণে।
বাঙ্গালীর মনঃপদ্ম কবিতা সুধায় সদ্য
এই মাত্র রাখ হে প্রমাণে॥"

—(পদ্মিনী-উপাখ্যানের উপক্রমণিকা)

ইহারই ফলে বাঙ্গালার অদ্বিতীয় কাব্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত "পদ্মিনী উপাখ্যানের" জন্ম। মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র এই ভূমিরই প্ররোচনায় বাঙ্গালারচনায় প্রথম লেখনী পরিচালন করেন। বার্ত্তাবহের জীর্ণ কয়েকখানি পত্র, যাহা আপনাদের সম্মুখে আজ ধরিয়াছি, উদ্ঘাটিত করিয়া দেখুন,—কালীচন্দ্রের বিঘোষিত পুরস্কারপ্রার্থী হইয়া হুগলী কলেজের তদানীন্তন কালের এই ছাত্ররত্নত্রয় বাঙ্গালারচনা করিতে আগ্রহান্বিত হন। তাঁহাদের হৃদয়ে যে বীজ, এই রঙ্গপুর হইতে উপ্ত হইয়াছিল, তাহারই সুমিষ্ট ফল, আজ সমগ্র বঙ্গ উপভোগ করিতেছেন; কিন্তু সে দিন আর নাই। কালীচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, রঙ্গপুরাকাশ হইতে চির-অস্তমিত হইয়াছেন।

আমরা হেলায়—তাঁহাদের প্রসাদে এবং নির্দ্দেশিত পথে বঞ্চিত হইয়াছি। আমাদিগের এই দৈন্য, সমগ্র উত্তরবঙ্গের দৈন্য, সমস্ত বাঙ্গালার দৈন্য—বলিতেও কুণ্ঠাবোধ করিব না। কালীচন্দ্রের অমৃতবর্ষিণী কবিতা ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা ভাষা আপন বৈভবের পরিচয় কখনই প্রদান করিতে পারে না; তাহাতে তাহার একাংশ অনলঙ্কৃতই থাকিয়া যায়।

অতীত-গৌরবকাহিনী একটু মনে করিয়া না দিলে আপনারা এ দৈন্য-মোচনে অগ্রসর হইবেন না,—সাহিত্যক্ষেত্রে খনিত্রহস্তে কোথায় কোন্ ধন লুক্কায়িত আছে, তাহার সন্ধান করিবেন না! আজ যখন আবার রঙ্গপুরের আহ্বানে আপনারা এখানে সমবেত হইয়াছেন, তখন এমন একটা কিছু করুন, যাহাতে তাহার সাহিত্য-বিভব, সমস্ত বাঙ্গালার চক্ষে ধাঁধাঁ লাগাইয়া দিতে পারে। এমন কিছু করুন, যাহাতে এই উত্তরবঙ্গের বন্য প্রদেশ হইতে, বঙ্গ-আর্য্য সভ্যতা-বিকাশের আদি স্থান হইতে, সুরভি-সম্পদে সমৃদ্ধ কুসুমচয় চয়িত হইয়া গৌড়জনের উপভোগ্য হয়।

এই শাখা পরিষদ্ প্রারম্ভিক চেষ্টাতেই আড়াই শত অশ্রুতপূর্ব্বনামা প্রাচীন

পুঁথি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন শুনিয়া, আপনারা আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না। স্ব স্ব গৃহের চতুর্দ্দিকে একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন, এরূপ কত শত অমূল্যরত্ন, কীট ও অগ্নির উদর পূর্ণ করিতেছে। আর উপেক্ষা করিবেন না, পরে ইচ্ছা করিলেও, ফললাভ সম্ভবপর হইবে না।

রঙ্গপুরের কবি কালীচন্দ্র, কমললোচন, কাজি হেয়াত মামুদ, ব্রাহ্মণ উল্যা; কোচবিহারের দ্বিজ শ্রীনাথ, নারায়ণদেব; আসামের শঙ্কর ও মাধবদেব, শ্রীমদ্‌গোবিন্দ মিশ্র; বগুড়ার জীবন মৈত্রেয়, অদ্ভুতাচার্য্য; দিনাজপুরের দ্বিজ জগন্নাথ; রাজসাহীর রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিগণের নাম শুনিয়া চমৎকৃত হইবেন না। খুঁজিয়া দেখিবেন, এরূপ শত শত কবি, এই কাব্যকাননে আপনার বাড়ীর পার্শ্বেই আবির্ভূত হইয়া একদা কাব্যঝঙ্কারে গ্রাম প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সুর-বাঁধা বীণা আপনারা সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক তদুপরি করাঙ্গুলি-সঞ্চালনের চেষ্টা করেন নাই বলিয়াই, উহার সুমধুর ঝঙ্কার, আজ নীরব হইয়াছে। এখনও সেই সপ্তস্বরা বীণার তার একেবারে ছিন্ন হয় নাই—চেষ্টা করুন, আবার ঝঙ্কারিত হইবে।

উত্তর বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যের অনুসন্ধান, উদ্ধার, রক্ষণ এবং প্রত্নতত্ত্বা র আলোচনার উপায়-উদ্ভাবনার্থ আমরা আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছি। এ আহ্বান কেবল আদর-আপ্যায়নে, মুখের কথায় পর্য্যবসিত করিবেন না। কর্ম্মের কঠোরতার সহিত ইহাকে মিশ্রিত করিয়া লউন, উত্তরবঙ্গের উষ্ণম উজ্জ্বল হউক। আমাদিগের সাহিত্যাকাশে যিনি উজ্জ্বলতম নক্ষত্ররূপে বিরাজিত, আজ আমরা তাঁহাকে নিকটে পাইয়াছি। তিনিই আমাদিগকে পথ দেখাইয়া দিবেন।

রঙ্গপুরের পক্ষ হইতে এই ক্ষুদ্র পরিষদ্, আপনাদিগকে এই বলিয়া সাদরাভ্যর্থনা করিতেছেন। *

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর-শাখার বার্ষিক অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

মুর্শিদাবাদের কতিপয় গ্রামের প্রাচীন কাহিনী।

উপক্রমণিকা।

মুর্শিদাবাদ অতি বিস্তীর্ণ স্থান। ইহার বহু গ্রাম উন্নতির চরমসীমা স্পর্শ করিয়া কালের বিচিত্র নিয়মে পূর্ণরূপে অবনত হইয়া জনসমাজের স্মৃতি-পথের অতীত হইয়াছে। এককালে যে সকল গ্রাম, লক্ষ্মী-সরস্বতীর নিত্য-বসতি ও আতিথ্য-সৎকারের পূর্ণ ভাণ্ডার ছিল এবং সুশোভিত বহু সরোবর, হৃদয়ে ধারণ করিয়া জনপ্রাণীর তৃষ্ণানাশ ও কৃষির বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া বহুল শস্য উৎপাদন করিত, সেই গ্রামসকল আজ ছিন্নভিন্নপ্রায় ও জনশূন্য;—সরোবরসমূহ, দুর্ভিক্ষক্লিষ্টগণের দুঃখে যেন আত্মসম্বল শেষ করিয়া কঙ্কালসার!

এই গ্রামসমূহের প্রাচীনতত্ত্ব সংগ্রহ করা অতি দুরূহ ব্যাপার; তথাপি জনশ্রুতি ও অতীতচিহ্ন দ্বারা যতদূর সাধ্য সংগ্রহ করিয়া হৃদয়ের ব্যথা দূর করিতে অগ্রসর হইলাম। মুর্শিদাবাদের চিরসুহৃদ্ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত নিখিলনাথ রায় মহাশয়, এখনও এই সকল গ্রামের কাহিনী অবগত হন নাই, সেই জন্য তাঁহার "মুর্শিদাবাদ-কাহিনীতে" এই সকল গ্রামের কথা স্থান পায় নাই।

এই গ্রামগুলি মুর্শিদাবাদ-সহর-সৃষ্টির বহু পূর্ব্ব হইতেই সুসমৃদ্ধ ছিল। ইহারা বর্ত্তমান সহর হইতে বেশী দূরে অবস্থিত নয়, অধিকাংশেরই তথা হইতে পাঁচ সাত ক্রোশ ব্যবধান মাত্র। এই সকল গ্রাম হইতে কত শৌর্য্যসম্পন্ন কুলরমণী, রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে অত্যাচারীর রুধিরে সাঁতার দিয়া পিশাচহৃদয় কম্পিত করিয়া আত্মত্যাগ ও ধর্ম্মরক্ষার জ্বলন্ত নিদর্শন রাখিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। কত মল্ল, নীচকুলে জন্মিয়াও রাজপুত বীরের ন্যায় প্রভুকার্য্যসাধনে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়া তাৎকালিক জনগণকে মুগ্ধ করিয়া অক্ষয় প্রতিষ্ঠা-ভাজন হইয়া গিয়াছেন। কত শত নির্দ্দয় দস্যু, প্রবলপরাক্রমে এতদ্দেশস্থ জন-সমাজকে প্রকম্পিত করিয়াছে ও কখন কখন রাজসৈন্যেরও বলদর্প পর্য্যন্তও চূর্ণ করিয়াছে। ধনিগণ, দানবলে দাতাকর্ণ নামে আখ্যাত হইয়াছেন;—তন্তু-বায়কুল, সূক্ষ্মকারুকার্য্যে জগৎকে চমকিত করিয়া এখন বিস্মৃতির ঘন আবরণে লোকলোচনের দৃষ্টিসীমার বহিরন্তরালে অবস্থিত। বিদ্যালয়, রেশমি-সূতি-বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি, কৃষিবাণিজ্যশিল্পালয় অতিথি-দেবসেবার নিত্য স্থান, এখন মরুবৎ দৃশ্যমান। স্তরে স্তরে বহু সৌধ অট্টালিকা, দেবালয়, মৃত্তিকার নিম্ন-স্তরে প্রোথিত। কেবল এই সকল গ্রামের প্রকাশ্য পথগুলি যেন মলিন

হাস্যে অতীত গৌরবের ক্ষীণ চিহ্ন ধরিয়া সাক্ষ্য দিতেছে। প্রায়ই গ্রামের পথগুলি ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত। এমন কি, পল্লীপথগুলিও তদ্রূপ দৃঢ়-ইষ্টকপ্রোথিত; স্থানে স্থানে মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত; কিন্তু বহুস্থান এখনও ব্যক্ত হইয়া প্রাচীন দৃঢ় স্থাপত্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এই ভূতপূর্ব্ব স্বর্গতুল্য গ্রামসমূহের অধিবাসিগণ কোন বিষয়ে কাহারও মুখাপেক্ষী ছিলেন না। নানাবিধ শস্য, সূত্র কিংবা রেশমী বস্ত্র, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বহুবিধ শিল্পকার্য্য এতদ্দেশেই প্রস্তুত হইত; প্রাচীন স্থপত্য কার্য্যের শিল্পিগণ এই সকল গ্রামেরই অধিবাসী ছিলেন—বেদ, বেদান্ত, ষড় দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, কাব্য-অলঙ্কার প্রভৃতি শিক্ষার জন্য কাহাকেও অন্য স্থানে যাইতে হইত না। নবদ্বীপ যখন ভবিষ্যতের অন্ধতম গর্ভে লীন ছিল, তখন এই সকল গ্রামই বিদ্যাচর্চ্চার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। মূল কথা—মহারাজ মহীপালের সময় এদেশে বিদ্যা বিভব, ধন গৌরব, কৃষিশিল্পবাণিজ্যের জন্য শ্রেষ্ঠ ছিল।

কুক্ষণে আলিবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গালার নবাব হইলেন এবং কুক্ষণে ভাস্কর পণ্ডিত, রঘু বর্গী নামে বাঙ্গালায় আপতিত হইলেন। এই ভীষণ আক্রমণে নবাব, যখন ভয় ব্যাকুলিতচিত্তে স্বীয় ধনরত্ন, গোদাবরীতে রাখিবার জন্য ব্যস্ত, তখন প্রজাসকল বর্গীদ্বারা ও দেশস্থ মাল বাগ্‌দী, ডোম প্রভৃতি বহুদলবলসম্পন্ন দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া হত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইলেন। হতাবশিষ্ট জনগণ হৃতাবশিষ্ট ধনসম্পদ্ লইয়া যাঁহার যেখানে সুবিধা হইল, তিনি সেইখানে প্রস্থান করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে গ্রামসকল শূন্যপ্রায় হইয়া উঠিল।

তারপর দুর্ভাগ্য বঙ্গমাতার হতভাগ্য সন্তান সিরাজদ্দৌলার পতনের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরতর নিরাশায় এ দেশ দুর্ভাগ্যের ক্রীতকিঙ্কর হইল; অসভ্য বর্গী ও ডাকাত দস্যুর অত্যাচার সহ্য করিয়া যে সকল হৃতসর্ব্বস্ব তন্তুবায় তখন দেশের ভবিষ্য উন্নতির আশাস্থল ছিল, সুসভ্য ইংরাজ বণিকের পালনরূপ অনুগ্রহে তাহারা আর টিকিতে পারিলেন না। নিরাশ্রয় ও নিরুপায় হইয়া তাহারা খাগড়া, সৈদাবাদ, মিরজাপুর, গনকর প্রভৃতি স্থানে প্রস্থান করিল এবং স্বীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া বাধ্য হইয়া অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিল।

এই সকল অত্যাচারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কৃষিক্ষেত্র, বহু মাঠ, প্রান্তর ও বসতিস্থল—গাঢ়তর জঙ্গলে পরিণত হইল। বহুদিন এইরূপে অতীত হইলে, ইংরেজের বৃত্তিভোগী নবাব নজমুদ্দৌলার সময় পূর্ব্ব জলাচরণীয় ভদ্র ব্রাহ্মণ-

গণের মধ্যে অনেকে আসিয়া পুনরায় বাস করিতে লাগিলেন। অন্যান্য জাতীয় সদ্‌গোপ প্রভৃতি নবসায়ক-শ্রেণী অনেকে বাস করায় গ্রামসমূহের পূর্ব্বশ্রী কতক ফিরিয়া আসিল! কিন্তু হায়! কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বৎসর অতীত না হইতে হইতেই, মহামারীতে বহু লোকক্ষয় হইয়া, গ্রামসকল অতিশয় হীন হইয়া পড়িল।

গত ১২৮০ সালের পর ক্রমে ক্রমে সাঁওতাল পরগণা হইতে প্রায় ৮,০০০ হাজার সাঁওতাল আসিয়া এদেশে বাস করাতে কৃষি কার্য্যে বর্ত্তমানে কিছু সুবিধা হইয়াছে এবং ভবিষ্যদুন্নতির আশা সূচিত হইতেছে।

নিম্নলিখিত গ্রামগুলি পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ ছিল। যথা—অমরকুণ্ড, রাইগুা, সাঁকুড়িয়া, আমদপুর, পঞ্চানন্দপুর, গুড়া, আমারবিছুরী, ব্রহ্মাপুর, অনন্তপুর, দাসপাড়া প্রভৃতি ত্রিশ খানি গ্রাম। ইহাদিগের প্রাচীন তত্ত্ব ও তৎপ্রাসঙ্গিক আখ্যায়িকামূলক ঘটনাবলি ও জনশ্রুতি যথাসাধ্য বিবৃত করিবার ইচ্ছা আছে।

শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

আনত-আননা।

কে ওই বসিয়া আনত-আননা অসীম মাধুরী ছড়া'য়ে।
করুণার ধারা উছলিয়া যেন মুখে পড়িতেছে গড়া'য়ে॥
সান্ধ্য-শীকর-শীতল-সমীর চুমিছে ললাট-দেশ।
মুখেতে তাহার বিষাদের ছায়া এলায়ে পড়েছে কেশ॥
কতই ভাবনা ভাবিতেছে ওগো ঠিকানা নাহিক তার।
বহুদূরে মন চলে' গেছে শুধু দেহ পড়ে' আছে তার॥
মুকুতার মত আঁখিধারা ওই ঝর ঝর পড়ে ঝরিয়া।
উদাসপরাণে, আকুল নিশ্বাসে, থেকে থেকে উঠে কাঁপিয়া॥
কত সুখে সুখী ছিল যেন সে গো সে সুখ চলিয়া গেছে।
ঘুম-ঘোর-ময় স্বপনের মত স্মৃতিটুকু যেন আছে॥
অতীতসুখের স্বপনকাহিনী আকাশের পানে চাহিয়া।
উলটি পালটি পড়ে যেন কভু কতই যতন করিয়া॥

সে কাহিনী-পাঠে সুপ্ত হিয়ায় ব্যথা যেন উঠে জাগিয়া।
অশ্রু-আকুল আঁখির ধারায় তাই যায় বুক ভাসিয়া॥
সেই ঘর-দ্বার সকলি রয়েছে, সেও ত রয়েছে সেই।
রহিয়াছে বটে সবই যেন তবু থেকেও কিছুই নেই॥
ঘরে, সেই আসে, হৃদি কেন তার উল্লাসে আর ভাসে না।
চাঁদিনী যামিনী সেই আসে যায় মন কেন আর মাতে না॥
আকুল-ঝঙ্কারে সেই গাহে পিক, প্রাণে ঝঙ্কার তোলে না।
মলয়-অনিল স্নেহ-পরশনে শিহরিয়া কেন ওঠে না॥
সেই তো সাজান সুখের শয্যা দেখে' সুখ কেন হয় না।
বুকের ভিতর করে "হায় হায়!" জেগে' ওঠে কেন বেদনা॥
সেই শয্যা 'পরে কতদিন হায়! মান অভিমান-কাঁদনা।
ভালবাসা ল'য়ে যুকতি তর্ক, সোহাগ আদর, যাচনা॥
কাহার আশায় পথপানে চায়, আগমন করে কামনা।
সারা নিশা হায়! বসে 'কেটে' যায় কেহ তবু আর আসে না॥
জীবন-নাটক-যবনিকা ফেলি' কে বসিয়া ওই বল না।
বঙ্গদেশের পতিহীনা নারী অভাগী আনত-আননা॥ *

ধ্রুবলাল দত্ত।

* গত জ্যৈষ্ঠ মাসের ১০ই তারিখে একুশ বৎসর বয়সে ধ্রুবলাল, স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কবিতাটী তাহার শেষরচনা। হায়, তখন কে জানিত যে তাঁহার এই শেষরচনা, তাঁহারই বালিকা বিধবা-পত্নীর ভবিষ্যজীবনের ভবিষ্যদ্বাণীরূপে পরিণত হইবে।

ধ্রুবলাল, জাহ্নবীর লেখক এবং আমাদের প্রিয়সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্তের একমাত্র পুত্র। তাহার কৈশোরের রচনা দেখিয়া, বোধ হয়, জীবিত থাকিলে তিনি একজন সুলেখক হইতে পারিতেন। গোবিন্দলাল বাবু যেমন অকপটসাহিত্যসেবী, দেবদ্বিজপরায়ণ এবং অকৈতবস্বভাব, তাঁহার পুত্র ধ্রুবলালও সেইরূপই ছিলেন। ধ্রুবলালে আমরা প্রাচীন পৌরাণিক ধ্রুবের আভাষ দেখিতাম। এই অকালমৃত্যুতে আমরা প্রকৃতই ব্যথিত। প্রার্থনা করি, শ্রীভগবান্ তদীয় শোকসন্তপ্ত পিতামাতা এবং বিধবা পত্নীর হৃদয়ে শান্তিদান করুন।—সহ-সম্পাদক।

রমণীর সাহস।

(১)

আমি পল্লীগ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সন্তান হইলেও, আমার শিক্ষা-দীক্ষা ইংরাজীধরণে হইয়াছিল এবং আমার বাল্যকালটাও কলিকাতাতেই অতিবাহিত হইয়াছিল ; সেই জন্য স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতা-সম্বন্ধে অনেক-গুলি "কুসংস্কার" পরিবর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলাম। বিবাহ হইলে স্ত্রীকে ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখাইব এবং তাহাকে চব্বিশ ঘণ্টা জুতামোজা, সেমিজ-জ্যাকেট পরাইয়া, রুজপাউডার, পোমেটম, এসেন্স মাখাইয়া বিবি সাজাইয়া রাখিব—যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই এইরূপ বাসনা আমার হৃদয়ে বলবতী হইয়াছিল ; কিন্তু বিধাতার বিধানে আমার সকল সঙ্কল্প ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইল। বিবাহের পরই জানিতে পারিলাম—আমার স্ত্রীর নাম হরিদাসী। হা অদৃষ্ট ! আমি কোথায় আশা করিয়াছিলাম যে, পত্নীর নাম বিদ্যুল্লতা বা তড়িৎপ্রভা অথবা এইরূপ একটা কিছু হইবে ; কিন্তু তাহা না হইয়া হইল কিনা হরিদাসী ! যে নামটার উপর আগাগোড়া বিরক্ত, যে নামটা মনে হইলেই, আমার কল্পনাতে একটা মোটা-সোটা কাল-কোলো সাদা-সিধা পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মূর্ত্তি আবির্ভূত হইত, সেই ঘৃণিত নামটা কিনা শেষে আমারই স্ত্রীর হইল। ইহা অপেক্ষা আর শোচনীয় ব্যাপার কি হইতে পারে ?

যদি নামটা কেবল হরিদাসী হইলেই নিষ্কৃতি পাইতাম, তাহা হইলেও কতক মঙ্গল বলিয়া মনে করিতাম ; কারণ নামটা বদলাইয়া দিলেই চলিতে পারিত ; কিন্তু তাহার নামটা যেমন হরিদাসী—তাহার প্রকৃতি আবার ততো-ধিক বিরক্তিকর হইয়াছিল। লাল কস্তাপাড় শাড়ী ও কপালে ভ্রূযুগলমধ্যে সিন্দূরের টিপ আমি কিছুতেই ঘুচাইতে পারিলাম না। বিবাহের পর কলিকাতা হইতে কত সেমিজ বডিস্ জ্যাকেট, কত এসেন্স পাউডার কিনিয়া তহোকে উপহার দিয়াছি ; কিন্তু একদিনের জন্যও তাহাকে ঐ সকল ব্যবহার করিতে দেখি নাই। যখন আমি ঐ সকল ব্যবহার না করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতাম, তখন হরিদাসী বলিত—"ব্রাহ্মণপণ্ডিতের কন্যা, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পুত্রবধূ ঐ সকল দ্রব্য ব্যবহার করিলে লোকে পাগল বলিবে যে ?"

অবশেষে একদিন অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করাতে সে বলিল—"যখন তুমি নিজে পয়সা উপার্জ্জন করিয়া আমাকে ঐ সকল দ্রব্য কিনিয়া দিবে, তখন ব্যবহার করিব। এখন আমাকে ও কথা বলিও না।" তাহার কথা শুনিয়া মনে করিলাম ;—তবু ভাল, ভবিষ্যতের জন্য একটু আশা রহিল। হায়! তখন কে জানিত যে, ভবিষ্যতে আবার আমাকেই ঐ সকল বিলাস দ্রব্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে হইবে?

যথাসময়ে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় কলেজে পড়িতে গেলাম। কলিকাতায় আমার পিতার একজন শিষ্য ছিলেন, বড়বাজারে তাঁহার কাপড়ের দোকান ছিল। আমি তাঁহারই বাসায় অবস্থান করিয়া বঙ্গবাসী কলেজে এফ, এ পড়িতে লাগিলাম। এই সময় কলিকাতায় অনেক সভ্য ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কুল-ললনাদিগকে অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দেখিয়া স্ত্রীস্বাধীনতার ভাবটা আমার মনে বিলক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। আমি স্ত্রীস্বাধীনতার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম। কলেজ বন্ধ হইলেই আমি বাটী যাইতাম এবং যে কয়দিন হরিদাসীর নিকট থাকিতাম সেই কয়দিন তাহাকে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে উপদেশ দিতাম। স্ত্রীশিক্ষায় তাহার সহানুভূতি লাভ করিলাম বটে ; কিন্তু স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনমতেই তাহাকে সম্মত করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমি গোপনে গোপনে তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতে আরম্ভ করিলাম। লেখাপড়ায় তাহার আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসা ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। এই বিষয়ে আমার আশা-লতা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা দেখা গেল। আমি তাহাকে ইংরাজীও শিখাইতে লাগিলাম। সে প্রথমে ইংরাজী শিখিতে আপত্তি করিয়াছিল ; কিন্তু পরে সে আপত্তি আর রহিল না। হরিদাসী বাঙ্গালা ও ইংরাজী শিক্ষায় মনোনিবেশ করিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার পিতা দরিদ্র অধ্যাপক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি মহাভারত রামায়ণ ইত্যাদি পাঠ করিয়া প্রতি বৎসর ৩।৪ শত টাকা উপার্জ্জন করিতেন, সামান্য ভূসম্পত্তিও ছিল। পিতার অর্জ্জিত অর্থ ও ভূসম্পত্তির আয় হইতে কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। এই দরিদ্র পরিবারের কুলবধূকে আমি বিবি সাজাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখন একথা মনে হইলে অত্যন্ত লজ্জা বোধ হয়।

(২)

যে বৎসর এফ, এ পরীক্ষা দিলাম, সেই বৎসর আমার পিতৃবিয়োগ হইল। পিতার উপার্জ্জনেই সংসার চলিতেছিল ; সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতে সংসার অচল হইল। অগত্যা আমাকে উচ্চ শিক্ষার আশা পরিত্যাগ করিয়া চাকরির চেষ্টা করিতে হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আমাদের সেই শিষ্যের বাটীতে থাকিতাম, তাঁহার বড়বাজারে একখানি দোকান ছিল। আমার বিপদ্ দেখিয়া তিনি একজন কাপড়ের দালালকে দিয়া অনেক অনুরোধ উপরোধ করিয়া কোন সওদাগরি আফিসে আমার জন্য একটা চাকরি যোগাড় করিলেন, মাসিক বেতন আপাততঃ ১৫ টাকা মাত্র। তখন আমার যেরূপ সাংসারিক কষ্ট, তাহাতে ১৫ টাকাই আমার পক্ষে ১৫ শত বলিয়া মনে হইল ; ইহার উপর এক গৃহস্থের বাটীতে একটি ছেলে পড়াইয়া প্রতিমাসে ১০ টাকা বেতনেরও যোগাড় হইল। এই ভাবে ৪।৫ বৎসর কাটিয়া গেল।

এই সময় একদিন হরিদাসীকে বলিলাম, "তুমি বলিয়াছিলে, আমার উপার্জ্জনের অর্থ হইতে তোমাকে জ্যাকেট সেমিজ কিনিয়া দিলে, তুমি ব্যবহার করিবে। এইবার তোমার জন্য জ্যাকেট সেমিজ কিনিয়া আনিব।" আমার কথা শুনিয়া হরিদাসী হাসিয়া বলিল "সেই ভাল, ১৫ টাকা বেতনের কেরাণীর স্ত্রী জ্যাকেট সেমিজ পরিয়া ধানের ঝুড়ি কাঁধে করিয়া ওপাড়া হইতে ধান ভাঙ্গিয়া আনিবে। বেশ মানাইবে, না?" আমি লজ্জায় যেন এতটুকু হইয়া গেলাম।

যাহা হউক, সুখে দুঃখে যে কোন প্রকারেই হউক, সংসার একরূপে চলিতেছিল, কিন্তু আমার অদৃষ্টে বুঝি তাহাও সহিল না। যে বৎসর আমার বেতন ১৫ টাকা হইতে ২৫ টাকা হইবে বলিয়া শুনিলাম ; সেই বৎসরই বঙ্গে স্বদেশী-আন্দোলন আরম্ভ হইল। আমাদের আফিসে বিলাতী বস্ত্র আমদানী হইত, সুতরাং আফিসের বিস্তর ক্ষতি হইল। বেতন-বৃদ্ধি দূরে থাকুক, আমাদের চাকরী থাকিবে কি না, এই ভাবনাই প্রবল হইল। অবশেষে একদিন আফিসে গিয়া সত্য সত্যই শুনিলাম - আমার চাকরী গিয়াছে। আমাদের বড় সাহেব আফিসের ১০।১২ জন বাবুকে জবাব দিয়াছেন, তাহার মধ্যে আমিও একজন। সাহেব অনুগ্রহ করিয়া আমাদের অতিরিক্ত এক মাসের বেতন দিয়া আমা-দিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। আমি পুনরায় পথের ভিখারী হইলাম।

সন্ধ্যার সময় বাসায় আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিলাম। রাত্রি

১০টার সময় আমার শিষ্য, বাটীতে আসিয়া আমাকে বলিলেন "আপনার কথা সমস্তই শুনিয়াছি। হতাশ্বাস হইবেন না; আমি অদ্যই তিন চারি স্থানে আপনার কথা বলিয়া রাখিয়াছি, একটা না একটা লাগিতে পারে।" আমি বুঝিলাম, তিনি কেবল আমাকে প্রবোধ দিতেছেন। ইহাও জানিতাম যে, স্বদেশী-আন্দোলনের জন্য তাঁহারও ব্যবসায়ে বিস্তর ক্ষতি হইতেছে। এরূপ অবস্থায় তাঁহার গলগ্রহ হইয়া বসিয়া থাকাও, যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিলাম না। আমি পরদিন বাটীতে গেলাম। হরিদাসীকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। সে নীরব হইয়া স্থিরভাবে সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিল—"পরমেশ্বর যাহা করেন, তাহা মঙ্গলের জন্যই করেন। তুমি কিছুমাত্র ভাবিও না। এই আন্দোলনে যেরূপ আমাদের বা রামজীবন বাবুর (আমাদের শিষ্যের) ক্ষতি হইল, সেইরূপ অনেকের লাভও হইবে। সুযোগ বুঝিয়া যদি চলিতে পার, তাহা হইলে আমাদের দুর্দ্দশা ঘুচিতে পারে।" দুই তিন দিন ধরিয়া আমাদের পরামর্শ হইতে লাগিল। হরিদাসীর কথাগুলি নিতান্ত অসার বলিয়া মনে হইল না; সুতরাং, আশার বুক বাঁধিয়া আমি আর একবার নূতন পথে অর্থোপার্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইলাম।

হরিদাসীর সহিত পরামর্শ করিয়া ব্যবসায় করিব স্থির করিলাম; কিন্তু ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলে মূলধন চাই, মূলধন কোথা? হরিদাসীর পিতার প্রদত্ত এবং আমার পিতার প্রদত্ত ৪।৫ শত টাকার অলঙ্কার ছিল, হরিদাসী সেই অলঙ্কার বিক্রয় করিতে বলিল। আমি তাহাতে কিছুতেই সম্মত হইলাম না, অবশেষে জনৈক প্রতিবেশীর নিকট ৮ বিঘা জমি বন্ধক রাখিয়া ৫০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করিলাম।

আমার মা ছিলেন না,—এক মাতুলানী আমাদের বাটীর কর্ত্রী। তিনি আবার মধ্যে মধ্যে পিত্রালয়ে গিয়া ৪।৫ মাস কাটাইয়া আসিতেন। হরিদাসীর সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলাম। হরিদাসীকেও তাহার পিতৃভবনে রাখিয়া আসিলাম এবং আমি অবশেষে পৈতৃক বাটীতে তালা চাবি দিয়া সেই পাঁচ শত টাকা লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলাম।

(৩)

রামজীবন বাবুকে আমার সঙ্কল্পের কথা জ্ঞাপন করিলাম। শুনিয়া তিনি আনন্দপ্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু তিনি একজন ব্যবসায়ী; সুতরাং পূর্ব্ব

হইতে ক্ষতি সহ্য করিবার জন্য মনকে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন "আমি বস্ত্রের ব্যবসায় করিয়া বৃদ্ধ হইয়াছি, বস্ত্রের ব্যবসায়ের কথাই বলিতে পারি। এখন বিলাতী বস্ত্রের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া বাতুলতামাত্র। যদি স্বদেশী বস্ত্রের ব্যবসায় করিতে পারেন, তাহা হইলে বোধ হয়, ক্ষতি না হইতেও পারে।"

রামজীবন বাবুর পরামর্শে আমি বহুবাজার ষ্ট্রীটে একখানি ক্ষুদ্র ঘর ভাড়া লইলাম এবং হাওড়ার হাট হইতে তিনশত টাকার দেশী কাপড় ক্রয় করিয়া আনিয়া দোকান সাজাইলাম। বলা বাহুল্য—এই সকল কার্য্যে রামজীবন বাবু আমার যথেষ্ট সাহায্য করিলেন।

তিন চারি দিনের মধ্যেই আমার সমস্ত বস্ত্র বিক্রয় হইয়া গেল। হিসাব করিয়া দেখিলাম, তিনশত টাকার বস্ত্র বিক্রয় করিয়া প্রায় ২০ টাকা লাভ হইল। ১৫ টাকা বেতনের কেরাণী এক সপ্তাহের মধ্যে ২০ টাকা উপার্জ্জন করিলাম, আমার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। পরবর্ত্তী হাটে পাঁচ শত টাকার বস্ত্র ক্রয় করিলাম। এবার প্রায় ৬০ টাকা লাভ হইল। প্রতি হাটেই ৪।৫ শত টাকার কাপড় ক্রয় করি, আর প্রতি সপ্তাহেই উহা বিক্রয় হইয়া যায়। তখন বঙ্গের গ্রামে গ্রামে স্বদেশীর বান ডাকিয়াছে। লোকে দেশী কাপড় পাইলে উহার মূল্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া অম্লানবদনে উহা ক্রয় করিতে লাগিল। আমার যাহা কিছু লাভ হইত, তাহার সমস্তই মূলধনে যোগ করিয়া ব্যবসায়ে খাটাইতে লাগিলাম।

এই সময় রামজীবন বাবুর পরিচিত কোন মাড়োয়ারি দালাল ব্যবসায়ে আমার উৎসাহ দেখিয়া, আমার বিশেষ সাহায্য করিলেন, তিনি আমাকে ২।৩ গাঁট স্বদেশী মিলের বস্ত্র ক্রয় করিয়া দিলেন। এই ২।৩ গাঁট বস্ত্র ৩।৪ দিনের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া গেল। আমার আর আহারনিদ্রায় অবসর নাই, দিবা-রাত্রি কেবল কাপড়ের ভাবনাই ভাবিতে লাগিলাম। মনে হইল, এই সময় যদি আরও ৪।৫ শত টাকা পাইতাম, তাহা হইলে বড় সুবিধা হইত; দেশী-মিলের ও তাঁতের উভয় প্রকার বস্ত্র এক সঙ্গে ক্রয় করিয়া রাখিতাম। অনাথের নাথ ভগবান্ আমার এ প্রার্থনা শ্রবণ করিলেন। পরদিন আমার সম্বন্ধীর নিকট হইতে একখানি রেজিষ্টারী পত্র পাইলাম। পত্র খুলিয়া দেখি, হরিদাসী পাঁচশত টাকা রেজিষ্টারী করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে। যখন আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় ছিল, আমি নিঃস্ব ছিলাম; তখন হরিদাসী অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া

আমাকে মূলধন দিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু আমি তাহা লই নাই। এখন আমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল; আমার দোকানের বেশ উন্নতি হইতেছে; সুতরাং এখন আমি টাকা লইব না কেন? আমি হরিদাসীর টাকা লইলাম; কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, হরিদাসীকে পাঁচসহস্র টাকার অলঙ্কার যতদিন দিতে না পারিব, ততদিন আপনাকে কিছুতেই অঋণী বলিয়া মনে করিব না।

দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর অতীত হইয়া গেল। দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি ১৫ টাকা বেতনে ফিরিঙ্গীর নিকট দাসত্ব করিতাম, এখন আমার দোকানে ৪।৫ জন লোক ১৫।২০ টাকা বেতনে চাকরী করিতেছে। সম্প্রতি পৈতৃক বাটীর জীর্ণসংস্কার করিয়াছি এবং বন্ধকী জমির উদ্ধার করিয়াছি। হরিদাসীর ঋণ-পরিশোধ এখনও করি নাই।

(৪)

তিন হাজার টাকার অলঙ্কার ও দুই হাজার টাকা নগদ লইয়া প্রায় আড়াই বৎসর পরে হরিদাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমি শ্বশুরবাটী যাত্রা করিলাম। আমার শ্বশুরবাড়ী যশোহর জেলার একটী পল্লীগ্রামে, হরিদাসী এতাবৎকাল পিত্রালয়েই বাস করিতেছিল। অবসর পাই নাই বলিয়া আমি এতদিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। সম্প্রতি রামজীবন বাবু আপনার বিলাতী কাপড়ের দোকান বন্ধ করিয়া আমার দোকানের অংশী হইয়াছেন, সেইজন্য তাঁহার উপর দোকানের ভার দিয়া আমি পত্নীসম্ভাষণে গমন করিলাম।

যথাসময়ে শ্বশুরবাটীতে উপস্থিত হইলাম। এখন আমি ধনবান্ জামাতা। যখন নির্ধন ছিলাম, তখনও শ্বশুরবাটীর কেহ আমাকে অনাদৃত করেন নাই; সুতরাং এখন আদর-আপ্যায়নের ত কথাই নাই। সন্ধ্যার পর হরিদাসীকে অলঙ্কারগুলি দিয়া পরিতে বলিলাম। হরিদাসী সহাস্যে বলিল "আমার গহনায় কাজ নাই, জ্যাকেট সেমিজ রুজ পাউডার কই?" আমি বলিলাম, "দোকান-দারের স্ত্রীকে সে সব পরিতে নাই, যখন কলেজের ছোকরা বাবুর স্ত্রী ছিলে, তখন সে সকল পরিলে শোভা পাইত। এখন বাউটি সুটের গহনা ও বারাণসী সাড়ীই তোমায় শোভা পায়।"

মনে করিয়াছিলাম, এইখানেই আমার কাহিনী শেষ করিব; কিন্তু আর একটা কথা না বলিলে, আমার হরিদাসীর কথা যেন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সেইজন্য সে কথাটা বলিয়া, আমার কাহিনী শেষ করিব। হরিদাসীকে লইয়া বাটীতে আসিবার সময় পথিমধ্যে এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব ঘটনা সংঘটিত হইল।

শ্বশুরবাটীতে আহারাদি শেষ করিয়া, বেলা দশটার সময় আমরা গরুর গাড়ীতে আরোহণ করিয়া, ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিলাম। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সাত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া, আমরা ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। ফাল্গুনমাসের অপরাহ্ণ—শীত বেশ ছিল। আমি একখানা বালাপোষ গায়ে দিয়াছিলাম, আর হরিদাসী আমার লাল রঙ্গের বনাতখানা মুড়ি দিয়াছিল। সে সেই লাল কস্তাপাড় শাড়ী ও সিন্দূরের টিপের মায়া, এখনও পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।

ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, দুইটি "বাবু" এবং তিনটি রমণী ষ্টেশনে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা আমার বালাপোষ এবং হরি-দাসীর লাল বনাত দেখিয়া ঈষৎ নাসাকুঞ্চন করিলেন; কারণ বাবুদের গায়ে অলষ্টার এবং সেই রমণীদিগের পায়ে জুতা ও মোজা ছিল। গাড়ী থামিলে, হরিদাসী সেই রমণীযুগলের সহিত স্ত্রীলোকদিগের কক্ষে প্রবেশ করিল। আমি বাবুদ্বয়ের সহিত পুরুষদিগের কক্ষে আরোহণ করিলাম।

রাত্রি আন্দাজ দশটার সময় স্ত্রীলোকদিগের কক্ষে একটা বিষম গোল-মাল হইল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য, আমরা সকলেই অত্যন্ত ব্যস্ত হইলাম। চারি পাঁচ মিনিটের পর গোলমাল থামিয়া গেল। পরবর্ত্তী ষ্টেশনে গাড়ী উপস্থিত হইবামাত্র, আমরা সকলে রমণীদিগের কক্ষের অভিমুখে ধাবিত হই-লাম। দেখিলাম, একটা ফিরিঙ্গী রক্তাক্ত বদনে রমণীদিগের কক্ষ হইতে অবতরণ করিয়াই, একদিকে বেগে পলায়ন করিল; কিন্তু ষ্টেশনের ৪।৫টা লোক তাহাকে তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফেলিল। পরে জানিতে পারিলাম—ঐ দুর্বৃত্ত, রমণীদিগের কক্ষে প্রবেশ করিয়া, সেই জুতা-মোজা-পরিহিতা রমণীদিগের সহিত প্রেমালাপ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। হরিদাসী এককোণে বসিয়াছিল। সে যখন দেখিল, দুর্বৃত্তটা সেই রমণীদিগের গাত্রস্পর্শ করিবার উপক্রম করিল, তখন সে সহসা গাত্রোত্থান করিয়া সবলে "হারামজাদা" বলিয়া ফিরিঙ্গীটার পীঠে এক ভীষণ পদাঘাত করে। সেই এক আঘাতেই পাপিষ্ঠ পড়িয়া যায়। তাহার নাসিকা দিয়া অজস্র ধারায় শোণিতস্রাব হইতে থাকে।

ফিরিঙ্গীটাকে রাত্রিকালে রমণীদিগের কক্ষে দর্শন করিয়া, সেই দুইজন রমণী যত না ভীত হইয়াছিলেন, বনাতমণ্ডিতা শাঁখা-সিন্দূর-ধারিণী পল্লীগ্রাম-বাসিনী উত্তেজিতা রমণীর সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দর্শন করিয়া, তাঁহারা ততোধিক বিস্মিত হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

পুলিশ যখন সেই পশুপ্রকৃতি ফিরিঙ্গীটাকে ধরিয়া লইয়া যায়, তখন সে একবার হরিদাসীর দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক মাথার টুপি খুলিয়া বলিল—

"Served right madam, capital for a native woman."

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

স্বপ্ন-প্রসঙ্গে।

স্বপ্ন যে, মানবজীবনে এক জটিল রহস্য—তাহা সকলেই জানেন; কিন্তু স্বপ্ন অলীক বা মিথ্যা নহে—তাহার আমি অনেক প্রমাণ দিতে পারি। যাঁহারা এই সকল বিষয়ে একটু লক্ষ্য রাখেন, তাঁহারা জানেন, স্বপ্নগুলি একেবারে মিথ্যা নহে। এক একটি—স্বপ্ন মানুষের হাতে হাতে ফলিয়া যায়। এসম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আত্মার সুষুপ্তি অবস্থায় সূক্ষ্ম আত্মার আবির্ভাব হয়। অন্তর্জগতে ইন্দ্রিয়গণ তখন নিজকার্য্য করে।

পনের বৎসর পূর্ব্বে আমার পুত্র রামগোপাল যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন আমার ভ্রাতারও একটি পুত্র হয়। ৬।৭ দিন অন্তর আমি এবং আমার ভ্রাতৃজায়া উভয়েই পুত্র প্রসব করিলাম।

ঈশ্বরেচ্ছায় আমার পুত্রটি দিন দিন সুস্থকায় ও সবল হইতে লাগিল, ভ্রাতার পুত্রটী নানারোগে অভিভূত হইল। যখন তাহার অবস্থা শোচনীয় হইল, আমার মাতাঠাকুরাণী পার্শ্বস্থিত কক্ষে শয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। পার্শ্বস্থ কক্ষে ভ্রাতৃজায়া সন্তানটি লইয়া শয়ন করিয়া আছেন—নিকটে দাসীও ঘুমাইয়া আছে, হঠাৎ রাত্রি দুইটার সময় মাতাঠাকুরাণী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সেই গৃহে আসিয়া বলিলেন,—"বৌমা তোমার ছেলে কই? আমি এই মাত্র স্বপ্ন দেখিলাম, দুইজন ভীষণাকার রক্তবস্ত্রপরিহিত লোক তোমার ছেলে লইয়া যাইতেছে—তাহারা যেন আমায় সরোষ ভ্রূকুটি করিল।" এই কথা বলিয়া মাতাঠাকুরাণী শিশুর নিকট গিয়াই দেখিলেন—শিশু মৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। তখন সকলে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন।

আর একবার আমার বয়স তখন দশ বৎসর। মাতাঠাকুরাণী সূতিকাগারে একটী কন্যা প্রসব করিলেন। ৮।১০ দিন মধ্যে কন্যার সূতিকাগারে পীড়া হইল। তাহার পীড়ার পূর্ব্বে মাতা রাত্রিতে মৃত আত্মীয়ের মূর্ত্তি স্বপ্নে

দর্শন করিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। সেই মৃতাত্মা, যেন শিশুকে কোলে লইয়া চলিয়া গেল। ঐদিন শিশুর মৃত্যু হইল। এই প্রকার ৩।৪টী শিশুসন্তান তাঁহার সূতিকাগারে মারা যায়। তিনি গর্ভাবস্থায় ও সূতিকাগারে সেই মৃত আত্মীয়ের সর্ব্বদা দেখা পাইতেন এবং ভয় পাইয়া চীৎকার করিতেন। ৩।৪ টি শিশু নষ্ট হইয়া যাওয়ায় অনেক রাম-কবজাদি ঔষধধারণে তাঁহার সন্তানরক্ষা হয়।

দুইবৎসর হইল হুগলীর স্বনামখ্যাত কবিরাজ নৃপেন্দ্রকুমার রায়ের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি এবং ইঁহার স্বর্গগত পিতা চিরদিন আমাদের চিকিৎসা করিতেন। আমাদের পিতৃপিতামহের আমল হইতে চিরকাল ইঁহারা চিকিৎসা করিতেছেন। তিনি আমাদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহার যেদিন মৃত্যু হইয়াছিল, আমরা তাহার বিন্দুবিসর্গ জানি না; কিন্তু হঠাৎ স্বপ্ন দেখিলাম, তিনি যেন নৌকারোহণে কোথায় যাইতেছেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বিস্তর আস্‌বাব দ্রব্যাদি রহিয়াছে, তিনি বলিতেছেন—"আমি অনেক দূর যাইতেছি; এখন আর ফিরিব না।' তোমরা সাবধান থাকিও।" তাহার পরদিন সংবাদ পাইলাম, কবিরাজ নৃপেন্দ্রকুমার রায় ঐ দিন মারা গিয়াছেন। স্বপ্ন দেখিয়া তাঁহার মৃত্যুসংবাদ আগেই সকলকে জানাইয়াছিলাম।

শ্রীরত্নমালা দেবী।

পরশ-পাথর।

(ভক্তমাল।)

চর্ম্মকার-কুলে জন্ম লভেছিল
ভক্ত সাধু রুইদাস,
জীবিকার তরে পাদুকা-নির্ম্মাণ
করিত সে বার-মাস।
বড় ক্লেশে তার চলিত সংসার;
তবু নিত্য সাধুজনে
করিত সে সেবা, সদা ভগবানে
ডাকিত একান্ত মনে।

একদিন প্রভু আসি' ছদ্মবেশে
কহিলেন—"রুইদাস,
আসিয়াছি আমি ইষ্টদেব তোর
পূরাইব তোর আশ।
দারিদ্র্য ঘুচাতে এ পরশ-মণি
দান করিলাম তোরে।"
কহে রুইদাস "পাথর আনিয়ে
ভুলাইতে চাহ মোরে।"
প্রভু কহে "লোহা সোণা হয় এর
পরশে নিমেষ-মাঝে।"
কহে রুইদাস "প্রভু, এ আমার
লাগিবে কিসের কাজে।"
ছুরিখানি তার তুলি' লয়ে প্রভু
রাখিলা মণির গায়,
দেখিতে দেখিতে লোহার ছুরিকা
হিরণ্ময় হয়ে যায়।
"যে অস্ত্রে আমার জীবিকা-অর্জ্জন"—
রুষ্ট রুইদাস কয়—
"সোণা করি' তারে কেন তুমি মোর
করিলে এ অপচয়?"
"যত খুসি, সোণা পাবে এই মত"
—বলি' প্রভু গেলা চলে'।
কহে রুইদাস— "স্বর্ণময় ফাঁসী
পরিব না আমি গলে।"
কুটীরের চালে রাখি' সেই মণি,
সোণার ছুরিকা লয়ে,
নিজ-কর্ম্মে পুনঃ রত রুইদাস
মুখে হরিনাম গেয়ে।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ

প্রাচীন ভারতের প্রেম।

পশ্চিমের রুদ্ধ অর্গল খুলিয়া প্রতীচ্য সভ্যতার স্রোতঃ, যখন ভারতের নির্জ্জীব বক্ষে প্রবাহিত হইল, তখন ভারতবাসী আকস্মিক উত্তেজনাবশে তাহার অপরাহত তরঙ্গমধ্যে যে রত্নরাজি উপলখণ্ডের ন্যায় নিক্ষেপ করিল, অতল নীরের গভীর পঙ্করাশির মধ্য হইতে, কে জানে—তাহার উদ্ধারসাধন আবার হইবে কি না? সমাজের ভিতর যখন একটা পরিবর্ত্তনের স্রোতঃ বহিতে থাকে, তখন তাহা বায়ুসঞ্চালিত বহ্নিবৎ নিমেষের মধ্যে অতি বিস্তৃত ভাবে ছড়াইয়া পড়ে এবং নিম্নাভিমুখী জলধারা যেরূপ রোধ করা যায় না, সেই-রূপ সেই জনসমূহের সবিস্ময় চিত্তবেগকে কিছুতেই শাসন ও যুক্তির কশাঘাতে নিবারিত করা যায় না।

অনুরাগের ভিতরও শান্তি আছে। যে স্বভাবসিদ্ধ আকর্ষণের বশে মানব-চিত্ত পুরাতনের প্রতি আকৃষ্ট হয়, সেই স্বভাবসিদ্ধ নিয়মের বশেই আবার বিরাগের সঞ্চার হইয়া থাকে। যুগ-যুগান্তর হইতে ত্যাগে দীক্ষিত ও কৃচ্ছ্র-সাধনে অভ্যস্ত দীন ব্রতধারীর এই প্রাচীন দেশের পার্শ্বে যখন প্রতীচ্যের ঐশ্বর্য্য-ঝলসিত বিলাসকলার উৎকট ভোগাড়ম্বর সন্নিবেশিত হইল, তখন অকস্মাৎ তাহার জীর্ণ চীর-বাস হইতে ধূলি-ধূসরিত আকাঙ্ক্ষা সজীব হইয়া উঠিল এবং বৈরাগ্যের ভস্মরাশির উপর লালসার মৃত্যুহীন বীজ, প্রলোভনের সলিলোৎসে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। উদীচ্য বৃত্তে আরোহণ করিয়াও, সূর্য্য, যেরূপ মহীরুহ দ্বারা আবৃত হন, ভারতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানও তদ্রূপ সেই নবোদ্‌গত তরুর বিব-র্দ্ধিত শাখাপ্রশাখার অন্তরালে আবৃত এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের নিষ্কলঙ্ক স্বর্ণযুগ অস্তমিত হইল। এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যার উচ্চ শিখর হইতে স্খলিত হইয়া ভারতবর্ষ যখন অতল গহ্বরে অন্ধের ন্যায় পথ খুঁজিতেছিল, তখন য়ুরোপ তাহার হস্ত ধারণ করিল এবং ভারতবাসী আপনার ছায়ামণ্ডিত তরুতল ত্যাগ করিয়া বৈদেশিক জনপদের অনাবৃত সূর্য্যতাপে উত্তাপিত হইল।

তদবধি এই ভারতভূমির কত না পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাহার আচারে, তাহার ব্যবহারে, তাহার সামাজিকতায়, তাহার শিক্ষায়—এমন কি, তাহার

প্রেমে কত না পরিবর্ত্তন অনুভূত হইয়াছে! য়ুরোপ সখ্যভাব-প্রধান দেশ। সাম্য তাহার বীজমন্ত্র; কিন্তু ভারতবর্ষ প্রেমকে শুধু সাম্যের আসন দিয়াই নিবৃত্ত হয় নাই, আপনাকে তাহার পদতলে ধূলির মত লীন করিয়াছে এবং তাহা হইতে যে অর্চ্চনার ভাব স্ফুরিত হইয়াছে, তাহা মানুষকে দেবতা গড়িয়াছে, অপবিত্র ভাবকে শুদ্ধসত্ব করিয়াছে, মৃত্যুকে অমরত্বে অভিষিক্ত করিয়াছে। প্রাচীন ভারতের প্রেম? সহস্রদল পুষ্পের সৌরভের মত তাহা হৃদয়ের অন্তস্থলে গোপনে থাকিত, সপ্তমহল প্রাসাদের ভিতর সতর্ক প্রহরি-বেষ্টিত অসূর্য্যম্পশ্যা রাজদুহিতার ন্যায় তাহা অবরোধে থাকিত। ভূগর্ভস্থিত অতুল রত্নরাজির মত তাহা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিত। এমনই করিয়া মর্ম্মকোষের ভিতর তাহার জন্মদান করা হইত বলিয়া,হয়তো তাহা জীবকোষের সমস্ত প্রাণশক্তিতে এমন করিয়া পরিপুষ্ট ও সতেজ হইয়া উঠিত যে, অকস্মাৎ যখন একদিন তাহা কঠিন দুঃখের কঠোর সংর্ঘষণে উপস্থিত হইত, তখম তাহা হইতে এমন এক দিব্যজ্যোতিঃ, বাহির হইত, যাহা বিশ্ববাসীর চিত্তকে বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় অভিভুত করিয়া দিত। এইখানে কথাটা আর একটু স্পষ্ট ভাবে বলা যাক্ —ঐ গভীর দ্বিপ্রহর নিশায় সুপ্তিমগ্ন পৌরবাসীর মধ্য দিয়া অবগুণ্ঠিত তরুণী বেপমান কোলাহলাকুলিতচিত্তে স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিতেছে। লোকাবগতির ভয়ে সে, চরণের মুখের সিঞ্জিনী খুলিয়া লইয়াছে, তাহার কম্পমান হস্তে দীপশিখা, বায়ুতাড়নায় কাঁপিয়া উঠিতেছে। ধীরে অতি ধীরে, আনত নেত্রে পল্লবের ভিতর সমস্ত হৃদয়াবেগ আবৃত করিয়া সে কক্ষে পদক্ষেপ করিতেছে; প্রিয়তমের অভিলষিত চক্ষু হইতেও সে আপনাকে অন্তরাল করিবার প্রয়াস পাইতেছে! হইতে পারে, ইহা বর্ব্বরতার পরিচায়ক. কিন্তু তথাপি এই লজ্জাতুর নারীহৃদয়ের মধ্যে প্রেমের যে অপরাজেয় অপরাহত শক্তি অন্তর্নিহিত বহ্নির মত গুপ্ত ছিল, তাহা তাহাকে পৃথিবীর সমগ্র জাতির উপর কালের সমস্ত ধ্বংস-স্তূপের উপর মৃত্যুর অন্ধকার-যবনিকার উপরে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী-প্রতিমার মত স্থাপিত করিয়াছে। স্বামীর মৃত দেহ অঙ্কে করিয়া সাধ্বী ভারতনারীর সেই অপূর্ব্ব উল্লাসপূর্ণ মূর্ত্তি কোথায় কোন দেশে কোন সমাজে দৃষ্ট হইয়াছে কি? প্রেম পরশ-পাথর বলিয়া উক্ত হইয়াছে —এ কথা বলা বোধ হয়, অত্যুক্তি হইবে না যে, ভারতবর্ষ একা তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বহ্নিশিখাকে যে প্রেম শীতল উশীরানুলেপে পরিবর্ত্তিত করে, দারুণ ভয়াবহ মৃত্যুকে সুহৃদের স্নেহস্পর্শে রূপান্তরিত করে, সে প্রেম কি প্রেম? পক্ষান্তরে সভ্যতাগর্ব্বিত পাশ্চাত্য ভূমিতে এই প্রেমের কি মূর্ত্তি? ভোগের মূল্যে ও রূপের পণ্যে যে প্রেম বিক্রীত হয়,—শিশুর ক্রীড়াকন্দুকের ন্যায় যে প্রেম পথের ধূলিতে সুখলিপ্সা দ্বারা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ও প্রহত হয়, সে প্রেম কি প্রেম? যেখানে Feirtalion নামক যে একটি অপূর্ব্বকলার অনুশীলন হইয়া থাকে, আমাদের শুদ্ধিপরায়ণা গৃহলক্ষ্মীগণের সম্মুখে তাহার একটী চিত্র ধরিলে তাঁহারা তাহাকে কি সংজ্ঞায় অভিহিত করেন, বলিতে পারি না।

অনেকে হয়তো মনে করিতেছেন,—আমি "প্রাচীন ভারতের প্রেমে"র দোহাই দিয়া পরচর্চ্চানামক একটি অবৈধ বিষয়ে হস্তার্পণ করিতেছি; কিন্তু এ পরচর্চ্চা নহে—ব্যাধিচর্চ্চা। ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ হইতে ভারতের নির্জ্জীব শিরায় Corruption (ধ্বংসের) বীজ, সংক্রামক ব্যাধির মত প্রবেশ করিতেছে, ধমনী ছিন্ন করিয়া সে বিষাক্ত রক্ত সমাজের দেহ হইতে বাহির করিয়া ফেল; নহিলে আজ যাহা অংশবিশেষে আছে, কাল তাহা সর্ব্বত্র ছাইবে। এইরূপে আজ যে তড়িৎপ্রবাহ তাহাকে প্রথম চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, তাহা সচ্ছিদ্র কুম্ভে বারি-রক্ষার ন্যায় অনতিবিলম্বে বিগলিত হইবে এবং অধঃপতনের অতলস্পর্শ গহ্বর, তাহার নিম্নে মুখব্যাদান করিবে।

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

দুঃখিনী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রমানাথের আর কোন গুণ থাকুক, আর নাই থাকুক, লোকের সঙ্গে মিশিতে সে বড় তৎপর। শ্রীহট্টে যাইয়াই নিজের মত চরিত্রের লোকের সঙ্গে তাহার খুব পরিচয় এবং সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কৈলাস নামে একজনের সঙ্গে রমানাথের বড় বন্ধুত্ব হইল। যেদিন শুনিল যে, তাহাকে বাড়ী পাঠাইবার কথা হইতেছে, সেইদিনই রমানাথ কৈলাসের নিকট উপস্থিত হইল এবং যে যে ঘটনা হইয়াছিল, সমস্ত তাহাকে ভাঙ্গিয়া বলিল। কৈলাস সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিল—"হাঁ তাই তো, তবে দেখছি, তুমি আমাদের ছাড়িয়া যাইতেছ।"

রমা। আর কি কোন উপায় নাই?

কৈলাস। তা থাকবে না কেন? তবে কি জান—তুমি ভাল মানুষ, তোমার দ্বারা কিছু হয় না।

রমা। দেখ ভাই! আমাকে তুমি যা বোলবে, তাই করবো, এখান থেকে গেলে আমার চলবে না। দেখ, বাড়ীতে এত সুখে থাকা যায় না। বিশেষ আর কয়েকদিন থাকলেই একটী চাকরীর সম্ভাবনা। চাকুরী হইলে আর আমায় পায় কে।

কৈলাস। একটী উপায় আছে। কোন প্রকারে তোমাদের বৌয়ের উপর তোমার দাদার সন্দেহ জন্মাইয়া দিতে পারিলেই হয়। তা হলেই তোমার দাদা তোমাকে আর পাঠাইবেন না।

রমা। সে বড় শক্ত কথা। দাদা বৌকে বড় ভাল জানেন, আর বৌয়ের বিরুদ্ধে কিছু করিলে দাদা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন—এ আমার কাজ।

কৈলাস। আরে আমি যা বলি, তা কোরলে কেউ জান্‌তে পারবে না। তোমাদের বাড়ীর পাশে যে ডাক্তার বাবু আছে, সে তোমাদের বাড়ীতে প্রায়ই যায়, বৌয়ের ব্যারাম হইলে দেখে শুনে, তোমার দাদাও তাকে খুব বিশ্বাস করেন, তাঁরি সঙ্গে বৌয়ের একটা বদ্‌নাম দিয়ে একখানা পত্র লিখিলেই ব'স্।

রমানাথ অনেকক্ষণ চিন্তা করিল। বোধ হয়, তাহার মনের মধ্যে সুমতি আর কুমতির বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিল; কিন্তু অবশেষে কুমতিরই জয় হইল। পাড়ার একজন লোকের দ্বারা ডাক্তার বাবুর জবানি একখানি পত্র, বৌয়ের নামে লিখাইয়া লইল এবং সেখানি ডাকে দিয়া আসিল। যথাসময়ে পত্র আসিয়া পৌঁছিল। পত্রাদি আসিলে বাহিরে চাকরের নিকট থাকে। বাবু, বাটীতে আসিলে তিনিই সমস্ত পত্র দেখেন এবং দুঃখিনীর পত্রও নিজে খোলেন। দুঃখিনীর ইহাতে আপত্তি ছিল না, কারণ স্বামীর নিকট হইতে গোপন করিবার তাহার কিছুই ছিল না; কিন্তু সেদিন বাবুর নামে অন্য চিঠি ছিল না, কেবল দুঃখিনীর নামেই একখানি পত্র। রমানাথ চাকরকে পত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। চাকর পত্র দেখাইল, রমানাথ বলিল "বৌ বলেছেন, যে তাহার পত্র যেন আর, বাবুর হাতে না পড়ে; তুই বৌকেই পত্র দিয়া আসিস্"।

অপরিচিত হস্তাক্ষর দেখিয়া দুঃখিনী ঠিক্ করিতে পারিল না এ কাহার পত্র;

কারণ দুঃখিনীর পিতা অথবা রসিক, তাহাকে পত্র লেখে, দুঃখিনী তাহাদের হাতের লেখা চেনে,এ তাহাদের হাতের লেখা নহে। পরক্ষণেই ভাবিল, হয়তো বাবার কোন ব্যারাম হইয়াছে, তাই তিনি নিজ হাতে লিখ্‌তে পারেন নাই, অন্যের দ্বারা লিখাইয়াছেন। এই মনে করিয়া তাড়াতাড়ি পত্র খুলিল; কিন্তু যাহা পড়িল, তাহাতে তাহার আত্মা, অস্থির হইয়া পড়িল; নিজেকে অপবিত্র জ্ঞান করিতে লাগিল; চুপ্ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এ বিষম পত্র কে লিখিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। আমরা সে পত্রে কি ছিল, তাহা সবিশেষ বলিতে চাহি না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, পত্রখানির ভাব বড় কদর্য্য। দুঃখিনী একবার মনে করিল, পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলে; কিন্তু স্বামীকে না দেখাইয়াই বা ছিঁড়িবে কি প্রকারে, আবার এ প্রকার কুৎসিত পত্রই বা স্বামীকে দেখায় কি প্রকারে? যদি স্বামী সত্য সত্যই সন্দেহ করেন, যদি স্বামী মনে করেন, পত্রে যে সমস্ত কথা লেখা আছে, সমস্তই সত্য—তাহা হইলে দুঃখিনীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে, তাহা হইলে দুঃখিনীর জীবন থাকিবে না। শেষে দুঃখিনী স্থির করিল—"স্বামী যাহাই মনে করুন, আমি এ পত্র তাঁহাকে দেখাইব, আমার এ কষ্টের কথা তাঁহাকে না বলিয়া কাহাকে বলিব? কে আমার এমন শত্রু হইল, তিনি হয় তো স্থির করিতে পারিবেন। আর যদি তিনি আমাকে সন্দেহ করেন,—জগদীশ্বর আমাকে রক্ষা করিও। আমার স্বামী যেন অন্য কিছু না ভাবেন। হে হরি! আমার মনের কথা সব জান। আমার স্বামী যদি একটু কুবিশ্বাস করেন, তবে আমি কোথায় দাঁড়াইব।" দুঃখিনী অনেকক্ষণ চিন্তা করিল, অনেক ভাবিল এবং নিজে নিজেই বলিতে লাগিল, "যদিই তিনি আমাকে সন্দেহ করেন, তবে এ প্রাণ রাখিব কেন? যে স্ত্রী, স্বামীর সন্দেহ উৎপাদন করিতে পারে, সে স্ত্রীর জীবনের দরকার কি? যে, স্বামীর হৃদয়ের সহিত নিজের হৃদয় মিশাইতে পারে নাই, তাহার বাঁচিবার প্রয়োজন কি?" দুঃখিনী আশ্বস্ত হইল। ভজহরি বাটীতে আসিয়াই দুঃখিনীর মুখ বিষণ্ণ দেখিলেন। দুঃখিনী নিজের কষ্ট ঢাকিবার অনেক চেষ্টা করিল; কিন্তু ঢাকা পড়িল না। দুঃখিনী কাঁদিয়া সমস্ত কথা ভজহরিকে বলিল। ভজহরি নির্ব্বোধ ছিলেন না, তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, অবশেষে স্থির করিলেন, এ কাণ্ড রমানাথের। পরদিন প্রাতঃকালেই ভজহরি, রমানাথকে বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। রমানাথ, বৌয়ের উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বাটী গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এই ঘটনার পর কয়েক বৎসরের মধ্যে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই। এ বৎসর পূজার সময় ভজহরি, তিন মাসের বিদায় লইয়া সপরিবারে বাটীতে আসিলেন। এতদিন পর্য্যন্ত দুঃখিনী নিকটেই ছিল। এ দিকে রসিক, গ্রামের কতকগুলি অকর্ম্মণ্য ছেলের দলে প্রবেশ করিয়াছে। লেখা-পড়া ছাড়িয়া দিয়া এখন কেবল দিবারাত্র আমোদ-আহ্লাদেই সময় কাটায়। নানাপ্রকার কুকার্য্যে তাহার বড়ই আসক্তি। একমাত্র ছেলে বলিয়া রামসত্য বড়ই আদর করিতেন; কাজেই ছেলের এ অবস্থা দেখিয়া দুঃখিত হইলেন; কিন্তু ছেলেকে কিছুই বলিতে পারেন না। মধ্যে মধ্যে রামসত্য, দুঃখিনীকে রাগ করিয়া পত্র লিখিতেন। দুঃখিনী বেশ বুঝিয়াছিল যে রামসত্যের দোষেই রসিক, এমন খারাপ হইয়া গিয়াছে। দুঃখিনী বাটীতে আসিয়া, পিত্রালয়ে যাওয়ার অভিপ্রায় স্বামীকে জানাইল। ভজহরি, দুঃখিনীর কোন কথায় কখনও অমত করেন নাই। দুঃখিনীর ন্যায় সুশীলা এবং বুদ্ধিমতী স্ত্রী, কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে। ভজহরি, নিজের অদৃষ্টকে ধন্য বলিয়া মানিতেন। দুঃখিনী পিত্রালয়ে যাইয়া দেখেন, এখনো দিদিমা (বাপের পিসী) ঘর আলো করিয়া আছেন। দুঃখিনীকে দেখিয়া রামসত্য বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। কত দুঃখের কথা, কত সুখের কথাই হইল। বৃদ্ধ রামসত্য, রসিকের কথা অনেক বলিলেন, দুঃখিনী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিনা বাক্য-ব্যয়ে সমস্ত শুনিল, কিন্তু অবশেষে থাকিতে না পারিয়া, বলিল ঃ—বাবা! তোমার জন্যই ছোঁড়ার কিছু হইল না।

বা। কেন মা, আমি তার কি করিতেছি।

দুঃ। বাবা! তুমি রাগ কোরো না, মনে কষ্ট কোর' না। তুমি যদি অমন কোরে' আদর না দিতে, তা'হলে কি ও বিগড়ে যায়।

বা। মা! তুমি কি বুঝিবে! যদি ছেলের মা হও, তবে বুঝিবে—সন্তান কি আদরের জিনিস! আমার এমন পোড়া অদৃষ্ট যে, তা বুঝি আর দেখা হয় না।

দুঃ। বাবা! আমি কি ভালবাস্‌তে বা আদর কোর্‌তে বারণ করি? তবে কি জান—ছেলে-পিলেকে যেমন আদর কোর্‌তে হবে, তেমনই লেখা-পড়ার জন্যে চেষ্টা করিতে হইবে।

বা। তা তো জানি; কিন্তু মা! আমি বুড়ো মানুষ! ঐ মাত্র একটী সন্তান। কি জানি, কি বোল্‌বো আর বাছা, আবার কোথায় চোলে যাবে।

জান না? সেদিন ওপাড়ার হরিশ সেন তার ছেলেকে মেরেছিল; তার আর ঠিকানা নাই। এখন তারা হায় হায় কোরে বেড়াচ্ছে।"

দু। তা ছেলে-পিলের এমন চোলে যাওয়া অভ্যাসই বা হবে কেন? আচ্ছা বাবা! আমাকে এবার আর সিলেট যেতে হবে না। তুমি দেখো, আমি রসিককে শোধরাইয়া দিব।

রা। তা বেশ ত। তুমি দেখ—যদি ওকে ভাল করিতে পার। আমি তো মা! অনেক চেষ্টা করেছি।

দু। ও যে এমন কোরে বেড়ায়, মদ গাঁজা খায়, টাকা পায় কোথায়?

রা। আমি তা কি কোরে জান্‌ব। আমার যে অবস্থা, তাতো জানই; তুমি মাসে মাসে যে কয়টী টাকা পাঠাও, তাতেই কোন রকমে আমি সংসার চালাই। যে জমিটুকু আছে, তার উপর নির্ভর কর্‌লে ত সবই হয়। তা আর ওকে আমি টাকা দেবো কোথা থেকে।

দুঃ। বাবা, দেখ ওর জন্য বড় কষ্ট পেতে হবে। যখন তুমি টাকা-পয়সা দাও না, বা ও নিজেও রোজগার করে না, তখন অবশ্যই ওকে চুরী কর্‌তে হয়।

এই প্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় রসিক, বাটীতে আসিল। সে দুঃখিনীকে দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইল এবং তাহাকে একটী প্রণাম করিল।

রসিক। তা দিদি! তুমি কবে সিলেট থেকে এসেছ?

দু। কেন, তুমি এ খবর রাখ না? আমি তো বাবাকে পত্র লিখেছিলাম।

রসি। বাবা ক' দিন বলেছিলেন বটে যে, তুমি বাড়ী আস্‌বে—তা বেশ হোয়েছে। দিদিমার জ্বালায় আর বাড়ীতে থাকা যায় না। আর বাবা তো কেঁদেই বাঁচেন না।

দু। ছি! রসিক বাবাকে কি অমন কথা বল্‌তে আছে। তুমি না লেখাপড়া শিখেছ? পড় নাই,—"পিতা আকাশ অপেক্ষাও উচ্চ"। তা যাও; খাওয়া দাওয়া কর গিয়ে।

রসিক ঘরে যাইয়া কাপড় রাখিয়া দিদির উপর রাগ করিতে আরম্ভ করিল। দুঃখিনী রসিকের ভাব দেখিয়া অবাক্! যে রসিককে সে তিন বছরের সময় হইতে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, মার মৃত্যুর পরে যে রসিককে

দিবারাত্রি কত কষ্টে দুঃখিনী পালন করিয়াছে, আজ সেই রসিকের ব্যবহার দেখে' দুঃখিনী, বড়ই ব্যথিত হইল। তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। রামসত্য কার্য্যান্তরে উঠিয়া গেলেন। দুঃখিনী একাকিনী বসিয়া সমস্ত কথা ভাবিতে লাগিল। মায়ের কথা মনে পড়িল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া দুঃখিনী স্থির করিল, যেমন করে' হউক রসিককে সুপথে আনিতে হইবে। মনে মনে ভাবিল "কত লোক ভাল হইয়াছে, কত লোক শোধরাইয়াছে। পুরাণে পড়িয়াছি বাল্মীক মুনি আগে ডাকাত ছিলেন। সে দিন একখানি বাঙ্গালা বহিতে একজন সাহেবের চরিত্রের কথা পোড়েছি। তারা কত খারাপ ছিল, কেউ বা মায়ের নিকট একটী কথা শুনিয়া ভাল হোয়েছে, কেউ বা হঠাৎ একটী কথা শুনে ভাল হইয়াছে। আর রসিক আমার আপনার মায়ের পেটের ভাই! হাজার হোক রক্তের সম্বন্ধ আছে। আমি যদি রসিকের ভ্রম বুঝাইয়া দিই, তাহা হইলে কি সে বুঝিবে না? অবশ্যই তাহাকে বুঝিতে হইবে। দেখি, আমি রসিককে ভাল করিতে পারি কি না।"

এই সমস্ত কথায় দুঃখিনীর হৃদয়ে বল আসিল; তাহার মন আরও দৃঢ় হইল। তাহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি আরও প্রশস্ত হইল। দুঃখিনী এত দিন ধরিয়া যে পড়িয়াছিলেন—কেমন করিয়া মানুষকে সৎপথে আনা যায়; কেমন করিয়া মানুষ ধার্ম্মিক হয়—সে সেই সকল কথা পরীক্ষা করিবার জন্য কৃত-সংকল্প হইল। সে দিন আর সে রসিককে কিছু বলিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

একদিন সন্ধ্যার পরে সকলের আহার হইয়া গিয়াছে; কিন্তু রসিক এখনও বাটীতে আসে নাই। শোবার ঘরের মেজেয় রসিকের আহারের দ্রব্য রাখিয়া দুঃখিনী বসিয়া আছে, ঘরের দুই পাশে দুইখানি চৌকি। এক-দিকের চৌকির পাশে একটী সেকেলে উঁচু সিন্দুক। রামসত্য একখানি চৌকির উপরে শুইতেন। তাহার পিসি সিন্দুকের উপর শুইতেন এবং অপর দিকের চৌকি রসিকের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, কিন্তু রসিক প্রায়ই বাটীতে থাকিত না। "আজ এতরাত্রি হইয়া গেল তবুও রসিক আসিল না"—এই কথা দুঃখিনী বসিয়া ভাবিতেছে এবং এক একবার দ্বারের দিকে চাহি-তেছে। রাস্তায় লোকের পদশব্দ শুনিলেই দুঃখিনী ভাবে—ঐ বুঝি রসিক আস্‌ছে, কিন্তু রসিকের কোন খোঁজ নাই। বৃদ্ধ রামসত্যের নিদ্রা হইতেছে

না। কিছুক্ষণ পরে রামসত্য বলিলেন "মা! আর রাত্রি জেগে কাজ কি। ভাতগুলি ঢেকে রেখে তুমি শোও।"

দু। না বাবা! আর একটু দেখি।

রাম। তবে যতক্ষণ বোসে থাক্‌বে, ততক্ষণ একখানি পুঁথি পড়।

দু। কি পুঁথি পোড়বো বাবা? কা'ল উদিপুর থেকে একখানা বই এসেছে তাই পড়ি।

রা। কি পুঁথি মা।

দু। সুশীলার উপাখ্যান।

রা। না মা! ও পুঁথি আমার ভাল লাগ্‌বে না। তুমি রামায়ণ কি মহা-ভারত পড়। যা শুন্‌লে আমার পরকালের কাজ হবে।

দু। বাবা! ভাল কথা শুনলেই পরকালের কাজ হয়।

এই বলিয়া রামসত্যের শিয়রের নিকটস্থ একটী বাক্সের মধ্য হইতে রামায়ণ বাহির করিয়া দুঃখিনী পড়িতে আরম্ভ করিল। দুঃখিনী বাছিয়া বাছিয়া সীতার বনবাস পড়িতে আরম্ভ করিল। বৃদ্ধ স্পন্দহীন হইয়া শুনিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে "আহা" বলিয়া দুই একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। দুঃখিনীও সীতার দুঃখে প্রাণমন ঢালিয়া দিয়া পড়িতে লাগিল, পড়িতে পড়িতে তাহার চক্ষু দিয়া দরদর ধারে জল পড়িতে লাগিল। পাঠিকাগণ! দুঃখিনীর ন্যায় আপনাদের চক্ষু দিয়া কি জল পড়ে? আপনারা কি এখন রামায়ণ, মহা-ভারত পড়িতে পড়িতে সীতার দুঃখে, দময়ন্তী সাবিত্রী-দুঃখে কাঁদিয়া থাকেন? না জামাই-বারিক, সধবার একাদশী পড়িয়া আমোদ উপভোগ করেন? বাস্ত-বিক সমস্ত পৃথিবীতে যাহা আছে,রামায়ণ মহাভারতে তাহা আছে। পাঠিকা-গণ, আপনারা একবার অভিনিবেশ সহকারে রামায়ণ ও মহাভারত পড়িয়া দেখিবেন। বুঝিতে পারিবেন, নবেল বা নাটক পড়িলে যে কাজ হয়, তাহা অপেক্ষা চতুর্গুণ ফল হইবে। একবার আমাদের দুঃখিনীর ন্যায় সীতার বন-বাসের কথা পড়িতে পড়িতে অশ্রুবিসর্জ্জন করিবেন। পরের দুঃখে সহানুভূতি দেখাইয়া যে কাঁদিতে পারে, সে বাস্তবিকই মানুষ।

দুঃখিনী এক একবার পড়া ত্যাগ করিয়া পিতাকে অন্যান্য দেশের মেয়ে-মানুষের গুণের কথাও বুঝাইতেছে। রামায়ণের অন্যান্য ভাগের কথাও ঐ প্রসঙ্গে বলিতেছে। সীতার অনুপম চরিত্রের ব্যাখ্যা শত মুখে করিতেছে। এমন সময়ে খট্ খট্ করিয়া রসিক আসিয়া উপস্থিত হইল। রসিকের হাবভাব

দেখিয়াই দুঃখিনী বুঝিতে পারিল যে, রসিক আজ মদ খাইয়া আসিয়াছে। দুঃখিনী মাতালকে বড় ভয় করিত। রসিক আসিয়াই চেঁচাচেঁচি আরম্ভ করিল এবং ঘরের মধ্যে মাটীতে বসিয়া নানা প্রকার অশ্রাব্য কথা বলিতে লাগিল, দুঃখিনী কি বলিবে বা করিবে ভাবিয়া পাইল না। সে রসিককে আহারের কথা বলিল, কিন্তু রসিক তাহাতে কর্ণপাত করিল না, বরঞ্চ দুঃখিনীকে সম্পর্ক-বিরুদ্ধ গালাগালি দিতে লাগিল। দুঃখিনী কাঁদিতে লাগিল, এ কান্না গালাগালির জন্য নহে, এ কান্না ভাইয়ের অবস্থা চিন্তা করিয়া ; তাহার মনে তখনই বৃদ্ধ পিতার কথা উপস্থিত হইল, ঋণের কথা উপস্থিত হইল। রসিক ধীরে ধীরে অবসন্ন হইয়া মাটীতে শয়ন করিল এবং নিদ্রাভিভূত হইল। দুঃখিনী যখন দেখিল যে, রসিক খালি মাটীতেই শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইল, তখন তাহাকে তুলিয়া খাটের উপর শয়ন করাইল এবং নিজে মেজেতে একটী মাদুর পাতিয়া শয়ন করিল ; কিন্তু সমস্ত রাত্রি তাহার নিদ্রা হইল না, সে সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাটাইল। তাহার মনে নানা প্রকার ভাবনা হইল। রসিক যে একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারিল ; কি উপায়ে এখন তাহাকে সৎপথে আনিতে পারা যায়, তাহাই সে ভাবিতে লাগিল। একমাত্র কনিষ্ঠের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া সে কাতরা হইল। অনিদ্রায় সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রাতঃকালে যথাসময়ে সকলেই শয্যাত্যাগ করিল। রসিক শারীরিক অসুস্থতার জন্য সেদিন আর বেড়াইতে গেল না, অনেক বেলা পর্য্যন্ত বিছানাতেই শুইয়া থাকিল।

রামসত্যের অবস্থা মন্দ বলিয়া দুঃখিনী আসিবার সময় অনেক জিনিস-পত্র লইয়া আসিয়াছিল এবং ভজহরি, মাসে মাসে টাকা পাঠাইয়া দিতেন, কাজেই যে কয়মাস দুঃখিনী পিতৃগৃহে ছিল, সে কয়মাস তাহার পিতার কোন প্রকার অসুবিধা হইল না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজলধর সেন।

অন্ধ কে ?

প্রদীপ হস্তে অন্ধ রমণী
পথের আঁধার নাশি,
আপনার মনে চলেছে আপনি
উজলিছে রূপ রাশি।

নিরখি পান্থ বিস্মিত চিতে
সুধা'ল কোমল স্বরে—
"অন্ধ যদ্যপি লো শুচিস্মিতে
প্রদীপ কেন ও করে ?"

"চক্ষু যাদের আছে" কহে নারী
তাদেরি তরে এ বাতি ;
গায়ে পড়ে কেহ যদি না নেহারি
যখন আঁধার রাতি।"

শ্রীরসময় লাহা

শাখী নামা।

৭ম শাখী।

...লা গ্রামের অধিবাসীরা গুরুর আতিথ্যসৎকার না করায়, গুরু সেখানে অবস্থান করিলেন না। এমন কি, তিনি বুসিয়ানেও আসিলেন না।* এ গ্রামটী বৃটিশ রাজ্যের ভিতরে অবস্থিত ; কিন্তু তিনি নাভা রাজ্যের দিলবানের নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে তাঁবু খাটাইলেন। ঐ গ্রামের জমীদার-দিগকে 'মোতা' বলিত। সেইদিন সূর্য্য গ্রহণ হয়। গুরু এই উপলক্ষে একটি প্রকাণ্ড উৎসব করিলেন। সেখানে অনেক গুলি ফকির আসিয়াছিলেন গুরু তাঁহাদের সকলকে আহার করাইলেন, এবং ১০১টি ভাল ভাল কপিলা গাই বিলাইলেন। পাতিয়ালা রাজ্যের অন্তর্গত তুপ্পা গ্রামের গৌজরাটিরা

* ইহা ও আরও অনেক শাখী হইতে বুঝা যায় যে, এই শাখী নামা গ্রন্থ ইংরেজ কোম্পানীর আমলে লিখিত হইয়াছে।

প্রথমে গাই লইতে অস্বীকৃত হন ; কিন্তু পরে গুরু তাঁহাদের বুঝাইলে তাঁহারা তখন গ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যাকালে গুরু যাত্রা করিলেন এবং দুলবেনে 'সচেটা' তৈয়ারি করিলেন। তখন মোর গ্রামের অস্তিত্ব না থাকায়, এই গ্রামে ধালুবাল জাতিরা বাস করিত। এই গ্রামের নিকটে একটি দীর্ঘিকা আছে। (সূর্য্যাদি) গ্রহণের সময় যাহারা সেখানে ভিক্ষা দেয়, তাহাদের অত্যন্ত উন্নতি হয়। *

৮ম শাখী।

এস্থান হইতে গুরু ভাদ্‌ড় রাজ্যের অন্তর্গত দিখান নামক এক গ্রামে বিশ্রামার্থ থামেন। এখানে একটি শিখ, গুরুকে তাহার বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য গুরুকে নিবেদন করে। সে নিঃসন্তান। সেই জন্যই সে গুরুকে অত আগ্রহের সহিত বলিতেছিল। গুরু তাহার জন্য প্রার্থনা করেন। পরে তাহার কয়েকটি সন্তান হয়। সে অনেকদিন তাহার অতিথিসেবা করিয়াছিল, পরে সে ও তাহার পরিবারবর্গ সকলে গুরুর শিষ্য হয়।

৯ম শাখী।

গুরু তৎপর দিন পাতিয়ালা রাজ্যান্তর্গত মৈসরখানা নামক গ্রামে গিয়া তাঁবু খাটাইলেন। তৎপরদিন তিনি পনধেরিন গ্রামে গমন করেন। সেখানে তিনি একটি ধর্ম্মশালায় গিয়াছিলেন এবং থাকিবার যায়গা খুঁজিবার জন্য অনুচরদের আদেশ করেন। জাটেরা একটি কুমারের গৃহ দেখাইয়া দিয়া বলিল যে, ঐখানে বিদেশীরা প্রায়ই স্থান পায়। শিখেরা গ্রামবাসীদিগকে নির্ব্বোধ বলেন। গুরু অশ্বারোহনে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিলেন। তাহাতে খোমারী চৌধুরি বলেন যে, এই বিদেশীরা বড় গর্ব্বিত।

১০ম শাখী।

পরদিন গুরু বিশ্রামার্থ আলি শেরিতে থামিলেন ভন্দারের লোকেরা যখন শুনিল যে, গুরু তেগ বাহাদুর তাঁহারের গ্রাম দিয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সেখানে থামেন নাই, তখন তাহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইল এবং আপনারা বলাবলি করিতে লাগিল—'বড়ই—দুঃখের বিষয় গুরু দিনবানে তিন মাস অবস্থান করিলেন ; কিন্তু আমরা মাত্র একদিনও তাঁহার সেবা করিতে

* এস্থানে গুরু তিন মাস অবস্থান করেন। ২০শ শাখী দেখ।
ইহাকে 'দুলবেন'ও বলে।

পাইলাম না।' একটা আধুলি ও দুই বোঝা ফসল লইয়া তাহারা অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত আলি শেরিতে চলিল।

রাস্তায় তাহারা অনুসন্ধান করিল, গুরুকে দর্শকদের কোন উপহার দিতে হয় কিনা। একজন বলিল যে, দেওয়া না দেওয়া ইচ্ছা। সে নিজে গুরুকে দেখিতে গিয়াছিল কিন্তু কিছু দেয় নাই। তখন ভন্দারের লোকেরা সেই ফসল গুলি খাইয়া ফেলিল ও আধুলিটি আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইল। পরে খালি হাতে গুরুর সহিত দেখা করিল। আলি শেরির লোকেরা যখন শুনিল যে, ভন্দারের লোকেরা গুরুকে কোন উপহার দেয় নাই, তাহারাও তখন তাহাদের পন্থানুসরণ করিল ; শুধু হাতে যাইয়া গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিল।

গুরু যে মঞ্চের উপর বসিয়াছিলেন, তাহার নিকটে একটি কুল গাছের মূলহীন গুঁড়ি পড়িয়াছিল। গুরুর প্রার্থনামত এই শুষ্ক গুঁড়িটার হঠাৎ ডাল পালা ও পাতা গজাইল। *

১১শ শাখী।

পরদিন মধ্যাহ্ন কালে গুরু পাতিয়ালা রাজ্যের অন্তর্গত জোগ নামক একটি গ্রামে অনুসন্ধান করিলেন, কাছে লোকের বসতি আছে কিনা। শুনিলেন যে, সেখানে অতি অল্প লোক বাস করে। তখন তিনি আবার যাত্রা করিলেন। রাস্তায় জোগরাজের সহিত দেখা হইল। জোগরাজ গুরুকে তাহার বাটীতে অবস্থানের জন্য অনুরোধ করিল। গুরু তাহাকে ঐ স্থানে একটি গ্রাম বসাইতে উপদেশ দিলেন ; কারণ, ও স্থানটী বড় পবিত্র। কথামত জোগরাজ সেখানে জোগ নামক গ্রামে প্রতিষ্ঠা করে। অতঃপর গুরু পাতিয়ালার অন্তর্গত ভুপালি গ্রামে থামিলেন। তথাকার লোকেরা তাঁহাকে দুগ্ধ ও পনির দেয় এবং তাঁহার অশ্বগুলির জন্য ঘাস ও ভুষি দেয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

* পূজ্য ব্যক্তিবর্গের তপঃ প্রভাব বুঝাইবার জন্য পূর্ব্বকালে এরূপ গল্পের যথেষ্ট প্রচার ছিল। মহারাজ আদিশূর যজ্ঞ করিবার জন্য কান্যকুব্জ হইতে লক্ষজন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। শুনা যায়; তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে রাজা অযথা দেরী করিলে, তাঁহারা একটি শুষ্ক বৃক্ষের উপর হস্ত রাখিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করেন। ব্রাহ্মণদিগের তপঃ প্রভাব বুঝাইবার জন্য এরূপ প্রাচীন গল্পের অবতারণা হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়। — অনুবাদক।

নিরুপাধি।

ওগো, তোমার মতন এত কার গুণ
ওহে গুণনিধি ভুবনে—
কোন জ্ঞানহীন তোমারে নির্গুণ
বলেছে নাজানি কেমনে ?
এ সৌরজগৎ কার বিনির্ম্মিত,
কাহার শাসনে নিত্য নিয়মিত,
কোন গুণবলে কালচক্র চলে ;
ষড় ঋতু মাস বৎসর শোভিত ?
যুগযুগান্তর করি অনুধ্যান
বুঝিবে কি কেহ তোমার বিজ্ঞান ?
বৃথা গর্ব্বস্ফীতি বৃথা অভিমান ;
তুমি জ্ঞান-বিজ্ঞান-অতীত !

তোমা, কোন আঁখিহীন, মূরতিবিহীন
বলেছে,—মুদিয়া নয়নে,
দেখায়ো তাহারে ও রূপ মাধুরী
জ্ঞানগর্ব্ব হরি, নিও তার হরি !
শূন্য আঁখি দুটী দিও পূর্ণ করি ;—
যাহে পলক না পড়ে নয়নে !

বহরমপুর প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলন।

অনেক দিনের অনেক কল্পনাজল্পনা ও বাধাবিঘ্নের* পর গত ১৭ই ও ১৮ই কার্ত্তিক বহরমপুর কাশীমবাজারে মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের প্রাসাদে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনের পাকা বন্দোবস্ত হইয়া গেল।

১৬ই কার্ত্তিক শনিবার রাত্রির ট্রেণে আমরা বহরমপুর যাইবার বন্দোবস্ত করিলাম। ঐ দিন সকালে দশটার ট্রেণে সভাপতি রবীন্দ্রনাথ বাবুকে লইয়া অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবী রওনা হইলেন। আমরা রাত্রিতে যাইব, বুঝিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। বেশ নির্ব্বিঘ্নে যাওয়া হইবে। দুইজন সঙ্গী পাইলাম ; তাঁহাদের সহিত বরাবর ষ্টেশনে যাওয়া গেল। টিকিট আগে হইতেই করা ছিল ; প্লাটফরমে গিয়া দশবার জন পরিচিত সাহিত্যসেবীর সহিত দেখা হইল। "শ্রীদুর্গা" বলিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। উঠিয়া দেখি—প্রায় সমস্ত গাড়ীখানিই পরিচিত সহযাত্রীতে ভরা ; তার মধ্যে ঔপন্যাসিক হইতে আরম্ভ করিয়া বৈয়াকরণিক, সম্পাদক, সহকারী-সম্পাদক, রিপোর্টার, লেখক, সমালোচক—এমন কি, হেড্‌মাষ্টার পর্য্যন্তও ছিলেন। ভাবিয়াছিলাম—বেশ নিরিবিলি যাওয়া যাইবে ; কিন্তু ঘটনা একেবারে উল্টাইয়া গেল। সূচনা দেখিয়া ভবিষ্যতের জন্য অনেকটা আশান্বিত হওয়া গেল।

গাড়ী ছাড়িতে কিছু দেরী হইল। গাড়ীর গমন-কোলাহলের সহিত আমাদের আনন্দ-কোলাহলও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিলাম, ঘুমান হইবে না, এমনই করিয়া রাত্রি কাটাইতে হইবে। দু' এক-

---

* গত ১৩১৩ সালের বৈশাখ মাসে বরিশালে প্রাদেশিক সম্মিলনের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনেরও বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু উক্ত সম্মিলন বন্ধ হওয়ায় সাহিত্য-সম্মিলনেরও অধিবেশন হয় নাই। মধ্যে একবার রঙ্গপুরে সভা হইবার আয়োজন হয়, কিন্তু সেখানে সভাবন্ধের আইন জারি হওয়ায় সেখানেও সভা হইল না। গত বৎসর গুড-ফ্রাইডের ছুটীর সময় বহরমপুর কাশীমবাজারে নূতন করিয়া অধিবেশনের বন্দোবস্ত হয় ; কিন্তু মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজকুমার মহিমচন্দ্র নন্দীর অকালমৃত্যুতে সে বন্দোবস্তও স্থগিত হয়।—লেখক।

জন বিশেষ নারাজ হইলেন; বিশেষতঃ হেডমাষ্টার ও রিপোর্টার মহাশয়। তাঁহারা গাড়ী ছাড়িতে না ছাড়িতেই, 'ব্যাঙ্কে'র উপর শয়ন করিলেন। একজন কুঞ্চিতকেশ সুরসিক সহকারী সম্পাদক, সঙ্গে একটী বালিশ আনিয়াছিলেন। তিনিও সেই বালিশে মাথা দিয়া নিদ্রার যোগাড় করিতে লাগিলেন। আমরা দেখিলাম, তিনি ঘুমাইলে আজিকার রাত্রিটা নেহাত মাঠে মারা যাইবে; তাই তাঁহাকে ঘুমাইতে দেওয়া গেল না।

গাড়ীখানি মেল নয়, উপ-মেলও নয়, হতভাগ্য প্যাসেঞ্জার ট্রেণ। সমস্ত ষ্টেশনে দর্শন দিয়া ভোরের বেলা কাশীমবাজার পৌঁছিবে। দু' চারিটা ষ্টেশন ছাড়াইতেই সাহিত্যের আলোচনা আরম্ভ হইল। বাঙ্গালার 'ঙ্গ' বেচারীকে কেহ কেহ বঙ্গ-সাহিত্য হইতে নির্ব্বাসিত করায়, একজন বন্দ্যো-পণ্ডিত বলিয়া উঠিলেন—'ঙ্গ' স্থলে 'ঙ' বা 'ং' ঠিক্ উপযুক্ত প্রয়োগ নহে, ইহা অপ-প্রয়োগ।" সুরসিক সহকারী সম্পাদক তার উত্তর দিলেন। বৈয়াকরণিক মহাশয়ের হাতে লাঠি ছিল। তাই বোধ হয়, তিনি কোন প্রমাণ বা যুক্তি লইয়া এ তর্কের আসরে নামিলেন না। যাহ'ক কিছুক্ষণ পরে এ তর্ক থামিয়া খোস-গল্প আরম্ভ হইল। আরম্ভকারী সেই বন্দ্যো-ঠাকুর; খোস-গল্প থেকে ক্রমে পাঁচালী আসিল; তারপর আরও কত কি। সেই কত-কি শুনিতে শুনিতে, আমরাও বেশ যাইতে লাগিলাম। এই কত-কির মধ্যে সমালোচনা, টিপ্পনী প্রভৃতিও ছিল। পর-চর্চ্চাও বড় বাদ যায় নাই।

গাড়ী কাঁচড়াপাড়া ছাড়াইতেই, অনেকে তন্দ্রামগ্ন হইলেন। আমিও যে হই নাই, তা নয়; তবে কতকটা ঘুমিয়ে জেগে থাকা গোছের। হঠাৎ একটা ষ্টেশনে একজন কে আরোহী আমাদের গাড়ীতে উঠায় "গোয়েন্দা" "গোয়েন্দা" রব উঠিল; তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। কি সর্ব্বনাশ! ষাচ্চি সাহিত্য-সম্মিলনে, এতেও গোয়েন্দা। চোখ মেলিয়া দেখি, আমাদেরই পরিচিত জনৈক মুসলমান সাহিত্যসেবী। হাসিয়া তাঁহাকে বলিলাম "আলি সাহেব, আপনিই নাকি গোয়েন্দা হইলেন?" তিনি উত্তর করিলেন "এই যে আপনি। আপনার বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়িয়া, আমায় গোয়েন্দা বনিতে হইয়াছিল।"

আবার তন্দ্রাভিভূত হইলাম। রাত্রি যখন আড়াই ঘটিকা, তখন গাড়ী কৃষ্ণনগরে পৌঁছিল। হঠাৎ পাশের বেঞ্চ হইতে জনৈক সাহিত্যসেবী বলিয়া উঠিলেন "সরভাজা কৈ?" সরভাজার নাম শুনিয়া অন্যের কথা বলিতে পারি না, আমার নিজের জিহ্বায় জল আসিয়াছিল। দু'চার জন "সরভাজা" "সরভাজা"

বলিয়া চীৎকার করিলেন; কিন্তু সে আড়াইটা রাত্রে কোন্ সরভাজাওয়ালা আমাদের শুভাগমনাশায় সরভাজা লইয়া ষ্টেশনে বসিয়া থাকিবে? কাজেই সরভাজা মিলিল না।

হঠাৎ একটা খেয়ালবশে সেই রসিক সহকারী-সম্পাদকের সহিত পরামর্শ করা গেল যে, একটা নিয়ম করা হউক, কথা বলিতে বলিতে যিনি ইংরাজী কথা বলিয়া ফেলিবেন, তাঁকেই প্রত্যেক কথার জন্য এক পয়সা করিয়া জরিমানা বা দণ্ড দিতে হইবে। সকলের তাতে মত হইল। আমারই প্রথম ও দ্বিতীয় নম্বরে জরিমানা। এক এক করিয়া তখন অনেকেই দিতে লাগিলেন। জরিমানার ভয়ে অনেকে কথা বন্ধ করিলেন; তাঁদের জোর করাইয়া কথা বলাইয়া এমন কি প্রশ্ন করিয়া ইংরাজী বলান হইল। আমাদের ভাণ্ডারেও জরিমানার পয়সা জমা হইতে লাগিল। অনেকের কাছে আদায় করিতে গিয়া আমায় আবার দিতে হইল। বৈয়াকরণিক মহাশয় বলিলেন, "আমি খাঁটি বাঙ্গালা বলি; আমাকে জরিমানা দিতে হইবে না।" কিন্তু তাঁহাকেও সেই রাত্রিতে এক পয়সা জরিমানা দিতে হইয়াছিল। নিজেদের কামরায় পরিচিত অপরিচিতের কাছ হইতে জরিমানা আদায় করিয়া আশা মিটিল না; তখন অপর গাড়ীতে যাইয়া সেখানেও জরিমানা আদায় করা হইল। সেদিন আমাদের সঙ্গে এমন কেহ ছিলেন না, যিনি জরিমানা দেন নাই। তবে অর্দ্ধেকের কাছাকাছি প্রায় আমাকেই দিতে হইয়াছিল। *

অমাবস্যার রাত্রি অন্ধকার। কাজেই কেহ না বলিয়া দিলে বা নিজেরা অনুসন্ধান করিয়া না দেখিলে, গাড়ী কোন্ ষ্টেশনে আসিল, তাহা জানিবার উপায় ছিল না। রাত্রি প্রায় ৪টার সময় একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিতে, একজন বলিয়া উঠিলেন "পলাসী"। তখন আমরা গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া পলাসীর দিকে চাহিলাম। অমাবস্যার অন্ধকারের আবরণ ভেদ করিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পলাসীর সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানের দিকে চাহিলাম। দেশকাল ভুলাইয়া দিয়া মনের মধ্যে পলাসীযুদ্ধের একখানা অস্পষ্ট ছবি জাগিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে সিরাজ, মোহনলাল, মীরকাশীম প্রভৃতি দেশহিতৈষীর কথা, আর উমীচাঁদ, মীরজাফর, জগৎশেঠ প্রভৃতি দেশকলঙ্ক ষড়যন্ত্রকারীদের বিষয় মনে পড়িয়া গেল। গাড়ী ছাড়িল; কিন্তু মনের চিন্তা দূর হইল না।

* এইরূপে সংগৃহীত দুই টাকা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 'গৃহনির্ম্মাণ'-তহবিলে সংগ্রহকারি-কর্ত্তৃক পাঠাইয়া দেওয়া হয়—লেখক।

দেখিতে দেখিতে একটু একটু করিয়া অন্ধকার অপসৃত হইতে লাগিল। ঊষারাণী ধরণীর গায়ে অল্পে অল্পে তাঁহার সোনালী রঙের আঁচল পাতিয়া দিতেছিলেন। আমাদের গাড়ীতে 'বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়ের' একজন সভ্য ছিলেন। তাঁহাকে ও আর জনকয়েক নবীন যুবককে বলিলাম "আসুন আজ এই মধুর প্রাতঃকালে বন্দেমাতরম্ গান করি।" তাঁদের সম্মতি পাইয়া আমরা পাঁচ ছয় জনে গান জুড়িয়া দিলাম। গাড়ীশুদ্ধ লোক আমাদের সেই মাতৃগান বিশেষ আনন্দের সহিত শুনিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বদিক অনেকটা লাল হইয়া উঠিল। গাড়ীও বহরমপুরকোর্ট ষ্টেশনে পৌঁছিল। প্লাটফরমে দেখি, একদল স্বেচ্ছাসেবক আমাদের অভ্যর্থনার জন্য একটা ষ্টেশন অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন। পরের ষ্টেশনই কাশীমবাজার। আমরা যে যাহার বাক্স পেঁটরা প্রভৃতি গুছাইতে লাগিলাম। গাড়ী যতই কাশীমবাজারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, মনে ততই একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার হইতেছিল। সে এক অভিনব আনন্দ; সন্তান, যোগ্য-অযোগ্য মিলিয়া, মার চরণ-কমলে পুষ্পাঞ্জলি দিতে চলিয়াছে, সকলেই আজ নির্ব্বিচারে মার মন্দিরে প্রবেশাধিকার পাইয়া উৎফুল্ল চিত্তে ছুটিয়াছে; হায়! জগতে বোধ হয়, এমন পুণ্যময় আনন্দ আর কিছুই নাই।

গাড়ী ,কাশীমবাজার ষ্টেশনে পৌঁছিল। বুকে ব্যাজআঁটা স্বেচ্ছাসেবক বালকবৃন্দ আমাদের অভ্যর্থনার জন্য প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া আছেন। আমরা গাড়ী হইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম—"বন্দে মাতরম্"। প্রতিধ্বনির আশায় উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম। প্রতিধ্বনি আসিল না। ক্ষুণ্ণমনে গাড়ী হইতে প্লাট-ফরমে অবতরণ করিয়া বলিলাম—"বন্দে মাতরম্" এবার উত্তর আসিল "স্বাগতম্"। মাতৃমন্ত্রে আহ্বান ছাড়িয়া এ মন্ত্রে আহ্বান আমাদের কেমন কেমন ঠেকিল।

স্বেচ্ছাসেবক বালকবৃন্দ নিজেরাই ঘাড়ে করিয়া আমাদের বাক্স ব্যাগ প্রভৃতি নামাইয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। অনুমানে বুঝিলাম, প্রায় ৬০।৭০জন ডেলিগেট এ গাড়ীতে আসিয়াছেন। একখানি গাড়ীতে করিয়া জনৈক স্বেচ্ছাসেবকের সহিত আমরা মহারাজের প্রাসাদে উপস্থিত হইলাম। তখন বেলা আট ঘটিকা। মহারাজের তোরণে নহবৎ, তখন সুমধুর রাগিণী আলাপ করিতেছিল। নিজে মহারাজ, তাঁহার তোরণ-দ্বারে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সুসজ্জিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণ

প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে প্রস্তরের সুন্দর খিলান পত্রপুষ্প ও রঙ্গীন বস্ত্রে সজ্জিত। চেয়ার ও বেঞ্চে সমস্ত প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ। প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে একটী উচ্চ বেদী নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই বেদীর উপরিভাগ বহুমূল্য মস্‌লন্দ দ্বারা মণ্ডিত; মধ্যে সভাপতির সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত বহুমূল্য সিংহাসন, সিংহাসনের উপরে রেশমী চাঁদোয়া।

স্বেচ্ছাসেবকেরা বলিলেন—"আপনারা কিরূপে থাকিবেন? তিন রকম বন্দোবস্ত হইয়াছে। যাঁহারা নিজে পাক করিয়া খাইবেন, তাঁদের বেলতলা বাড়ীতে স্থান হইয়াছে; এখানে খাঁটি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মত বন্দোবস্ত। যাঁরা মাঝামাঝি রকমে থাকিতে চান, তাঁদের জন্য গোলাবাড়ীতে বন্দোবস্ত। আর যাঁরা কিছু বাধাবাঁধি চান না, তাঁদের জন্য বাসা বাড়ী।" আমি ও আমার চারিজন সঙ্গী ব্রাহ্মণ-সাহিত্যসেবী গোলাবাড়ীই ঠিক করিলাম। বাড়ী কয়টিই মহারাজের প্রাসাদের সন্নিকটে। মহারাজের প্রাসাদে সভাপতি মহাশয় এবং গত কল্য ১০টার ট্রেণে আগত জনকয়েক সাহিত্যসেবী স্থান পাইয়াছেন।

জনৈক স্বেচ্ছাসেবকের সহিত আমারা গোলাবাড়ীতে যাইলাম। বাড়ীটি প্রাচীন,বড় বড় দুইটা মহল। নীচেকার ঘরগুলি অব্যবহার্য্য,উপরের দুই মহলে প্রায় ১০।১২ খানি ঘর আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। বাকী তিনখানি ঘরে চা, তামাক, জলখাবার প্রভৃতির বন্দোবস্ত। উঠানে রাসের জন্য মাটীর পুতুল বা সং তৈয়ার হইতেছে। কার্য্য দেখিয়া বুঝিলাম, কারিকর সকলেই কৃষ্ণনগরের। এ সং বা পুতুলের সাজ, চুল কিছুই দিতে হয় না। মাটীর উপর রং দিয়া এবং মাটীকে পাট করিয়া এমনই সুন্দরভাবে কাপড়, জামা, চাপকান পাগড়ী, চুল প্রভৃতি তৈয়ার করা হইয়াছে যে, দেখিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। উপরে একটী ঘর লওয়া গেল, আমি ও আমার সঙ্গী ব্রাহ্মণচতুষ্টয় পঞ্চ পাণ্ডবের মতন সেই গৃহটী দখল করিয়া বসিলাম। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ভায়া বলিলেন "বেশ হইল, আমরা পাঁচ জন ব্রাহ্মণ 'একঘরে' হইলাম।" বৃকোদর-ভায়া অর্থাৎ সেই বন্দ্যো-ঠাকুরও তাহাতে আনন্দ-প্রকাশ করিলেন।

নরসুন্দরেরও বন্দোবস্ত ছিল, ফাল্গুনী ভায়া তাহার দ্বারা নিজের কেশশূন্য মাথাটা একবার কামাইয়া লইলেন। আমরাও ক্ষৌরকার্য্য সারিয়া লইলাম। পাঁচজনে ঠিক করিলাম, গঙ্গাস্নানে যাওয়া হইবে। সব গাড়ী চলিয়া গিয়াছিল, তথাপি আমারা প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিয়া বাহিরের রৌদ্রে পুড়িতে লাগিলাম। স্বেচ্ছাসেবকগণের বিশেষ চেষ্টায় একখানি গাড়ী

আসিল। পাঁচজনে তাহাতে আরোহণ করিলাম, স্বেচ্ছাসেবক গাড়ীর উপরিভাগে উঠিলেন। প্রথমত বেলা হইয়া গিয়াছে, তারপর বামুনে বরাত, তাতে আবার পঞ্চ পাণ্ডবের সম্মিলন, কাজেই গাড়ীতে ত্র্যহস্পর্শ লাগিল। গাড়ী চলে না, অনেক কষ্টে প্রহারের চোটে কোন রকমে অশ্বযুগল পঞ্চপাণ্ডব বোঝাই গাড়ীখানা রেল লাইনের কাছাকাছি লইয়া গেল; ঠিক সেই সময়ে অপর দিক হতে একখানা গাড়ী আসিতেছিল, নিকটে আসিতেই যুধিষ্ঠির ভায়া "চন্দর দা" বলিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন। আগত গাড়ীখানির ভিতরে প্রাচীন চন্দ্রশেখর বাবু। অনেক অনুযোগ অভিযোগ করিয়া দাদা গাড়ীখানি বদ্‌লাইয়া লইলেন। এ গাড়ীখানি খুব শীঘ্রই আমাদের খাগড়ার বাজার দিয়া একেবারে গঙ্গার ঘাটে লইয়া গেল।

এখানকার গঙ্গা অতি শীর্ণকায়া। কার্ত্তিক মাস হইলেও এখানে একটু শীত পড়িয়াছিল; কিন্তু রাত্রি-জাগরণ-হেতু শারীরিক উষ্ণতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, সে শীতটুকু গণনার মধ্যেই আসিল না। স্বেচ্ছাসেবক বালকের কাছে কাপড়চোপড় রাখিয়া স্নানে নামিলাম। বাসা হ'তে তৈলমর্দ্দন কার্য্য সারিয়া আসা হইয়াছিল। গঙ্গার প্রায় অর্দ্ধেকাংশ গিয়া তবে ডুব দিবার মতন জল পাইলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই স্নান করিয়া লইয়া আহ্নিকাদিও মার বক্ষে সমাপন করিলাম। গাড়ীতে আসিয়া উপবেশন করিবার কিছুক্ষণ পরেই চোক জড়াইয়া আসিতে লাগিল। বেলা প্রায় ১১টার সময় বাসায় পৌঁছিলাম। ক্ষুধার বেগ বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঘরে প্রবেশ করিতে না করিতেই বেশ মোটা রকমের একপ্রস্থ জলখাবারের আয়োজন দেখিলাম; বিলম্ব না করিয়া আহারে বসিলাম।

জনকয়েক স্বেচ্ছাসেবককে কাগজ পেন্‌সিল লইয়া প্রত্যেক ঘর হইতে অভ্যাগত ভদ্রলোকদিগের নাম-ধাম ও বিবরণ লিখিয়া লইতে এবং তাঁহাদিগের বুকে ব্যাজ আঁটিয়া দিতে দেখিলাম। আমারাও নামধাম লিখাইয়া বুকে ব্যাজ আঁটিলাম; আহার-সমাপনান্তে সবেমাত্র নিজ স্থানে বসিয়াছি, এমন সময় দেখি, একজন গৌরবর্ণ যুবক দুই চারিটি ভদ্রলোকের সহিত আমাদের কক্ষে আসিয়া আমাকেই আমার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। আমিই যে তাঁর সেই ব্যক্তি, এটা জানিতে পারিয়া তিনি বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করিলেন। তিনি আমাকে লইয়া অনেক ঘরে গেলেন, অনেক নবাগত সাহিত্যিক উপ-সাহিত্যিক, সাহিত্যানুরাগীর সহিত পরিচয় হইল। কলিকাতা, হাবড়া, হুগলী,

বর্দ্ধমান, খুলনা, নদীয়া, বীরভূম, ভাগলপুর, কাটোয়া, রঙ্গপুর, রাজসাহী, পাবনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ এমন কি সুদূর শ্রীহট্ট হইতেও প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। বিভিন্ন জেলার সাহিত্য-সেবীদিগের এরূপ সুন্দর ও বিরাট সম্মিলন বাস্তবিকই ইতিপূর্ব্বে আর হয় নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে এরূপ লোকসমাগম হইতে পারে তা আগে ভাবিয়াই উঠিতে পারি নাই। যে ভাষা দীনা বলিয়া কথিত, এখন পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যে ভাষায় কথোপকথন পর্য্যন্ত তুলিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছেন, সেই আমাদের মাতৃভাষা বঙ্গভাষার এতগুলি সেবক আজ এখানে মার মিলন-মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য আসিয়াছে, ইহা কত গৌরবের—কত আনন্দের, তাহা বলিয়া বা লিখিয়া বুঝানো যায় না। সর্ব্বাপেক্ষা এক অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল, কাটোয়া হইতে প্রকাশিত "প্রসূন" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রের খঞ্জ চলৎশক্তিহীন সম্পাদক নিজের শারীরিক অক্ষমতাকে তুচ্ছ করিয়া এখানে আসিয়াছেন। একজন লোক তাঁহাকে কোলে করিয়া লইয়া যায়, তবে তিনি যাইতে পারেন। নিজেদের আত্মপ্রসাদ, ক্ষুদ্র গর্ব্বাভিমান আজ এই খঞ্জ সম্পাদককে—জননী বঙ্গভাষার এই প্রকৃত মাতৃভক্ত সাধক সন্তানকে দেখিয়া চূর্ণীকৃত হইয়া গেল। সাদরে তাঁহার সহিত আলাপ করিলাম; অতি অমায়িক প্রকৃতি, অতি সজ্জন, তার উপর বিনয়ে ভরা।

বেলা প্রায় ১২টা বাজিয়া গিয়াছিল। মধ্যাহ্ন ভোজনের আহ্বান আসিল। মহারাজের প্রাসাদের ভিতরে বিস্তৃত দরদালানে বর্ণ-নির্ব্বিশেষে আহারের পংক্তি হইয়াছিল। পূর্ব্বে রাজভোগেরই নাম শুনিয়াছিলাম; কিন্তু এ দেখিলাম মহারাজভোগ! নিজে মহারাজ আসিয়া তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন, ঊণকুটী চৌষট্টি রকমের আহার্য্যই উদরস্থ করা হইল। আহার শেষ করিয়া বাহিরে আসিলাম, তখন সভায় লোক সমাগম হইয়াছে। সভা আরম্ভ-প্রায়।

বেদীর উপর মহারাজ বাহাদুর, লালগোলার রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় ও অনেক প্রসিদ্ধ-নামা সাহিত্যিক পরিবৃত হইয়া সভাপতি রবীন্দ্রবাবু রহিয়াছেন দেখিলাম। নিম্নে বুকে ব্যাজ-আঁটা ডেলিগেট মহাশয়েরা, স্বেচ্ছাসেবক বালকবৃন্দ, বহরমপুর খাগড়া ও কাশীমবাজার অধিবাসিগণ উপবিষ্ট। ১টার সময় মঙ্গলাচরণ গানের সহিত সভার কার্য্যারম্ভ হইল।

মহারাজ বাহাদুর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে তাঁহার মুদ্রিত বক্তৃতা পাঠ করিলেন। তাঁহার ব্যক্তব্যের মধ্যে অনেকগুলি কথা আমাদের বড়

প্রাণে লাগিয়াছিল, তিনি যখন তাঁহার বক্তৃতা-প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ করাইয়া দিলেন—"আপনারা এখানে বৃথা উৎসব করিতে আসেন নাই, একটি মহাব্রত গ্রহণে আসিয়াছেন বাঙ্গালা-ভাষা ও বাঙ্গালা-সাহিত্যের পুষ্টি ও উন্নতি-সাধন জন্য একত্র সমবেত হইয়াছেন। মানুষের জীবনে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর লক্ষ্য বোধ আর কিছু হইতে পারে না। যাহাতে দেশের হিত, জাতির হিত, সমাজের হিত, তাহার মত পুণ্যকর্ম্ম আর কি আছে? আজিকার সাহিত্য-সম্মিলনের যে আয়োজন, প্রকৃত পক্ষে তাহা ত মাতার জন্য মন্দির-প্রতিষ্ঠার আয়োজন। যদি আমরা মন্দির সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, যদি মাতার নিত্যসেবা ও বার্ষিক উৎসবের ব্যবস্থা করিতে পারি, তাহা হইলে শুধু আজি বলিয়া নহে, অনন্ত-কাল, অনন্ত যুগ ধরিয়া অসংখ্য ভক্ত মাতৃপদে অঞ্জলি দিবার জন্য, যাহার যাহা আছে, সাধ্যানুসারে সে তাহাই লইয়া এই মহাপবিত্র মন্দির দ্বারে উপনীত হইবে।" তখন মনে হইল, যেন জননী বঙ্গভাষার এতগুলি সন্তান এখানে বৃথা উৎসব-মত্ত হইতে আসি নাই, মার মন্দির প্রতিষ্ঠার আয়োজনের জন্যই যেন আমাদের এখানে আগমন; কিন্তু এ আয়োজন করিতে হইলে যে সাধ-নার আবশ্যক, সে সাধনা আমাদের কোথায়? প্রকৃত সাধনার সহিত কয়জন সাহিত্যসেবী বঙ্গভাষার সেবা করেন? তাই বোধ হয় মহারাজ বাহাদুর তাঁহার বক্তৃতার শেষাংশে বলিলেন—"আমাদের অধিকাংশ সাহিত্যসেবী সৌখীন মাত্র। সাধকের সংখ্যা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।" আমার মনে হয় "আমাদের সাহিত্যিকগণ এখন যাহা করিয়া থাকেন তাহা প্রায় উদাসীনরূপে" তাঁহার এ কথাটী অতি সমীচীন; কিন্তু এ সমীচীনতাকে অতিক্রম করিয়া "তাঁহাদিগকে ব্রতধারী করিতে হইবে।" আর এ ব্রতধারী তৈয়ারি করিবার ভার তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

তারপর শত কণ্ঠে হর্ষধ্বনির মধ্যে সভাপতি রবীন্দ্র বাবু দণ্ডায়মান হইয়া সম্মিনের উদ্বোধন করিলেন। অতি বিনয় ও সৌজন্যের সহিত তিনি সম্মিলনে সভাপতির পদ-গ্রহণ বিষয়ে তাঁহার অক্ষমতার কথা জানাইলেন। তাঁহার এ বিনয় ও সৌজন্য তাঁহার মহৎ হৃদয়েরই প্রকৃত পরিচায়ক। তারপর তিনি বেশ সুন্দর ও হৃদয়-গ্রাহীরূপে দেশের বর্ত্তমান জাগরণের কথা, মাতৃভাষার সেবার নিমিত্ত এই সাহিত্য-সম্মিলনের মঙ্গলানুষ্ঠানের বিষয় এবং ইহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিলেন। এ পর্য্যন্ত অনেক সভা-সমিতিতে তাঁর লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করা শুনিয়াছি; কিন্তু তাঁহাকে এমন সুন্দর বক্তৃতা দিতে কখন শুনি নাই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রবীণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তারপর তাঁহার "সাহিত্য-সম্মিলন" নামধেয় প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। তাঁহার প্রবন্ধটি অতি উপাদেয় এবং সারগর্ভ হইয়াছিল। বিশেষ আগ্রহের সহিত আমরা সে প্রবন্ধ শ্রবণ করিলাম। সমস্ত প্রবন্ধটী আগাগোড়া এখানে প্রকাশ না করিতে পারিলে আমাদের আশা মিটে না; কিন্তু আমাদের প্রবন্ধ অতীব দীর্ঘ হইয়া পড়ে, তাই তাঁর প্রবন্ধের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি-তেছি। সাহিত্য-সম্মিলনের-উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলিলেন—"বাঙ্গালা দেশ ব্যাপিয়া একটা হাওয়া বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। এই হাওয়ার বেগে নীয়মান হইয়া বাঙ্গালার যত অগণ্য ধূলিকণা, বাঙ্গালার যেখানে যত তৃণাদপি লঘুপদার্থ বিদ্যমান আছে, তাহা এখানে ওখানে সেখানে পুঞ্জীভূত হইতেছে, ও স্থানে অস্থানে স্তূপের সৃষ্টি করিতেছে। * * * বাঙ্গালার ইতিহাসে বর্ত্তমান যুগকে আমরা দল-বাঁধার যুগ আখ্যা দিতে পারি। আজিকার হাওয়ার গতি দল বাঁধার দিকে। যিনি যেখানে আছেন, তিনি সমানধর্ম্মা ব্যক্তিকে খুঁজিয়া লইয়া তাহার সহিত দল পাকাইতেছেন। * * * সকলেই হাওয়ার অনুকুলে গা ঢালিয়া দেন, আমরাই বা বসিয়া থাকিব কেন?" তাই তিনিও বেশ সরল ভাবে দেখাইলেন যে, আজিকার এই দল-বাঁধার দিনে আমরা—সমবেত সাহিত্যসেবীরা দেশের হাওয়ার গতি লক্ষ্য করিয়া সেই দিকেই যাইব। তিনি বলিলেন "বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালী জাতির ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, কিন্তু দেশের অতি পুরাতন সাহিত্য আছে।" এই অতি পুরাতন সাহিত্য হইতেই তিনি সুন্দরভাবে বাঙ্গালা ইতিহাসের "নাড়ী নক্ষত্রের পরিচয়" দিলেন। দেড় হাজার বৎসর হইতে আজ পর্য্যন্ত বেশ একটী সরল সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ তিনি আমাদের শুনাইলেন। তারপর "গ্যামামায়ের পাগল ছেলে কবি রামপ্রসাদের" কথা তুলিয়া যখন আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের অনু-কূল মূর্ত্তির বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন—যখন তিনি অমর বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের কথা, মাইকেলের সেই প্রবাস-যাত্রার ব্যাকুলাশ্রুসিক্ত কবিতার কথা, আর হেমচন্দ্রের সেই গুরুগম্ভীর ভেরীনিনাদের কথা বলিলেন, তখন সেই সমগ্র প্রাঙ্গণ মহামন্ত্র "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল; দেশ কাল পাত্র বিস্মৃত হইয়া সভাস্থ সকলের হৃদয় একই মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল। যখন সেই পক্ককেশ ত্রিবেদী ব্রাহ্মণের মুখে বেদের সামগানের ন্যায় আমরা শুনিলাম—

"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারি প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।"

তখন আমাদের প্রাণের তারে-তারে কে যেন অজানা সুরে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল; অন্তরে অন্তরে মাতৃমন্ত্র গীত-ধ্বনিত হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন "আজিকার দিনে বঙ্গের সাহিত্যসেবীর এক বই দ্বিতীয় লক্ষ্য হইতে পারে না। যিনি যে কামনা করিয়া কর্ম্ম করিবেন, তাঁহাকে সেই শ্যামাঙ্গিনী জননীর চরণে সেই কর্ম্মফল অর্পণ করিতে হইবে। * * * যে মায়ের পূজা করিব বলিয়া বাঙ্গালী আজ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, আমরা সাহিত্যসেবী আমরাও আমাদের সামর্থ অনুসারে সেই মায়ের পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইব।" তারপর তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরের কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন যে, এই মন্দির নির্ম্মিত হইলে ইহাতে বাঙ্গালীর যাবতীয় গ্রন্থ, পুঁথি, বঙ্গদেশ সম্বন্ধে বিদেশীয় প্রবন্ধাদি, প্রাচীন স্থান ও মহাত্মাদিগের ছায়া বা তৈলচিত্রাদি, প্রাচীন মহাত্মাদিগের হস্তাক্ষর, প্রাচীন তাম্রশাসন, মুদ্রা প্রভৃতি থাকিবে এবং এই মন্দির "মাতৃ-মন্দির" ও এই মন্দিরস্থিত দ্রব্যাদি "মাতৃ-প্রতিমা" নামে অভিহিত হইবে। সর্ব্বশেষে তিনি মহারাজ বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্রশোকে তাঁহার প্রতি সমবেত সাহিত্যসেবিগণের হইয়া সমবেদনা জ্ঞাপন করিলেন।

তাঁহার প্রবন্ধপাঠের পর শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "ভাষা-সংস্কার" বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। বিষয়টী অতি শ্রুতিকঠোর ও গুরুতর হইলেও তাঁহার চির-প্রচলিত লিখিবার ভঙ্গীতে অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় আলোচ্য বিষয়গুলির বিজ্ঞাপন করিলেন। প্রথম দিন দুইটী মাত্র প্রস্তাব উপস্থাপিত ও সমর্থিত হয়। দুইটি বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব, ঐতিহাসিক উপকরণ, মুদ্রিত ও অমুদ্রিত প্রাচীন গ্রন্থ ও লৌকিক সাহিত্য-সংগ্রহ বিষয়ে, ইহাতে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের উদ্ধার, রক্ষণ ও প্রচারের কথাও ছিল। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু এবং শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় এই প্রস্তাবদ্বয় সম্বন্ধে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ করেন। বেলা প্রায় ৬টার সময় প্রথম দিনকার সভার কার্য্য বন্ধ হইল।

সন্ধ্যার পরেই গান বাজনার বন্দোবস্ত ছিল। মহারাজের প্রাসাদের দ্বিতলস্থ একটী বৃহৎ কক্ষে অনেক সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমাগম হইয়াছিল। সভাভঙ্গের পর বসিয়া বসিয়া গানশোনা আমাদের বরদস্ত হইল না; এদিক ওদিক ঘুরিয়া আগত সাহিত্যসেবিদিগের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে লাগিলাম।

যে কক্ষে গানের বন্দোবস্ত ছিল, তার পার্শ্বের কক্ষে বসিয়া মহারাজ বাহাদুর, পরিষৎ-সম্পাদক এবং চন্দ্রশেখর বাবু প্রভৃতি অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যসেবী নানা আলোচনা করিতেছিলেন। সেই খানে গিয়া আমিও তাঁহাদের মধ্যে একটু স্থান করিয়া লইলাম, আমার শ্রদ্ধাস্পদ জনৈক সুহৃৎ বিশেষ বিশেষণে মহারাজ বাহাদুরকে আমার পরিচয় দিলেন। একটু হাসিয়া নমস্কার পূর্ব্বক মহারাজ সে পরিচয় গ্রহণ করিলেন। রাত্রি আট-টার সময় একবার নিজেদের গোলাবাড়ীর বাসায় যাওয়া গেল। গিয়া দেখি আমাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহযোগীর জ্বরভাব হইয়াছে। সেখানে কিছু জলযোগ করিয়া পুনরায় প্রাসাদের সেই কক্ষে ফিরিয়া আসিলাম। সেখানে আমাদের জনৈক সুহৃৎ কবিরাজ ছিলেন। তাঁহাকে আমার বন্ধুটীর অসুখের কথা বলিলাম। তিনি সাহিত্যালোচনার্থ আসিলেও, সঙ্গে পাঁচন বড়ি আনিয়াছিলেন আমায় বলিলেন "চলুন, আমি ঔষধ দিচ্চি;" এমন সময় কে এক-জন লোক সংবাদ লইয়া আসিলেন যে, বাসা বাড়ীতে অবস্থিত নদীয়ার জনৈক ডেলিগেট সাহিত্য-সম্মিলনের কর্ম্মকর্ত্তা ও সাহিত্যপরিষদের উপর ভয়ানক চটিয়াছেন; তাঁহাদের অপরাধ—তাঁহাকে কোন প্রস্তাব উপস্থাপন বা সমর্থনের ভার দেওয়া হয় নাই।

অগত্যা কি করা যায়, উপস্থিত সকলের পরামর্শে পরিষদের জনৈক সহ-কারী, আমাদের সুহৃৎ কবিরাজ মহাশয় এবং আমি, তিনজনে বাসা বাড়ীতে গেলাম। ডেলিগেট মহাশয়কে দেখিয়া প্রবীন বোধ হইল; কিন্তু তাঁহার কার্য্য নবীনেরও যোগ্য নয়। অনেক বলিয়া কহিয়া তাঁহার উপর একটী প্রস্তাবের ভার দিয়া তবে অব্যাহতি পাইলাম।

বাসায় ফিরিয়া আসিয়া বন্ধুটীকে ঔষধ দিলাম। রাত্রে আহারাদি

করিয়া প্রাসাদেই আমাদের বৈয়াকরণিক বন্ধুর পার্শ্বে শয়ন করা গেল। তাঁর শীত করিতেছিল। কি করিব, সেখানে লেপ ছিল না, তাই একটী তোষক তুলিয়া তাঁহার উপর চাপা দিলাম। সবে মাত্র তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময়ে জনৈক স্বেচ্ছাসেবক ডাকিলেন "মহাশয় থিয়েটার দেখিতে যাইবেন, 'কৃষ্ণকান্তের' উইল অভিনয় হইতেছে।" গত কল্য সারারাত্রি ঘুম হয় নাই, আজ রাত্রি জাগিয়া থিয়েটার দেখিতে মোটেই ইচ্ছা হইল না, সুতরাং অসম্মতি জানাইয়া নিদ্রিত হইলাম।

রাত্রি প্রায় ২টার সময় একবার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। বাহিরে যাইবার দরকার হওয়ায় শয্যা হইতে উঠিলাম; তখনও দেখি স্বেচ্ছাসেবক জাগিয়া আছেন বাস্তবিক এমন স্বেচ্ছাসেবক—এমন কার্য্যকুশল, বিনয়ী, মিষ্টভাষী স্বেচ্ছাসেবক আমরা খুব কমই দেখিয়াছি। সকল সময় আদেশের প্রতীক্ষায় একজন না একজন উপস্থিত আছেনই। আর এমন সুবন্দোবস্তও দেখি নাই। মহারাজ বাহাদুর তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,—"আন্তরিক যত্নের ত্রুটী না থাকিলেও কার্য্যের ত্রুটী অনেক সময়ে হয়।" কিন্তু আমরা তাঁহার এবং অভ্যর্থনা-সমিতির প্রকৃত আন্তরিক যত্নের কোন ত্রুটী পাইলাম না, বরং তাঁহাদের প্রকৃত সরল ও সহৃদয় ব্যবহারে যথেষ্ট আনন্দলাভ করিয়াছি।

ভোর পাঁচটার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সহযোগী বৈয়াকরণিক মহাশয়কে উঠাইয়া একবার থিয়েটারের ব্যাপারটা দেখিতে গেলাম। তখন যবনিকা পড়ে পড়ে। দুই এক মিনিট থাকিয়া প্রাতঃকৃত্যাদির জন্য বাসাবাড়ীতে গেলাম। আমরা সেই বন্ধুটী ভাল আছেন দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। তারপর আবার সাহিত্যিক জটলা আরম্ভ হইল। আমিও এক ঘরে গিয়া সাহিত্যালোচনা করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে মহারাজ বাহাদুর নিজে আমাদের সেই ঘরে আসিয়া আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন ও অন্যান্য তথ্য লইয়া গেলেন। প্রায় সমস্ত গৃহেই তাঁহাকে যাইতে দেখিলাম। তাঁহার এই কার্য্য দেখিয়া আমার জনৈক বন্ধুকে বলিলাম—"স্বর্গীয় মহারাণী স্বর্ণময়ীর উপযুক্ত বংশ-ধরেরই কর্ত্তব্য কার্য্য বটে।"

পূর্ব্বদিনের ন্যায় এদিনও অনেক সাহিত্যসেবীর সহিত আমাদের পরিচয় হইল। পত্রে-আলাপী অনেক সাহিত্যিকের সহিত আজ মুখে আলাপ হইল। বেলা বারটার সময় স্নানাদি সমাপন করিয়া আহারাদি সারিয়া লইলাম।

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাণীস্তুতি

গানের সহিত দ্বিতীয় দিনের কার্য্য আরম্ভ হইল। এই দিন আটটী প্রস্তাবের আলোচনা হয়। প্রবন্ধ-পাঠের পর সভাপতিকে ধন্যবাদ, মহারাজ বাহাদুর ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে সাধুবাদ করা হয়। নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি রীতিমত উপস্থাপিত, সমর্থিত ও অনুমোদিত হইল।

১। বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও গঠনপ্রণালী নিরূপণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানের চলিত ভাষার শব্দ ও তাহার প্রয়োগ-রীতি সংগ্রহ করা হউক এবং তাহার সাহায্যে বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলিত হউক।

প্রস্তাবক ঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।

সমর্থক ঃ—শ্রীযুক্ত শরচন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্, এ।

২। বাঙ্গালার ভৌগোলিক তত্ত্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা হউক।

প্রস্তাবক ঃ—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, বি, এ।

সমর্থক ঃ—শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায়, এম্, এ।

৩। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে বঙ্গভাষায় বহুবিধ সদ্‌গ্রন্থের সঙ্কলন করা হউক।

প্রস্তাবক ঃ—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্।

সমর্থক ঃ—মুন্সী শ্রীযুক্ত মহম্মদ রওশন আলি চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত হরিমোহন মৈত্র।

৪। বাঙ্গালায় একটী "সারস্বত-ভবন" সংস্থাপিত হউক। এই সারস্বত ভবনে নিম্নোক্তরূপ দ্রব্যজাত সংগৃহীত হউক এবং পুরাবৃত্ত ও বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের মাসিক উপদেশ প্রদত্ত হউক।

(ক) প্রাচীন হস্তলিখিত বাঙ্গালা পুঁথি।

(খ) প্রাচীন মুদ্রিত ও এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য পুস্তক।

(গ) বাঙ্গালা দেশে আবিষ্কৃত তাম্র-শাসন, খোদিতলিপি, মুদ্রা প্রভৃতি।

(ঘ) জয়দেব, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাসাদি প্রাচীন কবিগণের স্মৃতি-চিহ্নাদি।

(ঙ) আধুনিক সাহিত্যিক—রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র প্রভৃতির প্রস্তরমূর্ত্তি, চিত্র এবং তাঁহাদের হস্তাক্ষর ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদি।

(চ) বঙ্গের সাধারণ খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের ঐরূপ স্মৃতি-চিহ্ন।

(ছ) বাঙ্গালার প্রাচীন শিল্পবিদ্যা, স্থপতিবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীতবিদ্যার যন্ত্রাদি প্রভৃতির নমুনা। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, প্রাচীন দুর্গ, অট্টালিকা, দেবমন্দিরাদির চিত্র। প্রাচীনকালের ব্যবহৃত বস্ত্র, অলঙ্কার, তৈজস, অস্ত্রশস্ত্রাদির নমুনা।

(ঝ) অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতিষ, (ফলিত ও গণিত) বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, দর্শন, সাহিত্য, প্রাণিবৃত্তান্ত, শরীরতত্ত্ব, উদ্ভিদ্, যন্ত্রতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ের প্রয়োজনীয় দ্রব্য।

(ঞ) পূর্ব্বোক্ত বিদ্যানিচয়ের রীতিমতভাবে বাঙ্গালা ভাষায় উপদেশ।

(ট) গ্রন্থালয়ের পুস্তক-সংগ্রহ।

এবং এই সারস্বত-ভবন প্রতিষ্ঠার জন্য নিম্নলিখিত মহোদয়গণের প্রতি ভার অর্পণ করা হউক ;—

মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন।

প্রস্তাবক :—শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, বি এল।

সমর্থক :—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ ও শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী।

৫। বাঙ্গালাদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় সাহিত্যালোচনার জন্য যে সকল সমিতি আছে, পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা হউক।

প্রস্তাবক:—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু এন্ এ বি এল,

সমর্থক :—শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বেদান্তশাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ শাস্ত্রী।

৬। প্রতিবর্ষে বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন জেলায় বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বান ও তাহার ব্যবস্থাদি করিবার জন্য একটী মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হউক। এই মণ্ডলী-স্থাপনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি ভার অর্পিত হউক ;—

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর, রাজা রণজিৎ সিংহ, বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন, রায় সেতাবচাঁদ নাহার, রায় মণিলাল নাহার, বাবু বিজয়চাঁদ দুধুরিয়া, রায় বুধসিংহ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ধনপৎ সিংহ, শ্রীযুক্ত গণপৎ সিংহ, বাহাদুর দেওয়ান খান বাহাদুর ফজলেরব্বী, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ সিংহ, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায়, শ্রীযুক্ত সরোজকৃষ্ণ ঘোষ মৌলিক, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক, শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ ঘোষ রায়।

প্রস্তাবক :—শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন বি, এল।

সমর্থক :—শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ি, শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায়।

আগামী বৎসর রাজসাহী জেলায় বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হউক।

প্রস্তাবক :—শ্রীযুক্ত শশধর রায়, এম্, এ, বি এল্।

সমর্থক :—শ্রীযুক্ত রায় কৃষ্ণচন্দ্র সান্যাল বাহাদুর, শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বি, এল্।

অক্ষয় বাবুর বক্তৃতার সময় আমি পরিষদের পক্ককেশ-সম্পাদক মহাশয়কে বলিলাম "কার্য্যতালিকার ভিতরে না থাকিলেও অদ্যকার সভায় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং দামোদর মুখোপাধ্যায়ের

জন্য শোক-প্রকাশ করা হউক।" তিনি মাথা নাড়িয়া উত্তর দিলেন "আজ হইতে পারে না, সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।" মনটা বড় খারাপ হইল ; বাঙ্গালার তিনজন মাতৃভক্ত সাহিত্যসেবীর মৃত্যু হইল, আর সাহিত্য-সম্মিলনের এই দুই দিবসব্যাপী দশঘণ্টা সময়ের মধ্যে তাঁহাদের শোক-প্রকাশের জন্য দশমিনিটও পাওয়া যাইবে না। এত বড় সুবন্দোবস্তের এই অসম্পূর্ণতার বিষয় খোদ সভাপতিকে জানাইবার ইচ্ছা হইল। সেই সঙ্গে আর একটী প্রস্তাবের কথা জানাইবার লোভও সম্বরণ করিতে পারিলাম না। সে প্রস্তাব —সমবেত সাহিত্যসেবিগণের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা-সমিতি ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে ধন্যবাদ প্রদান। একখণ্ড কাগজে এই দুইটী কথা লিখিয়া তাঁহার নিকট পাঠানো গেল। কিছুক্ষণ পরে জানিতে পারিলাম, রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শোকপ্রস্তাব উত্থাপিত করিবেন। ধন্যবাদ-প্রস্তাব শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় উত্থাপন করিবেন, আমাকে সমর্থন করিতে হইবে।

এই সময় নাটোরের মহারাজের নিকট হইতে টেলিগ্রাম আসিল যে, তিনি আগামী সাহিত্য-সম্মিলনের ভার নিজে লইবেন। প্রস্তাব এই,—

৮। সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ ও পণ্ডিত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের অকালমৃত্যুতে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন আন্তরিক ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক :—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ, বি এল।

সমর্থক :—(সমগ্র সভা)।

তারপর শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন বি, এল, মহাশয় সভাপতি রবীন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন।

রাত্রি অধিক হইয়া আসিয়াছিল, তাই প্রস্তাবিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইল না। সকলে তাহা সম্মিলনীর রিপোর্টে প্রকাশিত হইবার জন্য সভাপতি মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিলেন। নিম্ন লিখিত প্রবন্ধগুলি পাঠের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

(ক) মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিকতত্ত্ব—(শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল)

(খ) মুর্শিদাবাদের ভাষাতত্ত্ব—(শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়, বি এল)

(গ) মুর্শিদাবাদের প্রাপ্ত বৈষ্ণবসাহিত্য—(শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সাঙ্খ্যতীর্থ)

(ঘ) বাঙ্গালা ভাষায় পরিপুষ্টি সাধন উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা ভাষায় আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা,—(কবিরাজশ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন গুপ্ত শাস্ত্রী)

(ঙ) বাঙ্গালা ভাষার সংস্কার—(শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী)

(চ) নদীয়ার ঐতিহাসিকতত্ত্ব—(শ্রীযুক্ত কুমদনাথ মল্লিক)

প্রবন্ধ সমর্পণের পর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় মহারাজ বাহাদুর ও অভ্যর্থনা-সমিতিকে সাধুবাদ করিলেন। আমার উপর সমর্থনের ভার; কিন্তু আমি উঠিয়াই বলিলাম সকল প্রস্তাবই সমর্থনের নিয়ম আছে, কিন্তু আমি "মহারাজ বাহাদুর,অভ্যর্থনা-সমিতি এবং স্বেচ্ছাসেবকগণকে অক্ষয় বাবুর প্রদত্ত সাধুবাদ প্রস্তাব সমর্থনের জন্য ঠিক উপস্থিত হই নাই। কারণ, আমার মনে হয় তাঁহারা যে কার্য্য করিয়াছেন,তার প্রকৃত পুরস্কার সাধুবাদ বা ধন্যবাদ হইতে পারে না। সাধক-প্রবর বিল্বমঙ্গল একস্থানে তাঁহার জনৈক শিষ্যকে বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণদর্শনের ফল শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন। তাঁহারা আমাদের মাতৃভাষা বঙ্গভাষার সেবাকল্পে আজ যে মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান ও তাহা সুসম্পন্ন করিলেন, তার প্রকৃত পুরস্কার তাঁহাদের সেই কার্য্য। এর জন্য তাঁহাদের সাধুবাদ বা ধন্যবাদ দিলে তাঁহাদের কার্য্যকে ছোট করা হয়।

যুবক ও বালক স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ যে ভাবে আমাদের সেবা, যত্ন ও তদ্বির করিয়াছেন, বলিবার অগ্রে আমাদের প্রত্যেক অভাব যে ভাবে পূরণ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যেন তাহাদের এ নিঃস্বার্থ সেবা ও প্রকৃত সরল ব্যবহারের কোন প্রতিদান ধন্যবাদ বা সাধুবাদে পর্য্যবসিত হইতে পারে না! তাঁহারা আমাদের সহিত প্রকৃত সহোদরের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন,আমাদের প্রত্যেক সাহিত্যসেবীর কর্ত্তব্য গৃহে ফিরিবার সময় আমরা যেন প্রত্যেকে তাঁহাদের সাদরে কোল দিয়া যাই।

আমরা এই দুইদিনে যে আনন্দ পাইয়াছি, তাহা বোধ হয় কেহ ভাষায় বলিয়া শেষ করিতে পারি না। জাতীয় সাহিত্যের সেবার জন্য, জননী বঙ্গভাষার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি-কল্পে ইহাদের এইরূপ সাধুচেষ্টা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক। শ্রীভগবান্ মহারাজ বাহাদুরের কল্যাণ করুন, তাঁহার মঙ্গল করুন, তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি করুন। আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান, আমি প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হউক। আর অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণ এবং স্বেচ্ছাসেবক বালকবৃন্দ আপনারাও এইরূপে মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির সেবা করিয়া দেশের ও দশের উপকারে নিযুক্ত হউন।"

ইহার পরে সভাপতি রবীন্দ্র বাবু একটী সুললিত ও সারগর্ভ বক্তৃতা করিলেন। তিনি বলিলেন—"আনন্দের সহিত নির্ব্বিঘ্নে সম্মিলনের কার্য্য শেষ হইল। মাতৃপূজার এই প্রথম উদ্বোধন আমাদের চেষ্টায় ও যত্নেনয়,সেই নিখিল আনন্দময়ের ইচ্ছায় সুসম্পন্ন হইল। জননী বঙ্গভাষার সেবার জন্য তাঁহার কুটীর-দ্বারে আমরা যেন এমনি করিয়া সকলে মিলিত হইতে—তাঁহার চরণ-কমলে যেন এমনি করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিতে সমর্থ হই। আমাদের সম্মুখে উষার আলোকচ্ছটা দেখা দিয়াছে, সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া যেন আমরা উত্তরোত্তর অগ্রসর হই। সকলে মিলিয়া মার মন্দির নির্ম্মাণ করিবার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই। আজিকার দিনে যাঁহার যতটুকু ক্ষমতা, তিনি সেইভাবে মা'র অলঙ্কারের শোভা বৃদ্ধি করুন।" তিনি আরও অনেক সুন্দর কথা বলিলেন। তাঁর বক্তৃতাকালে বারংবার 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারিত হইল।

সর্ম্মশেষে বিদায় সঙ্গীত গীত হইল। গানটী আমাদের বড় প্রাণে লাগিল। তাঁহাদের সেই –

সারা হ'ল দেবী আরাধনা,
চলিলে গো সবে নিজ ঠাঁই।
বরষ অন্তে মায়ের দুয়ারে
যেন গো আবার দেখা পাই।
জ্ঞান-তৃষা যেন বাড়ে সদা,
মিটেনাক যেন এই ক্ষুধা ;
বাণীর মন্দিরে দাঁড়াইয়া যেন
ভাষার বলেতে বল পাই।
সারাটি বরষ থেকো না ভুলিয়ে
পৃথিবীর যত খুঁটিনাটি ল'য়ে ;
ক্ষীণ বাঙ্গালীর দীন মাতৃভাষা
আর নাহি যেন শুনি ভাই ;—
শত কাজ ল'য়ে ভার-নত শিরে
বারেক দাঁড়ায়ো বাণীর দুয়ারে ;
সুখে থাক যেন থেকো সুখে
বলিবার আর কিছু নাই।

আমাদের কর্ণে বিজয়া-দশমীর বাদ্যরোলের ন্যায় বাজিয়া উঠিল। রাত্রি প্রায় সাড়ে সাতটার সময় "বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের" প্রথম অধিবেশন সমাপ্ত হইল।

সভাভঙ্গের পর মহারাজ বাহাদুর বহরমপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এক শাখা-স্থাপনের প্রস্তাব করেন। শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন সমর্থন করায় প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

রাত্রে মহারাজের সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থিগণের পরীক্ষা ও পুরস্কার-বিতরণ হইল।

সে রাত্রে আমার জনৈক নিকটাত্মীয়ের পীড়াপীড়িতে তাঁহার গৃহে যাইতে বাধ্য হইলাম। তাঁহার গৃহ খাগড়ায়। সে রাত্রে সেখানেই আহার ও রাত্রি-যাপন করিলাম।

পরদিন প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া কাশীমবাজারে মহারাজ বাহাদুরের প্রাসাদে আসিলাম। তখন রবীন্দ্র বাবু প্রাসাদের একটী দ্বিতল গৃহে স্বেচ্ছা-সেবকগণ ও সমাগত যুবকগণকে দুচারিটী সারগর্ভ উপদেশ দিতেছিলেন,তাঁহার উপদেশ-বক্তৃতার পর তাহারা তাঁহাকে একখানি গানের জন্য ধরিয়া বসিল। তিনি তাঁহার সর্ব্বজনবিদিত "অয়ি ভুবনমনোমোহিনী" গানখানি গাহিলেন। সকালের ট্রেণেই তাঁহার কলিকাতায় আসিবার কথা। তাই তাড়াতাড়ি তাঁহার যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল।

গত কল্য প্রাতে যখন আমরা সাহিত্যসেবীদিগের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতেছিলাম, তখন কতিপয় সাহিত্যসেবী, মহারাজ বাহাদুর, লালগোলার রাজা এবং সভাপতি রবীন্দ্র বাবুকে লইয়া কাশীমবাজারের যুবকবৃন্দ একটী আলোক-চিত্র তুলিয়া লয়। আমি স্বেচ্ছাসেবকগণের নেতা মহাশয়কে বলিলাম "আপনারা সকলে একবার সমবেত হউন, আমি একটা ফটো তুলাইয়া লইব।" তাঁহারা বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে আমি রবীন্দ্র বাবুর কক্ষে গিয়া তাঁহাকে স্বেচ্ছাসেবকগণের সহিত ফটো তুলাইবার জন্য অনুরোধ করিলাম। দু' একজন সময় অল্প বলিয়া আপত্তি করিলেন। মহারাজ বাহা-দুর বলিলেন "কাল ত একবার তোলানো হইয়াছে।" আমি বলিলাম "সে আপনাদের সঙ্গে। ছেলেদের সঙ্গে রবীন্দ্র বাবুর ছবি উঠিলে তাহারা বিশেষ আনন্দিত হইবে, আর তাহাদের এ আনন্দ দেওয়া আমাদের উচিত নয় কি?" রবীন্দ্র বাবু হাসিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। রবীন্দ্রবাবুকে মাঝে বসাইয়া প্রায় সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকগণের ফটো তোলানো হইল। অল্পক্ষণ পরেই রবীন্দ্র বাবু কলিকাতা-যাত্রা করিলেন।

আমি সেদিন সেই আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকিয়া তৎপরদিন সকালের ট্রেণে

কলিকাতা রওনা হইলাম। বহরমপুর-কোর্ট ষ্টেশন হইতেই একজন সঙ্গী পাওয়া গেল। ইনি বাঙ্গালার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক। তাঁহার সহিত নানা আলোচনা করিতে লাগিলাম। রাণাঘাট ষ্টেশনে জনৈক পরিচিত সাহিত্য-বন্ধুর দেখা পাইয়া তাঁহার কামরায় যাইলাম। দেখিলাম, তথায় রবীন্দ্র বাবুকে সভাপতির আসন দেওয়া ঠিক হয় নাই বলিয়া দু'একজন তর্ক করিতে-ছেন। আমাদের সেই বন্ধুটী তাঁহাদের কথার বা তর্কের উত্তর দিতেছেন। "রবীন্দ্র বাবুকে সভাপতি না করিয়া অমুক অমুককে করা হইলে ভাল হইত। তাঁর সাহিত্য-জগতে দাবী কি? অমুক বিখ্যাত পণ্ডিতকে সভাপতি করা হইল না কেন?" ইত্যাদি। বন্ধুটির উত্তর শুনিবার অবকাশ হইল না, ঘণ্টা পড়িয়াছিল। তাড়াতাড়ি নিজ কামরায় চলিয়া আসিলাম। কলি-কাতায় আসিয়া এই প্রসঙ্গে দু' একজনের মুখেও কিছু কিছু বাদানুবাদ শুনিতে পাইয়াছিলাম।

বাস্তবিক এতলোক থাকিতে রবীন্দ্র বাবুকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি কেন করা হইল? প্রথমেই মনে হইল, এ প্রশ্নটা হইতে পারে না, আমার নিজের বিবেচনায় সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিত্ব করিতে বঙ্গ-সাহিত্যে রবীন্দ্র বাবু ভিন্ন এখন খুব কম লোকই আছেন। বাঙ্গালা দেশে মহামহো-পাধ্যায় পণ্ডিতের অভাব নাই, বঙ্কিম বাবুর পরিত্যক্ত সিংহাসনের সম্পূর্ণ দাবী করেন এমন ঔপন্যাসিকেরও অভাব নাই; মাইকেল, ঈশ্বর গুপ্ত, হেমচন্দ্র, এমন কি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের পরিত্যক্ত কাব্য-সিংহাসন অধিকার করিতে লালায়িত এমন কবিকুলগৌরবেরও অভাব নাই; যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, অক্ষয়কুমার দত্ত, রজনী গুপ্তের ন্যায় প্রবন্ধ-লেখকের অভাব কোনদিন বাঙ্গালা দেশে হইবে না। এতদ্ভিন্ন সাহিত্য-সেবায় চুল পাকাইয়াছেন, দৃষ্টি হারাইয়াছেন, কোমর পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,এমনতর অনেক প্রবীণ সাহিত্য-রথীও বর্ত্তমান আছেন। আমরা কি সাহিত্য-সম্মিলনে এইরূপ বিষয় বিশেষে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিকে সভাপতি হইতে দেখিলে তৃপ্ত হইতাম? সাহিত্য-সম্মিলন কি কেবল জ্ঞান, বয়স, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রদর্শনের ক্ষেত্র? আমার মনে হয়, তাহার জন্য সাহিত্য-সভা আছে, সাহিত্য-সম্মিলন আছে, অর্চ্চনা-সমিতি আছে, আর আমাদের কার্য্য-কুশল সাহিত্যপরিষদও আছেন। বৎসর বৎসর সকলেরই সভাপতির পরিবর্ত্তন হয়। গুণ, বয়স ও কার্য্যবিবেচনায় গৌরবের যশোমাল্য তাঁহারা অনেকের গলায় দিয়া আসিতেছেন। যদিও

তাঁহাদের কোন ভুলচুক হইয়া যায়, তাহা সুধারাইয়া লইবার জন্য এখনও তাঁহাদের হাতে অনেক বৎসর আছে। সাহিত্য-সম্মিলন একটা নূতন পথ দেখাইবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যদি অন্য পাঁচটা সভাসমিতির ন্যায় এই বিরাট সাহিত্য-সম্মিলনও কেবল মানমর্য্যাদা খুঁটিনাটি লইয়াই মরে, তবে প্রার্থনা করি, ইহার পুনরাধিবেশনে প্রয়োজন নাই।

সভাসমিতি দ্বারা কার্য্য করানো উপযুক্ত নেতা পাইলে হয়। রবীন্দ্রনাথ কর্ম্মী পুরুষ, তিনি হাতেকলমে কাজ করিয়া বাঙ্গালার অনেক আশা-ভরসা সজীব করিয়া তুলিয়াছেন। অনেক বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া লইয়া সাহিত্য-সম্মিলন তাঁহাকে সভাপতির পদে বরণ করিয়াছিল, আর যে জন্য করিয়াছিল তাহাতেও নিরাশ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ সেদিন সভাপতির অভিভাষণে কার্য্যের প্রণালী যে ভাবে সাহিত্য-সেবীদিগের সম্মুখে সুস্পষ্টরূপে ধরিয়াছিলেন, সাহিত্য-সেবীরা যদি অবহিত হইয়া তাহা অনুসরণ করেন, তাহা হইলে, সহিত্যসম্মিলনের সফলতা অনিবার্য্য। রবি রাজা তস্য মন্ত্রী বুধ-রামেন্দ্র সাহিত্য-সম্মিলনের বর্ষ-প্রবেশের সূচনা যাহা দেখাইয়াছেন, তাহাতে আমাদের অনেক আশা বাড়িয়া গিয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের স্থায়ী কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে; সাহিত্যের লাঙ্গল অনেকের কাঁধে আছে, কৃষকেরা কেবল পাটের পাট করিয়া যদি সকল কৃষিই হারান, আমরা নাচার। তারপর—রবীন্দ্রনাথ কি কেবলই কর্ম্মী পুরুষ? সাহিত্যে কি তাঁহার দাবী নাই? সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বঙ্কিমের পর আমাদের আর কোন্ সাহিত্য-সেবীতে ফুটিয়াছে? "চৌকস্" বলিতে আমরা যাহা বুঝি,সাহিত্য-বিষয়ে সেরূপ পটুতা আর কে দেখাইয়াছেন? বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শন" হাতে লইয়া বঙ্গসাহিত্যে অনেক বিষয়ের দ্বার নূতন খুলিয়া দিয়াছিলেন। তবু গোটা কয়েক বন্ধ ছিল—বন্ধ যে ছিল অনেক সাহিত্যসেবীকে সে জন্য তাঁহাদের নিজের রচনার মধ্যে আক্ষেপ করিতে,—কাঁদিতে দেখিয়াছি, কিন্তু হায়! খুলিবার চেষ্টা কেহতো করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে সেই সমস্ত দ্বার খুলিয়া দিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যে যে নূতন নূতন আলোক আসিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহার জন্য সমস্ত বাঙ্গালী-জাতি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহার মতন আর কে কাব্য, প্রবন্ধ, উপন্যাস এবং ছোট গল্পের ভিতর দিয়া মায়ের শ্রীঅঙ্গ সজ্জিত করিয়াছেন। সাহিত্যের কোন একটা বিষয়-বিশেষে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা কাহারও কাহারও বিশেষ কৃতিত্ব থাকিতে পারে; কিন্তু তাঁহার মত উদ্দেশ্য-

সাধিনী ও সামঞ্জস্যবিধায়িনী শক্তি সাহিত্য-সেবীদিগের মধ্যে সুবিরল নহে কি? একটা সংস্কারবদ্ধ বাঁধা-গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া চারিদিকের দ্বার-গবাক্ষাদি খুলিয়া দিয়া, তিনি ভাষায় যে ভাব ও চিন্তার ক্রমবিকাশ এবং উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন, তাহা বোধ হয়, আর কেহ এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা-সাহিত্যে দেখাইতে সক্ষম হন নাই।

তাহার পর আর একটা মস্ত কথা বিবেচনার আছে। তিন-তিনবার সাহিত্যসম্মিলনের চেষ্টা হইল, প্রথমে বরিশালে, পরে রঙ্গপুরে, পরে মুর্শিদাবাদে;—বাঙ্গালার পূর্ব্বে, উত্তরে, পশ্চিমে। প্রতিবারই অনুষ্ঠাতৃবর্গ বিভিন্ন; কিন্তু সকলেই চাহিল,—রবীন্দ্রনাথ সভাপতি হউন। ইহার অর্থ কি? দেশের তাবৎ লোক অন্ধ ও মূর্খ, আর আমাদের উপদেশক বন্ধুবর্গ, যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বের অসমীচীনতা লইয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহারাই একমাত্র বুদ্ধিদেবীর প্রিয় সন্তান! যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কি দেশের অন্য মনীষী সন্তান-গণকে চিনিতেন না বা তাঁহাদের কৃতিত্বের সহিত পরিচিত নহেন? যখন রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্ব লইয়া প্রশ্ন উঠে, তখন ভাবিয়াছিলাম যে, উহা ব্যক্তিগত মতামত, তাহার প্রতিবাদ না করিলেও চলে; কিন্তু কথাটা যখন ঘনাইয়া ছয় মাসেও জের মিটিল না, তখন এ ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা যুক্তি আসিল, তাহা প্রকাশ করিলাম। রবীন্দ্রনাথের যশ এখন কাহারও ওকালতিতে নির্ভর করে না বা যাঁহারা তাঁহাকে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভোট-সংগ্রহ করিতে বাহির হন নাই; কারণ তাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা যাহা করিতেছেন, তাহাই দেশমান্য ও দেশগ্রাহ্য হইবে। সাহিত্যিকদিগের নির্ব্বাচনে একদিন যে ব্যক্তি সাহিত্যের সামান্য দুটি কথায় সভাপতিত্ব করিতে আসিয়াছিলেন, পাবনা-কনফারেন্সে সমগ্র দেশ তাঁহার প্রতিভার নিকট মস্তক অবনত করিয়া ধন্য ও তৃপ্ত হইয়াছে। ইহার পরও রবীন্দ্রনাথের নির্ব্বাচনের আর কাহারও কিছু বলিবার বাকি থাকিবে কি?

আবার সাহিত্য-সম্মিলন আসিতেছে; এবার যিনি সভাপতি হইবেন, তিনি আমাদের আশা ও ভরসা রক্ষা করেন, এই আমাদের অনুরোধ রহিল। রবীন্দ্রনাথ উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে এবার যোগ্য 'স্বাধ্যায়' গাহিতে হইবে।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

স্বপ্ন।

বাল্যকালে 'বোধোদয়ে' পড়িয়াছিলাম, স্বপ্নসকল অমূলক চিন্তামাত্র। অনেকদিন মনে ঐ বিশ্বাস খুব জমাট বাঁধিয়াছিল; কিন্তু কালক্রমে নিজের বহু ঘটনায় উহা সমূলে উৎখাত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় দেখিতেছি, এ বিষয়ে কয়েকটী প্রবন্ধে বেশ গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। তবে তাঁহার লক্ষ্য বড়ই দুরূহ। এ ভাবে চেষ্টায় যে বিশেষ কিছু ফল পাওয়া যাইবে, তাহা স্থির বলা যায় না। তথাপি আলোচনা দ্বারা চেষ্টা করিতে করিতে যদি কোন পথ বাহির হইয়া পড়ে, এই আশাই বোধ হয় তাঁহার অবলম্বন। আর এই ভাবে চেষ্টার জন্যই হয়তো তিনি সাধারণ-সমীপে সত্যস্বপ্ন-সংগ্রহের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। বিষয় যেমন গভীর, চেষ্টাও সেইরূপ কঠোর হওয়া উচিত। তিনি সত্যই বলিয়াছেন,—ইহা একের কাজ নহে; সুতরাং যাঁর যেটুকু অভিজ্ঞতা বা বিচারশক্তি আছে, সেটুকু প্রয়োগে সাহায্য করিলে ফললাভের আশা আছে বলিয়া মনে করি; তাই আমার সামান্য জ্ঞান ও বিচারশক্তির অকিঞ্চিৎকরতাকেও উপেক্ষণীয় মনে করিলাম না। প্রথমে স্মরণানুযায়ী স্বপ্ন কয়েকটীর উল্লেখ করিতেছি।

একটী ঘটনা এইরূপ—আমি তখন কৃষ্ণনগরে মহারাজের সংস্কৃত কলেজে পড়িতাম। আমার প্রতি অনেকগুলি কার্য্যভার থাকায় কতকগুলি চাবি আমার জিম্মায় ছিল। একদিন সন্ধ্যার সময় হঠাৎ প্রয়োজনে চাবিগুলি পাওয়া গেল না। নানা স্থানে খুঁজিলাম, সম্ভবমত সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, স্মরণ করিতে চেষ্টা করিলাম, ফলে চাবি পাইলাম না। শয়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনেকবারই মনে ঐ একই বিষয় তোলাপাড়া হইল। রাত্রিশেষে স্বপ্নে দেখিলাম, রাজবাটীর এক বৃদ্ধা পরিচারিকা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে,—এই চাবি কি আপনার? আমি যেন তদুত্তরে কিছু বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু হর্ষাতিশয্যেই হউক অথবা অন্য কারণেই হউক, আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঐ পরিচারিকার বাটী খুব নিকটেই ছিল। একটু ফরসা হইবামাত্র আমি তাহার বাটীতে গিয়া তাহাকে নিদ্রা হইতে উঠাইয়া চাবির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে এক থোলো চাবি আমাকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দেখুন দেখি ইহাই কিনা, আমি ইহা ঘাটের পথে পাইয়াছি।" আমি চাবি চিনিয়া লইয়া আসিলাম এবং অনেকের নিকট এই বৃত্তান্ত গল্প করিয়াছিলাম। পাঠক, এস্থলে লক্ষ্য করিবেন, স্বপ্ন দেখিবার পূর্ব্বে ঐ বিষয়েই মন একান্ত নিবিষ্ট ছিল। কোথায় হারানো সম্ভব, কে লইবার সম্ভব, এরূপ অনেক বিষয়ের চিন্তায় মন পূর্ণ ছিল। চিন্তা, আগ্রহ, বুদ্ধি সমস্তই একমুখী হইয়াছিল। ব্যক্তিগত অবস্থা—দেহ সবল, মন প্রফুল্ল, পবিত্র, সংসার-চিন্তা রহিত ও একনিষ্ঠ ছিল।

আর একটি ঘটনা—এক সময় একাদশীতে নির্জ্জলা উপবাসে অভ্যস্ত ছিলাম। একদিন একাদশীর রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম,স্নানের ঘাটে জলের প্রথম ধাপে কিছু পয়সা পড়িয়া আছে। প্রভাতে স্নানের সময় কথাটা মনে হওয়ায়, স্বপ্নদৃষ্ট স্থানের দিকে চাহিয়া দেখি, সত্যই চারিটী পয়সা আছে। অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পয়সা কয়েকটী সঙ্গে আনিয়া সকলকে ঐ বিষয় বলিলাম। বহুক্ষণ আলোচনার পর, অধ্যাপক মহাশয়ের নির্দ্দেশমত ঐ পয়সায় কিছু খাদ্য কিনিয়া একজন ভিক্ষুককে খাওয়ান গেল। আশ্চর্য্য সেই রাত্রেই আবার স্বপ্ন দেখিলাম, যেন রাজবাটীর দারোগা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, আপনি কি ঘাটে ৪টী পয়সা পাইয়াছেন? আমি যেন ৪টীর কথা স্বীকার করিলাম ও তাহার যাহা ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাও বলিলাম। প্রভাতে সকলের নিকট এই স্বপ্নবৃত্তান্তও গল্প করা হইল। এবারে পরীক্ষার জন্য সকলে মিলিয়া ঘাটে যাওয়া গেল। আমাকে জলে নামিতে না দিয়া অপর একজন অন্বেষণ করিতে করিতে পূর্ব্বদিনের স্থানের পরবর্ত্তী ধাপে ২টী পয়সা পাওয়া গেল। অতিমাত্র বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত দেখিবার জন্য আমরা তৎক্ষণাৎ রাজবাটীতে দারোগার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার কিছু হারাইয়াছে কি? তিনি বলিলেন ৪টী পয়সা কালি হইতে পাই নাই, কোথায় ফেলিয়াছি। আমরা তাঁহাকে সেই দুইটী পয়সা দিয়া আদ্যন্ত ব্যাপার বলিলাম। তিনিও আমাদেরই মত অবাক্ হইয়া গেলেন। পাঠক এস্থলে দেখিবেন, পূর্ব্ব দিনের ব্যাপার অচিন্তিতপূর্ব্ব, পরদিনের আন্দোলনপ্রসূত; কিন্তু সংখ্যায় মিল না ঘটিলেও ঘটনায় ব্যক্তির বা স্থানের সমতা আশ্চর্য্য। বয়স, দেহ ও মনের অবস্থা প্রথম স্বপ্নকালের তুল্য।

তৃতীয় ঘটনা—আমি যখন স্মৃতিশাস্ত্র পড়ি, সেই সময় আমার অধ্যাপক মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রের কলেরা হয়। এই যুবক আমার বড় অনুগত ছিল, আমিও তাহাকে সোদরতুল্য জ্ঞান করিতাম, ফলতঃ প্রবাসে হৃদয়ের অনেকটা স্থান সে অধিকার করিয়াছিল। যথালব্ধ চিকিৎসায় সুফল না হইয়া রোগী

ক্রমশঃ মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া তাহার পিতার ও জ্যেষ্ঠের মতানুসারে ৪ ক্রোশ দূরবর্ত্তী নবদ্বীপের বাটীতে পরিজনবর্গের নিকট রোগীকে লইয়া যাওয়া হইল। চিকিৎসাদির বন্দোবস্তের পর গৃহস্বামীর একান্ত পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া কৃষ্ণনগর ফিরিতে হইল ; কিন্তু সংক্রামক মহামারীর ভয়ে সেখান হইতেও কলিকাতায় আসিলাম। সেই রাত্রেই স্বপ্ন দেখিলাম যেন রোগীটীর মৃত্যু হইতেছে। তাহার পিতা, ভ্রাতা ও শ্বশুর পার্শ্বে রহিয়াছেন এবং তাহাকে বাটীর সম্মুখস্থ একটি বিল্ববৃক্ষের তলায় শোয়ানো হইয়াছে। পিতা বলিতেছেন "সমগ্র নবদ্বীপ গঙ্গাগর্ভের চরে স্থাপিত, অধিকন্তু এই বেলগাছ লক্ষ শিবলিঙ্গের মৃত্তিকায় প্রতিষ্ঠিত ; সুতরাং উহার অসদ্গতি হইবে না।" যাহা হউক, প্রভাত হইবামাত্র ব্যাপার কি জানিতে পত্র লিখিলাম। যথাসময়ে উত্তর পাইয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া দেখিলাম, স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তি, অবস্থা, ব্যবস্থা, এমন কি কথোপকথনেও সম্পূর্ণ মিল। বিশেষ আশ্চর্য্য এই, বিল্ববৃক্ষটির ঐ ইতিহাস আমার আদৌ জানা ছিল না।

সময়ে সময়ে এরূপ হইয়াছে দেখিয়াছি যে, কোন ব্যক্তি বা স্থান বিশেষে অথবা কাহারও বাক্যালাপক্রমের নূতন পরিচয় স্থলেও পূর্ব্বপরিচিত মনে করিয়া স্মরণের চেষ্টায় স্বপ্নদৃষ্টমাত্র জানিয়া বিস্মিত হইয়াছি। কলিকাতায় সংস্কৃতকলেজে অধ্যয়ন-কালে একদিন এক বন্ধুর সম্বন্ধে বেশ আমোদজনক এক স্বপ্ন দেখি। ২।৪ দিন মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা থাকায় তাঁহাকে সেই সময়ে স্বপ্নবৃত্তান্ত জানাইব বলিয়া এক পত্র লিখিলাম। বন্ধুটি উত্তরে লিখিলেন যে, তিনিও ঠিক ঐ রাত্রে আমার সম্বন্ধে এক স্বপ্ন দেখিয়া অত্যন্ত আমোদজনক বলিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন। সময়ে সাক্ষাতের পর আমার বৃত্তান্ত অগ্রে শুনিয়া তিনি একেবারে মুখ গম্ভীর করিয়া একখানি কাগজ আমার হাতে দিলেন। পড়িয়া দেখিলাম, আমার কথিত বৃত্তান্ত যেন এইমাত্র কে লিখিয়া লইয়াছে। উভয়ে অবাক্ হইয়া গেলাম।

এখন একটি কথা আমার বলিতে বাকি রহিয়া গিয়াছে। আমার সকল সত্য স্বপ্নই ১৭।১৮ হইতে ২৫।২৬ বৎসর বয়সের মধ্যেই ঘটিয়াছে। এই সময়ের স্বপ্নগুলি আমার বিশ্বাসের উপর এ ভাবে কার্য্য করিত যে, আমি অনেক সময় উহা দ্বারা পরিচালিত হইতাম। যশোহর জেলায় থাকাকালীন একখানি উত্তম কাটারী গড়াইয়া বাড়ী আনিয়াছিলাম। কি গুণে, কি দৃশ্যে উহা আমার বড়ই প্রিয় ছিল। একদিন স্বপ্নে দেখিলাম, হঠাৎ উচ্চ হইতে

পড়িয়া উহাতে আমার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের পৃষ্ঠদেশের অনেকটা কাটির যাওয়ায় তাঁহার জীবনের আশঙ্কা ঘটিয়াছে। প্রভাতে স্বপ্নটি স্মরণ হওয়ায় ভীতচিত্তে কাটারীখানি নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। কার্য্যটি যে আমার দুর্ব্বলতাপ্রসূত তাহা স্বীকার করিতে পারি ; কিন্তু সত্যই আমি স্বপ্নে তৎকালে এতই নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম ; কিন্তু আশ্চর্য্য সেই হইতে আর আমার একটি স্বপ্নও সত্য হয় না। যাহাহউক এখন আমার ঐ সকল স্বপ্নবৃত্তান্ত হইতে কি সিদ্ধান্ত করিতে পারি দেখা যাউক। প্রথমতঃ তত্তৎকালে আমার মন প্রফুল্ল, বিশুদ্ধ, চিন্তা-রহিত বরং একাগ্রই ছিল। সংস্কার পবিত্র এবং চিন্তা পাপশূন্য ছিল। আত্মা যতটুকু স্বচ্ছ অর্থাৎ অকলুষিত থাকে, ততটুকু পরিমাণেই তাহাতে ব্যাপার বা বস্তু আদি প্রতিফলিত হয়। পূর্ব্বকালে বিপুল তপোবল-সম্পন্ন ঋষিগণের ত্রিকালদর্শনশক্তির সহিত কতকটা ইহার মিল থাকিতে পারে। যোগমার্গের অষ্টসিদ্ধির অন্তর্গত ঈশিত্ব সিদ্ধিতে অনেক পরিমাণে এই শক্তি জন্মে। আরও আমার বিশ্বাস এই শক্তি পুণ্যলক্ষণ। পুণ্যক্ষয়ে এ শক্তি লোপ পায়। সত্য-স্বপ্নে কেবল যে অতীত বিষয় দেখা যায় তাহা নহে, ভবিষ্যৎ ব্যাপারও দেখা গিয়া থাকে। আত্মার ত্রিকালদর্শন-শক্তি না মানিলে মীমাংসা করা যায় না। স্থলবিশেষে দেখিতেছি, যাহা আকর্ষণের আধারভূত হয়, আর যদি সেই আকর্ষণ একাগ্র অথচ উদ্দামতাশূন্য অর্থাৎ গভীর হয়, তবে সেই স্থলে পূর্ব্বচিন্তিত বস্তু, ব্যক্তি বা ব্যাপার স্বপ্নে আসিতে পারে ; কিন্তু এরূপ স্থলেও বাঞ্ছিত বস্তু বা ব্যক্তির পরিবর্ত্তন ঘটিল, কিন্তু বিষয় ব্যাপার ঠিক থাকিল, এমনও দেখা যায়। এক্ষেত্রে অনুমান করিতে পারি, হয়তো বস্তু বা ব্যক্তি অপেক্ষা বিষয় বা ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষা সমধিক পুষ্টি আশ্রয় করিয়াছিল। অনেকের নিকটে এমন শুনা যায়, কোন দুর্ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্ব হইতে মনে দুশ্চিন্তা, অব-সাদ বা অস্বস্তিভাব অকারণে আবির্ভূত হইতে থাকে ; এ ঘটনা বিরলও নহে। ইহা হইতেও আত্মাতে ভবিষ্য বিষয়ের উদ্ভাসন অনুমান করিতে পারি। সেইরূপ স্বপ্নাবস্থায়ও ঘটিতে পারে, ইহা স্বীকার করা যায়। আত্মা ব্রহ্মবস্তুর প্রতিবিম্ব বা ব্যাপকের অংশমাত্র, ইহা আমাদের শাস্ত্রসিদ্ধ ; সুতরাং অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ এ সকল কাল-ব্যবচ্ছেদে লৌকিক কার্য্য-সৌকর্য্য সুবিধাজনক হয় বলিয়া সামাজিকগণ কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত ; কিন্তু অত্যন্ত ব্যাপক নিত্যকালবিষয়ে আত্মার খণ্ডবুদ্ধি থাকিতে পারে না। খণ্ডভেদ লৌকিক

সংস্কারমাত্র। যদি তাহাই হয়, তবে সার্ব্বকালিক ঘটনাই আত্মাতে পরিদৃষ্ট হইতে পারে, এরূপ বলা যায়। তাহা হইলে সসীম কাল-মধ্যে সম্ভূত বা ভবিষ্যমান বস্তু বা ঘটনার সমাবেশ স্বপ্নে দেখা যায় কেন,—এ প্রশ্ন উঠিতে পারে; কিন্তু ইহাও ত বলিতে পারি, এমন স্বপ্ন দেখা যায়, যাহা অধুনাতন কালমধ্যে ঘটিয়াছে বলিয়া জানি না, অথবা অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে ঘটিতে পারিবে কি না, তাহাও কে বলিতে পারে? যাহা আমার পূর্ব্বদৃষ্ট বা পরদৃষ্টরূপে স্মরণগোচরে আসিল, তাহাকেই সত্যস্বপ্ন বলিলাম। এমনও ত হইতে পারে, যে ঘটনা ঘটিল, তাহা স্বপ্নগোচর হইয়াছিল কিনা, তাহা স্মরণ নাই। কথাটা একটু কাঁচা বটে, কিন্তু এযুক্তি নিতান্ত ভিত্তিহীন নহে। তবে সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার যাহা কিছু ঘটে, ছোট বড় সবটাই যে স্বপ্নের সহিত জড়িত হইবে, এমন বলা যায় না। এ ত গেল, কোন্ কোন্ অবস্থার স্বপ্ন সত্য হইতে পারে, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা-চেষ্টা। কিন্তু আর একদিক্ দিয়া প্রস্তাবগুলি তুলিলে নিতান্তই হতাশ্বাস্ হইতে হয়। যদি এই ভাবে কথাটী তোলা যায় যে, কোন জাতীয় স্বপ্ন সত্য হইতে পারে, অথবা স্বপ্নের সার্থকতা কি, তবে উত্তরগুলি বোধ হয় বেশ সন্তোষজনক হয় না। যাহা হইক প্রবন্ধের কলেবর আর বাড়াইতে ইচ্ছা নাই। যখন সুযোগ্য ব্যক্তিগণ এ দিকে মন দিয়াছেন, তখন বোধ হয় অনেকটা সুফল আশা করিতে পারি। ফলকথা স্বপ্ন-সম্বন্ধে একটা সংশয়াবিল কৌতূহল চিরদিনই মনে রহিয়া গিয়াছে, শেষ মীমাংসা পাই নাই। তবে আমার মোটের উপর ধারণা যে, প্রবৃত্তি সংযত রাখিয়া সাধনা দ্বারা আত্মাকে সাত্ত্বিক-পথে যিনি যতটুকু অগ্রগামী করিতে সক্ষম হন, তাঁহারই এইরূপ ত্রিকালদর্শনশক্তি ততটুকু স্ফূর্ত্তি পায়—তা কি স্বপ্নাবস্থায় কি জাগ্রদ্বস্থায়। আরও, যাহার মোহাবরণ যতটা কাটিয়া যায়, বা বেশী পুরু হয়—সেইমত সেও এই প্রসাদনশক্তির ততটা অধিকারী বা উহা হইতে ততটা বঞ্চিত হয়।

শ্রীউমাকান্ত কাব্যতীর্থ।

ভক্তের দান।

সরলা বালিকা 'শুভা' তার নাম,
ভিখারিণী মার সনে,
কাশীর প্রান্তে পর্ণকুটীরে
যাপে দিন নিরজনে।

প্রতিদিন প্রাতে ভিক্ষায় যায়
দশ বছরের মেয়ে,
লোকে দান করে গঙ্গার ঘাটে,
সে থাকে শুধু গো চেয়ে,
ইচ্ছা হয় তারো করিবারে দান
কি দান করিবে খেপী,
ভাবিয়া না পায়— ভাবে কতদিন
প্রহর রজনী ব্যাপি'।
বহুদিন পর একদিন আহা
দ্বিগুণ চাউল পেয়ে,
মুখভরা হেসে জননীর কাছে
কুটীরে আসিল ধেয়ে।
জননী তাহার আছিল পীড়িতা
না পারিল উঠিবারে
শুভা নিজে তাই করিয়ে রন্ধন
খাওয়াইল জননীরে।
না করি আহার অবোধ বালিকা
সরা-ভরা ভাত লয়ে,
মাতারে লুকায়ে বাহিরিল পথে
পুলকে অধীরা হয়ে!
আজি কাশীধামে মহা উৎসবে,
বরদার মহারাণী,
দিয়াছেন নব অন্নসত্র,
ছুটিছে অযুত প্রাণী।
অতিথি ভিখারী কত সারি সারি
রাজপথে চলে' যায়,
'শুভার' আহা সে সরা-ভরা ভাত
কেহ নাহি ল'তে চায়।
ভ্রমি পথে পথে, ভাতগুলি তার
কেহ লইল না দেখি,

মনোদুখে আহা ভাবিতে লাগিল
বালা অবনতমুখী।
ভিখারিণী বলে' আমার নিকটে
কেহ পাতিল না হাত,
দিতে এসে কিগো ফিরে নিয়ে যাব
মোর একসরা ভাত ?
ফিরিল বালিকা বিষাদিত মনে
আসি কুটীরের কাছে,
দেখিল দুয়ারে ভিখারী জনেক
ম্লানমুখে বসে আছে।
বলিল ভিখারী— "আছি উপবাসী
দাও দাও কৃপা করে,
মোর হাতে তুলি' ওই ভাতগুলি -
অন্নপূর্ণা মোরে।"
বালিকার আহা ধরে না পুলক
হাসি হাসি বলে কথা,
"হ্যাঁগো এত লোক গিয়াছে যেখানে
তুমি যাও নাই সেথা ?
শুনিলাম পথে, কত সন্দেশ—
পরমান্ন যে কত,
খেতেছে নিয়ত অন্নসত্রে
আজি লোক শত শত।"
বুড়া বলে "ওগো সবে যেথা যায়
আমি নাহি সেথা যাই,
সকলেই পায় তাহাদের কাছে
আমি কিছু নাহি পাই।
হইয়াছি বুড়া না টানিলে কেহ
যাইব কেমন করে,
পথ ভুলে এই— পথে বসে আছি
দাও ভাতগুলি মোরে।"

উল্লাসে বালা কম্পিত করে
সরাখানি ধীরি ধীরি,
নামাইয়া দিল বৃদ্ধের হাতে
বুড়া বলে 'হরি হরি' !—
"এমন অন্ন পাইনি কখন
ঘুরিয়া হয়েছি সারা,
আমারে কে আর দিবে গো অন্ন
অন্নপূর্ণা ছাড়া !"
চলে গেল বুড়া বালিকা দেখিল
হইয়াছে দেরী পথে,
বকিবে জননী এই ভয়ে ধীরে
ফিরে গেল কুটীরেতে।
'আট-কড়কড়ে' ভাতগুলি খেয়ে
যে সুখ লভিল আসি,
ইন্দিরা কভু লভেনি সে সুখ.
ভুঞ্জিয়া সুধারাশি।
বিশ্বেশ্বর- মন্দিরে প্রাতে
দেবতার অতি কাছে,
পরিচারকেরা ঝুটা সরা এক
দেখিল পড়িয়া আছে।
প্রধান পাণ্ডা প্রভাত স্বপনে
দেখিছেন—"পাতি হাত,
বিশ্বেশ্বর বালিকার কাছে
লইছেন মাগি ভাত !"
স্নান করি প্রাতে মন্দিরে আসি
শুনি এই বিবরণ—
দরদর ধারে অশ্রু গড়ায়,
বিস্মৃত হয়ে র'ন।
ফোঁটা ফোঁটা জল মুকুতার মত
পড়ে দুগণ্ড বহি',

বলে "ব্যোম ব্যোম বিশ্বেশ্বর,
অন্নপূর্ণা মায়ি!"
এসেছিল 'শুভা' প্রণমিতে দেবে,—
তারে নিজ কোলে টানি
বলেন পাণ্ডা "মা তোরে দেখেছি
স্বপনে এ মুখখানি!"
হে শিব-ভিখারী ভকত-বাঞ্ছা
মন্দিরে রাখি সরা,
এতদিন পরে হাতে হাতে প্রভু
আজিকে পড়িলে ধরা।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

পানীকুণ্ড বা অমরকুণ্ড।

(সাগরদীঘি)

ভগবান বিষ্ণু কর্ত্তৃক সতীর খণ্ডিত দেহাংশসকল স্থানে স্থানে পতিত হইয়া নানা নামে আর্য্যের পবিত্র ও সতীত্বের জ্বলন্ত-প্রমাণ পীঠরূপে বিখ্যাত হইয়াছে। এই পীঠস্থান মাত্রেই উচ্চ ভূমির উপর স্থাপিত। এই অমরকুণ্ডা গ্রাম ৺কৃটেশ্বরীর মহাপীঠের তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ও কৃটেশ্বরীর জল ও ভূমির প্রকৃতি প্রভৃতির সমভাবসম্পন্না। ইহা বর্ত্তমান বহরমপুর খাগড়ার তিন ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। অতিপূর্ব্বে এই গ্রামের এক ক্রোশ মাত্র পূর্ব্বে গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন। অনুমান ৭।৮ শত বৎসর গত হইল, গঙ্গা পূর্ব্বদিকে সরিয়া যাওয়ায় প্রাচীন গঙ্গাগর্ভ এখন প্রকাণ্ড বিলে পরিণত হইয়াছে। উহা বর্ত্তমানে তেলকার বিল নামে খ্যাত। পূর্ব্বে গঙ্গার পশ্চিমতট অর্থাৎ অমরকুণ্ডার একক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত সাঁকুড়িয়া, মাধুনীয়া, চয়েনডাঙ্গা, রাইন্দীয়া, প্রভৃতি অতিশয় সুসমৃদ্ধ ছিল—তাহাদের উন্নতির প্রধান কারণ এই অমরকুণ্ডা গ্রাম।

সম্রাট মহীপালের শাসনসময়ে এই গ্রামসমূহ মগধ হইতে সুদূর দিল্লী-বাসীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সম্রাট মগধ হইতে ক্রমে নলহাটী

৺কৃটেশ্বরী প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে একদা বর্ত্তমান সুপাড়া গ্রামে শিবির সংস্থাপন করেন এবং দেশের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর দেখিয়া ও গ্রামসমূহে নিবৃত্তিশীল ব্রাহ্মণদিগের পূর্ণবিকাশ দেখিয়া বৎসরাধিক কাল অবস্থিতি করিবার ইচ্ছা করিয়া অমাত্যকে তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিবার অনুমতি দিলেন। সম্রাট্ কখন একদল সৈন্যসহ, কখন বা ছদ্মবেশে কখন বা সামান্য ভৃত্য লইয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী সকল পরিদর্শন করিতেন। এক বৎসর অবস্থানের নিদর্শন-রক্ষা সম্বন্ধে অমাত্যবর্গের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করাতে সকলেই তাঁহাকে এক দীর্ঘিকা-খননের পরামর্শ দিলেন। কেহ কেহ বলেন, সম্রাটের সুপাড়া প্রবেশ-সময়ে, সম্রাটের সৈন্য-দর্শনে একটী অষ্টমবর্ষীয় ব্রাহ্মণ বালক, ভয়ে নিকটবর্ত্তী বৃক্ষ হইতে আরোহণ করিয়া পলায়ন-কালে পতিত হইয়া, প্রাণত্যাগ করে। সম্রাট ইহাতে শোকান্বিত হইয়া পণ্ডিতদিগের নিকট ব্যবস্থা লইলেন। ব্যবস্থা হইল—সস্ত্রীক সম্রাট প্রথম দিন নিরম্বু উপবাস—দ্বিতীয় দিন কুশাগ্রে বারিপান—তৃতীয় দিবসে মধ্যাহ্নে একতোলা ঘৃতসেবন করুন। সম্রাট পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে ও সাম্রাজ্ঞী উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে যতদূর যাইয়া ক্লান্ত হইয়া পরিবেন,সেই পরিমিত স্থানে জলাশয় খনন করাইতে হইবে। সম্রাট একক্রোশ ও সাম্রাজ্ঞী অর্দ্ধক্রোশ যাইয়া ক্লান্ত হন; তজ্জন্য এই দীর্ঘিকা একক্রোশ দীর্ঘ ও অর্দ্ধক্রোশ প্রস্থ হইয়াছে। তখনকার রাজা ও রাণী কত কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন, এ কিম্বদন্তী হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়।

সম্রাট বলিলেন, "একথা যুক্তিযুক্ত। কেন না বহুপল্লী ভ্রমণ করিয়া সাক্ষাৎ, আলাপ ও জনশ্রুতিতে বুঝিলাম—এদেশ ঐশ্বর্য্যশালী নয়; কিন্তু এখানে বহু শাস্ত্রাভিজ্ঞ বিদ্বান মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আছেন। নিকটে বৃহৎ জলাশয় নাই। অতএব জলাশয় খনন করিয়া প্রতিষ্ঠা-কালে এদেশস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীকে একত্রিত পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সাহায্য ও উৎসাহ দানে পবিত্র আনন্দ অনুভব করিব।"

তদনুযায়ী জলাশয়খননের ব্যবস্থা করিয়া রাজা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কথিত আছে, তিন বৎসরকাল খননকার্য্য চলিয়াছিল;—অতি কঠিন বজ্রবৎ মৃত্তিকা ৮০ হস্ত গভীর করিয়া খনন করিয়াও জল উঠিল না, খননকার্য্যাধ্যক্ষ ইহা সম্রাটকে জ্ঞাপন করিলে, তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সম্রাজ্ঞী, সৈন্য ও অমাত্যসহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন প্রকাণ্ড জলাশয় অতি গভীর, কিন্তু জলশূন্য। কেহ কেহ বলেন যে, দ্বাদশ বৎসর কাল এইরূপ

জলশূন্য ছিল। যাহা হউক সম্রাট জলাশয়ের মধ্যস্থলে দুইশত হাত প্রস্থ ও চারিশত হাত দীর্ঘ সুদৃঢ় ইষ্টক প্রাচীর মধ্যে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। মন্দিরের ত্রিংশ হাত দূরে প্রায় দশবর্গহাত একটী গোলাকার কূপ বহু গভীর করিয়া কাটাইলেন, কিন্তু উহা বহু গভীর হওয়াতে পরিশেষে আর কেহ কাটিতে সাহসী হইল না। মৃৎতত্ত্ববিদ্ বহুদর্শী খনিজগণ অনুমান করিল যে, আর ৩।৪ হাত কাটিলেই হঠাৎ প্রবলবেগে জল উঠিবে। সে ভীমবেগ সহ্য করিয়া কেহ প্রাণরক্ষা করিতে পারিবে না। বহু তর্ক হইল; কেহ স্বীকার করে না, তখন সম্রাট বলিলেন ঃ—"যে ব্যক্তি আমার এই কার্য্য সম্পন্ন করিবে, তাহার যাহা ইচ্ছা, প্রার্থনা করিলে তাহাই দিব এবং যতদূর সাধ্য তাহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব।"

এইরূপে দুই তিনদিন অতিবাহিত হইল, কেহই অগ্রসর হইল না। সম্রাট অতিশয় চিন্তিত হইলেন। সহসা একদিন একজন কুম্ভকার রাজকার্য্যে সম্মত হইয়া রাজসাক্ষাৎ প্রার্থনা করিল। সম্রাট সংবাদপ্রাপ্তি মাত্রে কুম্ভকারকে স্বসমীপে আনয়ন করিতে অনুজ্ঞা দিলেন। কুম্ভকার যথাবিধি সম্মান পুরঃসর বলিল—"মহারাজ! আপনার বহু অর্থব্যয়ের সৎকীর্ত্তি লোপ হইতেছে। আমি মহারাজের কার্য্যে ও দেশস্থ জলাশয়ের জলকষ্ট দূর করিবার জন্য এই দুরূহ কার্য্যে, স্বীকৃত আছি।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—"তোমার নাম কি?"

কুম্ভকার। মহারাজ! আমার নাম সাগর কুম্ভকার।

সম্রাট। তুমি ৩২ সহস্র মুদ্রা পর্য্যন্ত পারিতোষিক পাইবে।

কুম্ভকার। মহারাজ! অর্থলোভে আত্মত্যাগ পাপের আশ্রয়;—নরকের সরল পথ। আমি অর্থলোভে আপনার নিকট আসি নাই।

সম্রাট। তবে তুমি কি চাও?

কুম্ভকার। এই জলাশয় আমার নামে খ্যাত করিতে হইবে, ইহা ব্যতীত আমার অন্য প্রার্থনা নাই।

সম্রাট। নামে কি লোভ হয় না?

কুম্ভকার। মহারাজ! কীর্ত্তি অক্ষয় স্বর্গ,—কীর্ত্তিই মানবকে অমর করে। আমি ধর্ম্মবিচার জানি না। মহাজনদিগের নিকট যেমন শুনিয়াছি সেইরূপ বলিলাম।

সামাত্য সম্রাট সাগরকুম্ভকারের অকম্পিত কণ্ঠস্বর, ব্যগ্রভাব ও অর্থের অনাকাঙ্ক্ষা দর্শনে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন।

সম্রাট। তোমার হৃদয় সাধুভাবপূর্ণ। অদ্য হইতে এই বৃহৎ জলাশয় "সাগর দীঘি" নামে খ্যাত হইয়া তোমার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। তোমার রক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা যাইবে। যদি ভগবান্ এই কার্য্যে নিতান্তই তোমাকে ইহলোক হইতে অপসৃত করেন, তবে আমি তোমার স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিব।

সম্রাটের শান্তিমধুর বাক্যে সাগরের চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু মুক্তাফলকের ন্যায় ঝরঝর করিয়া পড়িতে লাগিল। সে গদ্‌গদ্ ভাবে কহিল—

"মহারাজ! আমি ক্ষুদ্র প্রাণী। আমার প্রাণের মূল্য কি? আমার দ্বারা জগতের কোন উপকার নাই। আমার স্ত্রীপুত্রের জন্য চিন্তা কি? হঠাৎ রোগেও ত আমার মৃত্যু হইতে পারে। এখনই যে আমার মৃত্যু হইবে না, তাহারই বা নিশ্চয় কি? যতক্ষণ বাঁচি, ততক্ষণই স্ত্রীপুত্র; মরিলে কে কার? বিশেষতঃ আপনি রাজা, পরমেশ্বর পিতা! হঠাৎ রোগে যে শরীর পতন হইতে পারে, সে ক্ষণবিধ্বংসী শরীর পাত করিয়া যদি মহারাজ ও দেশের হিতের জন্য প্রাণ বলি দিতে পারি, তাহা হইলেই আমার জীবন সার্থক। মহারাজ! আমার এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণ আপনার কার্য্যে উৎসর্গ করিলাম।"

সম্রাট ও জনসমূহকে বিস্মিত করিয়া সাগর কুম্ভকার খননকার্য্য আরম্ভ করিল। ক্রমে তিন দিন কার্য্য করিয়া চতুর্থ দিবস প্রাতে সে বলিল—

"মহারাজ! আজ আমার শেষ কার্য্য। আপনি, আপনার মন্ত্রিবর্গ, পণ্ডিতগণ ও আমার স্ত্রীপুত্র সকলে কূপসমীপে আগমন করিলে, আমার আশা পূর্ণ হয়।" সম্রাট তৎশ্রবণে সকলের সহিত কূপসমীপে উপস্থিত হইলে, কুম্ভকার স্থিরগম্ভীর অথচ ঈষৎ হাস্য বদনে ঊর্দ্ধ হস্তে আকাশে দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া বলিল ঃ—"ভগবান্, আপনি নররূপে রাজা, আপনার কার্য্যে আমার প্রাণ বলি লইয়া আমাকে মুক্ত করুন।"

তারপর স্ত্রীপুত্রগণকে বলিল—"তোমরা শোক করিও না; কারণ কোন জিনিষের মূল্য নাই। প্রয়োজনে জিনিষের মূল্যের অবধারণ হয়। আমার ক্ষুদ্র জীবনের কোনই মূল্য ছিল না। কোটী কোটী মানব-কীটের মধ্যে আমি এক-জন কীটাণুকীট ছিলাম; কিন্তু আজ ভূপতির কার্য্যে প্রাণ দিয়া আমা হেন ন-গণ্যের প্রাণ মূল্যবান্ হইল। নতুবা রোগে শোকে, বা অনাহারে মরিলে আমার এক কপর্দ্দকও মূল্য হইত না। যতদিন সম্রাটের এই জলাশয় থাকিবে, ততদিন আমার নাম লোকসমাজে প্রকাশ থাকিবে। এ সুযোগ না হইলে

মৃত্যুর পর ইহজগতে আমার নাম কদিন থাকিত ? তোমরা দুঃখ করিও না। কীর্ত্তি ও স্বদেশের কার্য্যের জন্য প্রাণবিনিময় করিতে চেষ্টিত থাকিও। আমি মরিয়া আজি অমর হইব।"

সকলে স্তম্ভিত ও বাক্যহীন হইল। রাজাজ্ঞায় সাগরের কটীদেশে ও বাহুদ্বয়ের পার্শ্বে একগাছি রজ্জু দৃঢ়রূপে বন্ধন করা হইল। সাগর তখন সানন্দে বলিল—"মহারাজ! আমার শেষ প্রার্থনা, আপনারা সকলে তীরে উত্তীর্ণ হউন। কোনরূপ প্রতিবাদ করিবেন না।" রাজাজ্ঞায় সমবেত জনমণ্ডলী তীরে উঠিয়া একদৃষ্টে সাগরকে দেখিতে লাগিল।

সাগর দেখিল সকলেই তীরে উঠিয়াছে। তখন সাগর করতালি দিয়া নাচিতে নাচিতে বলিতে লাগিল,—

'নাচ রে সাগর কুমার
বিনা টাকায় দীঘি আমার—"

তিনবার বলিয়া মস্তক অবনত করিয়া সম্রাট প্রভৃতি সকলকে প্রণামপূর্ব্বক সাগর কূপমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। দর্শকগণ বিদ্যুৎ-চকিত-আলোক-মোহজালে যেন বজ্রপাত আশঙ্কায় স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সাগরের কটিবদ্ধ-রজ্জুধারিগণ প্রকাণ্ড কাষ্ঠদণ্ডদ্বয়ের উপরি সরল পাতিত কাষ্ঠে গ্রথিত কপি-মধ্যে রজ্জুর শেষভাগ দৃঢ়ভাবে ধরিয়া প্রস্তুত রহিয়াছে। দুইজন সেই কাষ্ঠের সরল দণ্ডে বসিয়া কূপমধ্যে নিরীক্ষণ করিতেছিল। সাগর রজ্জুধারীগণকে রজ্জু টানিতে ইঙ্গিত করিলেই তাহারা ঘর্ঘর শব্দে উহা টানিতে লাগিল। কিন্তু হায়! ইতিমধ্যে ভীষণ শব্দে জল ছুটিয়া উৎসের মত উৎক্ষিপ্ত হইয়া ছিন্নরজ্জুর সহিত রজ্জুধারীগণকে দূরে নিক্ষিপ্ত করিল। দেখিতে দেখিতে অর্দ্ধ জলাশয় জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

সাগরকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, সম্রাটের বহু আশা ছিল উহাকে বাঁচাইবেন;—কিন্তু তিনি ব্যর্থমনোরথ হইয়া অত্যন্ত সন্তপ্ত হইলেন। হায়! মৃত্যু সম্রাটেরও অজ্ঞবহ নয়। মহারাজ তখন সাগরের স্ত্রীপুত্রগণকে সঙ্গে লইয়া শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীযোগীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

রুচি

এখনকার নব্য সমাজের নব্য রুচি। পুরাতনে আর কাহারও বড় একটা আস্থা নাই। এখন প্রাচীন নীতি, প্রাচীন প্রথা, প্রাচীন কালের আচার-ব্যবহার, পোষাকপরিচ্ছদ সকলি লোপ পাইয়াছে। যে দিকে চাও, সেই-দিকে নব্যরুচির বিকাশ সকল বস্তুতেই দেখিবে। এখন নব্যরুচিরই অনেকেই পক্ষপাতী।

রুচির বিষয় আলোচনা করিতে হইলে আমাদের সামাজিক আচার-ব্যবহারের দিকে প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে। কাজেই সেই সকল বিষয়ের সুরুচি-কুরুচি-প্রসঙ্গ লইয়াই আগে আলোচনা করিতে হয়। আমাদের প্রাচীন রুচি আর আধুনিক নব্য রুচিতে অনেক প্রভেদ, একথা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। তবে সে কালের প্রাচীন সমাজের আচারব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদের কি প্রকার রুচি ছিল, এক্ষণে তাহা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য। সুস্থ, সবলকায়, দীর্ঘজীবী ও নিরোগ হইতে যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সকল বিষয়েই, আহারেবিহারে শয়নেভোজনে সংযম-শীলতা ও সুরুচি রাখিতে হইবে। প্রত্যহ পরিমিত ও আয়ুবর্দ্ধক আহার স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর ও প্রয়োজনীয়। আমাদের প্রাচীন আর্য্যনীতির অনুসারে সূর্য্যোদয়ের চারিদণ্ড পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থানের বিধি। প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের চারিদণ্ড পূর্ব্বে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিলে শরীরের জড়তা দূর হয়; শরীর সতেজ, প্রফুল্ল ও স্বাস্থ্যবান্ থাকে। এজন্য চিন্তাশীল বহুদর্শী প্রাচীন আর্য্যগণ সূর্য্যোদয় হইবার চারিদণ্ড পূর্ব্বে শয্যাত্যাগের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এখনকার নব্য রুচিতে সূর্য্যোদয়ের চারিদণ্ড পরেও বোধ হয় অনেকেই শয্যাত্যাগ করেন না। অনেকে ৭টা ৮টা বাজিলে শয্যাত্যাগ করিয়া থাকেন। প্রত্যূষে ভ্রমণ করিলে শরীর কিরূপ সতেজ, সবল ও প্রফুল্ল হয়, তাহা অনেকেই জানেন। আর তাহার বিপরীত আচরণ যে শরীরের অপকারক, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহার পর স্নানবিধি। প্রাতে উঠিয়া শৌচাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া প্রাতঃস্নান করা বিধেয়। নদীস্রোতের শীতল জলে অবগাহন-স্নানই প্রশস্ত। গরম জলে স্নান সুস্থ শরীরের পক্ষে হিতকর নহে; তবে রুগ্ন শরীরের পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা বটে; কিন্তু এখন অনেকেই দরজা জানালা বন্ধ করিয়া গরম জলে স্নান করেন।

তাহার পর পরিচ্ছদের কথা। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। এজন্য আমাদের দেশে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা গরম কাপড় অল্পই ব্যবহার হয়। সর্ব্বক্ষণ আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত রাখা আমাদের প্রাচীন বিধি নহে। প্রাচীন কালে এখনকার মত পোষাকপরিচ্ছদের এত আড়ম্বর ছিল না। এত মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত আটাসাঁটা পোষাক ব্যবহার ছিল না। শীতগ্রীষ্ম রাত্রিদিন কেহ এরূপ পায়ে মোজা আঁটিয়াও থাকিত না; টুপি, কম্ফর্টার, অ্যালেষ্টার, পেণ্টুলুন, কোট, নেকটাই, কলারের এত আমদানীও ছিল না। বুট, মোজা, ষ্টকিং ইত্যাদির এত আদর ছিল না। প্রাচীন রুচিতে সাদাসিধা পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন পিরাণ বা মের্জাই ও সাদা কাপড়েরই ব্যবহার ছিল। যাহাতে ভদ্রতা এবং গাত্রের উত্তাপ রক্ষা হয়, এইরূপ গাত্রবস্ত্র ব্যবহৃত হইত। সর্ব্বদা সামান্য একখানা মোটা চাদর হইলেই চলিয়া যাইত। তবে অবশ্য শীতের সময় শীতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শাল, বনাত, আলোয়ান বা ধোসার ব্যবহার ছিল। সভাসমিতিতে বা রাজদরবারে যাইতে হইলে পায়জামা, ঢিলা চাপকান, পাগড়ি প্রভৃতির ব্যবহার ছিল; কিন্তু এখনকার নব্যরুচির মত নিরন্তর শীতগ্রীষ্ম ঝুড়ি ঝুড়ি কাপড় ব্যবহার তখন করিত না। এক্ষণে হ্যাট কোট, বুট, কলারেই নব্যরুচি বিশেষ পক্ষপাতী। এক্ষণে অবস্থাপন্ন ধনী ব্যক্তির গৃহে বিদেশী আচারব্যবহারই বহুল পরিমাণে দেখা যায়।

বোধ হয়, সকলেই জানেন—বেশী মাত্রায় যাঁহারা সন্তানসন্ততিদিগকে জামাকাপড় পরাইয়া রাখেন, তাঁহারা নিজেই শিশুদিগের স্বাস্থ্যকে বিকৃত করিয়া তুলেন। অল্পক্ষণমাত্র নগ্নদেহে থাকিলে বা সামান্য একটু হিম লাগিলে বা কিছুক্ষণ খোলা গায় ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলেই তাহারা একটুতেই সর্দ্দি কাসি ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়।

এখনকার রুচিতে কাপড়চোপড় পোষাকপরিচ্ছদের যাঁহাদের যত আড়ম্বর, তাঁহারা তত সভ্য ও সুরুচিসম্পন্ন বলিয়া খ্যাত। আমাদের দরিদ্র দেশে প্রত্যেক গৃহস্থ পরিবার যদি এত পোষাকপরিচ্ছদের আড়ম্বর করিতে যান, তাহা হইলে আমাদিকে দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়িতে হইবে। এজন্য ভদ্রোপযোগী সাদাসিধা স্বল্পমূল্যের বস্ত্রাদি ব্যবহারই আমাদের প্রাচীন নীতিসম্মত। তাহা ছাড়া, আমরা স্বভাবের হস্তে—প্রকৃতির সুকোমল ক্রোড়ে পালিত হইয়া যেরূপ সুস্থ দেহ লাভ করিতে পারি, তাহার বিপরীতে সেইরূপ স্বাস্থ্য লাভ করিতে কখনই সক্ষম হই না।

তাহার পর সেকালের লোকের আহারের রুচি কিরূপ ছিল? আমরা হিন্দুজাতি। আমাদের সমাজ, ধর্ম্মের উপর স্থাপিত এবং আহারাদি সমস্তই বিজ্ঞানমূলক। যে আহার আমাদের পক্ষে পুষ্টিকর, জীবনী-বর্দ্ধক, বলকারক ও সারবান্; আমাদের সেই আহারই বিধি। ফল, মূল, কন্দ বলকারক বলিয়াই ফল, মূল, কন্দ প্রাচীন রুচির হিন্দুর পরম পবিত্র আহার বলিয়া বিদিত। ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, নবনীত আমাদের উৎকৃষ্ট উপাদেয় সারবান্ আহারীয় বস্তু এবং গব্যদ্রব্য অধিকপরিমাণে আহার করিলে শরীরে সাত্ত্বিক ভাবের সঞ্চার হয়। শাকসবজী তরিতরকারি অধিক জীবনী-শক্তি-বিশিষ্ট বলিয়াই আমাদের শাকসবজী তরিতরকারি বহুল পরিমাণে আহারে ব্যবহৃত হয়। তামসিক আহার অপেক্ষা সাত্ত্বিক আহার সকলেরি প্রিয় ছিল। প্রাচীন প্রথা অনুসারে তিথিবিশেষে আমাদের কোন কোন আহার্য্য নিষিদ্ধ ছিল। সকলেই জানেন—তিথিবিশেষে আমাদের শরীরের রসাধিক্য হয়। এজন্য কোন কোন তিথিতে কোন কোন খাদ্যাহার শরীরে অপকারক বলিয়া পরিত্যক্ত হইত। যেমন অমাবস্যায় মৎস মাংস মাষকলাই ইত্যাদিতে অপকার হয়। সেইরূপ তিথিবিশেষে এক একটা আহার ত্যাগের ব্যবস্থা আছে। এক্ষণে নব্যরুচি-মতে এ কথাটা কুসংস্কার বলিয়াই গণ্য; কিন্তু তিথি-বিশেষে আমাদের শরীরের রসের হ্রাস বৃদ্ধি হয় বলিয়া যে কোন কোন আহার নিষিদ্ধ তাহা অনেক নব্যও স্বীকার করেন। আমাদের জীবনী-বর্দ্ধক আহার্য্যই নাই, শাক সবজী খাইয়া দেহ থাকে কি? কিন্তু আমিষ আহার অপেক্ষা নিরামিষ আহার যে স্বাস্থ্যকর, তাহা নিশংসয়।

অনেকে বলেন, মৎস্য মাংস ডিম্ব অপেক্ষা সারবান ও পুষ্টিকর আহার নাই; মৎস মাংস আহার ব্যতীত জীবনরক্ষা কঠিন। এরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। পশ্চিমবাসী লোকেরা মৎস্য মাংস আদৌ আহার করে না। ডাল রুটি তরিতরকারী ও দুগ্ধদধি আহার করিয়া ইহারা যেরূপ বলিষ্ঠ ও সতেজ-শরীর সে হিসাবে মৎস্যমাংস-ভোজীরা তাঁহাদের সমকক্ষ নহেন। এখন নব্যরুচির মতে নিরামিষ আহারের মধ্যেই গণ্য নহে।

নব্যরুচিরা মৎস্য মাংস ও ডিম্বকেই সারবান এবং পুষ্টিকর আহার বলিয়া গণ্য করেন। অনেককে প্রাতর্ভোজনে চা, পাঁউরুটী রোষ্ট ও অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম্ব খাইতে দেখা যায়। নব্যদলের ধারণা যে মাংসের যুষ ও অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম্ব আহারে শরীর যেরূপ সতেজ ও সবল হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না।

এখন অজীর্ণ, অম্ল, উদরাময় ইত্যাদিরও ঐ হেতু বেশী প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ডিসপেপ্‌সিয়া রোগে বোধ হয় অধিকাংশ ব্যক্তিই ভুগিয়া থাকেন। এখন সে কালের মত সুস্থ শরীর, নিরোগী ও দীর্ঘজীবি লোক দেখা যায় না। প্রাচীন কালের ন্যায় একালের লোকের সে স্বাস্থ্য, বল, শক্তি, তেজ, বীর্য্য, সাহস নাই। আমাদের আহারের মধ্যে গব্যবস্তুই প্রধান। লুচি, রুটি, হালুয়া প্রভৃতি পুষ্টিকর ও বলপ্রদ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন প্রাচীন রুচির আহারে লোকের স্পৃহা নাই; নব্যরুচির আহারেই সকলের ঝোঁক।

তারপর আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদিতেও প্রাচীন রুচির পরিবর্ত্তন দাঁড়াইয়াছে। এখন প্রতিগৃহই বিলাতী আয়না, ব্রুস, চিরুনি, এসেন্স, সাবান ল্যাভেণ্ডার, অডিকলম ইত্যাদিতে পূর্ণ। ছাতা জুতা হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় বিদেশী সৌখিন দ্রব্য আমাদের গৃহে গৃহে ব্যবহৃত হইতেছে। প্রাচীন পরিবার, এত বিলাসের ভাণ্ডার ছিল না। সেখানে এত ডজন ডজন মোজা ডজন ডজন কামিজের ব্যবহার ছিল না। তারপর নব্যরুচির আর এক ছবি—চসমাধারণ। এখন দুগ্ধপোষ্য বালকও চসমা ধরিয়াছে, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলে দৃষ্টিশক্তির হীনতার জন্যই চসমা লইতে হইয়াছে! এখন বালক যুবা সকলেই চসমা পরিয়া সভ্যতার চরম উৎকর্ষসাধন করিতেছে; কিন্তু আহারের সঙ্গে দৃষ্টিশক্তির কতটা সম্বন্ধ তাহা বিচার করেন কি?

আমাদের প্রমোদব্যসনেও তাই হইয়াছে। আগে বালকেরা গুলিদাণ্ডা খেলিত, হাডুডু খেলিত। এখন তাহার স্থানে ফুটবল, ক্রীকেট একাধিপত্য করিয়াছে; অর্থাৎ খেলাতেও খরচ বাড়িয়াছে। যুবার দলে আগে পাশা, দাবা-বোড়ে সতরঞ্চ, তাস প্রভৃতি খেলাই প্রচলিত ছিল। এখন তাহার পরিবর্ত্তে ব্রিজ ও রবার খেলা হয়। প্রাচীন সময়ে রামযাত্রা বা কৃষ্ণযাত্রা, পাঁচালি, কবি, পৌরাণিক গীতি ইত্যাদি শুনিতেই লোক ভালবাসিত; এখন থিয়েটার, বাইস্কোপ, সার্কাস সে সকলের স্থান অধিকার করিয়াছে। যিনি থিয়েটারে গিয়া বারাঙ্গনার কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী না দেখিয়াছেন, তিনি মনে করেন, আমার জন্মই বৃথা।

আমাদের চিরন্তন প্রথানুসারে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই প্রণাম-নমস্কার, অভিবাদন-আশীর্ব্বাদ প্রভৃতি যথাযোগ্য ব্যবহারের প্রচলন ছিল। এখন নব্যরুচিতে মাথা হেঁট করিয়া প্রণাম করা ঘোর অসভ্যতার পরিচায়ক। গুরুজনের নিকট মাথা হেঁট করিতে আর কেহই চান না। এখন সম্বন্ধে, কি

ছোট কি বড়, সকলেরই সহিত করমর্দ্দন বা সেকেণ্ড করা পূর্ণ সভ্যতা লক্ষণ হইয়াছে।

অনেকে আবার মাতৃভাষার উপরও বিরূপ। মাতৃভাষাটা যেন দায়-গ্রস্ত হইয়াই বলিতে হয়। বাঙ্গালা পুস্তক, বাঙ্গালা সংবাদপত্রে আর আস্থা-নাই। প্রাচীন রুচিতে সমস্ত দিন সাংসারিক ও বৈষয়িক কার্যকর্ম্মের অবসরে পাঁচজনে একত্র মিলিত হইয়া শাস্ত্রালোচনা, ধর্ম্মালোচনা বা পুরাণ-ভাগবত-রামায়ণ-পাঠ বা নির্দ্দোষ গীতবাদ্য করিত। এখন নব্যরুচিতে ইভনিংপার্টী, কনসার্ট পার্টী, গার্ডেন পার্টী বা ক্লাবে যাওয়া সভ্যতার অনুমোদিত। এখন নব্যরুচিরা বিদেশী আচারব্যবহারই বেশী অনুকরণ করিয়াছেন।

পুরুষদিগের দেখাদেখি সিমন্তিনীগণও এই পথ অবলম্বন করিয়াছেন। দেবার উপযুক্ত দেবীরাই বা না হইবে কেন? এখন ঘরে ঘরে চা-বিস্কুট জল-খাবার। সিমন্তিনীকুল আর অসূর্য্যম্পশ্যা নাই। এখন তাঁহারা স্বাধীন জেনানা। এখন রমণীকুল বিদুষী শিক্ষিতা; কাজেই থিয়েটারে সার্কাসে তাঁহাদের অবাধ গমন হইয়াছে। হার্ম্মোনিয়ম, পিয়নো গ্রামফোনে অনেকেই সিদ্ধহস্ত। নব্য রুচিতে এখন স্ত্রীলোক সর্ব্বস্থানেই পুরুষের সহচারিণী, সকল স্থলেই স্ত্রীলোকের অবাধ অধিকার।

পুরাতন সহ নব্যালোচনা করিলে নব্যরুচি হেয় বলিয়াই মনে হয়। স্বদেশী আচার, স্বদেশী ব্যবহার যে আমাদের একান্ত উপযোগী, তাহা নিঃসন্দেহ। আমাদের দরিদ্র ভারতভূমি বিদেশী আচার শিক্ষা করিয়া দিন দিন আরও অধোগতি লাভ করিতেছে। ইহা সকলের ভাবিয়া দেখাই উচিত। সংযম, বিনয় ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা যেমন একদিকে প্রয়োজন, আবার অন্যদিকে সেইরূপ স্ব স্ব অবস্থার অনুরূপ জাতীয় ধর্ম্ম, আচারব্যবহার প্রতি-পালন করা কর্ত্তব্য। যাহাতে প্রাচীন নীতি, প্রাচীন প্রথা আবার ফিরিয়া আসে, তাহাই প্রার্থনীয়।

শ্রীরত্নমালা দেবী।

খোকাবাবু।

মোর কণ্ঠ জড়াইয়া শিশু কহে "সবারি কবিতা
হ'য়ে গেল। মোর কই? মোর প্রতি নাহি ভালবাসা?"
খোকার সে কাঁদ-কাঁদ মুখখানি, আধ-আধ ভাষা
নিরখি, হইল মোর চিত্ত-রাধা দুঃখিতা, লজ্জিতা!
কহিলাম মনে মনে "খোকাবাবু! ভ্রাতা, ভগ্নী, পিতা,
সবারি তুলনা আছে! সৃষ্টিছাড়া! কোথা তোর বাসা?
চন্দ্র হারে তারা হারে তোর কাছে! একি রে তামাসা!
লাজে তাই অধোমুখী আমারো এ বাসন্তী কবিতা।"
শাদা কুন্দ নিরানন্দ হেরি তোর অতি শুভ্র হাসি;
লাল পদ্ম লাজ পায় হেরি তোর টুক্‌টুকে মুখ!
কেমনে কবিতা লিখি? যাদু তুই আনন্দের রাশি;
তোরে হেরি আশা, প্রেম, প্রীতি, স্নেহে ভরি গেল বুক!
অপূর্ব্ব * বাৎসল্যভাব চিতে জাগে!—বুঝি এতকালে
পাব আমি নীলকান্ত মণি ধনে, ননীচোরা লালে!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

---

* বৈষ্ণবেরা বলেন, আত্যন্তিক বাৎসল্য-ভাবের উদয় হইলে, ভক্ত শীঘ্রই শ্রীভগবানের বালকমূর্ত্তি দেখিতে পান।

চীন-পরিব্রাজকদিগের বঙ্গ-বিবরণ।

ইতিহাস-আলোচনা—বিশেষতঃ, প্রত্ন-তত্ত্বানুশীলন যে—কিরূপ গুরুতর ব্যাপার,—তাহা বড় একটা কাহারও অবিদিত নাই। বিশেষতঃ, প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিবৃত্ত যে কি প্রকার গাঢ় কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন—ইতিহাস-পাঠক-মাত্রেই, তাহা সুবিদিত আছেন। বহু প্রণালী অবলম্বন করিয়া, বঙ্গেতিহাস আলোচিত হইতে পারে। তৎসমুদয়ের আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে, যে পদ্ধতি অনুসারে বঙ্গের পূর্ব্বকাহিনী, এ প্রবন্ধে বিবৃত হইতেছে, তাহাই বলিয়া রাখা আবশ্যক। আমরা সাধারণতঃ চারিটী উপায়ে প্রাচীন বঙ্গ-বিবরণ জানিতে পারি। (১) ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে এমন অনেক উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়—যে গুলি, একত্র করিলে, বাঙ্গালা দেশের কতকটা প্রাচীন ঐতিহাসিক উপাদান বা মালমসলা সংগৃহীত হইতে পারে। সেগুলি শাস্ত্রীয় বচন বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। (২) তার পর আমরা দেখিতে পাই, বিদেশীয় পর্য্যাটকবৃন্দ ও ঐতিহাসিকগণও, বঙ্গেতিহাস-লিখনোপযোগী অনেক বিষয়ই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেগুলি হইতেও বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিবার সুবিধা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। (৩) Archæology (প্রত্ন-তত্ত্ব-বিজ্ঞান) হইতেও বাঙ্গালা-সম্বন্ধে কিছু কিছু সাহায্য পাওয়া যায়। (৪) যে জাতির যে সময়ে যাহা কিছু চূড়ান্ত রকমের ঘটে, সেই জাতির সমসাময়িক সাহিত্যাদিতেও সেগুলির কিছু না কিছু আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সমসাময়িক সাহিত্যও যে, ইতিহাস-জ্ঞান-ব্যাপারে বিশেষ অনুকূল—তাহাতে আর সন্দেহ কি? কাজেই, শাস্ত্রীয় বচন, বিদেশীয় পর্য্যাটক ও ঐতিহাসিকগণের উক্তি, প্রত্ন-তত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমকালিক সাহিত্য দ্বারা যে বঙ্গেতিহাসের কিছু না কিছু জ্ঞাত হওয়া যায়—তাহা মনে করা, বোধ হয়, নিতান্ত অযৌক্তিক হইবে না। চীন, ফ্রান্স্, গ্রীস, পর্ত্তুগাল, হলণ্ড, ফিনিসিয়া প্রভৃতি দেশের পরিব্রাজকবর্গ, নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া, তত্তদ্দেশ-সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাহা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই সমুদয় পুস্তকের মধ্য হইতে বাঙ্গালা দেশ সম্বন্ধে অনেক যথার্থ তথ্য বিদিত হওয়া যায়। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে চীনদিগের ভ্রমণবৃত্তান্তানুসারে বঙ্গের যথাযথ বিবরণ দিতেছি।

চীনদেশে ৬৭ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রবর্ত্তনের পর ফা-হিয়েন্‌ই সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধদিগের পবিত্র স্থান ভারতবর্ষে তীর্থযাত্রায় নিরত হ'ন। ইঁহার ভ্রমণ প্রায় ষোল (১৬) বৎসরকালব্যাপী হইয়াছিল (৩৯৯–৪১৪ খৃষ্টাব্দ)। চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়েন্ খৃষ্টীয় ৩৯৯ অব্দে ভারতে আগমন করেন। তিনি বঙ্গদেশপর্য্যটনও করিয়াছিলেন। "ফো-কুই কি" (Foe koue ki[১]) নামক তদ্রচিত গ্রন্থে অন্যান্য বিবরণের সঙ্গে একটী বঙ্গবিবরণও, তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ফা-হিয়েনের গ্রন্থ রেমুসাট্ (Remusat), ক্লাপরোট্ (Klaproth) ও লান্দ্রেস্ (Landdresse) কর্ত্তৃক ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়। ইহার ইংরেজি অনুবাদও, ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পর ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বীল (Beal) সাহেব সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে "Buddhist Pilgrims" (বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী) নামে বহুভ্রমপূর্ণ এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কতক অংশে সংশোধিত ইহার একটী সংস্করণও, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অনন্তর ফা-হিয়েনের আর দুইটী সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছিল। গাইল্‌সের (Giles) সংস্করণ, ১৮৭৭ এবং লেগের ((Legge) সংস্করণ, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; কিন্তু, এই কয়েকটি অনুবাদের কোনখানিই প্রীতিপ্রদ বলিয়া বোধ হয় না। তবে, ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে "ফো-কুই-কি"র যে একটি ফরাসী অনুবাদ প্রকাশিত হয়, তাহাই সমধিক সমীচীন বলিয়া আমাদের ধারণা। ইহার ৩২শ অধ্যায়ে যে বঙ্গবিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, আমরা তাহার বঙ্গানুবাদ করিয়া দিলাম। "গঙ্গার স্রোতোভিমুখে ক্রমাগত পূর্ব্বদিক্ ধরিয়া, ১৮শ যোজন গমন করিলে, তোমরা ঐ নদীর দক্ষিণ তীরস্থ "চেন্‌ফো" (চম্পা) নামক বৃহৎ সাম্রাজ্যে উপস্থিত হইবে। পথিমধ্যে [দেখিবে] 'ফো'-(বুদ্ধ)-মন্দির-মধ্যে এবং যে চারিটি (৪) স্থানে 'ফো' (বুদ্ধ) উপবেশন করিয়াছিলেন, তাহারা কতকগুলি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছে। এ গুলিতে সাধারণতঃ ধর্ম্মযাজকেরা বাস করিয়া থাকে। এই স্থান হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ন্যূনাধিক ৫০ (পঞ্চাশ) যোজন অগ্রসর হইলে, তোমরা "তো-মো-লি-তি" (১) (To-mo-li-ti) রাজ্যে উপনীত হইবে। এই স্থান [গঙ্গা ও] সমুদ্রের সঙ্গমস্থল। এই সাম্রাজ্য কুড়িটী (২০) 'সেঙ্-

(১) তমলুক-নামক স্থান।

কিয়-লন্' (Sen-kia-lan) অর্থাৎ সঙ্ঘারাম আছে; এ গুলিতে ধর্ম্মযাজকদিগের বাস,—অপিচ, 'ফো'র (অর্থাৎ বুদ্ধের) নিয়ম খুব প্রচলিত।"

উপরিউক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ফা-হিয়েন্, ধর্ম্মগ্রন্থলিখনে ও মূর্ত্তি-চিত্রণে ব্যাপৃত থাকিয়া, তথায় দুই বৎসরকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই সময় কয়েকজন বণিক্ যে জাহাজে করিয়া পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে যাইতেছিলেন, তিনি সেই জাহাজে আরোহণ করিলেন। শীতকালের প্রারম্ভে সু-বাতাস বহিতেছিল; ক্রমান্বয়ে ১৪ (চৌদ্দ) দিবস ও তৎসংখ্যক রাত্রি জাহাজ চলিবার পর, তিনি "সেৎ-সু-কুয়ে" দেশে [সিংহের রাজ্যে= সিংহলে] উপস্থিত হইলেন। "[তো-মো-লি-তি] প্রদেশের লোকেরা বলে যে, এই রাজ্য তাহাদের রাজ্য হইতে ৭০০ (সাত শত) যোজন দূরবর্ত্তী।"

অতঃপর সুঙ্-য়ুন (Sung-yun) ও হোয়েই-সাঙ্ (Hwei-Sang) নামক দুই জন চীন পরিব্রাজক, খৃষ্টীয় ৫১৮ অব্দে, ভারতে আগমন করেন। ইঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত, অতীব সংক্ষিপ্ত ও তন্মধ্যে বঙ্গবৃত্তান্ত কিছুই পাওয়া যায় না।

ইহার পর পরিব্রাজকবর সুবিখ্যাত অন্ য়ুয়ন্-চয়ঙ্ (On-Yuan-Chwang) [যাঁহাকে সাধারণতঃ আমরা 'হুয়েন্-সঙ্' 'হয়েন্থ-সাঙ্' ইত্যাদি নামে আখ্যাত করিয়া থাকি, তিনি] ভারতে আগমন করেন। ইনি খৃষ্টীয় ৬২৯ হইতে ৬৪৫ অব্দ পর্য্যন্ত ১৭ (সপ্তদশ) বর্ষ নিয়ত পর্য্যটনে ব্যাপৃত ছিলেন এবং ভারতের দক্ষিণাংশ ব্যতীত সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের নাম "Si-yu-ki" ('সি-য়ু-কি') অর্থাৎ পশ্চিম রাজ্যের বৃত্তান্ত। এই গ্রন্থখানি ফরাসী, ইংরেজি ও জর্ম্মাণ ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। এই মহাত্মার জীবনী তদীয় বন্ধু Hwui-li কর্ত্তৃক লিখিত হয়। তাহাতে ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা আছে। অন্‌য়ুয়ন্-চয়ঙের জীবনীসহ তদীয় গ্রন্থের অনুবাদ, ১৮৫৩-৮ খৃষ্টাব্দে মুসো ষ্টনিস্‌লাস্ জুলিয়েন্ ফরাসী ভাষায় তিন খণ্ডে প্রকাশ করেন। পরে, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বীল সাহেব, বর্গেসের (Burgess) টীকা-টিপ্পনী-সমেত এক ইংরেজি ভাষান্তর প্রকাশ করেন। ইহার পর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ওয়াটার্স (Watters) সাহেব দুই খণ্ডে এক সুন্দর অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহার ন্যায় গ্রন্থ, পূর্ব্বে কখনও প্রকাশিত হয় নাই। আর ইহার মত চীনভাষায় সুপণ্ডিত, পূর্ব্বে

কেহ ছিলেন বলিয়া বোধ হয় হয় না। ইনি সবিশেষ যুক্তি দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে,অন্-য়ুয়ন্-চয়ঙের নামে সকলে,ভ্রান্তবর্ণযোজনা করিয়া থাকেন। যথা ঃ—

(১।২) Julien ও Wadeএর মতে ইঁহার নাম Hiouen Thsang.

(৩) Mayersএর মতে Huan Chwang.

(৪) Wylieর মতে Yuen Chwang.

(৫) Beal এর মতে Hiuen Tsiang,

(৬) Leggeর মতে Hsüan Chwang,

(৭) Nanjio মতে Hhüen kwan,

(৮) Rhys Davids এর মতে Yüan Chwang,

(৯) V. A. smith এর মতে Hiuen Tsang ইত্যাদি।

কিন্তু, ঐ গুলি চীনভাষার বৈয়াকরণ রীতিবিরুদ্ধ। ওয়াটার্সের বানানই সর্ব্বথা গ্রহণীয়।

জুলিয়েনের গ্রন্থ হইতে অন্-য়ুয়েন্-চয়ঙের ভ্রমণবৃত্তান্তের কিয়দংশ ভাষান্তরিত করিয়া দিলাম। এই অনুবাদে ওয়াটার্সের (Watters) টীকা-টিপ্পনীর যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

"এই স্থান (চম্পা) হইতে, অন্যূন ৪০০ (চারিশত) লি পূর্ব্বদিকে গমন করিলে, আমরা "ক-ষেঙ্-কী-লো" (ka-sheng-kie-lo) সাম্রাজ্যে উপস্থিত হই। * * * * এখান হইতে পূর্ব্বদিকে গিয়া ও গঙ্গা পার হইয়া প্রায় ৬০০ (ছয় শত) লি [গমন করিলে] পর, "পু-ন-ফ-তন্-ন" (পুণ্ড্রবর্দ্ধন) নামক স্থানে উপনীত হই। [এখানেও তিনি পবিত্র চিহ্নগুলির প্রতি যথোচিত সম্মান দেখাইয়াছিলেন] * * তথা হইতে প্রায় ৯০০ (নয় শত) লি পূর্ব্ব-দক্ষিণে গমন করিয়া, আমরা "কী-লো-ন-সু-ফা-ল-ন" (কর্ণসুবর্ণ) [নামক] স্থানে উপস্থিত হই। সেখানে প্রায় ১০ (দশটী) সঙ্ঘারাম ও ৩০০ (তিনশত) ধর্ম্মযাজক আছে।

* * * সেখান হইতে পশ্চিম-দক্ষিণে গমন পূর্ব্বক আমরা 'সমতট' প্রদেশে সমুপনীত হই। ইহার সম্মুখস্থ ভূমির সীমা, সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে * * * * এখান হইতে পূর্ব্বোত্তরে সমুদ্রের তীর দিয়া, পর্ব্বত ও উপত্যকার মধ্য দিয়া গমন করিলে, আমরা "চি-লিৎ-স-ত-লো" (শ্রীক্ষেত্র) [নামক] স্থানে আসি; আরও পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে সমুদ্রের মধ্যে

'কামলঙ্কা' (২) (কুমিল্লা); ইহারই পূর্ব্বে দ্বারাপতি (৩) Sandoway); ইহার পূর্ব্বে ঈশানপুর প্রদেশ; তাহার পূর্ব্বে মহাচম্পা, কোচিন-চায়না ও আনামের অংশ—অপর নাম ('লিন-ই'); তৎপশ্চিমে "য়েন-মো-লো" প্রদেশ (যমরাজ ;—বোধ হয় যবনপ্রদেশ. "য়েন-নো-ন-চৌ" দেশকেই বুঝাইতেছে) এই ৬ (ছয়টী) রাজ্য পর্ব্বত ও গভীর সমুদ্রের দ্বারা সীমাবদ্ধ"।

[যদিও অন্-য়ুয়ন-চয়ঙ্ তাহাদের দেশমধ্যে প্রবেশ করেন নাই, তথাপি তিনি তাহাদের রীতি-নীতির জ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।]

"পশ্চিম দিক্ ধরিয়া প্রায় ৯০০ (নয়শত) লি "সমতট" প্রদেশ হইতে গমন করিয়া আমরা 'তাম্রলিপ্তি' রাজ্যে আসিয়া পড়ি।"

"[এই স্থানটী] সমুদ্রের একটি * * * উপরিস্থিত। এখানে ১০ (দশটী) সঙ্ঘারাম এবং প্রায় ১০০০ (একহাজার) ধর্ম্মযাজকের সম্মিলন দেখা যায় (৪)। * * ৭০০ (সাতশত) যোজন, ক্রমান্বয়ে জলযাত্রা করিয়া সেই (সিংহল) প্রদেশে উপনীত হওয়া সম্ভব হইয়াছে।"

ফা-হিয়েন্ ও অন্-য়ুয়ন-চয়ঙের উপরিলিখিত বিবরণ আলোচনা করিলে, বুঝা যায় যে, তাঁহাদের সময়ে বঙ্গদেশ নিম্নলিখিত ৬ (ছয়টী) রাজ্যে বিভক্ত ছিল :—

(১) পুণ্ড্রবর্দ্ধন (বা উত্তর বঙ্গ, ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমভাগ)।

(২) কামরূপ (বা ময়মনসিংহের পূর্ব্বভাগ, শ্রীহট্ট, মণিপুর, কাছাড়-সহ পূর্ব্ববঙ্গ)।

(৩) সমতট (বা ঢাকা ও ফরিদপুর)।

(৪) কামলঙ্কা (বা ত্রিপুরা অথবা কুমিল্লা)।

(৫) তাম্রলিপ্তি (বা দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ)।

(৬) কর্ণসুবর্ণ (বা পশ্চিম বঙ্গ)।

চীন-পরিব্রাজকগণ, দূরত্ব বুঝাইবার জন্য 'যোজন' ও 'লি' এই দুইটী শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু, যোজন ও লি বলিলে কত মাপ বুঝিতে হইবে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। অথচ, খৃষ্টীয় ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে

---

(২) প্রচলিত ইতিহাসে "কমলাঙ্ক" বলিয়া উল্লিখিত। এই উচ্চারণ ভ্রান্তিমূলক।

(৩) দ্বারাপতি—(দ্বারাবতী)—"Sanskrit name for Ayuthya or Ayudhya the ancient capital of Siam"—Watters.

(৪) বর্ত্তমানে ও সকলের কিছুই বিদ্যমান নাই।

ভারতের প্রকৃত বিশ্বাসযোগ্য ভৌগোলিক বিবরণ, চৈনিক বিবরণ ভিন্ন অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে মতান্তর দেখুন ঃ—

১। অন্-য়ুয়ন্-চয়ঙের যোজন H. H. Wilson এর মতে ইংরেজি ঃ (চারি) মাইলের সমান।

২। G. Cunningham এর মতে ৬. ৭৫ মাইল।

৩। V. A. Smith এর মতে ৬. ৫ মাইল।

৪। Julien এর মতে ৮ মাইল।

৫। ফা-হিয়েনের যোজন Gen. Cunningham এর মতে ৬. ৭: ইংরেজি মাইল।

৬। Sir H. M. Elliot এর মতে ৭ মাইল।

৭। V. A.Smith এর মতে প্রায় ৭.২৫ মাইল।

৮। Giles এর মতে ৫ হইতে ৯ মাইল।

৯। Dr. M. A. Stein বলেন, বর্ত্তমান রাজধানী শ্রীনগরের চতুর্দ্দিকে অন্-য়ুয়ন-চয়ঙের সময় যোজন ইংরেজি ৮ মাইলের সমান;

১০। এই সমস্ত বিভিন্ন মতের যথেষ্ট প্রতিবাদ করিয়া Major W. Vost, I. M. S. (J. R. A. S. 1904) প্রমাণ করিয়াছেন যে, অন্-য়ুয়ন--চয়ঙের যোজন ৫·২৮৮ ইংরেজি মাইলের সমান এবং ফা-হিয়েনের যোজন প্রায় ৭.০৫০ মাইলের সমান এবং "লি" = ·১৩২২ ইংরেজি মাইল।

ফা-হিয়েন "চম্পা" অর্থাৎ বর্ত্তমান ভাগলপুর হইতে ৫০ (পঞ্চাশ) যোজন অর্থাৎ ২৫০·২৮৮ মাইল পূর্ব্বাভিমুখে আগমন করিয়া তাম্রলিপ্তিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ফা-হিয়েনের "চেনকো" যে চম্পা এবং চম্পা, চম্পাপুর বা চম্পানগরই যে, বর্ত্তমান ভাগলপুর —তাহা নূতন করিয়া প্রমাণ করিবার আবশ্যক নাই। ইহা মুঙ্গের হইতে ৫০ মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ইৎ-চিঙ্ (It-Ching) কিয়দ্দিন এই চম্পায় অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহাকে তিনি নালন্দা হইতে ৬০। ৭০ যোজন দূরবর্ত্তী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (৫)

জলপথে চীনদেশ হইতে ভারতযাত্রাকালে পর্য্যটকগণ এইস্থানেই অবতরণ করিতেন। এইস্থানেই ইৎ-চিঙ ও অন্যান্য চৈনিক পরিব্রাজক জাহাজ হইতে অবতরণ করেন এবং এই স্থান হইতেই তাঁহারা ভারতের দক্ষিণে গমন ও চীনদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। [Takakusu, pp. 185-211, Nan-hai-

(৫) Chavannes, Mem. p. 97 ; Hsi-yu Chiu, ch I.

Chi-Kuei, ch 34 and 40 ; Chavannes, p. 71] তোমলুক ও প্রাচীন তাম্রলিপ্তি একই, এই সাধারণ মত ভ্রমপূর্ণ বলিয়া প্রমাণ করিতে ফার্গুসন সাহেব যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। ইঁহার মতে সাতগাঁ-ই তাম্রলিপ্তি। (Op. c. p. 243). কিন্তু, সম্প্রতি শ্রীরাজেন্দ্রলাল গুপ্ত মহাশয় প্রাচীন তাম্রলিপ্তির ইতিবৃত্তালোচনায় নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রাচীন তাম্রলিপ্তি ও তোমলুক অভিন্ন স্থান। (J. Bud. Text. Soc. Vol V, pt II, p4) এই তোমলুক ফা-হিয়েন্ ও অন্-য়ুয়ন-চয়ঙের সময় বিশেষ সমৃদ্ধিশালী বন্দর ছিল। ফা-হিয়েন্ এইখানে ২ (দুই) বৎসর শাস্ত্রালোচনা করিয়াছিলেন। তিনি এখানকার লোকদিগকে 'সজ্জন' বলিয়াই জানিতেন। "মহাবংশেও" ইহার নাম 'তামলিত্তি' (১৯শ অধ্যায়)। বৌদ্ধদিগের মতে এই প্রদেশ, প্রাচীনকালে অতি সুবিখ্যাত ছিল। পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে জম্বুদ্বীপরাজ ধর্ম্মাশোক, সিংহলের রাজার নিকট এক দূত প্রেরণ করেন। এই দূত তাম্রলিপ্তির বন্দরে নামিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব, এখানেও পর্য্যাপ্ত ছিল; কিন্তু, অধিকাংশ লোকে কুসংস্কারাপন্ন ছিল (৬)। অন্-য়ুয়ন্-চয়ঙ যে বিবরণ দিয়াছেন, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, যখন তিনি ভারতের পূর্ব্বভাগে আসিয়া বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করেন, তখন তিনি চম্পা বা ভাগলপুর হইয়া ৫২০ মাইল পূর্ব্বাভিমুখে আগমন করিয়া কজঙ্গলে উপস্থিত হ'ন। এই কজঙ্গল বা কজঙ্গলা বৌদ্ধপালিগ্রন্থোল্লিখিত এতৎসন্নিকটবর্ত্তী একটী স্থান। [J. R. A. S, 1904, pp 86-88]।

ক্যানিঙ্হামের মতে ইহা কাঞ্জোল—এক্ষণে রাজমহল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ফার্গুসন্ অনুমান করেন, ইহা হয় 'রাজমহল' বা 'শিলিগুড়ি' অথবা 'উভয়ের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থান'। তঙ্-য়ু'র (Tang-shu) মতে পুণ্ড্রবর্দ্ধন, কামরূপ হইতে ১২০০ লি দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। ক্যানিঙ্হাম বর্ত্তমান 'পাবনা' জিলার সহিত ইহাকে অভিন্ন বলিতে চান। কিন্তু ফার্গুসন্ সাহেবের মত এই যে, বর্ত্তমান রঙ্গপুরের সহিত ইহার দূরত্ব মিলে, ইহা সঙ্গত বলিয়া বোধ

(৬) অন্-য়ুয়ন্-চয়ঙের উক্তিতে "তাম্রলিপ্তির" পরিধি ১৪০০ লি ; ইহার রাজধানী ১০ লির অধিক বিস্তৃত, ইহা উপসাগরের সন্নিকটবর্ত্তী এবং নিম্নভূমি। এখানে কৃষিকার্য্য খুব ভালরূপেই হইয়া থাকে, প্রচুর পরিমাণে পুষ্প পাওয়া যায়। অত্রত্য জলবায়ুমৃত্তিকা কিছু উষ্ণ। অধিবাসীরা অতি সাহসী; কিন্তু রুক্ষস্বভাবাপন্ন ও ধনশালী: ইহারা বৌদ্ধ ও অন্যান্যধর্ম্মাবলম্বী। এখানে পঞ্চাশের অধিক দেবমন্দির আছে, ১০টী বৌদ্ধমঠ ও সহস্রাধিক বৌদ্ধশ্রমণ আছে। এই স্থানে বহুবিধ মূল্যবান্ সামগ্রী সংগৃহীত হইয়া থাকে।"

হয়। [A. G. I. p. 480 ; Ferguson op. c. p. 238]। এই কঞ্জগল হইতে ৭৯·২২ মাইল পূর্ব্বাভিমুখে গিয়া ও গঙ্গাপার হইয়া, তিনি পুণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়া উপস্থিত হন এবং একটী বিস্তৃত নদ পার হইয়া কামরূপে আগমন করেন। বর্ত্তমান কামরূপ অর্থাৎ পশ্চিম আসাম ও তাহার রাজধানী গৌহাটীর সহিত চীনপর্য্যাটক-বর্ণিত কামরূপের সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। 'তঙ্-যু'তে এই দেশটী উত্তর ব্রহ্মের ১৬০০ লি পশ্চিমে, কৃষ্ণপর্ব্বতের পরপারে এবং ভারতবর্ষে অবস্থিত বলিয়া কথিত আছে। ইহা পুণ্ড্র বর্দ্ধনের ৬০০ লি পূর্ব্ব-দক্ষিণে অবস্থিত। কামরূপ ও পুণ্ড্রবর্দ্ধনের মধ্যবর্ত্তী নদের নাম "Ka-lo-tu" কা-লো-তু। বোধ হয় ইহাই ব্রহ্মপুত্র। (৭)

এই ক্ষমতাশালী কামরূপ রাজ্য, ২০০০ (দুই সহস্র) মাইল বিস্তৃত ছিল। ইহার ভূমি নিম্ন। এখানে নিয়মিতরূপে ধান্য উৎপন্ন হইত ; প্রচুর পরিমাণে কাঁটাল ও নারিকেল জন্মিত ; নগরের চারিদিকে পয়ঃপ্রণালী দিয়া জল প্রবাহিত হইত। এখানকার জল-বায়ু-মৃত্তিকা অতি সুন্দর ; লোকেরা সচ্চরিত্র, উন্নতমনা, উদ্যমশীল ও সাধু ছিল। অধিবাসীরা খর্ব্বাকৃতি ও কৃষ্ণকায় ; তাহাদের ভাষা মধ্যভারতের ভাষা হইতে কিছু বিভিন্ন। তাহারা সাকার দেবতার উপাসনা করিত। ইহাদের মধ্যে কেহই বৌদ্ধ ছিল না। এখানে বৌদ্ধদিগের মঠের সংখ্যা অতি অল্প ছিল এবং তাহারা অতি গুপ্তভাবে ধর্ম্মানুশীলনাদিতে অভ্যস্ত ছিল।—এই দেশে শতাধিক দেবমন্দির ছিল। যে সময় চীনপরিব্রাজক, এখানে আসিয়াছিলেন, তখন নারায়ণ দেব-বংশীয় ভাস্কর বর্ম্মা কামরূপে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। ইঁহার অপর নাম কুমার বর্ম্মা। এই বংশ অতি প্রাচীন এবং সহস্র পুরুষ ধরিয়া রাজোপাধি লাভ করিয়া আসিয়াছেন। ভাস্কর বর্ম্মা বিদ্যোৎসাহী ছিলেন ; প্রজারাও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতেন। সঙ্গতিপন্ন ও বিদ্যালিপ্সু লোকেরা, অধ্যয়নার্থ কামরূপে আগমন করিত। রাজা, শ্রমণদিগকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন, ইহাই কামরূপ-সম্বন্ধে চৈনিক বিবরণ। ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমাংশ, পুণ্ড্রবর্দ্ধনের অধিকারভুক্ত ছিল ;—কিন্তু ঐ পশ্চিমাংশ,তখন কামরূপের অধীন। এই পুণ্ড্রবর্দ্ধনের জনসংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল। দেশটী পুষ্করিণী, পুষ্প-তরু ও বৃক্ষরাজিতে সুন্দর ও সুশোভিত দেখাইত। এখানে

(৭) "লৌহিত্য"—ব্রহ্মপুত্রের নামান্তর। ইহার সহিত চীন নামের সম্বন্ধ থাকিতে পারে।

ধান্য ও কাঁটাল প্রচুর পরিমাণে জন্মিত। লোকেরা কাঁটাল খুব ভালবাসিত। বিদ্যালাভের দিকে সকলেরই আগ্রহ দৃষ্ট হইত। এখানকার আব্হাওয়া বেশ ভালছিল। অতঃপর অন্য়ুয়ন্-চয়ঙ্ কামরূপ হইতে কর্ণসুবর্ণে (৮) গমন করেন। ইহার ব্যাস ৪৪৫০ লি এবং ইহার রাজধানী ২০ (কুড়ি) লি বিস্তৃত। এখানে বহুজাতি ও নানাধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা বাস করিত। সম্মত্য সম্প্রদায়ের দ্বিসহস্রাধিক বৌদ্ধগণ, এখানে যে ১০।১১টী বৌদ্ধমঠ ছিল—তাহাতেই থাকিতেন। এখানে তখন ৫০টী দেবমন্দির বিদ্যমান থাকার কথা জানা যায়। লোকেরা সাধারণতঃ ধনী, সচ্চরিত্র ও বিদ্যানুরাগী। ফল,পুষ্প ও ধান্য এখানকার উৎপন্ন দ্রব্য। এক সময়ে এই প্রদেশ অত্যন্ত বৃহৎ, সমৃদ্ধিশালী ও মগধের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল। তার পর অন্য়ুয়ন্-চয়ঙ্, কর্ণসুবর্ণ হইতে "সমতটে" গমন করেন। তৎকালে সমতট সমুদ্রতটে অবস্থিত ছিল।

সমতটের পরিধি ৩০০০ (তিন হাজার) লি এবং ইহার রাজধানীও, ২০ (কুড়ি) লি বিস্তৃত। এস্থলে ৩০ (ত্রিশ) টীরও অধিক বৌদ্ধমঠ ছিল এবং এগুলিতে ২০০০ (দ্বি-সহস্রাধিক) স্থবির বৌদ্ধ বাস করিতেন। সমতটে ১০০ (একশত) দেবমন্দির ছিল। এখানে বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা থাকিত। তবে, দিগম্বর নিগ্রন্থের সংখ্যাই কিছু বেশী। ক্যনিঙহাম্ সমতটের এই বর্ণনা দিয়াছেন—"The delta of the Ganges and its chief city which occupied the site of the modern Jessore" [A. G. I. p. 50] ফার্গুসনের মতে সমতট বর্ত্তমান ঢাকা জেলা এবং সোনার গাঁ ইহার পূর্ব্ব রাজধানী ছিল—[op. C. P, 242]। ওয়াটার্সের মতে ইহা ঢাকার দক্ষিণে ও ফরিদপুরের পূর্ব্বভাগস্থ জেলায় অবস্থিত ছিল। ইহাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। ইত্-চিঙের মতে সমতট পূর্ব্বভারতে অবস্থিত। [Hsi yü-Ch'iu, ch 2, and chauannes, Memoires, p 128 and note]

তার পর অন্য়ুয়ন-চয়ঙ্ তাম্রলিপ্তিতে আগমন করেন। তিনি বলেন—এখানে বহুসংখ্যক স্থলযান ও জলযান গমনাগমন করিত। ইহার অন্যান্য বিবরণ, ইত:পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। অন্-য়ুয়ন-চয়ঙের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে

(৮) ফার্গুসনের মতে কর্ণসুবর্ণ বলিলে বর্দ্ধমানের উত্তরাংশ, সমগ্র বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর ও বিশেষরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত যশোর—এই কয়েক স্থানকেই বুঝাইত। [Op. C, p.248]

ইৎ-চিঙ্ It-Ching নামে আর একজন বৌদ্ধ পর্য্যাটক ৬৭১ খৃষ্টাব্দে ভারত-যাত্রা করেন এবং ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ভাগীরথীর (Hugli-river) মোহানায় তাম্র-লিপ্তিতে উপনীত হন। ইনি বৌদ্ধ-শিক্ষা-কেন্দ্র নালন্দায় রাজগৃহের উপত্যকার পূর্ব্বসীমায় অনেক দিন ধরিয়া অধ্যয়ন করেন; ৪০০ (চারিশত) সংস্কৃত পুস্তক সংগ্রহ করেন। ইহাদের শ্লোক সংখ্যা ৫০০০০০ (পঞ্চলক্ষ)। চীন-প্রত্যাবর্ত্তন-কালে তিনি শ্রীভোগ (সুমাত্রার মধ্যবর্ত্তী Palembang) নামক স্থানে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এইখানে তিনি আরও কিছুদিন অধ্যয়ন করেন এবং সংস্কৃত বা পালিভাষার কতকগুলি গ্রন্থানুবাদ করেন। ইৎ-চিঙ শ্রীভোগ হইতে তাঁহার সংগৃহীত গ্রন্থ চীনদেশে পাঠাইয়া দেন। সেখানে তাহা Ta-Ts'in নামে অপর একজন চীন পুরোহিত কর্ত্তৃক অনূদিত হয়। Ta-Ts'in চীনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন; সুতরাং ইৎচিঙের গ্রন্থের নাম হইল—"Nan-hai-chi-kuci-na-fa-ch'uan" অর্থাৎ "দক্ষিণ সমুদ্র হইতে গৃহ-প্রেরিত গূঢ়-তত্ত্ব-লিপি"। ইৎচিঙের সময় Malaya উপদ্বীপের সন্নিকটস্থ দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপ বলিয়া কথিত হইত। ইৎ-চিঙ্ ৬৯৫ খৃষ্টাব্দে চীন দেশে ফিরিয়া আসেন এবং তদানীন্তন সম্রাট্‌পত্নী Wu-hon কর্ত্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। ইৎ-চিঙ্ ২৫ বৎসর (৬৭১-৬৯৫ খৃঃ) বিদেশে অতিবাহিত করেন। ৬৯৫ খৃষ্টাব্দের পর তিনি "শিক্ষানন্দ," "ঈশ্বর" প্রভৃতি ৯ (নয়) জন ভারতীয় পুরোহিতের সহিত বৌদ্ধগ্রন্থের ব্যাখ্যাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ৭১৩ খৃষ্টাব্দে ৭০ (সত্তর) বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইঁহার গ্রন্থ ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে প্যারীনগরে Chavannes কর্ত্তৃক অনূদিত হয়। ইহার নাম—"Les Religieux Eminents qui allerent chercher la loi dans les pays d'occident" ইৎ-চিঙের অপর গ্রন্থ—"A record of the Buddhist Religion,as practised in India and the Malay Archipelago (৬৭১-৯৫খৃ) নামে J. Takakusu কর্ত্তৃক ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে অনূদিত হয়। এই গ্রন্থ হইতে বঙ্গদেশ-সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"Kacha-র উত্তরে নগ্নজাতিদিগের দেশ হইতে প্রায় একমাস কাল জলযাত্রা করিয়া আমরা তাম্রলিপ্তিতে উপস্থিত হই। ইহা মহাবোধি ও নালন্দা হইতে ৬০ (ষাট) যোজনের অধিক দূরবর্ত্তী।" * * * * *

"Hsien Heng" অব্দের চতুর্থ বর্ষে (অর্থাৎ ৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে) দ্বিতীয় মাসের ৮ম দিবসে আমরা তাম্রলিপ্তিতে উপনীত হই।" * * * *

তাম্রলিপ্তি, হুগলির রূপনারায়ণনদের মোহানায় স্থিত বর্ত্তমান তমলুক। ইহা ভারতের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত এবং ইৎ-চিঙের সময় ইহা ভারত ও চীনের সহিত বাণিজ্যের প্রধান স্থান ছিল। ইৎ-চিঙ্ তাম্রলিপ্তির বিবরণ এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ—"মোটামুটি ধরিতে গেলে, ভারতের মধ্যদেশ হইতে ইহা প্রান্তদেশ—পূর্ব্বে ও পশ্চিমে ৩০০ (তিন শত) যোজনেরও অধিক। দক্ষিণে ও উত্তরে সীমান্তভূমি ৪০০ (চারিশত) যোজনেরও অধিক দূরবর্ত্তী। যদিও আমি নিজে দেখি নাই এবং নির্দ্ধারণও করি নাই—তথাপি অনুসন্ধান দ্বারা এইরূপই জানিয়াছি। ভারতের পূর্ব্বসীমা হইতে তাম্রলিপ্তি ৪০ (চল্লিশ) যোজন দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে ৫।৬ (পাঁচছয়টী) ধর্ম্মমন্দির আছে ; অধি-বাসীরা সকলেই ধনী। ইহা পূর্ব্বভারতের অন্তর্গত ; 'মহাবোধি' ও "শ্রীনালন্দ" হইতে প্রায় ৬০ (ষাট্) যোজন। এই স্থানেই আমরা চীনপ্রত্যাবর্ত্তনের সময় প্রত্যাগমন করিয়া থাকি। এই স্থান হইতে ২ (দুই) মাস ক্রমাগত পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়া আমরা "ক-চ" (Ka-cha) নামক স্থানে উপস্থিত হই। ইতোমধ্যে 'ভোগ' হইতে কোন জাহাজ আসিয়া থাকিবে। সাধারণতঃ, বৎসরের ১ম ও ২য় মাসে এইরূপ হইয়া থাকে ; কিন্তু যাঁহারা সিংহলে যাইবেন, তাঁহারা অবশ্যই পশ্চিম-দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিবেন। লোকে বলিয়া থাকে যে, সেই দ্বীপ ৭০০ (সাত শত) যোজন দূরে অবস্থিত। আমরা 'ক-চে' শীত ঋতু পর্য্যন্ত অবস্থান করিলাম। সেই সময় দক্ষিণে যাইবার নিমিত্ত জাহাজে আরোহণ করি, এবং মাসান্তে মলয় (Malaya) প্রদেশে আগমন করি। ইহা 'ভোগ'-নামে অভিহিত হইয়া থাকে।" ইত্যাদি।

ইৎ-চিঙের সমতটের কথা, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহার সময়ে সমতটের রাজার নাম "হো-লো-ষে-পো-ত" (Hoh lo-she-po-ta) উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাকে সাভান্ (chavannes) 'হর্ষভট' (Harshabhata) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহার মতে চীনভাষায় এই নামের "হর্ষ" এই অক্ষরগুলির অর্থ "রাজা" ; সুতরাং নৃপতির নাম সম্ভবতঃ 'রাজভট'। এই রাজা বৌদ্ধ-মতাবলম্বী ও বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী। ইনি ২০০০ হইতে ৪০০০ (দুই হইতে চারি হাজার) তীর্থযাত্রীর ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। অন্-য়ুয়ন্-চয়ঙ্ বলেন, ইঁহারা সকলেই স্থবির-সম্প্রদায়ভুক্ত। ইৎচিঙের সময় ইঁহারা 'ঘোর মহাযানাবলম্বী' ছিলেন।

ইউঙ্-লো (Yung-lo) নামক একজন চীন-সম্রাট্ ছিলেন। ইঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাট্ হুইতিকে (Huiti) সিংহাসন-চ্যুত করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। তিনি দেশত্যাগ করিয়া যে, কোথায় গেলেন-তাহার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। ইউঙ্-লো এই নিরুদ্দিষ্ট সম্রাটের অনুসরণের জন্য এবং সেই সঙ্গে বিদেশীয় জাতিসমূহের নিকট চীনের অর্থবল ও সামরিক-শক্তি-প্রদর্শন-মানসে মাহুয়ান্ (Mahuan) নামক এক জন চীন-দূতকে চেঙ্ হো (Cheng-Ho), ওয়াঙ্-চিঙ্-হুঙ্ (Wang-ching-hung) প্রভৃতি কয়েক জনকে সঙ্গে লইয়া, পশ্চিম মহাসাগরের নানা রাজ্যে অভিযান করিতে আদেশ করেন। তাঁহারা যে সকল রাজ্যে ভ্রমণ করিয়াছিলেন—মাহুয়ান্ তন্মধ্যে (২০) কুড়িটি রাজ্যের বর্ণনা করিয়া একখানি গ্রন্থরচনা করিয়া গিয়াছেন। তদ্রচিত "ইঙ্-ইয়াই-চিঙ" অর্থাৎ 'মহাসমুদ্রের উপকূলের সাধারণ বর্ণনা' নামক বৃহৎ গ্রন্থের একটী অধ্যায়ে বাঙ্গালা রাজ্যের নিম্নলিখিত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় :—

"জাহাজে করিয়া "সু-মেন্ত-ল" (= আচীনের নিকটবর্ত্তী সুমাত্রার অন্তর্গত সমলেঙ্গ) রাজ্য হইতে নিয়বর্ণিত পথ অবলম্বন করিয়া 'পাঙ্কোলা' (বেঙ্গলা) রাজ্যে উপনীত হওয়া যায়। প্রথমে মাওযানের (অর্থাৎ Acheen head) কিয়দ্-দূরবর্ত্তী একটী দ্বীপে, (সম্ভবতঃ, Pulo Bras বা Nasi) এবং "সুই-লন" [নিকোবর]-দ্বীপ-[দ্বয়]-অভিমুখে আমাকে যাত্রা করিতে হয়। এই [স্থান]গুলিতে উপস্থিত হইলে পর, জাহাজের গতি ফিরাইয়া পশ্চিমোত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়া অনুকূল বায়ুর সাহায্যে ২০ দিনের পর সর্ব্বপ্রথম "চে-তি-গান" [চট্টগ্রাম] নামক স্থানে পৌঁছান যায়। এইখানে জাহাজের নঙ্গর ফেলিয়া জাহাজ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী-আরোহণে নদীপথে যাত্রা করিতে হয় এবং নদীর মোহানা হইতে উপর দিকে কিঞ্চিদূর্দ্ধ ৫০০ (পাঁচশত) বা ততোধিক লি [= প্রায় ১৬৬ মাইল, ১ লি = ⅓ মাইল] গমন করিলে, "সোন-উর্-কঙ্" (Sona-urh-kong) অর্থাৎ সোণার গাঁ নামক স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়। এইখানে তীরে উঠিয়া এই স্থান হইতে পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে ৩৫ ষ্টেজ (বা ১০৫ মাইল, ১ ষ্টেজ = ১ লিগ = ১০ লি) গমন করিলে, "পাঙ্কোলা" রাজ্যে উপনীত হওয়া যায়।"

এই চীন পরিব্রাজকের বর্ণনা-পাঠে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, যে স্থানে চীন-বণিক্‌দিগের জাহাজ নঙ্গর ফেলিত, সে স্থানটী একটী বন্দর এবং সেই বন্দরই

যে, চাটগাঁ (চট্টগ্রাম) এবিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ঐ চাটগাঁই বোধ হয়, বাঙ্গালার বন্দর ছিল। জন বীম্‌স্ (John Beames) বলেন—এই স্থানে বাঙ্গালার অভ্যন্তর-প্রদেশে গমনাভিলাষী পর্য্যাটকগণ, সমুদ্রগামী অর্ণব-যান হইতে অবতরণ করিয়া তৎপ্রদেশ-প্রচলিত নৌকারোহণে "মেঘনা" নদীতে প্রবেশ করিতেন এবং সে বিষয়ে তাঁহার সহিত আমাদেরও মতদ্বৈধ নাই। এই চীন পর্য্যাটকের বিবরণও, সেই মতেরই পোষকতা করিতেছে। সোণার গাঁ একটী গ্রাম, উহা মেঘনা নদীর তীরে এবং ঢাকার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত, ঢাকা হইতে ইহার ব্যবধান প্রায় ১২ (বার) মাইল। কোন ব্যক্তি চাটগাঁয়ে মেঘনার মোহানা হইতে নদীর উপর দিয়া ১৬৬ মাইল গমন করিলে যে, সোণার গাঁয়ে গিয়া পৌঁছিবে—ইহার মধ্যেও কোন ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয় না। এ স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, এই "সোণার গাঁকে" অনেকে 'সুবর্ণ-গ্রাম' বলিয়া মনে করেন। সে বিশ্বাসটি ভ্রান্তিমূলক। সোণার শব্দের অর্থ স্বর্ণকার (goldsmith) এবং গাঁ শব্দে গ্রাম (Village); সুতরাং সোণার গাঁকে "সুবর্ণগ্রাম" বলা যাইতে পারে (goldsmiths-village); কিন্তু সুবর্ণগ্রামের অর্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইংরেজীতে অনুবাদ করিলে ইহার নাম Golden town হয়। (বোধ হয়, অনেক স্বর্ণকারের বাস ছিল বলিয়া, ঐ গ্রামের নাম সোণার গাঁ বা স্বর্ণকারগ্রাম)। মাহুয়ান্ লিখিয়া গিয়াছেন যে,—বেঙ্গালা রাজ্য (বঙ্গদেশ) সোণার গাঁ হইতে ১০৫ (এক শত পাঁচ) মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে অবস্থিত। জন্ বীম্‌স এই স্থলে টিপ্পনী করিয়াছেন :—'ঐ দিক্ ধরিয়া ঠিক্ সরল রেখায় ঐ পরিমিত পথ অতিক্রম করিলে, সরকারের (the Sarker) পূর্ব্ব সীমা বা সাত গাঁওয়ের রাজস্ব-বিভাগের সীমায় আসিয়া পৌঁছান যায়। ঐ দিকেই আরও ৪০ (চল্লিশ) মাইল দূরে প্রসিদ্ধ প্রাচীন 'সাত গাঁও' নগর অবস্থিত। সাতগাঁ, বাঙ্গালার ঠিক্ রাজধানী না হইলেও, বাঙ্গালার একজন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ঐ স্থানে অবস্থিতি করিতেন। ঐ নগর বাঙ্গালার বৃহত্তম প্রধান বাণিজ্য-বন্দর বলিয়া পরিগণিত ছিল"।—

"This distance and direction brings us, as the crowflies, to the easterly boundaries of the *Sarkar*, or fiscal division of Satgaon, and forty miles further in the same line is the site of the famous ancient city of Satgaon, which if not precisely the capital of Bengal, was the residence of one of the provincial governors and the largest and most important commercial and trading port of the country." (১১)

(১১) বীম্‌সের মতান্তর।

যাহা হউক, বাঙ্গালা যে—চট্টগ্রামের পূর্ব্বদিকে নয়, পশ্চিম দিকে অবস্থিত—এ কথা, চীন-পরিব্রাজক, স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে সুস্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে 'মাহুয়ান্' বাঙ্গালার স্থাননির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ দেশের অন্যান্য বিবরণ-সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালা-রাজ্যটী কতকগুলি নগরের সমষ্টি। ঐ সকল নগর, উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং রাজধানী, রাজার ও সকল শ্রেণীর রাজপুরুষদিগের আবাস-ভবন-সমন্বিত। এই প্রদেশ বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, উৎপন্ন সামগ্রীও প্রচুর—এবং জন-সংখ্যাও অসংখ্য। অধিবাসিগণ সকলেই মুসলমান। সামাজিক ব্যবহারে তাহাদের প্রকৃতি সরল ও নির্ভীক এবং তাহাদের অবিচল চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে যাহারা অর্থশালী, তাহারা জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া বিদেশীয় জাতির সহিত বাণিজ্য বিনিময় করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই ব্যবসায়জীবী। কৃষিজীবীর সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। অবশিষ্ট লোকেরা শিল্পানুশীলনের দিকে তাহাদের বুদ্ধিকৌশল পরিচালিত করিয়া থাকে। সাধারণতঃ তাহারা কৃষ্ণবর্ণ। তবে কদাচ তাহাদের মধ্যে দুই চারি জনকে ঈষৎ গৌরবর্ণেরও দেখা যায়। পুরুষেরা মস্তক মুণ্ডন করে, এবং শিরোভূষণরূপে শ্বেত বস্ত্রের উষ্ণীষ ধারণ করে। দীর্ঘ ঢিলা আল্‌খিল্লা তাহাদের পরিচ্ছদ। ঐ আলখিল্লার উপর কটিদেশে রঙ্গিন প্রশস্ত রুমাল কোমরবন্দরূপে ব্যবহার করে।

("wear white cloth turbans and a long loose robe with a round collor, which they put on over their heads, and which is fastened in at the waist by broad coloured handkerchief") তাহারা সূক্ষ্মাগ্র চর্ম্মপাদুকা (নাগরাজুতার মত) ব্যবহার করে। রাজা ও তাঁহার কর্ম্মচারীরা সকলেই, মুসলমানের মত পরিচ্ছদ পরিধান করেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের শিরোভূষণ ও পরিচ্ছদ স্ব স্ব পদ-মর্য্যাদানুসারে বিভিন্ন (Their head-dress and clothes are becomingly arranged) বাঙ্গালাই, তাহাদের জাতীয় ভাষা। তবে পারসী ভাষাও মধ্যে মধ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তঙ্কা (টাকা) নামক একপ্রকার রৌপ্যমুদ্রা ও কাউলি (Kaolyor cowry) বা কড়ি, তাহাদের সাধারণতঃ প্রচলিত মুদ্রা। সাবালকত্বপ্রাপ্তির উৎসব, বিবাহ, বলি ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, মুসলমানদিগের প্রচলিত প্রথার অনুরূপ।

গৃহে অতিথি আসিলে, ইহারা তাঁহাকে গুবাক দান করিয়া তাহার অভ্যর্থনা করে। তাহাদের সমর-কুশল চিরস্থায়ী সৈন্য আছে। নগদ টাকার পরিবর্ত্তে জায়গির বা তদনুরূপ কোন বাৎসরিক আয়যুক্ত সম্পত্তি তাহাদিগের বেতনস্বরূপ প্রদত্ত হইয়া থাকে। আইনভঙ্গের অপরাধে দোষী ব্যক্তিকে তাহার অপরাধের লঘুত্ব বা গুরুত্ব অনুসারে নানাবিধ দণ্ডের মধ্যে কোন নিকটবর্ত্তী বা পরবর্ত্তী স্থানে নির্ব্বাসিত করিবার বিধানও হইতেছে। তাহাদের সীল মোহর ছিল এবং সরকারি চিঠি পত্রাদি লিখিবার পদ্ধতিও তাহাদের জানা ছিল। নানাবিধ গীতবাদ্য দ্বারা তাহারা আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করিত। স্নানাগার, পানাগার ভোজনাগার ও বিবিধ সুসজ্জিত বিপণি, তাহাদের পথের শোভা সম্পাদন করিত।

বিবিধ উৎপন্ন সামগ্রীর মধ্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ—গম, দারুচিনি, (seasamum), সকল প্রকার দানা শস্য, millet, আদা, সরিষা, পলাণ্ডু, শণ, quash, বার্ত্তাকু, কদলী, কাঁঠাল, আম্র, দাড়িম্ব, ইক্ষু, বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ শর্করা, নারিকেল ও অন্যান্য বহুবিধ ফল, তিন চারি প্রকার মদ্য, চাউল, Tary and Kadjang এবং পাঁচ ছয় রকম তুলার বস্ত্র [cotton fabrics, (muslin)] ইত্যাদি।

বহুবিধ পশুপক্ষীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ—উষ্ট্র, ঘোটক, অশ্বতর, রাসভ, বলীবর্দ্দ, ছাগ, মেষ, মহিষ, পাতিহাঁস, রাজহংস, কুক্কুট, শূকর, কুক্কুর ও বিড়াল।

পোষাকের সহিত তাহারা রেসমের রুমাল ও সোণালির কারুকার্য্য-খচিত উষ্ণীষ (চুপি) ব্যবহার করিত। গৃহসজ্জার জন্য নানারূপ চিত্র ও রঞ্জিত দ্রব্যও ব্যবহৃত না হইত—এমন নয়। থালা, গেলাস, ঘটী, বাটী ইত্যাদি, ভোজন ও পান পাত্রের কার্য্য সম্পাদন করিত। অস্ত্রের মধ্যে ছুরি, কাঁচি হইতে বন্দুক ও তরবারি পর্য্যন্ত তাহারা ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল এবং লিখনের জন্য 'এণ' (মৃগবিশেষের) চর্ম্মবৎ উজ্জ্বল ও মসৃণ বৃক্ষ-বল্কল হইতে প্রস্তুতীকৃত একপ্রকার শ্বেত বর্ণের কাগজের ব্যবহার, তাহাদের মধ্যে প্রচলিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাঙ্গালার যে দুইজন রাজা, চীনসম্রাটের দরবারে উপঢৌকন সহ দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, উপসংহারকালে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতেছি। মিঙ্ বংশের (Ming dynasty) ইতিবৃত্তমধ্যে এই সকল ঘটনার উল্লেখ পরিদৃষ্ট

হয়। প্রথম দূত Gai-ya-sza-ting কর্ত্তৃক ১৪০৯ খৃঃ প্রেরিত হইয়ছিল। Kien-fuh-ting নামক বাঙ্গালার অপর একজন রাজা, স্বর্ণপত্রে লিখিত এক খানি পত্র, উপহারস্বরূপে একটী জিরেফা সহ চীনসম্রাটের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। এই দুইজন রাজার সনাক্ত-সম্বন্ধে জন বীম্‌স্ যাহা লিখিয়াছেন, আমরা এ স্থলে তাহারই উল্লেখ করিতেছি। তিনি বলেন ঃ—

গয়াসুটিঙ্ (Gai-ya-sza-ting)-কে যদি গয়াসউদ্দিন্ বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে চীন পর্য্যাটকগণ, যে সময়ের উল্লেখ করিয়াছেন—তাহা ভ্রান্তিমূলক। কারণ, হিজিরা ৭৯৯ অর্থাৎ ১৩৯৬ খৃঃ অব্দের পর ঐ রাজার নামাঙ্কিত কোন মুদ্রা বা লিপি, পাওয়া যায় না; কিন্তু দ্বিতীয় রাজাকে নিম্নলিখিত প্রকারে সনাক্ত করা যাইতে পারে। যথা ঃ—১৪১৫ খৃঃ অঃ জেলাল্-উদ্দিন রাজা ছিলেন বটে; কিন্তু হিজিরা ৮১৮ অর্থাৎ ১৪১৫ খৃঃ অঃ মার্চ্চ মাসের শেষ অংশে তাঁহার রাজত্ব আরম্ভ হয়। ১৪১৫ খৃষ্টাব্দের আদ্যাংশে

(১২) A.H. 817—818. অর্থাৎ ৮১৭-১৮ হিজরা।

তাঁহার পিতা হিন্দু রাজা কংস (Kans) বোধ হয়, জীবিত ছিলেন; সুতরাং সম্ভবতঃ চীন ঐতিহাসিকেরা, কংস (Kans) এবং জেলাল্ উদ্দিন এই দুইটী স্বতন্ত্র নামকে ভ্রমবশতঃ একত্র মিশ্রিত করিয়া Kans-uddin এই সম্মিলিত নামের কল্পনা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় এবং তিনি তাঁহার ভাষায় ঐ খাঁ-উদ্দিনকে Kien-hut-ding বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু ও মুসলমান নাম একত্র করিলে সামঞ্জস্য থাকে না, চীনবাসীরা, তখন তাহা জ্ঞাত ছিল না। Lane Poole আধুনিক আরবী রীতি-অনুসারে Jalal-ad-din এবং Ghiyas-ad-din লিখিয়াছেন; কিন্তু ভারতে প্রাচীন আরবীরই প্রচলন। সুতরাং প্রাচীন আরবী ভাষায় কর্ত্তৃকারকে পদান্তে যে "উ" ব্যবহারের রীতি ছিল, ব্যক্তিবিশেষের নামের বানানে এখনও সেই রীতি অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে। আমরা এখনও জেলাল-উদ্-দীন, মনির্-উদ্দীন, গিয়াস্-উদ্দীন ইত্যাদি লিখিয়া থাকি। জেলাল-"অদ্দীন", বা মনির-"অদ্দীন" লিখি না। (১৩)

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।

(১৩) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩১৩ সালের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

ভগবানের প্রতি।

১

শত দোষী আমি ও চরণে,
তাই কি গো চরণে ঠেলিলে ?—
তোমা বিনা কিছু আর, কোথা নাই এ দীনার,
এত বোঝ—এই শুধু
বুঝিতে নারিলে ?

২

বোঝ নাথ, অনন্ত জগত,
বোঝ দেখি সৃষ্টিস্থিতিলয়,
প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড খোঁজ, অণুপরমাণু বোঝ,
কেবলি বুঝিলে না ক, —
আমারি হৃদয় ?

৩

গড়িয়াছ ভীষণ অশনি,
গড়িয়াছ কুসুমকোমল ;
সকলি কাজের তরে, গড়িয়াছ চরাচরে,
কেবলি কি গড়িয়াছ
আমারে বিফল ?

৪

জগতের সকলি তোমার,
তোমাময় জগতের মেলা ;
আমি কি এতই পর, বিজনে বাঁধিব ঘর.
সকলের হবে তুমি,
আমিই একেলা ?

৫

শুনি নাথ, তুমি শান্তিময়,
তাপিতের চির-প্রাণারাম ;
আমারে যে আশীবিষ, দংশিতেছে অহর্নিশ
তুমি কি ঘুমায়ে আছ—
লভিছ আরাম ?

৬

জানি আমি দীনহীন পাপী
অযোগ্য, অবাধ্য, দুরাচার,
তাই কি ঠেলিবে পায় ?— দেখেছি কুপুত্রে মায়
রেখেছে স্নেহের আড়ে,
ভুলি দোষ তার।

৭

মাতৃ-স্নেহ পবিত্রা জাহ্নবী
তাই যদি হয় এতদূর,
তব স্নেহ সিন্ধুসম, গভীর গভীরতম,
না জানি সে কি বিশাল
কত ভরপুর।

৮

তবে মোরে "নরাধম" বলি'
উপেক্ষিয়া রয়েছ কেমনে,
দাও পুণ্য—দাও আলো, শান্তিসুধা বুকে ঢালো
তোমারে আমারি ভেবে'
জুড়াই জীবনে।

শ্রীবীরকুমার-বধ রচয়িত্রী।

সংসারীর ব্রহ্মজ্ঞান।

(সত্যঘটনা)

(১)

আমি মনে করিতাম, বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে আমার এমন একটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, এখন আর কিছুতে তেমন উৎসাহ নাই। যৌবনে যদিও আর বড় দাবি করিবার নাই, কিন্তু তার আগে হইতেই যেন জাল গুটাইতে হইয়াছে। এমনি একভাবে, একটানা স্রোতের মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছিলাম। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া যেমন গঙ্গার স্থির বক্ষ আন্দোলিত ও বিক্ষোভিত করিয়া তুলে, ভাবের তরঙ্গও তেমনই বুকে বড় আঘাত করিত; কিন্তু মাংসপিণ্ডের দেহ-বেলায় আঘাত পাইয়া সে তরঙ্গের তেমন স্ফূর্ত্তি হইত

না। সাধ-আহ্লাদের অভিনয়ে পড়িতে হইয়াছে ; কিন্তু আনন্দে কখন আত্ম-বিলোপ ঘটে নাই, মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছি—আমি উহা হইতে স্বতন্ত্র।

মনে মনে বৃথা ভাবিতাম, এখন সব গিয়াছে। মনে করিতাম—বাসন্তী মারুতদোদুল্যমানা ব্রততীর সে শোভা আর নাই, সান্ধ্য নীলাকাশের সে নীলিমাটুকু অন্তর্হিত হইয়াছে, চিরহাস্যময়ী দিগঙ্গনার প্রফুল্ল মুখকমল হইতে সে লাবণ্য মুছিয়া গিয়াছে। মনে করিতাম, যৌবনের বিদায়-অবসরে জীবনের অতীত কামনারাশির সমাধি হইয়াছে। যেমন জীর্ণ দেবমন্দির—তার সকলই পতনোন্মুখ, কেবল বড় বড় অশ্বথের শিকড় বড় বড় ভগ্নস্তূপ আঁকড়াইয়া রাখে, তেমনই সকলই গিয়াও যেন অন্তরের অন্তরে স্মৃতির শিকড়ে ভাবের জমাট বাঁধা পড়িয়াছে।

মনের এই ভাব যেমনই হউক, আমি বস্তুতঃই তত আশাহীন হই নাই। যৌবনের দীপ্ততেজে এখনও বুঝি এক একবার উৎসাহিত হই। একদিন সেই ভাবের একটা ঘটনায় পড়িয়াছিলাম।

(২)

বন্ধু বলিলেন,—"এস, তীর্থদর্শনে যাই।"

"কোথায় ?"

"পুরুষোত্তমে।"

উত্তম কথা। জগন্নাথ মহাপ্রভুর শ্রীমুখ দেখিব, অনেক দিন হইতেই প্রাণের বাসনা, সুযোগ আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল।

যাত্রার আয়োজন করিলাম। গৃহিণী ধরিয়া বসিলেন, তাঁহাকেও সঙ্গে লইতে হইবে। তীর্থদর্শনে যদি পুণ্য থাকে, মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালায় যদি সৌন্দর্য্য থাকে, সে পুণ্য, সে সৌন্দর্য্য, সে মনের আনন্দ হইতে গৃহিণীকে বঞ্চিত করিতে ইচ্ছা হইল না। তাঁহাকে সঙ্গে লইলাম, নয়নের তারা দূরে রাখিয়া নিষ্ফল নয়নে কি দেখিব ? জননীও পূর্ব্বেই প্রস্তুত ছিলেন।

আ মরি মরি ! কি দেখিলাম। ইহজীবন কেন, জন্মান্তরেও এ আনন্দ ভুলিবার নহে। দেব-দর্শনে এত আনন্দ, এত সুখ—বুঝি কখন পাই নাই। দেহের জড়ত্ব বুঝি ঘুচিয়া গেল। প্রাণের ভিতর একটা যেন বেশ ওলটপালট হইয়া গেল, হৃদয়ের তলদেশে যেন কি জমিয়া গিয়াছিল, এই বিলোড়নে তাহা বিক্ষিপ্ত হইল, বেশ একটা মধুর অনুভূতি হইল—আমি ভক্তি গদগদ চিত্তে,

নিমীলিত নয়নে তন্ময় হইয়া রহিলাম। মহাপাপীর হৃদয়ে মহাপ্রভুর অনন্ত করুণার বুঝি বিন্দুপাত হইল, আমি ধন্য হইলাম।

চক্ষু চাহিয়া দেখি, অশ্রুপরিপ্লুত নয়নে, গৃহিণী একান্ত মনে দেবতার পানে চাহিয়া আছেন। হাসি-মুখে বলিলেন, "তুমি এ সৌভাগ্য হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতেছিলে?"

তখন দুই জনে আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম। নিকটে এক সাধক গাহিতেছিলেন,——

"দিন যাবে—রবে না,
দীনবন্ধু হে।

* * * *

এই সঙ্গীত আমার বড়—বড় মধুর লাগিল। হরিনাম সর্ব্বসময়ে, সর্ব্ব অবস্থায় মধুর; কিন্তু ভক্তের অভিমানের সহিত হরিনাম মধুর হইতেও মধুরতর। আমি আত্ম-বিভোর হইয়া শুনিতেছিলাম।

গীতসমাপনান্তে, সাধক উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমরা তাঁহার পদধূলি লইলাম। তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ইতঃপূর্ব্ব হইতে এক নবীন সন্ন্যাসী আমাদের প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলেন। আমি সন্ন্যাসীকেও প্রণাম করিলাম। তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি ঐ গায়কের প্রতি এত মুগ্ধ হইতেছিলে কেন?"

আমি। শুনিয়াছি, উনি বড় ধার্ম্মিক লোক। একজন সাধুপ্রকৃতি ভগবদ্ভক্ত। ভক্তমাত্রেই লোকের পূজনীয়। কেন না, উহাতে ভগবানের অধিষ্ঠান।

সন্ন্যাসী। উহাতে ভগবানের আবির্ভাব না কি?

আমি। নিশ্চয়ই। ভগবানের বিশেষ কৃপা না পাইলে, ভক্ত হইবেন কেন?

স। আমি উহাঁর আদ্যন্ত জানি। একজন সাধারণ সাংসারিক ব্যক্তি বৈ আর কিছুই নহে। গলা মিঠা, দুটা হরিনাম করিলেই কি ভক্ত হয়?

আমি। আমরা সংসারের জীব, সংসারী-ভক্ত আমাদের হৃদয়কে অধিক আকৃষ্ট করে। উঁহার স্ত্রীপুত্র আছে, সংসারের চিন্তা আছে, সুখদুঃখের তারতম্য আছে। তথাপি উনি ভগদ্ভক্ত। কেন না,উঁহার সর্ব্বকর্ম্ম ধর্ম্মের দ্বারা অনুশাসিত, উনি কর্ম্মফলে অনাসক্ত, একান্ত দয়ার্দ্রচিত্ত এবং ভক্তিই জীবনের সারব্রত বলিয়া, ভক্তির সাধনা করেন।

তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"উঁহার প্রতি তোমার ভক্তি অচলা হউক, কিন্তু উঁহাকে ভক্ত বলিতে আমার আপত্তি আছে। জ্ঞানই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু, ভক্তি দুর্ব্বল চিত্তের অবলম্বন। সংসারের চিন্তায় সে জ্ঞানের সাধনা সম্ভবপর হইলে, তুমিও জ্ঞানী হইতে পারিতে, তুমিও একজন ভক্ত হইতে পারিতে? স্ত্রীপুত্রের চিন্তা করিবে, না ভগবানের ধ্যান করিবে? অর্থের চেষ্টায় জীবনযৌবন ক্ষয় করিবে, না কঠোর ধর্ম্মসাধনায় জীবন উৎসর্গ করিবে? যাহাদের পুত্রমুখ দর্শন করিবার সাধ আহ্লাদ আছে, দশের মধ্যে প্রতিষ্ঠাবান্ হইতে অকাঙ্ক্ষা আছে, তাহারাই একটু কোমল হৃদয়ে ভক্তিগদগদ হইয়া হরিনাম করিয়া, সহজেই ভক্ত হইতে পারে!"

আমি এই সন্ন্যাসীর বিষয় ইতঃপূর্ব্বে অবগত ছিলাম। ইনি নিজেকে বেদান্ত-শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত,সংসারে বীতস্পৃহ এবং ধার্ম্মিক বলিয়া জানিতেন। সংসারজীবের মধ্যে ধর্ম্ম আনিতে পারে, ঈশ্বরনির্ভর আনিতে পারে, জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয় আনিতে পারে, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। এইরূপ আত্মাভিমান তাঁহার অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি যখন তখন, যেখানে সেখানে পরিবারগ্রস্থ ভক্তদিগের প্রতি আক্রমণ করিতেন। তিনি তাঁহার দলের নায়ক ছিলেন, তাঁহার শিষ্যসংখ্যাও বিস্তর ছিল। আমার সময়ে সময়ে সন্দেহ হইত, এই শিক্ষাভিমানী, সন্ন্যাসব্রতধারী, আপাতব্রহ্মচর্য্যধারী ব্রাহ্মণ সংসারের কি কাজে আসিতেছেন? শিষ্যগণের সংগৃহীত অর্থে ইঁহাদের স্বচ্ছন্দে গ্রাসাচ্ছাদন হয়, কোন চিন্তার দায়ে পড়িতে হয় না, সংসারে কোন কাজেই ইঁহারা লিপ্ত নহেন, বিশেষ বিচার করিয়া পরহিতব্রত পালন করেন,—ইঁহারা শ্রেষ্ঠ? না, যাঁহারা দুঃখদারিদ্র্যের মধ্য দিয়াও সৎপথে থাকিয়া পরিবার প্রতিপালন করেন, অতিথি অভ্যাগতে দয়া, স্বজন-প্রীতি, পরোপকারে আত্মবিসর্জ্জন এবং সর্ব্বকালে সর্ব্ব অবস্থায় ভগবানে আস্থাবান্, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ? যেই শ্রেষ্ঠ হউন, সে বিচারে আমাদের কাজ নাই। যিনি ভক্ত, যিনি আপনা হইতে আমার ভক্তি আকর্ষণ করেন, তিনি প্রণম্য। তাঁহাকে দেখিয়া ভগবান্‌কে মনে পড়ে, তাঁহাকে দেখিয়া বলিতে হয়, "ভগবানের করুণাধারা, তাঁহার ভিতর দিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছে।"

গৃহিণীও চুপি চুপি বলিলেন, "ঠাকুর দেখা হল, এখন উঠ, তর্কের মহামারিতে কাজ কি? এখানে যে পঞ্চতীর্থ আছে, সমুদ্রও তাহার অন্যতম। চল সমুদ্র দেখিয়া আসি।"

(৩)

এই সেই বঙ্গোপসাগর! কি বিরাট ব্যাপার! দূর হইতে সে গম্ভীর গর্জ্জন শুনিতে শুনিতে আসিতেছিলাম। দূর হইতে সুনীল জলরাশির অত্যুচ্চ তরঙ্গের অপূর্ব্ব লীলা দেখিতে দেখিতে আসিতেছিলাম। উপরে অনন্ত নীলাকাশ, নিম্নে অনন্ত সমুদ্র, মাঝে উত্তাল তরঙ্গমালা; যেন সেই তুষারশুভ্র-তরঙ্গ, বায়ু দ্বারা আকাশে ও সমুদ্রে কি মধুর স্পর্শের অভিনয় হইতেছে। সৈকতভূমি কতদূর অতিবাহিত করিয়া, সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী হইলাম। সে গাম্ভীর্য্যমিশ্রিত মাধুর্য্যের লীলা দেখিয়া মুগ্ধনেত্রে দাঁড়াইলাম। আনন্দ, ভক্তি, ভয়,—যুগপৎ সকল ভাবের অভিনব সমাবেশ হইল, আমি আত্মহারা হইলাম।

তারপর ধীরে ধীরে সমুদ্রে অবগাহন করিলাম। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে উত্তাল তরঙ্গ আসিয়া, কখন ভাসাইয়া লইয়া গেল, কখন একেবারে তীরে উঠাইয়া দিল, কখন আছড়াইয়া ফেলিল, কখন তরঙ্গের মাথায় চড়াইয়া বসাইল—সে এক সভয় আনন্দের অপরূপ লীলা-খেলা। গৃহিণী আমার পার্শ্বে থাকিতে চেষ্টা করিতেছেন, আমার পাঁচ বৎসরের শিশুটিও প্রথমে আমার ক্রোড়দেশে থাকিতে চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু তরঙ্গের সে রঙ্গ-ভঙ্গে কে কোথায়, কখন পড়িতেছে—তাহা ঠিক করা যায় না। আমার বৃদ্ধা জননী, দুই চারিবার ওলটপালট খাইয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং তীরে দাঁড়াইয়া মহাসমুদ্রের সে তরঙ্গ-লীলা দেখিয়া, সরল বালিকার ন্যায় উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন।

আমি সত্যই তখন সব ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সে তুমুল আলোড়ন ও বিলোড়নে আমার হৃদয়েও যেন একটা ওলটপালট হইয়া গেল, কিছুকালের পর যেন একটা ঝাঁকরাণী পাইয়া বুকের ভার লঘু হইয়া গেল।

তরঙ্গের তালে তালে আমার শিশুগণের সে আনন্দ-নৃত্য দেখে কে! গৃহিণী সহাস-নয়নে তাহাদিগের প্রতি চাহিতেছেন, পিছন হইতে বিশালতরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে ডুবাইয়া দিল, তিনি উঠিতে না উঠিতে আবার আমি ডুবিলাম।

এই বিশাল সমুদ্র দেখিয়া, মেনাহাতি যে সমুদ্রকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল, সে এমন কিছু অন্যায় করে নাই! চাঞ্চল্যে এমন গাম্ভীর্য্য; গাম্ভীর্য্যে এমন মাধুর্য্য, আতঙ্কেও এমন আনন্দ বুঝি কোথাও নাই! ক্ষুদ্র মানব, নিজের ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া, অনন্তে বিলীন হয়।

আমরা তীরে উঠিয়া সমুদ্রকে প্রণাম করিতেছিলাম। দেখিলাম পূর্ব্ব-কথিত সেই সাধক হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইতেছেন। আমি বলিলাম,

"ঠাকুর, এই শ্রীক্ষেত্র যেমন সার তীর্থ, এই মহাসমুদ্রও তেমনই চক্ষের সার দ্রষ্টব্য। যদি আর সব ভুলিয়া যাই, এই সমুদ্র ভুলিতে পারিব না।"

তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"মা'র আমার কত ভাবেই যে নৃত্য কর্‌তে সাধ যায়, তা কেমন করে' বলব? তাঁর অনন্তরূপ, তাই তিনি লীলাময়ী। ঐ দেখো, তিনি না নাব্‌লে কি সমুদ্রের এমন শোভা হয়?"

সহসা দেখিলাম, একটি শিশু উত্তপ্ত বালুকার উপর দিয়া ছুটিতেছে, তাহার জননী অতি দ্রুতপদে আগে চলিয়াছে। যুবতী সুন্দরী; কিন্তু বিষাদ-প্রতিমা; আলুলায়িত কেশ পৃষ্ঠে দুলিতেছে, বস্ত্রাঞ্চল ভূমিতে লুটাইতেছে; ঘন ঘন নিশ্বাসে বক্ষ কম্পিত হইতেছে। যুবতী অত্যন্ত ত্রস্তভাবে কাহাকে ধরিবার জন্য চলিয়াছে, শিশু জননীর সঙ্গ রাখিতে না পারিয়া পিছনে ছুটিয়াছে।

আমি বলিলাম, "ঠাকুর একি? বোধ হয়, কেহ সঙ্গী-হারা হইয়াছে?"

সাধক হাসিয়া বলিলেন,—"দেখ্‌লে বাবা, মায়ের কত লীলাখেলা! বেটী সমুদ্রে নাচে; এই তপ্ত বালির উপর ছুটে। ও আমার জন্যই ছুটেছে—নইলে আমার প্রাণে টান পড়ে কেন?"

৪

আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন ছিল, একটু শীতল বাতাসও বহিতেছিল। বর্ষাকাল না হইলেও, যেন বৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল।

তবু বাহির হইলাম। সমুদ্রপারে দাঁড়াইয়া অস্তগামী সূর্য্যের শোভা দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না; কিন্তু সূর্য্য কোথায়? তবু চলিলাম।

শিশু কয়টিকে জননীর নিকট রাখিয়া, গৃহিণীকে লইয়া দিবাবসানে সমুদ্র-তীরে গেলাম। কি আশ্চর্য্য, সেই বিশালসমুদ্রতীরে জনমানব কেহ নাই! কেবল আমরা দুটী।

আমরা বুঝি নাই; কিন্তু আর সকলে বুঝিয়াছিল, প্রবল ঝড় উঠিবে। সেইজন্য সকলেই ইতিপূর্ব্বে সমুদ্র হইতে ফিরিয়াছিল।

যখন দুটীতে সেই বিশাল তরঙ্গলীলাময় সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী হলেম, সত্য কথা বলিতে কি, আতঙ্কে আমাদের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। আমি সেই মেঘাচ্ছন্ন অনন্ত আকাশতলে, সেই গম্ভীরনাদী, কোটী কোটী তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্রপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ভয়ে অভিভূত হইলাম। প্রাতে যাহাকে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছি, দিবাবসানে তাহার তীরে দাঁড়াইতে সাহস হইতেছে না।

নিতান্তই ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মনে করিয়া ভাবিলাম—এই অনন্তের মাঝে আমরা দুটি কি, আমার কতটুকু! তখন সহসা মনে হইল, আমাদের পূজা-বাড়ীর উঠানে বাল্যকালে একটী প্রকাণ্ড জল-পাত্র দেখিতাম ; তাহাতে কার্য্য-উপলক্ষে শত শত লোকের পানীয় জল থাকিত। একদিন সেই পাত্রের উপর দুইটী অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকা দেখিয়া মনে হইয়াছিল, ইহারা কতটুকু? যদি পা পিছলাইয়া এই জালার মধ্যে পড়িয়া যায়,—কে জানিবে, ইহাদের কি হইবে। আজ আমারও সেইরূপ মনে হইল। এই দুইটী অতি ক্ষুদ্র মানুষ-পিপীলিকা এই বিশাল সমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া! আমি ভয়ে অভিভূত হইয়া গৃহিণীকে ফিরিবার জন্য বলিলাম।

দেখিলাম, তিনি সমুদ্রের উপকূলে বসিয়া, অঞ্চল বিছাইয়া রাশি রাশি ঝিনুক কুড়াইতেছেন। যেন শরতের প্রভাতে আমার কুটীরপ্রাঙ্গণে শ্বেত শিউলি ফুলের রাশি বিস্তীর্ণ থাকে, সমুদ্রের উপকূলে তরঙ্গ-বিক্ষিপ্ত ঝিনুকের রাশি তেমনি বিস্তৃত ;—গৃহিণী সাগ্রহে সেগুলি অঞ্চলে তুলিতেছেন। ভয়ের লেশমাত্র নাই।

আমি অবাক্ হইলাম। কখন দু'একটা তরঙ্গ গড়াইতে গড়াইতে আসিয়া সমস্ত ঝিনুক লইয়া প্রস্থান করিল, গৃহিণী সরিয়া গিয়া আবার কুড়াইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন "ভয় কি? যদি ঝড় উঠে, ঝড় দেখা যাবে। সমুদ্রে ঝড়ের বড় সুন্দর শোভা হবে!"

কে বলে রমণী বিধাতার কোমল সৃষ্টি! প্রকাণ্ড জাহাজ তরঙ্গাভিঘাতে চূর্ণ হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু যে কুসুম শিশিরসংস্পর্শে সঙ্কুচিতা হয়, সে অনায়াসে তরঙ্গের মাথায় চড়িয়া হাসিতে হাসিতে ভাসিয়া যায়! এ রহস্য কে বুঝিবে?

সহসা ঝড় উঠিল। অন্ধকার রাত্রি—প্রবল বাতাস, বাতাসের সহিত প্রবল বৃষ্টি। সমুদ্র ও আকাশ এক হইয়া গেল। সমুদ্রের গর্জ্জন গম্ভীরতর হইল, আকাশেও তাহার গম্ভীর আহ্বানের প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। সমুদ্রের কিছুই দেখা যায় না ; কেবল মনে হয়, সেই অন্ধকার রাত্রিতে যেন কোন্ বিরাট প্রান্তরে কোটি কোটি লোক শুভ্র কার্পাসের বোঝা মাথায় করিয়া ছুটিয়াছে! আর সেই শুভ্র সফেন তরঙ্গে তরঙ্গে কি এক সুন্দর ছটা বাহির হইল। যেন সমস্ত সমুদ্রবক্ষ শুভ্র বৈদ্যুতিক আলোকে ভরিয়া উঠিল। প্রবল বাতাসে তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত সলিলরাশি চোকেমুখে পড়িতে লাগিল।

নিরাশ্রয়ে, সিক্তবস্ত্রে সেই অনাবৃত সমুদ্রতটে প্রায় অর্দ্ধপ্রহর অতীত হইল।

এখন মনে করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে, হৃদয় আতঙ্কে অবসন্ন হয় কি অসমসাহসের কাজ করিয়াছি। উভয়েই শীতে কাঁপিতে লাগিলাম। গৃহিণী আবার বায়ুরোগগ্রস্থা; মনে হইল, যদি এই সময়, এইখানে, তিনি হঠাৎ মূর্চ্ছিতা হন, উপায় কি? লোকালয় নিকটে, কিন্তু সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠিয়া যাইতে বহু বিলম্ব,তাঁহাকে একা এই সমুদ্রগর্ভে রাখিয়াই বা কিরূপে যাইব।

তখন যুক্তকরে, জগন্নাথকে ডাকিলাম। যাঁহার ঈঙ্গিতে এই প্রলয়ের সংঘটন তিনি ভিন্ন কে ইহাকে শান্ত করিবে? বৃষ্টি কমিয়া আসিল, কিন্তু বাতাস উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। আমি সাহসে ভর করিয়া, গৃহিণীকে সেই সৈকতভূমি পার করাইলাম। যখন উপরে উঠিলাম, সাহস বাড়িল, কিন্তু পথনির্ণয় করিতে পারিলাম না। সম্মুখে যে পথ পাইলাম, চলিলাম। গৃহিণী আর চলিতে পারেন না, দেহ অবসন্ন হইল, আমি আকুল হইলাম। অতি দ্রুতপদক্ষেপে যাইয়া একটি আশ্রম দেখিতে পাইলাম। দ্বারে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিলাম, "কে আছ রক্ষা কর।"

আলোক লইয়া, এক সন্ন্যাসী আসিয়া আমার বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। তিনি মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"আমাদের আশ্রমে স্ত্রীলোকের আসিবার অধিকার নাই। আপনি স্ত্রীকে বাহিরে রাখিয়া, ভিতরে আসিতে পারেন।"

আমি বিপদের কথা জানাইলাম। ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হইবার ভয়ে, সে একটুকুও বিচলিত হইল না, কেবল বলিল,—"আমি তোমায় রক্ষা করিব, রমণী আমার শত্রু—শত্রুকে আমি রক্ষা করিব না।" সন্ন্যাসী পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আমি কোনও উত্তর করিলাম না দেখিয়া, সে স্বচ্ছন্দে দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া গেল।

আমরা নিরুপায় হইয়া পথিপার্শ্বে বসিয়া রহিলাম।

ঝড়ের বেগ ঈষৎ প্রশমিত হইলে, আবার চলিলাম। এক গৃহস্থের বাড়ীতে উঠিলাম। সেই বাড়ীর গৃহিণী আমাদের দুর্দ্দশা অবগত হইয়া, তৎক্ষণাৎ আমার গৃহিণীকে অন্দরে লইয়া গিয়া, শুষ্কবস্ত্র ও গরম গাত্রবস্ত্র দিলেন। বিশ্রামের পর রাত্রি দশটার সময় বাসায় আসিতেছি, পথে সাধকের সেই বীণানিন্দিত মধুর কণ্ঠে সাধক কবি শ্রীজয়দেবের স্তোত্র শুনিতে পাইলাম। তিনি ভক্তি-গদগদ চিত্তে গাহিতেছেন,—

"ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে,
ধরণিধরণ-কিণচক্রগরিষ্ঠে,
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর! জয় জগদীশ হরে!"

আমি তাঁহাকে দেখিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনি এই দুর্য্যোগে কোথায় গিয়াছিলেন?" তিনি বলিলেন,—"তোমরা যেমন বাহির হইয়াছিলে, আমিও তেমনি বাহির হইয়াছিলাম। মা'র আমার জগদ্ধাত্রীরূপ যেমন ভুবন আলো করে, এই ভয়ঙ্কর কালীরূপও তেমনি ভুবন অন্ধকার করে। কেবল আলো দেখেই কি বিচার হয়?—তোমরা এ দুর্য্যোগে কেন বাবা?"

"আমি তো বলেছি, সমুদ্র দেখে আমার আশা মিটে না, আমি সন্ধ্যাবেলা তাই দেখ্‌তে এসে, এই বিপদে পড়েছি।"

"এ আর বিপদ কি বাবা, ভগবানের ধন পেতে গেলে, এ সব বুক পেতে নিতে হবে, চাহিবামাত্র পেলে কি মনের বাঁধন হবে, না সে বাঁধনের জোর আসিবে?"

দেখিলাম সাধকের বক্ষে বস্ত্রাচ্ছাদিত কি রহিয়াছে। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা, ওটা কি?"

তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"একটা বিড়াল, পোড়ারমুখীর কত ঢং, ঝড়ের সময় সব পালাল, আমিও দৌড়ে যাচ্ছি, উনি কোথা হতে বিড়াল হয়ে আমার পিছু নিলেন। ঝড়ে মর্‌বে কেন, তাই বুকে তুলেছি।"

আমি তাঁহার পদধূলি লইলাম। সর্ব্বজীবে ব্রহ্মদর্শন সেতো এই?

হে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসি! হে রমণী-ভয়-বিহ্বল ব্রহ্মচারী! হে বেদান্ত-দর্শনাভিমানী জ্ঞান-সাধন-তৎপর মহাপুরুষ, একবার চেয়ে দেখ, বৎসরান্তে পুত্রমুখ-দর্শনাকাঙ্ক্ষী, সংসারে প্রতিষ্ঠা-পরায়ণ, সুখদুঃখসমাকুল এই মহাত্মা তোমা অপেক্ষা কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন।

আর জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সেই যুবতীর কি হইল?" তিনি বলিলেন,—"এক মোহান্ধ জীব, ঐ যুবতীকে কুলত্যাগিনী করে। সে অনেক কথা। যৌবনের প্রবল বন্যায় বেগবান হৃদয়কে বিশ্বাস কি? কিন্তু ভোগের একটা জ্বালাও আছে। যুবক তীব্র অনুতাপে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে। অনেক করিয়া বুঝাইলাম, যুবতী তাহার মমতা কাটাইতে চাহে না। —কিন্তু লোভে হতাশ হইয়া, ফিরিয়া আসিয়াছে।"

আমি। তবে সে পতিতা?

সাধক। পতিতা না হলে, আমি তার পদধূলি লইব কেন?

আমি বিস্ময়ে তাঁহার মুখপানে চাহিলাম। তিনি বলিলেন, "যে পতিতা বলে নিজেকে বুঝেছে,—মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছে, অমনি পতিতপাবন তাহাকে দয়া করেছেন। যার উপর ভগবানের দয়া পড়ে, সে কি সামান্য রে?"

(৫)

গৃহে ফিরিয়া দেখি, জননীর চক্ষে নিদ্রা নাই। শিশু পুত্রেরা পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। সকলেই মনে করিয়াছে, তাহাদের পিতামাতা আজ সমুদ্র-গর্ভে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে।

পরদিন প্রাতে সাধকের বাড়ী গেলাম। পতিতার কি হইল, জানিবার জন্য বড় আগ্রহ হইয়াছিল। দেখিলাম, মন্দির-প্রাঙ্গণে বসিয়া ঠাকুর মধুর হরিনাম করিতেছেন। আমার অভিপ্রায় জানাইলাম।

তিনি হাসিতে হাসিতে ইঙ্গিত করিলেন, আমি একটি কুটীরে গিয়া দেখিলাম, যুবতীর মৃতদেহ পড়িয়া আছে, পার্শ্বে সেই সোণার শিশু ঘর আলো করিয়া নিদ্রিত রহিয়াছে।

আমি চমকিত হইলাম। তিনি বলিলেন,—"কেন, এই ত ঠিক; কার্য্য ফুরাইল, মা ডেকে নিলেন।"

আমি শিশুর দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া বলিলাম,—"ইহার কি হইবে?"

উন্মুক্ত বাতায়নে প্রভাত-রবির উজ্জ্বল কিরণ বিকশিত হইল, সেই রবি-কণা শিশুর অধর স্পর্শ করিল, নিদ্রা অপসারিত হইল। আমি দেখিলাম, শিশুর অধরে হাসি ফুটিল—সেই রবি-কণায় আর হাসিতে মিলিয়া গেল।

মহাপুরুষ বলিলেন, "ঐ দেখ, মৃতা জননীর পার্শ্বে শয়ন করিয়া শিশু হাসিতেছে। জগতে যে মাতৃপিতৃহীন অনাথ, ভগবান্ তাকে কোলে করিয়া মানুষ করেন।"

অনেক দিন হইল, পুরুষোত্তম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। সেই পতিতা রমণীর মৃতদেহ-পার্শ্বে নির্ভীক শিশুর সেই হাসি আজিও আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। সেই গম্ভীর নদী, কূলপ্লাবী অকূল সমুদ্র, তাহার উত্তাল তরঙ্গ-লীলা, সেই প্রবল ঝড়, মানসচক্ষে যেন সুস্পষ্ট দেখিতে পাই। সেই সাধু-মহাপুরুষের অদ্ভুত চরিত্র—যিনি তরঙ্গলীলায় বিশ্বজননীর নৃত্য, পতিতা রমণীতে মায়ের অন্যরূপ, ক্ষুদ্র বিড়ালশিশুতে ব্রহ্মদর্শন, রজনীর অন্ধকারে কালীরূপী মায়ের ভীষণরূপ প্রত্যক্ষ করেন, তিনি যে ভাবেরই সাধক হন না, তিনি যে ধন্য, তিনি যে প্রণম্য তাহাতে আর সন্দেহ কি? শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত।

স্থবির।

দীর্ঘ পথের হয়ে এল শেষ
দীর্ঘ দিনের সনে,—
তরী এসে ধীরে লাগিয়াছে তীরে
সন্ধ্যার সমীরণে।
পশ্চাতে তার পড়ে আছে দূরে
যে সকল গানে যে সকল সুরে
তুলেছিল ঢেউ সংসার-পুরে
প্রাণ-পণ সযতনে।
দীর্ঘ পথের হয়ে এল শেষ
দীর্ঘ দিনের সনে!

শান্তি-সলিলে মগন হৃদয়
করম-অন্ত সুখে,—
বর্ষণ পর পূত জলধর
শুভ্র গগন-বুকে।
শুভ সফলতা চারিপাশে তার
বিজয়-বার্ত্তা ঘোষে আপনার
শিহরে বক্ষ পুলকে অপার
পাশরি' বিষাদ-দুঃখে।
শান্তি-সলিলে মগন হৃদয়
করম-অন্ত সুখে।

সম্মুখে আজি দেখা যায় চির-
বিশ্রাম-গৃহখানি,—
বিশ্ব-রাজার মহাকরুণার
স্নিগ্ধ অভয় পাণি।
জীবনের তার প্রিয় সাথীচয়

পথ চেয়ে সেথা যাপিছে সময়
একটি নিমেষ হইতেছে ক্ষয়
যুগ-ব্যবধান আনি'।
সম্মুখে আজি দেখা যায় চির
বিশ্রাম-গৃহখানি।

সকল চিত্ত আকুল অতি যে
পুণ্য-মিলন মাগি'—
নিশা অবসানে দীপ আছে ধ্যানে
অঞ্চল-বায় লাগি'।
গৃহ-দেবতার ইঙ্গিত কবে
শ্রান্ত পথিকে ঘরে ডেকে' লবে
তাহারি আশায় আছে আজি ভবে
নিশিদিন সেতো জাগি'।
সকল চিত্ত আকুল অতি যে
পুণ্য মিলন মাগি'।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

শাখীনামা।

১২শ শাখী।

অতঃপর গুরু যাত্রা করিলেন ও পাতিয়ালার রাজ্যান্তর্গত খিবা গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে সিংহ নামে এক শিখ, গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করে ও তাঁহাকে ঘাস, জ্বালানী কাঠ, ও অন্যান্য জিনিষ পত্র দেয়। সে তাহার বাড়ী যাইতে চাহিলে, গুরু বলিলেন—এত শীঘ্র যাচ্চ কেন? বস।' শিখ বলিল যে, সেদিন এক জমীদারের ছেলের বিবাহ হইবে, সেই উপলক্ষে গ্রামে চিনি বিলান হইতেছে, কাজেই তাহার যাওয়া বিশেষ আবশ্যক। গুরু বলিলেন —তুমি আমার সেবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছে—এইখানেই থাক। তুমি দ্বিগুণ ভাগ পাইবে।'

১৩শ শাখী।

পাতিয়ালা রাজ্যান্তর্গত সিনাকা গ্রামে যাইবার সময় কাবুল হইতে আগত এক দল শিখের সহিত গুরুর সাক্ষাৎ হইল। তিনি তখনই সেই খানে একটি বৃক্ষের তলে তাঁহার আসন পাতিয়া উপবেশন করিলেন। শিখেরা কতক-গুলি ঈশ্বর গীতি গান করিল ও গুরুকে পূজা করিল। গুরু তাহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিলেন। এই স্থানের নিকটেই একটি জমীদার তাহার জমী চষিতেছিল। এ সব দেখিয়া, সে ভাবিল, গুরু কোন মহৎ ব্যক্তি হইবেন! এই ভাবিয়া সে গুরুকে রুটি ও ক্ষীর দিল। গুরু তাহা তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে বিলাইয়া দিলেন ও বলিলেন—'ইহা তোমাদের অংশ; তোমরা ইহা ভোগ কর।' গুরু নিজেও তাহার সামান্য অংশ আহার করিলেন ও জমীদারকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; বলিলেন, তাহার গৃহে দুগ্ধ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হইবে, এবং তাহা বাস্তবিকই হইয়াছিল।

১৪শ শাখী।

অতঃপর তিনি পাতিয়ালার অন্তঃপাতী ভিকী গ্রামে গমন করিলেন। দেশু নিকটে গেল। গুরু বলিলেন,—'এস দেশরাজ! এখানে বস। তুমি লাঠি রেখেছ কেন?' দেশু উত্তর করিল যে, সে সাখী সুলতানের পূজক (ভক্ত), তাই সে চিহ্ন স্বরূপ এই লাঠি ব্যবহার করে। গুরু বলিলেন—'সে কি কথা! তুমি হিন্দু হইয়া তুর্কী (মুসলমান) * ফকিরদের পূজা কর। লাঠি ফেলিয়া দাও। আমি তোমার উপর এক রাজ্যভার ন্যস্ত করেছি।' বাহান্ন জন বীরের † তূণীর হইতে পাঁচটি তীর লইয়া তিনি তাহাকে উপহার দিয়া বলিলেন 'আমি তোমাকে শ্রেষ্ঠ বীরদের পাঁচটি তীর দিলাম। তুমি যেখানে যাইবে, সেইখানেই জয়ী হইবে। যদি তুমি শিখ ধর্ম্ম মান, তবে তুমি রাজা হইবে; কিন্তু যদি অবিশ্বাসী হও (অর্থাৎ শিখ ধর্ম্মত্যাগ কর,) তবে তোমার ধ্বংস অনিবার্য্য।' দেশু তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্বীয় দুর্গে প্রস্থান করিল।

---

* পরম দয়ালু তেগবাহাদুর মোগলদের ব্যবহারে এতদূর বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, তুর্কী-দের প্রতি যে সাধুজনোচিত দয়া, তাহাও তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল।

† এই বীরেরা অপার্থিব জীব বিশেষ। ইঁহারা সংখ্যায় ৫২ বাহান্ন। শিখেরা তাঁহাদিগকে অত্যন্ত ভক্তি করে।

গুরু আরও দশ ক্রোশ পথ গমন করিয়া পাতিয়ালার অন্তর্গত খিসলা গ্রামে উপস্থিত হইলেন।

শরবর ফকিরের অনুচর সেকেরা দেশরাজের নিকট যাইয়া বলিল—দেখ তুমি সোড়িবংশীয় গুরু তেগ বাহাদুরের বাক্য মানিয়া লাঠি ফেলিয়া দিয়া মহাপাপ করিয়াছ। গুরু একজন যাদুকর বই ত' নয়! আত্ম পাপ স্মরণ করিয়া অনুশোচনা কর। ফকিরের (তুষ্টির) জন্য উপহারের বন্দোবস্ত কর। তীরগুলা ফেলিয়া দাও, আবার লাঠি ধর। ইহাকে নমস্কার কর। সর্ব্বদা ইহা সঙ্গে রাখিও।' এরূপে তিরস্কৃত হইয়া দেশু তীরগুলি ফেলিয়া দিল ও লাঠি লইল। তখন শরবরের সেই শিষ্যেরা সেই তীর গুলি ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল ও উনুনে ফেলিয়া দিল। শরবরের শিষ্যদের কথা শুনিয়া দেশরাজ এইরূপে আপনার ধ্বংস আপনি করিল।

১৫শ শাখী।

খিসলাতে একটী ব্রাহ্মণ গুরুর সেবা করিত। কিছুক্ষণ পরে যখন সে ফিরিতেছিল, তখন গুরু তাহাকে আগুন আনিতে বলিলেন: ব্রাহ্মণ আগুন, জল ও দুধ আনিল—একটি ছেলে সেই আগুন লইয়া আসে, একটি রমণী সেই জল ও সে নিজে দুগ্ধ লইয়া আসে। তাহারা এই সব জিনিষ লইয়া তাঁহার নিকট দাঁড়াইলে, গুরু সেই ব্রাহ্মণ ও তাহার ছেলেকে এবং অন্যান্য শিখদেরও খানিকটা দুধ দিলেন। ব্রাহ্মণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—'তুমি সর্ব্বদাই রাজপুতদের বিবাহ কালে দক্ষিণা পাইবে, এবং তোমার গৃহে যথেষ্ট দুধ হইবে।' গুরু আরও বলিলেন যে, এখানে একটি কূপ খনিত হইবে এবং একটি বির গাছ বসান হইবে। পরে তাহা কার্য্যতঃ ঘটিয়াছে

১৬শ শাখী।

অতঃপর গুরু মৌড়গ্রামে থামিলেন। এ গ্রামটি পাতিয়ালা ও নাভার সামান্ত দেশে অবস্থিত। বিশ্রামের স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে তিনি একটি প্রকাণ্ড ঘেরা জায়গা দেখিতে পাইলেন, তাহার মধ্যস্থলে একটি 'জুণ্ড' বৃক্ষ রহিয়াছে। তিনি সে স্থানে বাস করিতে অভিলাষী হইয়া তাহার দরজা খুলিয়া দিবার জন্য গ্রামবাসীদের বলিলেন।

গুরু যাহাতে ঐ বৃক্ষতলে না যান, এজন্য পথিকেরা ও গ্রামবাসীরা তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতে লাগিল; কারণ, সেখানে একটি অপদেবতা

ছিল। যে কেহ সেখানে যায়,সে তাহাকেই মারিয়া ফেলে। ইহার কয়েক দিন আগে একটি ছেলেকে সে খুন করিয়াছে। গুরু বলিলেন "আমি এই অপদেবতাকে তাড়াইয়া দিয়া তৎস্থানে কোন পবিত্র দেবতার বাস করাইব। আমি অপদেবতাকে ভয় করি না। আমি অতি পূর্ব্বে আনন্দপুর হইতে একটা ভূতকে তাড়াইয়াছি। সে তাহার দলবল লইয়া পলাইয়াছে। ইহাকেও আমি তাড়াইতে সমর্থ হইব।" তখন গ্রামবাসীরা আর কোন আপত্তি না করিয়া তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিল।

রাত্রে সেই অপদেবতা গুরুকে বলিল, "১৪৫বৎসর পূর্ব্বে * গুরু অমরদাস গোবিন্দবাল হইতে আমায় তাড়াইয়া দিলে আমি এই জঙ্গলা দেশে বাসা লইয়াছি।" গুরু কিন্তু তাহাকে সে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবার জন্য আদেশ করিয়া বলিলেন—"তালবাণ্ডী†আমার নিকট ৺কাশীর ন্যায় পবিত্র। সে স্থানের ছয় ক্রোশের মধ্যে কোন অপদেবতা বাস করিতে পারিবে না। আমি বলিতেছি, চলিয়া যাও। এখানে কোন দেবতা আসিয়া বাস করিবেন; আর এখানকার লোকেরাও দেবতাদের ন্যায় ধার্ম্মিক হইবে।" গুরুর আদেশমত জুণ্ড বৃক্ষের স্থলে একটি পিঁপুল গাছ জন্মিল। এ গাছটিকে পূর্ব্বে নষ্ট করা হইয়াছিল। গ্রামবাসীরা গুরুকে গভীর বিশ্বাস ও ভক্তি করিতে লাগিল এবং তিনি যতদিন তাহাদের নিকট ছিলেন, ততদিন তাহারা বেশ বিশ্বস্ততার সহিত তাঁহাকে সেবা করিয়াছিল। ‡

* অরদাস তৃতীয় গুরু। তিনি ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে গুরুপদ পান। শিখ সম্প্রদায়গ্রন্থে তাঁহার জীবনী লেখা হইয়াছে। তাঁহার গুরুপদপ্রাপ্তির কালে খাঁড়ুর শিখদের প্রধান কেন্দ্রস্থান ছিল; কিন্তু তিনি গুরু হইয়াই স্বীয় জন্মভূমি গোবিন্দবালে গুরুদরবার করেন। ফলে গোবিন্দবাল শিখদের প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। ১৫৫২+১৪৫=১৬৯৭। গুরুতেগ বাহাদুর ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মোগলদের হস্তে নিহত হন। কাজেই এ ভ্রমণ ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে সম্পাদিত হয়। তাহা হইলে ১৬৭৫—১৪৫=১৫৩০। প্রায় ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থোক্ত ঘটনা ঘটে। ঐ ঘটনাটি পৌরাণিক হইতে পারে, এবং বোধ হয়,তাহাই। তবে ঐ সময় অমর গোবিন্দবালে অবস্থান করিতেন, এই টুকু ইহা হইতে জানা গেল। অমর ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে একত্রিংশৎ বর্ষ বয়সে শিখধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তাহা হইলে উপরোক্ত ঘটনা তাঁহার শিখধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে ঘটে।

† তালবাণ্ডী গ্রামে বাবা নানক জন্মগ্রহণ করেন; ইহার বর্ত্তমান নাম নানকাণা। এখানে একটি গুরুদরবার আছে। ইহা শিখদের একটি তীর্থ।

‡ এই শাখীতে গুরুর লোকহিতৈষণার পরিচয় পাওয়া যায়।

১৭শ শাখী।

মৌড়ে অবস্থানকালে গুরু প্রত্যহ একটি পুষ্করিণীতে যাইতেন ও তিনি উপস্থিত থাকিয়া গ্রামবাসীদের দিয়া তাহা পরিষ্কার করাইতেন। * সেই সময় তিনি 'তালি' বৃক্ষাবলির তলে বসিয়া তাহাদের কার্য্য দেখিতেন। এইখানে বাস করিবার কালেই তাঁহার পূর্ব্বকালীন অষ্ট জন গুরুর এক জনের জন্মোৎসবের দিন আসিল। সেই উপলক্ষে নানাস্থানের শিখ ও ভক্তেরা তথায় গুরুকে দেখিতে আসিল। যাত্রার উদ্যোগ করিতে করিতে এক মাস দশ দিন কাটিয়া গেলে তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন এবং বহুদিন ধরিয়া অচেতন হইয়া রহিলেন। যখন তাঁহার চৈতন্য আসিল, তখন শিখ ও গ্রামবাসীরা সকলে দলে দলে ব্যাপার কি, জানিবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন, দেশুকে যে পাঁচজন বীর উপহার দেওয়া হইয়াছিল, দেশু তাহাদের বড়ই অপমান করিয়াছে, এজন্য তাহারাও দেশুকে নষ্ট করিবে; গ্রামবাসীরা দেশুর জন্য মিনতি করিতে লাগিল—'সে আমাদের আত্মীয়। কারণ, ভীখার মেয়ের সহিত সুকিয়া রায়ের পুত্র বগ্‌গার বিবাহ হইয়াছে। তাকে আমরা এখানে লইয়া আসি।' গুরু তাহাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র যাইতে বলিলেন; কিন্তু তাহারা দেশুর নিকট যাইয়া তাহাকে আসিবার জন্য জেদ করিলেও সে তাহাদের কথা শুনিল না। ভাগ্য বড় কঠোর—অখণ্ডনীয়; কেহ তাহার হাত এড়াইতে পারে না। দেশু গুরুর দানের মর্য্যাদা বুঝিতে পারে নাই। গুরু বলিলেন—'আমি তাহাকে যথেষ্ট উন্নত করিয়াছিলাম, তাহাতে সে তাহার দেশরাজ-নামের যোগ্য হইয়াছিল। সে এই মরুভূমির কোন বর্দ্ধমানগ্রামের অধিপতি হইতে পারিত। কিন্তু সে আমার অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।" মৌড়ের শিখেরা তখনও কাতরভাবে গুরুর সমক্ষে দাঁড়াইয়া রহিল দেখিয়া, গুরু বলিলেন—"তোমরা কি চাও?" তাহারা বলিল—"প্রভু, এক জনের দোষে কি সমগ্র চাহুল জাতিটা নষ্ট হইবে?" (তাহাদের কাতরোক্তিতে কাতর হইয়া) গুরু উত্তর করিলেন—"আমি সে জাতিকে ক্ষমা করিয়াছি। তাহারা শান্তি ও নিরাপদে থাকিবে। তাহাদের অনেকেই শিখ হইবে। আমি (তাহাদের উপর হইতে) আমার অভিশাপ তুলিয়া লইলাম। শিখদের সম্মানের জন্য আমি তাহাদের ক্ষমা করিলাম এবং

* গুরু, লোকের স্বাস্থ্যরক্ষায় বিশেষ মনোযোগী ছিলেন, তাহা এই কথা হইতে বেশ বুঝা যায়।

এক দেশুকে ছাড়া আর তাহাদের সকলকে রক্ষা করিব। দেশু অপদেবতাদের দ্বারা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইবে।"

১৮শ শাখী।

তার পর গুরু তালবান্তীতে থামিলেন। এখানে একটি 'উয়ের ঢিবি' ছিল। তিনি এই ঢিবির সমক্ষে প্রণাম করিলেন। নিকটে কোন মন্দির নাই, অথচ গুরু প্রণাম করিলেন দেখিয়া তাঁহার অনুচরেরা আশ্চর্য্য হইয়া গেল এবং এরূপ করিবার কারণ কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, "এখানে একটা প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মিত হইবে। তাহা উচ্চে নয়টা বর্ষার সমান হইবে। তাহার চূড়াগুলি স্বর্ণমণ্ডিত হইবে।" শিখেরা জিজ্ঞাসা করিল—"কে এ মন্দির করিবে?" তাহাতে তিনি বলিলেন "গুরু নিজে পর্য্যাপ্ত ধন ও অদ্ভুত ক্ষমতা লইয়া তাঁহার দশম অবতারে দেখা দিবেন।* আরও বলিলেন—"সেই অবতার রাজা ও সাধু উভয়ই হইবেন। তিনি ব্রাহ্মণদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভোজ দিবেন, মহাদেবীকে পূজা করিবেন। এই দেবী তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন এবং তাঁহার প্রভাবে সেই অবতার তাঁহার শত্রুকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন। তিনি একটি তৃতীয় সম্প্রদায় গঠন করিবেন। বাইশটি পার্ব্বত্য রাজ্য স্ববশে আনিয়া তিনি তুর্কদের (মোগলদের) বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিবেন ও বড় বড় যুদ্ধে তাহাদের দশ লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য নষ্ট করিয়া প্রাপ্ত রাজ্য শিখদের দান করিবেন। তিনি একটী নূতন গ্রন্থ লিখিবেন। তিনি পাটনাতে জন্ম গ্রহণ করিবেন। তিনি একটি গ্রামে অবস্থান করিবেন। রক্তপাতী যুদ্ধে তিনি জয়ী হইবেন। সে যুদ্ধ এই স্থান হইতে বিশ ক্রোশ দূরে হইবে। পরে তিনি এখানে আসিবেন এবং বর্ম্ম খুলিয়া রাখিয়া বিশ্রাম করিবেন। সেই পবিত্র ব্যক্তির মন্দিরের কথা পূর্ব্বে জানিয়াই আমি এখানে প্রণাম করিয়াছি।" এখানে থাকিবার জন্য শিখেরা গুরুকে অনুরোধ করিল; কিন্তু তিনি বলিলেন—"না, যাঁহার কথা বলিলাম, তিনি এখানে বসিয়া

* শিখদের বিশ্বাস যে, গুরু একজনমাত্র। বিভিন্ন বিভিন্ন গুরুর যে অস্তিত্ব দেখা যায়, তাহা কেবল বিভিন্ন দেহমাত্র, সেই এক আত্মাই প্রত্যেক দেহে কার্য্য করেন; অর্থাৎ অপরাপর গুরু প্রথম গুরু বাবা নানকের অবতার বা বিভিন্ন প্রকাশমাত্র।

তাঁহার দয়া বিতরণ করিবেন। তাঁহার মন্দিরের পাদদেশে আমার সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হইবে।*

১৯শ শাখী।

পর দিবস গুরু একটী বদরী বৃক্ষের তলে বসিয়া কতকগুলি কোদাল আনিবার জন্য শিষ্যদের আদেশ করিলেন। (কোদাল আসিলে) তিনি একখানি লইয়া স্বহস্তে 'তালবান্তী দীঘি' পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। আপনার শালে করিয়া পাঁচ বার মাটি তুলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার এরূপ কার্য্য দেখিয়া সেখানে যে কেহ উপস্থিত ছিল, শিখ ও ভক্তগণ, নর ও নারীগণ, সকলেই দীঘি পরিষ্কার করিবার জন্য লাগিয়া গেল। †

ক্রমশঃ

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

* এই শাখীতে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, সমস্তই দশমগুরু গোবিন্দসিংহকে লক্ষ্য করিয়া। ইহা পাঠে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, ইহা গোবিন্দের জন্মের পূর্ব্বকার কথা। যদি তাহাই হয়, তবে ৪র্থ শাখীতে এ ভ্রমণে গুরু গোবিন্দের উপস্থিতির কথা যাহা বলা হইয়াছে, তাহা লেখকের ভুলক্রমে ঘটিয়াছে। আর যদি তাহাই সত্য হয়, তবে ইহা ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বকার ঘটনা অর্থাৎ তেগ গুরুপদ প্রাপ্তির পর যে পঞ্জাব হইয়া দিল্লী ও তথা হইতে বিহার ও বঙ্গে যান, ইহা সেই যাত্রার কথা। গুরু গোবিন্দ সিংহসম্বন্ধে এখানে যাহা কিছু ভবিষ্যোক্তি করা হইয়াছে, তাহা সমস্তই ঘটিয়াছিল। তাঁহার জীবনী পাঠ করিলেই পাঠকের সকল সংশয় দূর হইবে। শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়প্রণীত 'গুরুগোবিন্দ সিং' ও মল্লিখিত 'গোবিন্দ সিংহ' দেখুন। এই শাখীতে আর একটি তথ্য প্রকাশিত হইল যে, জ্যোতিষশাস্ত্রে গুরু তেগ বাহাদুরের অধিকার ছিল, অন্যথা এরূপ ভবিষ্যোক্তি সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে একটা কথা উঠিতে পারে, এই শাখী-উক্ত বাক্যাবলী সমস্তই লেখকের লেখনী প্রসূত এবং তেগবাহাদুরের সহিত ইহার কোন সংস্রব ছিল না। অসম্ভব নয়: কিন্তু ইহার সম্ভাবনা অসম্ভাবনা বিচারের উপায় কি?

† ১৭শ শাখী দ্রষ্টব্য। গুরু তেগ বাহাদুর যে, দেশের স্বাস্থ্যরক্ষায় একান্ত মনোযোগী ছিলেন এবং দেশের স্বাস্থ্যরক্ষায় অপরের উৎসাহবিধানের জন্য নিজে সামান্য কুলির ন্যায় কার্য্য করিতেও সঙ্কুচিত হইতেন না, ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। আজ আমরা কোনরূপ সামান্য কার্য্য করাকে হীন কার্য্য বলিয়া মনে করি। দেশের স্বাস্থ্যবিধান যে সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, ইহা আমরা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। স্বহস্তে পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করা দূরে থাকুক, বর্ত্তমান কালের জমীদার ও ধনী মহাশয়েরা দেশের নষ্টপ্রায় পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের জন্য সামান্য অর্থব্যয়টুকু করিতেও সমর্থ নহেন! ফলে দেশে ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগসমূহের প্রচার হইয়া পড়িতেছে। আমরা নিজের দোষেই নষ্ট হইতে বসিয়াছি।

দুঃখিনী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এ সংসারে চিরদিন কাহারও এক ভাবে যায় না; আজ যে, অতুল সুখের সাগরে সাঁতার দিতেছে, কাল সে মুষ্টিভিক্ষার জন্য অন্যের দ্বারে যাইয়া দাঁড়াইতে পারে। জগতে প্রতিদিন এই প্রকার ঘটনা ঘটিতেছে। সংসারের ধন, মান, প্রতিপত্তি, পার্থিব সুখ এমনই জলবিম্বের ন্যায় একবার উঠিতেছে, আবার নিমেষের মধ্যে কোথায় মিশিয়া যাইতেছে। আমাদের দুঃখিনীর অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিল। দরিদ্রের সন্তান, অল্প বয়সে মাতৃহীন হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লইয়া কত কষ্ট পাইল। রামসত্য কতকগুলি টাকা ধার করিয়াও ভাল ঘরে তাহার বিবাহ দিলেন। দুঃখিনী সুখের মুখ দেখিল; পৃথিবীতে রমণীর সকল রত্নের সার পবিত্র-হৃদয় স্বামিরত্ন পাইয়া সে কৃতার্থ হইল। কিন্তু কে জানিত যে, তাহার জীবনের সুখের দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে, কে জানিত যে এমন সরলা পতিপ্রাণা রমণী অগাধ দুঃখসাগরে পড়িবে? ক্ষুদ্র কীট আমরা,—আমরা কেমন করিয়া বুঝিব যে, সৃষ্টির মহান্ প্রভু এই কার্য্যের দ্বারা কি উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবেন; আমাদের সাধ্য কি যে, সে কথা বুঝিতে পারি।

পাঠকগণের মনে আছে যে, দুঃখিনীকে বাটীতে রাখিয়া ভজহরি এবার কর্ম্মস্থানে গিয়াছিলেন,—তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে,দুই চারি মাস পরেই দুঃখিনীকে আপনার নিকট লইয়া যাইবেন; কিন্তু সে দিন আর আসিল না; দুঃখিনী আর স্বামীর সন্দর্শন লাভ করিতে পারিল না। ভজহরির কর্ম্মস্থানে সেবার ভয়ানক ওলাউঠা আরম্ভ হইল। ভজহরি যদি পূর্ব্বে এ সংবাদ দুঃখিনীকে লিখিতেন, তাহা হইলে দুঃখিনী কিছুতেই নিশ্চিন্ত থাকিত না। নিশ্চয়ই সে ভজহরিকে বাটীতে আনিবার চেষ্টা করিত; কিন্তু ভজহরি জানিতেন যে, এ সংবাদে দুঃখিনী বড়ই ব্যাকুল হইবে; সেই জন্য তিনি কোন কথাই তাহাকে লেখেন নাই। একদিন ভজহরিও ঐ রোগে আক্রান্ত হইলেন; ডাক্তারেরা নানা প্রকার চেষ্টা করিলেন, বন্ধুবান্ধবেরা যত্নের ত্রুটি করিল না, কিন্তু ওলাউঠা হইলে বাঁচা বড় কম লোকের অদৃষ্টেই ঘটে। ১৩ ঘণ্টার মধ্যেই ভজহরির প্রাণবিয়োগ হইল। তাঁহার বন্ধুগণ যথারীতি তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করিল। দুঃখিনীর জীবন ঘোর দুঃখসাগরে ডুবিয়া গেল। ভজহরির মৃত্যুর

তিন দিন পরেই উদয়পুরে সেই নিদারুণ সংবাদ আসিল। বাটীতে মহা কান্নাকাটী পড়িয়া গেল।

মন্দ সংবাদ বাতাসের অগ্রে চলে; সেই দিন অপরাহ্ণেই মহেন্দ্রপুরে রামসত্য শুনিলেন যে, তাঁহার জামাতা ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। রামসত্য এই সংবাদ শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দুঃখিনীর মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। কে যেন আসিয়া তাহার মাথার উপরে চাপিয়া বসিল,—তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল,—শরীর অবসন্ন হইল; একটী কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না,—নীরবে, ধীরে ধীরে অচৈতন্য অবস্থায় দুঃখিনী ভূমিতে পতিতা হইল। কিছুক্ষণ পরে তাহার জ্ঞানসঞ্চার হইল, সে চারিদিক্ আঁধার দেখিতে লাগিল; কিন্তু সে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে পারিল না, তাহার বাক্‌শক্তি কে যেন হরণ করিয়া লইয়া গেল। দুঃখিনীর প্রাণের নিদারুণ যন্ত্রণার কথা কি বলিয়া বুঝাইব; ভাষায় শব্দ নাই, যাহাতে সে কথা বলিতে পারা যায়। আমাদের পাঠিকাদিগের মধ্যে যদি এমন হতভাগিনী কেহ থাকেন, কাহারও মস্তকে যদি এমন বজ্রপাত হইয়া থাকে, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, দুঃখিনীর সে সময়ের অবস্থা কেমন শোচনীয়। দুঃখিনীর যে আশ্রয়-যষ্টি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে!

রসিক বাটীতে আসিয়া সমস্ত কথা শুনিল এবং দুঃখিত মনে বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল। হতভাগিনীর সান্ত্বনার জন্য একটী বার তাহার নিকটে আসিয়া একদণ্ডের জন্যও বসিল না। প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোকেরা ক্রমে ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কেহ দুঃখিনীকে বুকে করিয়া বসিলেন, কেহ ভজহরির গুণের কথা বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কেহ বা অদৃষ্টের নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং দুঃখিনীকে শান্ত করিবার জন্য নানা কথা বলিতে লাগিলেন।

সময়ে সবই সয়। ধীরে ধীরে দুঃখিনী স্বামি-শোক হৃদয়ের মধ্যে চাপিয়া সংসারের কাজ করিতে লাগিল। সংসারের কাজ না করিলে বৃদ্ধ পিতাকে কে আহার যোগায়, ভাইয়ের তত্ত্ব কে করে? দুঃখিনী কাজেই দিনে দিনে শান্ত হইতে আরম্ভ করিল। এ শান্তি তাহার প্রাণের নহে,—তাহার প্রাণ কি আর এ জীবনে শান্ত হইবে? তাহার হৃদয়ে এখন রাবণের চিতা দিবা-নিশি জ্বলিবে; কিন্তু তাহা বলিয়া কি হইবে? দুঃখিনী চিন্তায় আকুল হইল, সে চারিদিকে নানা বিপদ্ দেখিতে লাগিল। যতই দিন যাইতে লাগিল,

ততই সে বুঝিতে পারিল যে, তাহার চারিদিকে নানা বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে! রামসত্যের উপার্জ্জনের ক্ষমতা ছিল না,—অথচ মাসে দশ টাকার কমে সংসার চলিত না, তাহার পরে মহাজনের ঋণ আছে। দুঃখিনীর বিবাহে যে টাকা ঋণ হইয়াছিল, তাহার একটী পয়সাও শোধ হয় নাই,—কোথা হইতে শোধ হইবে? দুঃখিনী মনে করিয়াছিল, স্বামীর নিকট হইতে ধীরে ধীরে দুই এক টাকা লইয়া সে ঋণ পরিশোধ করিবে, কিন্তু এতদিন তাহা করিতে পারে নাই। দুঃখিনী এতদিন দেখিয়াছিল, ভজহরি যাহা বেতন পান, তাহাতে তাঁহার সংসার খরচ হইয়া অতি কমই বাঁচে। মাসে মাসে বাটীতে টাকা পাঠাইতেই হইবে। দুঃখিনী কোনদিন একখানি অলঙ্কারের জন্য আব্দার করে নাই। যখনই ভজহরি দুঃখিনীর কোন অলঙ্কার প্রস্তুতের কথা বলিয়াছেন, তখনই দুঃখিনী সুশীলার (ভজহরির ভগিনীর) বিবাহে অনেক টাকা লাগিবে, তাহার জন্য সঞ্চয় করা দরকার বলিয়া অলঙ্কার গড়াইতে নিষেধ করিয়াছে। কাজেই এতদিন পিতৃঋণ পরিশোধের কথা সে মুখেও আনিতে পারে নাই। সে ভাবিত, তাহার স্বামীর উপার্জ্জনের অর্থ অগ্রে তাঁহার নিজ পারিবারিক অভাব মোচন এবং সচ্ছলতার জন্য ব্যয়িত হইবে,তাহার পরে যদি কিছু বাঁচে, তবে তিনি তাহা অন্য ব্যাপারে ব্যয় করিতে পারেন। তবুও দুঃখিনী বাসা খরচের টাকা হইতে ২।১ টাকা বাঁচাইয়া অনেক সময়ে পিতাকে পাঠাইবার ইচ্ছা করিত; কিন্তু একদিনও পারে নাই, সে হয়তো সেই স্থানে কোন দুঃখী দরিদ্রকে দেখিয়া তাহা দান করিত। তাহার মনে আশা ছিল,—তাহার বিশ্বাস ছিল, তাহার স্বামী ধর্ম্মভীরু, সত্যপরায়ণ ব্যক্তি; তাঁহার ক্রমে উন্নতি হইবে এবং যখন তাহাদের অবস্থা সচ্ছল হইবে, তখন পিতার ঋণ অনায়াসে শোধ করিতে পারা যাইবে। সেই জন্যই এতদিন ঋণ শোধ হয় নাই। দুঃখিনী যতদিন মহেন্দ্রপুরে ছিল, ততদিন ভজহরি মাসে মাসে খরচ পাঠাইতেন;—তাহা না হইলে যে, সংসার চলে না। এখন ধীরে ধীরে দুঃখিনীর সব কথা মনে পড়িল। দেবরের ব্যবহারের কথা মনে পড়িল; সে সংসারে যে তাহার স্থান হইবে না, তাহা সে বুঝিতে পারিল; এদিকে পিতার বাটীতে থাকিলেও অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। তাহার পরে ছোট ভাইটীর যে প্রকার চরিত্র, তাহাতে সেই বা কোন্ সময়ে কি করিয়া বসে! নানা চিন্তায় দুঃখিনী অধীর হইয়া পড়িল।

ইতোমধ্যে একবার দুঃখিনীকে উদয়পুরে যাইতে হইয়াছিল। সেখানে যথারীতি ভজহরির শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলেই, দুঃখিনী আবার পিত্রালয়ে আসিল।

ক্রমশঃ।

শ্রীজলধর সেন।

সায়র্-উল্-মুতাখরীণ।*

ইহা আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাহাদুর শা (শাহ আলম্) হইতে মোগল রাজ-লক্ষ্মীর পতনের বিবরণমূলক ইতিহাস। ৭৪ (চুয়াত্তর) বৎসরের (১৭০৭খৃঃ ১৭৮০ খৃঃ পর্য্যন্ত) বর্ণনা, ইহাতে আমূল বিবৃত। পাঠান ও মোগলদের (আওরঙ্গজেব পর্য্যন্ত) বাদ্‌শাহদের মূল ইতিহাস—পার্সী হইতে ইলিয়ট্ কর্ত্তৃক প্রকাণ্ড ৮ (অষ্ট) খণ্ডে ইংরাজিতে ভাষান্তরিত হইয়া গিয়াছে। তৎপরবর্ত্তী কালের ইতিবৃত্তের যে অভাব ছিল, গোলাম হোসেন্ তাহার পরিপূরণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আর এক নাম ছিল—"আল্‌তবা তবাই আল্ হুসেনী।" তিনি পদস্থ মুসলমান;—আবার এদিকে দিল্লী, তাঁহার জন্ম-স্থলী। সুতরাং মর্য্যাদায় ও স্থান-মহিমায়, তাঁহার গুণের সীমা নাই। এই মূল পার্সী পুস্তকে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে—অর্থাৎ প্রথমোক্ত ব্যাপার-গ্রন্থকর্ত্তার চক্ষুর গোচরে ঘটিয়াছিল। অতএব গ্রন্থের গুরুত্ব বিলক্ষণ।

দিল্লীর যে ৭ (সাতটী) বাদশাহী কাহিনী ইহাতে বর্ণিত, সেই ৭টিই নামমাত্রেই সম্রাট্ ছিলেন। কাজেই তাঁহাদের বিষয়—সংক্ষিপ্ত। ইহার দুই কারণ:—(১) ঐ ঘটনাবলী এই লেখকের অগোচরে ঘটে। (২) তাঁহাদের রাজত্বের স্মরণযোগ্য ঘটনা অতিব বিরল।

মুর্শিদাবাদের নবাবদের বিবরণও, ইহার বর্ণনার বিষয়ীভূত। নবাব আলিবর্দ্দি হইতে সেরাজ ও ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সূচনার ইতিহাসও অতি সবিস্তারে বর্ণিত। ইহা অতি যোগ্য কার্য্যই হইয়াছে। উহা থাকাতেই এটী একটী সামাজিক ও ঐতিহাসিক, নৈতিক ও সাহিত্যিক, ধর্ম্ম-বিষয়ক ও অন্যান্যব্যাপারসংক্রান্ত—ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের কেমন সুন্দর দর্পণস্বরূপই হইয়াছে!

* ৺গৌরসুন্দর মৈত্র কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ।

আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে—যদিও ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে একটী ফ্রেঞ্চ (তিনি মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া হাজি মুস্তাফা এই কল্পিত নাম ধারণ করেন) কলিকাতা রাজধানীতে প্রথম ইংরাজী অনুবাদ করেন—যদিচ তৎপরে ১৮৩২ খৃঃ বিগ্রস্ (Colonel Briggs) সাহেব বিলাতে একটী অসম্পূর্ণ ইংরাজি অনুবাদ প্রচার করেন বটে এবং যদিও ক্যাম্ব্রে এণ্ড কোম্পানির অর্থব্যয়ে ও শ্রমে একটি পুনঃসংস্করণ প্রচারিত হয় বটে, তথাপি বক্তব্য এই যে, তত্তাবৎ কোনরূপেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইতে পারে নাই। মূল্যও যার-পর-নাই সাধারণ পাঠকের ক্ষমতাতীত এবং অনুবাদও, নির্ভুল নহে;—মধ্যে মধ্যে তাহাতে অশ্লীল ও অবিশুদ্ধ, অলীক এবং অমূলক—এমন কি, অনেক অনাবশ্যক কথাও স্থান পাইয়াছে। মজিদের মুদ্রিত মূল পার্সী শুদ্ধগ্রন্থ। পার্সীতে সুপণ্ডিত, এবম্ভূত বিদ্বন্মণ্ডীর চেষ্টা, উদ্যম, যত্ন ও বিদ্যাবত্তার গুণেই উহার এত উৎকর্ষ! তাহা হইলেও, তাহাতে বাঙ্গালী-পাঠক-সমাজের যে অভাব—সেই অভাবই ছিল। সুখের বিষয়, এখন অবস্থায় গৌরসুন্দর বাবুর এই বঙ্গানুবাদ, যেমন মূলানুগত - তেমনই আবার সহজ ও প্রীতিপদ, অথচ বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত ও অতি সুন্দররূপেই মুদ্রিত হইতেছে। ইহাতে এক দিকে বঙ্গভাষার পরিপুষ্টি ঘটিবে—এবং পক্ষান্তরে ইতিহাস-ক্ষেত্রের ভূমিরও উর্ব্বরতা বাড়িয়া যাইবে। এই অনুবাদের মুদ্রণ জন্য স্বর্গীয় অনুবাদকের যোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। কেননা, কতিপয় বৎসর অতীত হইল, অনুবাদক মৈত্র মহাশয়, সমগ্র মূলের সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রস্তুত করিয়া, দিব্য-ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। পুত্র যোগ্য হইলেই, পিতৃ-কীর্ত্তি বজায় হয়। ইহাই আমাদের আনন্দের কথা। অতএব আশা করিতে পারি যে, প্রত্যেক সাহিত্যসেবকই, পঞ্জিকার ন্যায় ইহার এক একখণ্ড ক্রয় করিয়া প্রকাশককে উৎসাহিত করিতে ত্রুটি করিবেন না।

বোধন।

মেঘমুক্ত নীলাম্বরে, নব রবি খেলা করে
আজিকে হয়েছে ওরে নবীন প্রভাত,
নাহি গুরু গরজন, ঘন বারি-বরিষণ,
থেমেছে অশনি ঝঞ্ঝা-তমোময়ী রাত।
হাসিয়া এসেছে উষা, পরিয়ে কণকভূষা
সাজায়ে বরাঙ্গখানি ফুল-অলঙ্কারে,
অই না সেফালী হাসে, যামিনীফুলের বাসে
আকুল ভ্রমর-বঁধু হরষে গুঞ্জরে?
কমলনয়ন মেলি', খুলেছে রূপের ডালি
নেহারি প্রেমের রবি গগনের গায়,
গাহিছে দোয়েলা পিক ঝঙ্কারিছে চারি দিক্
রূপের তরঙ্গ যে গো, আজি ব'য়ে যায়।
অই বহে কল্লোলিনী, 'কুলু-কুলু' কি রাগিণী
চলেছে সে প্রেমময়ী মিলিতে সাগরে,
মাঠে মাঠে সোণা-ধান, কি সুষমা হরে প্রাণ
দাঁড়ায়ে কমলা যেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে।
নির্ম্মল গগনগায়, শুভ্র মেঘ ভেসে যায়
সে অনন্ত নীলিমার মরি কি মাধুরী,
নীড় ছেড়ে পাখীগুলি, উড়িছে আপনা ভুলি'
তুলিয়া মধুর তানে সঙ্গীত-লহরী।
এখনো ফুলের কোলে, নীহার-মুকুতা দোলে
নবীন আনন্দ ল'য়ে বায়ু বয়ে যায়,
চারিদিকে সজীবতা, চারিদিকে প্রফুল্লতা,
বিশ্ব ছেড়ে প্রাণ যেন কার পানে ধায়।
শ্যাম-তরু-ছায়া-তলে, পল্লী-বালকের দলে
ডাকিছে করুণ কণ্ঠে 'আয় মা জননি!'
সরল শিশুর ডাকে জননী ঘুমায়ে থাকে?
তাই কি আসিবি মাগো! শকতিরূপিণী?

আয় মা শারদে অয়ি! মা আমার জ্যোতির্ম্ময়ী
আঁধার ভারতে মাতা! বিদ্যুৎরূপিণী,
শত ব্যথা নির্য্যাতনে, সয়েছে সন্তানগণে
তবু কি হবে না দয়া জননী কল্যাণী?

* * * * *
* * * * *

কে তোরা ঘুমের কোলে, দেখ্‌রে নয়ন মেলে'
জননী ডাকিছে সবে শিয়রে দাঁড়ায়ে,
তাই তো সেফালী ঝরে, স্থলপদ্ম-শোভা করে,
কুমুদ-কল্লার সরে হাসিছে দুলিয়ে।
"ওঠ্‌রে ওঠ্‌রে তোরা, মোছ্‌রে নয়নধারা
আমি যে জননী বাছা হিত-বিধায়িনী,
এমনি শাঙন শেষে, আসিবে শারদ হেসে
ফুটিবে নবীন তেজে দীপ্ত দিনমণি।
বিদ্যালয়ে বাণীরাণী, কমলা কমলপাণি,
ভরিয়া এনেছে হের মুঠা মুঠা ধানে,
কার্ত্তিক সে ধনু হাতে, দাঁড়াবে তোদেরি সাথে
গণপতি দিবে জ্ঞান তোদেরি কল্যাণে।
দশ বাহু প্রসারিয়া, দিব অশ্রু মুছাইয়া
কোলে তুলে নিব, বাবা, আজিকে সবারে।"
একি আমি নিদ্রামগ্ন, সহসা ভাঙ্গিল স্বপ্ন
দাঁড়ায়ে শিয়রে মাতা ডাকিছে আমারে—
"ওঠ বাবা! ভোর হ'লো, কত ঘুম যাবে বলো?"
—চেয়ে দেখি নিশা-শেষ, হাসিছে তপন।
সহকার-শাখা-'পরে, রৌদ্র ঝিকিমিকি করে
সানাই তুলেছে দূরে সঙ্গীত মোহন।
অঙ্গনে ছেলের দলে, ক্রীড়া করে কলরোলে
নবীন উৎসাহভরা বদনে সবার,
"বন্দে মাতরম্" বলি, কেহ নাচে হাত তুলি,
কেহ বলে "জয় জয় ভারতমাতার।"

হেরিয়া তাদের খেলা সে আনন্দ প্রাণভোলা
বিস্ময়ে পূরিল প্রাণ আনন্দ-উৎসবে,
এই তো 'বোধন' মা'র, ডাকিছে সন্তান তাঁর
ছুটেছে চলিয়া সবে জীবন-আহবে,
ডাকিলাম হাত তুলে, "আয় রে মায়ের ছেলে
বল সবে হাত যুড়ি জননীর পায়,
দে জননি দেশভক্তি, দে জননি আত্মশক্তি,
দে জননি তোরি গুণগান রসনায়,
বল মা করুণা-ময়ি, 'মোরা যেন ধন্য হই
তোমারি সেবায় মাগো! করি দেহপাত।"
মেঘমুক্ত নীলাম্বরে, নব রবি খেলা করে
আজিকে হ'য়েছে ওরে নবীন প্রভাত।

শ্রীচম্পকলতা দেবী।

বাঙ্গালীর ইতিহাস।

বাঙ্গালীর ইতিহাস-সংকলনের উপকরণ বড় অধিক নাই। যাহা আছে, তাহাও সকল সময়ে সকলের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। সম্যক্ সমালোচনার অভাবে, পুরাতনগ্রন্থনিহিত অনেক কাল্পনিক কাহিনীও কখন কখন প্রমাণ-রূপে উদ্ধৃত হইয়া থাকে; এই সকল কারণে, বাঙ্গালীর ইতিহাস-সংকলনের জন্য আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইয়াও, তাহা বাঙ্গালীকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করিতে পারিতেছে না।

মুসলমান-শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বকালের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস সংকলিত হইবার আশা নাই। পুরাতন সাহিত্য, শিলালিপি, তাম্রলিপি, বা কদাচিৎ-প্রাপ্ত দুইচারিটি মুদ্রালিপি ভিন্ন সেকালের অন্য কোনরূপ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই।

যে সকল দূরদেশের সহিত সেকালে বাঙ্গালীর বাণিজ্য-সংস্রব বর্ত্তমান ছিল, তথায় কিছু না কিছু প্রমাণ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও, বাঙ্গালী এখনও তাঁহার অনুসন্ধানকার্য্যে ব্যাপৃত হন নাই।

জনশ্রুতি, সে কালের ব্রহ্ম, শ্যাম, মালয়োপদ্বীপ, তিব্বৎ, চীন, সিংহল ও বিবিধ দ্বীপপুঞ্জের সহিত বাঙ্গালীর কিছু না কিছু সংস্রব থাকা ব্যক্ত করিয়া আসিতেছে; কিন্তু তাহার বিস্তৃত বিবরণ সংকলন করিবার জন্য এখনও যথাযোগ্য আয়োজন আরব্ধ হয় নাই। আয়োজন করিতে হইলে, স্বদেশ ছাড়িয়া, বহুবিদেশে ধাবিত হইতে হইবে; তথাকার পুরাতন ভাষায় ও সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিতে হইবে; সে সকল দেশের শিল্পবাণিজ্যে, আচার-ব্যবহারে, ধর্ম্মে-নীতিতে, সাহিত্যে-সভ্যতায় বাঙ্গালীর প্রভাব কতদূর পরিলক্ষিত হইতে পারে, তাহার বিচারকার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হইবে। বাঙ্গালীর শিল্পবাণিজ্যে, আচারব্যবহারে, ধর্ম্মে, নীতিতে, সাহিত্যে, সভ্যতায় সে সকল দেশের কোনরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় কিনা, তাহারও বিচার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

মুসলমান-শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বকালের কথা যেরূপ হউক না কেন, মুসলমান-শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পরকালের কথা সেরূপ নহে। তাহা নানা গ্রন্থে উল্লিখিত আছে;—নানা শাসনলিপিতে, শিলালিপিতে, মুদ্রালিপিতে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। এখনও অনেক প্রমাণ আবিষ্কৃত হইতেছে; কিন্তু তাহার আলোচনা-কার্য্যেও বাঙ্গালী যথাযোগ্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন বলিয়া স্বীকার করিবার উপায় নাই। এই সকল কারণে, মুসলমান-শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার অব্যবহিত পরবর্ত্তী দুই তিন শতাব্দীর ইতিহাস এখনও তমসাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। অথচ এইকালের ইতিহাসই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালীর সকল শ্রেণীর লোকের সাধারণ ইতিহাস; কারণ, তাহা হিন্দু-মুসলমানের ইতিহাস। তাহার প্রধান কথা—সংঘর্ষ এবং সমন্বয়। এক সময়ে হিন্দুমুসলমান-সাম্রাজ্য, কলহে লিপ্ত হইয়া পরস্পরের কণ্ঠচ্ছেদ করিয়াছে; অল্পকালের মধ্যে তাহারাই আবার পরস্পরের কণ্ঠলগ্ন হইয়া সমবেত শক্তিতে দিল্লী-সাম্রাজ্যের অভিযানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, পরস্পরের সহায়তায় জন্মভূমির স্বাতন্ত্র্যরক্ষার্থ অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে। এই বিচিত্র ঐতিহাসিক যুগের বিবরণসংকলন করিবার জন্য এখনও সমুচিত আগ্রহ উপস্থিত হয় নাই।

কেবল পুরাতন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া সকল কথা অবগত হইবার উপায় নাই। যাহা কিছু তদ্দ্বারা অবগত হইবার উপায় আছে, তাহার উপরেও সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিবার উপায় নাই। যে সকল মুদ্রালিপি এবং শিলালিপি

আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহার সহিত পুরাতন গ্রন্থের অনেক কথার সামঞ্জস্য না থাকায়, নানা সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ পুরাতন গ্রন্থের উপর আস্থাশূন্য হইয়া উঠিয়াছেন; কিন্তু পুরাতন মুদ্রালিপি বা শিলালিপি যে,কতদূর অভ্রান্ত প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে, তাহার যথাযোগ্য আলোচনার সূত্রপাত হয় নাই। অন্যান্য দেশের ন্যায় বঙ্গদেশের পুরাতন মুদ্রালিপি বা শিলালিপির উপর নিঃসংশয়ে আস্থাস্থাপন করিবার উপায় নাই।

বঙ্গভূমি বহুবিপ্লবের লীলাভূমি। বৃটিশ-শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী যতকালের ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, ততকাল কেবল এক কথা—বিপ্লবের উপর বিপ্লব। তাহার জন্য কত সাম্রাজ্যের এবং কত রাজবংশের অভ্যুদয় এবং তিরোভাব সংঘটিত হইয়াছে। কখন কখন একই সাম্রাজ্যে,—একই সময়ে,—একাধিক ব্যক্তি আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য শিলালিপি বা মুদ্রালিপি প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। কখন বা পিতা বর্ত্তমানেই পুত্র আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। কখন বাঙ্গালী দিল্লীর অধীন হইয়াও, আপনাকে স্বাধীন বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়াছেন; কখন বা স্বাধীন বাঙ্গালীকে দিল্লীশ্বর অধীন বলিয়াই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

এই সকল কারণে কি লিখিত ইতিহাস, কি পুরাতন মুদ্রালিপি, কি শিলালিপি, কিছুর উপরেই নিঃসংশয়ে নির্ভর করিবার উপায় নাই। যাঁহারা বিনা বিচারে ইহার যে কোনও শ্রেণীর প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, ইতিহাস রচনা করেন, তাঁহারা মতান্ধতার জন্য পথভ্রান্ত হইয়া পড়েন। ইহাতেই বাঙ্গালীর ইতিহাস-সংকলনের চেষ্টা সমধিক আয়াস-সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

আয়াসসাধ্য হইলেও, ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। যাঁহারা এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন, তাঁহাদিগকে বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানপ্রণালীর শরণাপন্ন হইতে হইবে। কেবল পুরাতন গ্রন্থ ধরিয়া, অথবা কেবল মুদ্রালিপির বা শিলালিপির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া, সকল সময়ে সত্যনির্ণয়ে সফলকাম হইবার আশা নাই। বিচারপ্রণালী অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে, প্রমাণ সংকলন আবশ্যক। তাহাও বিলক্ষণ আয়াসসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

বক্তিয়ার খিলিজির বাঙ্গালায় আগমনের বহুপূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালী হিন্দুর সহিত মুসলমানের বাণিজ্যসংস্রব বর্ত্তমান ছিল। তাহা সমুদ্রপথে সংস্থাপিত হইয়াছিল। সে পথে বাঙ্গালী যেমন নানা দূরদেশে গমনাগমন করিত, অন্যান্য

দূরদেশের লোকেও সেইরূপ বঙ্গদেশে গমনাগমন করিত। লিখিত ইতিহাসে তাহার আভাসমাত্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়;—বিস্তৃত বিবরণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সে সময়ে যে সকল মুসলমান বণিক্-বাণিজ্যোপলক্ষে যাতায়াত করিত,তাহারা কার্য্যোপলক্ষে এদেশে দীর্ঘকাল বাস করিতেও বাধ্য হইত। তজ্জন্য পূর্ব্ববঙ্গের সহিত বহুপূর্ব্বেই মুসলমানদিগের পরিচয় সংস্থাপিত হইয়া গিয়াছিল।৩

এইরূপে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যে প্রথম সংস্রব সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার সহিত সাম্রাজ্যকলহ সংযুক্ত না থাকায়, উভয়ের মধ্যে সদ্ভাবের অভাব ছিল না। বাণিজ্য-ব্যাপারে বাঙ্গালী, চিরকাল সরলস্বভাব এবং সত্যনিষ্ঠ বলিয়া সুপরিচিত থাকায়, হিন্দুমুসলমানের মধ্যে বাণিজ্যকলহ সংঘটিত হইবারও কারণ উপস্থিত হইত না। বণিকবর্গের প্রতি শিষ্টাচার-প্রদর্শনের জন্য ভারতবর্ষের সমুদ্রোপকূলের সকল স্থানেই পুরাকাল হইতে ধর্ম্মান্ধতা বিদূরিত হইয়াছিল। তজ্জন্য হিন্দুরাজ্যে খৃষ্টান, মুসলমান, ইহুদীয় এবং পারসিকগণ নিরুদ্বেগে আপন আপন ধর্ম্মমতের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া বাস করিতে পারিতেন। বাঙ্গালাদেশেও এইরূপ উদারতা বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু সেকালের বিশেষ বিবরণ সংকলন করিবার উপায় নাই ;—যে পথে বাঙ্গালীর সমুদ্রযাত্রা চিরপ্রস্থান করিয়াছে, সেই পথে তাহার বিজয়বার্ত্তাও চিরপ্রস্থান করিয়াছে।

বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গাগমনের সমসময়ে কোন হিন্দু বা মুসলমানলেখক সে কথা লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিনা, তাহা অবগত হইবার উপায় নাই। কেহ সেরূপ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিলেও, তাহা উত্তর-কালে জনসমাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ; তাহার জনশ্রুতি-পর্য্যন্ত বর্ত্তমান নাই ! বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গাগমনের সময়ে এদেশে কোন্ হিন্দুরাজা বর্ত্তমান ছিলেন, তাহাও তর্কবিতর্কের ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। বক্তিয়ার এবং তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী মুসলমান-শাসনকর্ত্তার যে সকল মুদ্রা-প্রচার বা মস্‌জেদ নির্ম্মাণ করিবার কথা মুসলমান-লিখিত ইতিহাসে উল্লিখিত আছে, তাহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, তাহাতেও সংশয়ের অভাব নাই। এ পর্য্যন্ত সেরূপ মুদ্রা বা মস্‌জেদের চিহ্নমাত্রও আবিষ্কৃত হয় নাই।

এখন যাহা সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ইতিহাস বলিয়া সুপরিচিত, তাহার নাম—"তবকাৎ-ই নাসেরী"। তাহা কিন্তু বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস নহে,—তাহা নাসে-রুদ্দীন-নামক দিল্লীশ্বরের শাসনসময়ের দিল্লীসাম্রাজ্যের ইতিহাস ;—বক্তি-

য়ার খিলিজির বঙ্গাগমনের ন্যূনাধিক ষষ্টি বৎসরের পরবর্ত্তী কালে সংকলিত। তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে বঙ্গদেশের কিছু কিছু বিবরণ সন্নিবিষ্ট আছে। তাহারও অধিকাংশ কেবল উপাখ্যান ; অথচ তাহার সকল কথাই, প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

গ্রন্থখানি পারস্যভাষায় লিখিত। মেজর রাভার্টি তাহার যে ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাও বঙ্গসাহিত্যে যথোপযুক্তভাবে সমালোচিত হয় নাই। এই গ্রন্থ পাঠ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়,—ইহাতে বৈজ্ঞানিক বিচারপ্রণালীর পরিচয় প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। তাহার প্রধান কারণ এই যে,—গ্রন্থকার, সমসাময়িক ঘটনা বিবৃত করিবার জন্যই লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে যে সকল পুরাকাহিনী লিপি-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সত্যমিথ্যা নির্ণয় করিবার জন্য আগ্রহপ্রকাশের প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই।

এই গ্রন্থে বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গাধিকারের যে বিচিত্র কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহার সহিত লেখকের সমসাময়িক বিবরণের সামঞ্জস্য নাই। লেখক, লক্ষ্মণাবতীরাজ্যে উপনীত হইয়া দেখিয়াছিলেন, তখন পর্য্যন্তও পূর্ব্ববঙ্গ স্বাধীনভাবে সেনরাজবংশের অধিকারভুক্ত ছিল। তখনও মুসলমানশক্তি তাহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। যাহারা একাংশ হইতে পরাভূত হইয়া, অপরাংশের স্বাধীনতা-রক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছিল, তাহারা যে, সপ্তদশ অশ্বারোহীর আগমনসংবাদে পলায়নপর হইতে পারে, তাহা কেবল আর-ব্যোপন্যাসের বিচিত্র কাহিনীতেই সমাদর লাভ করিতে পারে। তথাপি নাসেরী গ্রন্থের এই কাল্পনিক কাহিনী অদ্যাপি প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়া আসিতেছে!

যাঁহারা তথ্যনির্ণয়ের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা না করিয়া,বা তাহার জন্য অপেক্ষা না করিয়া, ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা একটি মুখ্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। এই গ্রন্থে আদৌ "নবদ্বীপের" নাম নাই!

"নওদিয়া"-নামক স্থানে রাজধানী সংস্থাপিত থাকিবার উল্লেখ আছে। তাহাই নদীয়া এবং নবদ্বীপ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে! এক সময়ে "রায় লছমনিয়া" লক্ষ্মণসেন বলিয়া অনুমিত হইতেন। এক্ষণে তাহার ভ্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। "নওদিয়া" নবদ্বীপ কি না, এখনও তাহার সম্যক্ সমা-লোচনা আরব্ধ হয় নাই। বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গাগমনের সমসময়ে বিক্রমপুরে

লক্ষ্মণাবতীতে এবং লক্ষ্ণৌরনগরে গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের তিনটিমাত্র রাজধানী থাকিবার কথা মুসলমানলিখিত ইতিহাসে উল্লিখিত আছে ;—তৎপ্রসঙ্গে নবদ্বীপের নাম উল্লিখিত নাই। "নওদিয়া" কোন্ স্থানে, তাহা নির্ণীত হয় নাই ,—কেবল শব্দসাদৃশ্যে তাহা নবদ্বীপ বলিয়া অনুমিত হইয়া আসিতেছে !

যে কয়েকটি পরগণা, বক্তিয়ার খিলিজির করতলগত হইয়াছিল, তিনি তাহার মধ্যেই খিলিজিগণকে জায়গীর দান করিয়া, রাজধানী ও সেনানিবাস সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তাহা সমস্তই উত্তরবঙ্গে অবস্থিত। নবদ্বীপে বা তাহার নিকটে সেরূপ কোন পুরাতন জায়গীর বা সেনানিবাস সংস্থাপিত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

যাঁহারা লক্ষ্মণসেন দেবকে পলায়ন-কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়া ইতিহাস-রচনা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা বলেন,—নবদ্বীপে রাজধানী না থাকিলেও, বৃদ্ধ রাজা তথায় গঙ্গাবাস করিতেন। কিন্তু লক্ষ্মণসেনের লক্ষ্মণাবতী যে, গঙ্গাতীরেই অবস্থিত ছিল, সে কথা স্মরণ করিলে, গঙ্গাবাসের জন্য নবদ্বীপে একটি পৃথক্ রাজবাটী নির্ম্মাণ করিবার প্রয়োজন বুঝিতে পারা যায় না। *

যে সকল ইংরাজ-লেখক তথ্যনির্ণয়ের জন্য কিছু কিছু আয়োজন করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে সুবিখ্যাত অধ্যাপক ব্লকম্যানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালার ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক তথ্যবিষয়ক সুলিখিত প্রবন্ধ, তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়ের কথা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। তাহার আদ্যন্ত বিশেষভাবে অধ্যয়নের যোগ্য। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—অধ্যাপক ব্লকম্যান্ বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানপ্রণালীর পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—খৃষ্টীয় ১২০৩ হইতে ১৫৩৮ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার ইতিহাস-সংকলনের মুখ্য প্রমাণ বর্ত্তমান নাই ; যাহা আছে, তাহা দিল্লীর ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত গৌণ প্রমাণমাত্র। †

---

* নাসেরী গ্রন্থের এই সকল উক্তির সম্যক্ সমালোচনা আবশ্যক। এ পর্য্যন্ত যে সকল সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, পাঠ্য-পুস্তক-রচনায় ব্যস্ততাগ্রস্ত লেখকগণ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন বলিয়া বোধ হয় না।

† Whilst for the history of the Delhi-empire we possess general and special histories, often the work of contemporaneous writers, we have only secondary sources and incidental remarks for the early Mahomedan period of Bengal from A. D. 1203 to 1538.—*Professor Blochmann.*

এই সকল গৌণ প্রমাণের মধ্যে নাসেরী গ্রন্থই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। তাহার পর, "তারিখ-ই-ফিরোজশাহী" নামক দুইখানি গ্রন্থ ;—একখানি বারণীর, অপরখানি আফিফের লেখনী-প্রসূত। বারণী, দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহের সমসাময়িক ; আফিফ তাঁহার অল্পকালের পরবর্ত্তী। লেখক এই তিন খানি ভিন্ন প্রায় তুল্যকালবর্ত্তী অন্য কোনও লেখকের গ্রন্থ বর্ত্তমান নাই।

এই তিনখানি গ্রন্থের অবস্থাই একরূপ,—পক্ষপাতদুষ্ট। দিল্লির প্রাধান্য-কীর্ত্তন, বাঙ্গালীর কুৎসা-রটনা এই তিন গ্রন্থেই তুল্যভাবে বর্ত্তমান। তাহার কারণপরম্পরার অভাব নাই। বাঙ্গালার হিন্দুমুসলমান দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষার্থ ব্যাকুলতা প্রকাশিত করায়, বঙ্গভূমি পদানত রাখিবার জন্য দিল্লীশ্বরগণও যথাসাধ্য ব্যাকুলতা প্রদর্শিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের জয়পরাজয় লিপিবদ্ধ করিবার জন্য তাঁহাদিগের অমাত্যগণ যে সকল ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে বাঙ্গালীর প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইবার আশা নাই !

আকবর শাহের বক্সী নিজামুদ্দীন "তবকাৎ-ই-আকবারি" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাহা খৃষ্টীয় ১৫৯০ অব্দে সমাপ্ত হইয়াছিল। তাহাকে ১৩৩৮ হইতে ১৫৩৮ পর্য্যন্ত দুইশত বৎসরের বাঙ্গালার লিখিত ইতিহাস বলিয়া উল্লেখ করিতে হইবে। এই গ্রন্থকেই প্রথম গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। ইহার পর ফেরেস্তা এই দুইশত বৎসরের কথাই কিছু বিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন,—হাজি মহম্মদ কান্দাহারীর গ্রন্থ, তাঁহার অবলম্বন। সে গ্রন্থ বর্ত্তমান নাই।

ইহার পর বাঙ্গালার ইতিহাসবিষয়ক যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহা চর্ব্বিতচর্ব্বণমাত্র। যাঁহারা ইতিহাসরচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই একপথে ধাবিত হইয়াছিলেন,—তাহা কেবল পুরাতন গ্রন্থ হইতে বিবরণসংকলনের সুপরিচিত সরল পথ। এইরূপে সে সকল বিবরণ পুনঃ পুনঃ সংকলিত হইয়া ঐতিহাসিক প্রমাণের মর্য্যাদালাভ করিয়াছে, তাহা কতদূর মর্য্যাদা-লাভের যোগ্য, এখনও তাহার মীমাংসা করিবার জন্য যথোপযুক্ত আগ্রহ উপস্থিত হয় নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মালদহের ইংরাজকুঠির অধ্যক্ষ মিষ্টার উডনীর উৎসাহে গোলাম হোসেন "রিয়াজ-উস-সলাতিন" রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহাই বাঙ্গালা দেশের ধারাবাহিক ইতিহাসরচনার প্রথম

চেষ্টা বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। ষ্টুয়ার্ট সাহেব তাহাকে অবলম্বন করিয়াই স্বরচিত ইতিহাস সংকলিত করিয়া গিয়াছিলেন। উহা রিয়াজ গ্রন্থের পুনরুক্তি মাত্র; ইহাতেও বিচারপ্রণালী অবলম্বিত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তথাপি ইহাতে পুরাতনের সঙ্গে এক শ্রেণীর নূতন কাহিনীর সংস্রব দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা মালদহ প্রদেশের প্রচলিত জনশ্রুতি বলিয়া কথিত হইতে পারে। কোন কোন বিষয়ের তথ্যনির্ণয়ে তাহাকে বহুমূল্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

এই সকল পুরাতন এবং নূতন গ্রন্থের সহিত নবাবিষ্কৃত মুদ্রালিপির তুলনায় সমালোচনা করিয়া তথ্যাবিষ্কার করিতে না পারিলে, বাঙ্গালীর ইতিহাস সংকলিত হইবে না। তাহার জন্য যেরূপ অধ্যবসায় আবশ্যক, আমাদের মধ্যে তাহার অভাব আছে বলিয়াই. এখনও বাঙ্গালীর ইতিহাস-সংকলনের জন্য আগ্রহ উপস্থিত হয় নাই।

বাঙ্গালীর ইতিহাস, গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের ইতিহাস। সেই সাম্রাজ্যের স্বার্থসমন্বয়যুগে হিন্দু মুসলমান একত্র মিলিত হইয়া বাঙ্গালীনামে ইতিহাস পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। সুলতান সামসুদ্দীন ইলিয়াসের শাসনসময়েই তাহা প্রথমে সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে।

গৌড়ীয় ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সুলতান সামসুদ্দীন ইলিয়াসের কোনরূপ কীর্ত্তিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। দিল্লীর "হাউজ-ই-সামসী" নামক বাদশাহী স্নানাগারের অনুকরণে পাণ্ডুয়া নগরে তাঁহার যে স্নানাগার নির্ম্মাণ করিবার জনশ্রুতি গোলাম হোসেনের গ্রন্থে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাও লোকলোচনের অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে! সাতাই শখরা নামক স্থানে তাঁহার রাজপ্রাসাদ বর্ত্তমান ছিল, এইরূপ এক জনশ্রুতি অদ্যাপি প্রচলিত আছে। তথায় একটি স্নানাগার ছিল বলিয়া অনুমান হয়।

সুলতান সামসুদ্দীনের প্রধান কীর্ত্তি, গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা-সংস্থাপন। তাহার জন্যই তিনি বাঙ্গালীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইবার যোগ্য। কিন্তু বাঙ্গালীর নিকট তাঁহার নামপর্য্যন্ত অপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

স্নেহের ব্যথা।

(১)

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, আর্দ্র বায়ু মাঝে মাঝে কদম্ব কেতকীর উন্মাদ সৌরভ বিতরণ করিয়া সোঁ সোঁ রবে ছুটিয়া পালাইতেছে। আমি একা নন্দনপুর গ্রামের প্রান্তস্থিত থানাগৃহে বসিয়া ডায়েরী লিখিতেছিলাম, বাদলের ঠাণ্ডা বাতাসে বর্ষার সেই উদ্যম উচ্ছ্বাসে প্রাণ যেন কেমন একটা শূন্যতা লইয়া ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিল। কনেষ্টবলেরা অদূরবর্ত্তী রথের মেলায় শান্তিরক্ষার্থে গমন করিয়াছে, কাজেই একা এই বিজন গৃহের চতুর্দ্দিকস্থ নীরবতায় বড়ই ক্লেশবোধ হইতেছিল। জনমানবের বসতিহীন মাঠের মধ্যে থানাগৃহ, চারিদিকে দিগন্ত-বিস্তৃত ধূ-ধূ মাঠ ও প্রান্তনিলীন গ্রামসমূহের মসীময় বিটপী রেখা ভিন্ন এখান হইতে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। নববর্ষার জোয়ারের ও বৃষ্টির জলের টুপ টাপ্ শব্দ এবং ভেকের রব সন্ধ্যারাণীর ভয়াল মূর্ত্তির ভীম চিত্র আঁকিয়া দিতেছিল। এমনি বর্ষার দিনে এমনি ঘনঘটায় দূরপ্রবাসে বিরহীহৃদয়ের বিষাদ চিত্র হৃদয়ে অনুভব করিয়া মর্ম্মযন্ত্রণা অনুভব করিতেছিলাম। বিদ্যাপতির রাধিকার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া আজ আমারো গাহিতে ইচ্ছা করিতেছিল —

"স্বজনি! আজু শমন দিন হোয়।"

পুলিশ এমনি জিনিষ যে,এই স্বদেশীর দিনে গ্রাম্য নিরীহ ভদ্রলোকগণও পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর থানাগৃহে পদার্পণ করেন না—কি জানি, পাছে সিডিশনের গন্ধে আমরা তাহাদিগকে পাকড়াও করি। হায় রে অধম গোলামি!

ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, গ্রাম্য রজনীর ভীষণত্ব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, —এমন সময়ে সহসা রমণী-কণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদে প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। শুনিলাম, কে যেন কাতর স্বরে বলিতেছে "ওগো! আমাকে ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—আমি কোন দোষে দোষী নই—তোমাদের ভাল হ'বে, আমায় ছেড়ে দাও।" দেখিতে দেখিতে সে করুণ বামাকণ্ঠ নিকট হইতেও নিকটতর হইল। দেখিলাম কিষণজী ওঝা ও ফাগ সিংহ কনেষ্টবল কর্দ্দমসিক্তা জীর্ণবস্ত্রপরিহিতা একটী রমণীকে লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল। কিষণজী সেলাম দিয়া বলিল "বাবুজী হামি একটা চুর পাকড়েছি, এই নিন্, বেটী বড়

তক্‌লিপ দিয়েছে।” ফাগ সিংও তাহার সহযোগীর বাহাদুরীর সঙ্গে সঙ্গে নিজ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করিবার জন্য কক্ষান্তরে গমন করিল।

আমি এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চুপ্ করিয়া সব শুনিতেছিলাম, এখন তাড়াতাড়ি কর্ত্তব্যবুদ্ধির তাড়নায় টেবিলের উপরিস্থিত হ্যারিকানটা নামাইয়া রমণী যেখানে বসিয়া কাঁদিতেছিল, তাহার সম্মুখস্থ একটী টুলের উপর রাখিলাম। তখনো করুণকণ্ঠে হতভাগিনী আর্ত্তনাদ করিতেছিল—আর মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া একটী পঞ্চবর্ষ বয়স্ক শিশু মায়ের বুকে মুখ রাখিয়া “মা”-“মা” শব্দে কাঁদিতেছিল। সত্য কথা বলিতে কি, উহাদের করুণ আর্ত্তনাদে আমার পাষাণ হৃদয়ও কি যেন কেমন এক অব্যক্ত বিষাদে শিহরিয়া উঠিতেছিল। ল্যাম্পের ক্ষীণ আলোকে অযত্নবিন্যস্ত এলায়িত কেশরাজির আবরণের মধ্য দিয়াও যুবতীর মুখখানা শৈবালবেষ্টিত কমলিনীর ন্যায় সুন্দর দেখাইতেছিল, দারিদ্র্যের কষাঘাতে যদিও তাহার বর্ণ বিবর্ণ; তথাপি রমণী একদিন সুরূপা ও গৌরবর্ণা ছিল, তাহা স্পষ্টই বোধগম্য হইল। রমণীর বয়স পঞ্চবিংশ বর্ষের অধিক হইবে না—সে যে ভদ্রবংশসম্ভূতা তাহা আমি তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। জানি না কেন আমার হৃদয়ে ইহার প্রতি সহানুভূতি জাগিতেছিল,—আমি করুণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম,—“মা, তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে তোমার পরিচয়, এবং কেনই বা তুমি চুরি অপরাধে ধৃত হইয়াছ সে কথা আমাকে বলিতে পার, বোধ হয় আমি তোমার ভাল করিতে পারিব। ভুমি নির্ভয়ে আমার নিকট সব কথা বল, তোমার কোন ভয় নাই।’ আমার মুখে সহানুভূতিসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া রমণী মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিল, তাহার সেই ডাগর ডাগর চোখ বাহিয়া নয়নজল ঝরিতেছিল, আর শিশুটি একবার মায়ের মুখের দিকে আর বার আমার মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল। শিশুটীকে একটু সান্ত্বনা করিয়া ক্রুদ্ধ রাজহংসীর মত সে আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল “বাবুজি আমার কথা কি বিশ্বাস করিবেন? আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধিনী; যারা আমায় বৃথা যন্ত্রণা দিয়াছে, ভগবান্ কি তাদের বিচার করিবেন না? দুঃখিনীর নয়নজল কি বৃথাই পড়িয়াছে?” আমি বলিলাম “ভগবান্ ন্যায়বান্, তিনি অবশ্যই দোষীর শাস্তি দিবেন, আর তুমি যদি নির্দ্দোষী হও, আমি তোমাকে এখনি ছাড়িয়া দিব, তুমি সব ঘটনা আমাকে বল।”

(২)

সেই নির্জ্জন থানাগৃহে মেঘাচ্ছন্ন নিশীথিনীর গভীর স্তব্ধতার মধ্যে বসিয়া দুঃখিনীর সে শোককাহিনী শুনিতে লাগিলাম, আমার নিকট সে বিষাদ-কাহিনী সত্য সত্যই একখানি করুণ সঙ্গীতের ন্যায় বোধ হইতেছিল। রমণী নয়নজল কর্দ্দমসিক্ত বস্ত্রাঞ্চলে মুছিয়া অকম্পিত গম্ভীর কণ্ঠে বলিতে লাগিল, “বাবু, আজ আমি যেমন পথের ভিখারিণী, চিরদিনই কি এমনি ছিলাম? আমারও ধনদৌলত পিতামাতা, স্বামী, আত্মীয় বন্ধু সবই ছিল; কিন্তু কালবশে সবই হারাইয়াছি। ভগবান্! যদি সব নিলে, তবে আমাকে কেন নাও না? আমি র—গ্রামের কোনও ধনাঢ্যপরিবারের পুত্রবধূ ছিলাম—আমার পিতা দরিদ্র হইলেও বড় সাধ করিয়া এই ধনাঢ্য পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। হায়! তিনি যদি তখন বুঝিতে পারিতেন যে, দরিদ্রের মেয়ের সুখশান্তি ধনীর গৃহে কখনো হইতে পারে না, তাহা হইলে আর আমাকে এমন পথের ভিখারিণী হইতে হইত না। আমি অভাগিনী, তাই পিতাকে দোষ দেই, অদৃষ্টের দোষ কেমন করিয়া এড়াইব? আমার বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই আমার পিতার মৃত্যু হয়। মাতা অতি শৈশবেই আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, আমিই পিতামাতার একমাত্র সন্তান ছিলাম। বাবার মৃত্যুতে সমগ্র সংসার শূন্য বোধ হইতেছিল—কিন্তু স্বামীর অকপট প্রেমে পিতার শোক ভুলিয়াছিলাম। বিধাতার শাপে স্বামি-প্রেম-সুখভোগও বেশী দিন আমার অদৃষ্টে সহিল না। এই শিশুটি যখন দুই বৎসরের, তখন আমার স্বামী বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়া সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া চলিয়া গেলেন, আমি দশ দিক্ শূন্য দেখিলাম। আমার শ্বশুরশাশুড়ীও জ্যেষ্ঠ পুত্রশোকে কাতর হইয়া শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করিলেন। সংসারের বিভীষিকা চতুর্দ্দিক্ হইতে পূর্ণ মাত্রায় আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। শ্বশুর আমার নামে কিছু সম্পত্তি লিখিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু হায় রে সংসার! অর্থলোলুপ পাপিষ্ঠ দেবর নানা ষড়যন্ত্রে এবং পীড়নের দ্বারা উহা আমার নিকট হইতে হস্তান্তরিত করিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে অভাগিনীর একমাত্র নয়নের মণি সোণার শিশুটীকে পর্য্যন্ত বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। জানি না এমন পাপপরিপূর্ণ সংসারে লোক কেমন করিয়া থাকে। শিশুর প্রাণরক্ষার্থে একদিন নৈশ নীরবতার মধ্যে গৃহত্যাগ করিয়া এক দূর-সম্পর্কিত আত্মীয়ের গৃহে আসিলাম; কিন্তু সেখানেও পাপিষ্ঠের চর আমার সর্ব্বনাশসাধনের

সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। হায়! যেখানে যাই—সেখানেই সংসার, ভীষণ কুটিল কটাক্ষে আমার পানে চায়। তার পরে শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করিয়া পথে পথে ঘুরিতেছি। শ্যামা মেদিনীসুন্দরী এবং উন্মুক্ত নীলাকাশই এখন আমার আশ্রয়। প্রথম প্রথম বড়ই যন্ত্রণা হইত; কিন্তু এখন আর আমার কোন কষ্ট নাই। আজ কয়েক দিবস এ গ্রামে মেলা বসিয়াছে; মেলায় বেশী ভিক্ষা পাইব বলিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু আমার অদৃষ্টে দেখুন, এ কেমন কর্ম্মভোগ।

মেলায় কত দোকান, কত বাঁশী, কত খেলনা উঠিয়াছে—কত দ্রব্যসম্ভার আমার এ হতভাগ্য সন্তানের মত কত ছোট ছোট ছেলেরা পিতামাতার সহিত আসিতেছে যাইতেছে—খেলার পুতুল কিনিতেছে, বাঁশী বাজাইতেছে। ইহাদের শুভ্র সরল অপাপবিদ্ধ শিশুহৃদয়ে কত আনন্দ! হায়! আমার সোণার যাদুর কি অমনি একটী বাঁশী বা খেলনা পাইবার জন্য মন কাঁদে নাই? আজ আমার স্নেহের ধন—একমাত্র অবলম্বন সোণার খোকাও এক মনোহারী দোকানের একটী সুন্দর পুতুল দেখিয়া বলিল, 'মা, আমায় একটী কিনিয়া দাও।' তাহার সেই করুণ মিনতি—চোখের ছল ছল ভাব, আমার হৃদয় মর্ম্ম-বেদনায় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল। দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, উহার মূল্য দুই আনা। ভাবিলাম, আমি সারাদিন অনাহারে থাকিয়া যদি দুই আনার পয়সা ভিক্ষা দ্বারা সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা হইলেই বাছার মনঃকষ্ট দূর করিতে পারিব। সারাদিন পরিশ্রম করিয়া কত তাড়না সহিয়া—কত দুর্ব্বাক্য শুনিয়া দুই আনার পয়সা সংগ্রহ করিয়া সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দোকান হইতে পুতুলটি ক্রয় করিয়া খোকার হাতে দিলাম। শিশুর শীর্ণ গণ্ডে আনন্দের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল. সে মনের আনন্দে দুই হাতে সেই পুতুল ক্রোড়ে করিয়া খেলা করিতে লাগিল। তাহার সে হর্ষে আমিও শান্তিবোধ করিলাম। দোকান ছাড়িয়া যখন কিয়দ্দূর আসিয়াছি, তখন দোকানের একজন লোক দৌড়িয়া আসিয়া বলিল 'ওগো, এ পুতুলের দাম চারি আনা—ভুলে তোমায় দুই আনায় দিয়াছি, বাকি পয়সা দাও, নইলে পুতুল ফেরত নিব।' আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইল, সারাদিনের ক্লেশে দুই আনার পয়সা সংগ্রহ করিয়া বাছার মনঃসাধ পূর্ণ করিয়াছি, বাকি পয়সা আমি কোথায় পাইব? আমি দোকানীকে কত মিনতি করিলাম, কিন্তু সে নিষ্ঠুর আমার কোন কথাই শুনিল না। কর্কশ কণ্ঠে

শিশুর নিকট হইতে পুতুল কাড়িয়া নিতে চাহিল। সরল শিশু ভীতমনে সজল নয়নে একবার আমার দিকে চাহিয়া বলিল "মা"। হায়! তার সে একটীমাত্র মা শব্দের মধ্যে কত না আশা, কত না ভরসা, কত না সাহস লুক্কায়িত ছিল। সে তো বোঝে নাই, তার এই পার্থিব জননী শক্তিহীনা তাহারি মত দুর্ব্বল ও পরমুখাপেক্ষী; কিন্তু আর আমি সহ্য করিতে পারিলাম না, হায় আমি জীবিত থাকিতে আমার যাদুর হাত হইতে পুতুলটি কাড়িয়া লইবে? তাহা হইতে পারে না। আমি একেবারে পাগলের মত ছুটিয়া কিছুদূরে আসিয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া ভূমিতে পতিত হইলাম। তার পর কি হইল জানি না। যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম কনেষ্টবলেরা আমাকে চোর বলিয়া ধৃত করিয়াছে, আর আমার সোনার শিশু কাদায় পড়িয়া কাঁদিতেছে। বাবু! আমি কি চোর? যদি চোর হই, আমায় শাস্তি দিন্, কিন্তু আমার খোকার পুতুল দিন, তার পুতুল কোথায়?" এই বলিতে বলিতে সহসা রমণী দণ্ডায়মান হইয়া উন্মাদিনীর মত চঞ্চল দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষু দুটিতে তখন আগুণ জ্বলিতেছিল।

(৩)

আমার হৃদয় শোকে ভরিয়া গিয়াছিল। হায়! মাতৃস্নেহ, এ জগতে কোথায় তোমার তুলনা? রমণীর সেই স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তিদর্শনে আমার হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া গেল। মা বিশ্বজননী ধন্য তোর লীলা। আর সংসার, তুমি এত নিষ্ঠুর? আজ যদি আমার মৃত্যুতে আমার পত্নী এমনি পথে দাঁড়ায়? এমনি একটী ক্ষুদ্র পুতুলের জন্য ছোট ছেলেটি কাদায় লুটায়? উঃ, সে যে ভাবাও যায় না! দুঃখিনীর মর্ম্মবেদনা আজ অন্তরে অন্তরে অনুভব করিলাম। এতদিন যে কঠোরতা, যে অত্যাচার আমার সহচর ছিল, জানি না কোন এক অজ্ঞাতশক্তিপ্রভাবে তাহা অন্তর্হিত হইল। মানবের অন্ধ নয়ন বুঝি এমনি করিয়া সহসা ফুটিয়া উঠে। অশ্রুপূর্ণ নয়নে ব্যথিত কণ্ঠে রমণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "মা, তোমার কোন ভয় নেই, তুমি চোর নও, চোর এই দুনিয়ার নিষ্ঠুর লোক। মা, আমি তোর অবোধ ছেলে, সব দোষ মার্জ্জনা কর।" সেই মুহূর্ত্তেই কিষণজীকে মেলায় পাঠাইয়া পুতুল ও বস্ত্রাদি ক্রয় কয়াইয়া আনিয়া রমণীর সম্মুখে রাখিয়া বলিলাম "মা, সন্তানের এই দানগ্রহণ কর। তুমি এ সন্তানকে ছাড়িয়া আর কোথাও যাইতে পারিবে না, মাতৃহীন আমি আমায় মাতৃস্নেহে বঞ্চিত করিও না।" শিশুটিকে আমি বক্ষে

টানিয়া লইলাম। সে পুতুল পাইয়া সহর্ষে ক্রীড়া করিতে লাগিল। রমণী দেবী-প্রতিমার ন্যায় মহিমামণ্ডিতরূপে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহার মুখে এক কৃতজ্ঞতার করুণজ্যোতিঃ উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠিল। নববস্ত্র-পরিহিতা মালিন্য-বিরহিতা বিধবার শুভ্র সুন্দর পবিত্রমূর্ত্তিতে যখন তিনি পুনরায় আসিয়া আমার নয়নসমক্ষে দণ্ডায়মানা হইলেন, তখন বিশ্বজননীর সেই শুভ্রোজ্জ্বল শান্তমূর্ত্তির নিকট আমার পাপ-গর্ব্বিত উচ্চশির অলক্ষ্যে নত হইয়া পড়িল, মাতৃত্বের পূর্ণ গাম্ভীর্য্য নয়নসমক্ষে দর্শন করিয়া ধন্য ও তৃপ্ত হইলাম।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

শাখীনামা।

২০শ শাখী।

শিখেরা বলিল—'কিছুকাল পূর্ব্বে আপনি বলিয়াছিলেন যে, তালবান্তী আপনার ভবিষ্যৎ বারাণসী। কোন্ কোন্ লক্ষণ হইতে আপনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন? ৺ কাশীতে ভগবান্ বিশ্বেশ্বর নাথের ও ভগবতী অন্নপূর্ণার মন্দির আছে। তদ্ব্যতীতও সেখানে পুণ্যাম্বু গঙ্গা ও মণিকর্ণিকা তীর্থ আছে। গুরু উত্তর করিলেন যে, দমদমা নামক মৃত্তিকা স্তূপটিই বিশ্বেশ্বর নাথের মন্দির। যে কেহ ইহাকে ভক্তির সহিত নিরীক্ষণ করিবে, সে পার্থিব সম্পত্তি ও ক্ষমতা ভোগ করিতে পাইবে, তাহার অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মিবে, ও সে একটি খাঁটি শিখ হইবে। এখানকার 'ভিক্ষা-বাটী' অন্নপূর্ণার মন্দিরেরই তুল্য। ভগবানের নামই এখানে গঙ্গার কাজ করিবে। গুরু-সরতীর্থ বারাণসীর মণিকর্ণিকা তীর্থের সমতুল্য। বহু শিল্পী, দার্শনিক, ধর্ম্মবিৎ, ধর্ম্মতত্ত্বব্যাখ্যাকার, যোগতত্ত্বজ্ঞ, ব্রহ্মচারী, সুদক্ষলেখক, ভক্ত ও শিষ্য এই স্থানে বাস করিয়া ইহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিবে। আমি এই পবিত্র স্থান দেখিতে আসিয়াছি। কিন্তু শিখেরা আমার আগমনসংবাদ জানিয়াও এখানে কোন 'মুঙ্গি সাহেব' প্রস্তুত করে নাই।

২১শ শাখী।

ভ্রমণে বাহির হইয়া গুরু একদিন একটি অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন। অট্টালিকাটি (তালবান্তী হইতে) আড়াই ক্রোশ দূরে অবস্থিত। গুরু উহা কি, তাহা জানিতে চাহিলে, শিখেরা বলিল যে, উহা বিতুন্দার দুর্গ। গুরু

বলিলেন, স্থানটি বেশ সমৃদ্ধিশালী। (স্থানের মনোহারিত্বে মুগ্ধ হইয়া) গুরু স্থির করিলেন যে, তিনি সেখানে নয় দিবস কাল অবস্থান করিবেন।

২২শ শাখী।

অতঃপর গুরু যাত্রা করিয়া বিশ্রামের জন্য সুলিসরে থামিলেন। এখানে চারিজন চোর তাঁহার তাঁবুকে প্রবেশ করে। তাহাদের দুইজন হিন্দু ও অপর দুইজন মুসলমান। তাহারা দেখিল, গুরুর সম্মুখে একটি সিংহ বেশ বিনীত ভাবে, ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা তাহার কাছে কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল। পরে মুসলমান চোর দুইটি (একটু সঙ্কুচিত হইয়া) বলিল যে, তাহারা গুরুর কিছুই চুরি করিবে না। কারণ, গুরু যে ভগবৎ-প্রেরিত ব্যক্তি, সে বিষয়ে তাহাদের আর সন্দেহ নাই। কিন্তু হিন্দুরা বলিল, তাহারা চুরি করিবেই; গুরুর সহস্র সহস্র টাকা মূল্যের অনেকগুলি অশ্ব আছে। মুসলমান চোরেরা আপনারা চুরি করিবে না ঠিক করিলে, তবে হিন্দুরা যাহা চুরি করিবে, তাহাতে কিন্তু ভাগ বসাইবে। গুরুর একটি অশ্ব খুলিবামাত্র হিন্দুরা অন্ধ হইয়া গেল। অশ্বটি একটি কাপড় দিয়া ঢাকা ছিল। হিন্দুরা মুসলমানদের সাহায্য চাহিল। কিন্তু সাহায্য করিতে আসিয়া তাহারাও চক্ষুরত্ন হারাইল।

সূর্য্যোদয়ের কিছু পরে গোলমাল শুনিয়া গুরু তথায় উপস্থিত হইলেন ও ব্যাপার কি, তাহা জানিতে চাহিলেন। মুসলমানেরা বলিল—"হে দরিদ্রের রক্ষক! আমরা আপনার বহুমূল্য অশ্বগুলি চুরি করিতে আসিয়াছিলাম। কিন্তু একটি সিংহকে আপনার পার্শ্বে বিনীত ভাবে বেড়াইতে দেখিয়া, আমাদের স্থির বিশ্বাস হইল যে, আপনি ভগবৎ-প্রেরিত ব্যক্তি; আমরা চুরির ইচ্ছা একেবারে ত্যাগ করিলাম। কিন্তু আমাদের হিন্দুসঙ্গিগণ আপনার একটি অশ্ব খুলিয়া ফেলে ও তৎক্ষণাৎ অন্ধ হইয়া যায়। তাহাদের সাহায্য করিতে আসিয়া আমরাও অন্ধ হইয়া পড়ি। আজ প্রভাতে শিখেরা আমাদের ধরিয়া ফেলে ও আপনার নিকট আমাদের লইয়া আসিয়াছে।' গুরু বলিলেন—'রাত্রি-কালে ঘোড়া লইতে আসিয়াছিলে কেন? এখন লইয়া যাও না!' চোরেরা বলিল—'প্রভু! আমরা আপনার নিকট তৃণ-বৎ। চোরেদের জন্য যে শাস্তি নির্দ্দিষ্ট আছে, আমাদের প্রতি তাহাই বিধান করুন।' গুরু তাহাদিগকে মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। শিখেরা 'জুণ্ড'-বৃক্ষের (কণ্টকাকীর্ণ) শাখার উপর দিয়া তাহাদের হাঁটাইয়া লইয়া চলিল। কণ্টকে

বিদ্ধ হইয়া একটি হিন্দু দেহ ত্যাগ করিল। তখন (গুরুর আদেশে) অপর চোরদের ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

২৩শ শাখী।

অতঃপর গুরু পাতিয়ালার অন্তঃপাতী বরহৈ গ্রামে যাত্রা করিলেন। তিনি তথাকার অধিবাসীদের উপদেশ দিলেন যে, তাহারা সে গ্রাম ত্যাগ করিয়া অন্য গ্রামে গিয়া বাস করুক। কারণ, তাহা হইলে তাহারা শত্রুর আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইতে পারিবে। বর্ষা আরম্ভ হওয়ায় গুরুকে চারি মাস সেই গ্রামে বাস করিতে হইল। ইতঃপূর্ব্বে তিনি যে সবুজ ছোলা বুনিয়াছিলেন, এখন সেই ছোলাই আপনার পশুগুলিকে খাওয়াইলেন। *

২৪শ শাখী।

পাতিয়ালার অন্তর্গত 'বুছোহাণা' গ্রামে একটি পিঁপুল গাছের ছায়ায় গুরু সাত দিন বাস করিলেন। তাহার নিকটেই একটি বৃহৎ দীর্ঘিকা ছিল। গ্রামবাসীরা তাঁহাকে সেইখানে বাস করিতে দিয়াছিল। তাহারা শিখদের জন্য অনেকগুলি মহিষ আনিয়া দিল, সেই সব মহিষ শিখদের দুগ্ধ ও ক্ষীর দিয়াছিল। উহাদের মধ্যে একটি কটা-রঙের মহিষ ছিল। সেটি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ দিত। শিখেরা ইহার দুগ্ধের প্রশংসা করিলে, গুরু বলেন—এই মহিষটি কখনও দুগ্ধ দিতে বিরত হইবে না।' রংঘর জাতিরা এই গ্রামে বাস করিত।

২৫শ শাখী।

অতঃপর গুরু গোবিন্দপুরে যাত্রা করিলেন। তথাকার শিখেরা বেশ অবহিত হইয়া তাঁহার উপদেশ শুনিয়াছিল।

২৬শ শাখী।

পরদিন গুরু 'গোগি' গ্রামে যাত্রা করেন ও মধ্যপথে (সে দিন) অবস্থান করিয়া তৎপর দিবস তথায় উপস্থিত হন। তাঁহার ভৃত্যেরা অশ্বদের জন্য ঘাস আনিতে যাইলে, রংঘর ও বুঘাশিয়ারা তাহাদিগকে অত্যন্ত প্রহার করে। গুরু (গ্রামবাসীদের ব্যবহারে) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ও সে গ্রাম ত্যাগ

* দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। গুরু বর্ষারম্ভে ভ্রমণে বাহির হইয়া সৈফাবাদে (১ম শাখী দেখুন) বর্ষা কাটাইয়াছিলেন। পরে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় আসি একটি বর্ষা এই বরহৈ গ্রামে কাটাইলেন।

করিবার জন্য তখনই প্রস্তুত হইলেন। (অশ্বটী গুরুর, এ কথা শুনিয়া) রংঘরেরা তাহাদের দোষ ক্ষমা করিবার জন্য গুরুকে বিশেষ করিয়া ধরিল ও তিনি যাহাতে সেখানে বাস করেন, এ জন্যও যথেষ্ট অনুরোধ করিল; কিন্তু গুরু তাহাদের অপরাধ ভুলিতে পারিলেন না।

২৭শ শাখী।

পরদিবস গুরু 'গুরুণা' গ্রামে অবস্থান করিলেন। সেখানে পর্য্যন্ত গোগার (পূর্ব্বে ইহাকে গোগি বলা হইয়াছে) জাঠেরা তাঁহার অনুগমন করে; কিন্তু তিনি তাহাদের প্রতি লক্ষ্যই করিলেন না।

২৮শ শাখী।

পরদিবস গুরু মাকোরোর গ্রামে অবস্থান করিলেন। সেখানেও জাঠেরা তাঁহার অনুগমন করে। তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবার জন্য সঙ্গত গুরুকে বলিল—হে দরিদ্রের রক্ষক! এই জাঠেরা ঘৃণিত পাপ করিলেও, আমরা এখন ভরসা করি যে, আপনি এখন তাহাদের ক্ষমা করিবেন।' গুরু উত্তর করিলেন যে, তিনি তাহাদের মূল উৎপাটন করিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়াছেন। তবে সঙ্গতের (সভার) বিশেষ অনুরোধে গুরু কেবল বুঘা শিখাদেরই ক্ষমা করিলেন।

গুলগুলিয়া জাতিদের উদ্দেশ করিয়া গুরু বলিলেন যে, তাহাদের পাঁচ জন সমগ্র স্যোদ্বান জাতিদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সমর্থ হইবে। আবার স্যোদ্বান জাতিদের বলিলেন যে, তাহাদের ক্ষমতা কখনও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে না, তাহা চিরকালই মাঝামাঝি রকমের থাকিবে।

সিধো জাতির রাখালেরা কতকগুলি কম্বল ও ঘিয়ের মট্‌কী আনিল। গুরু তাহাদের উপহার গ্রহণ করিলেন ও (সদুপদেশ দিয়া) শিখধর্ম্মে তাহাদের মতি দৃঢ় করিয়া দিলেন।

২৯শ শাখী।

পরদিবস গুরু ঝিন্দ গ্রামে তাঁহার একজন মসন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মসন্দটি তথাকার জমীদার। তাহার নাম 'দুগ্‌গু'। গুরু বলিলেন—'দুগ্‌গু! এই উপহার লইয়া এখানে আমার সহিত সাক্ষাৎ করায় তোমার

গৃহে দুগ্ধ অপর্য্যাপ্ত হইবে। * শিখ ও সাধুদের (সদা) সেবা করিবে ; আর যে পর্য্যন্ত আমরা এখানে থাকিব, ততকাল আমাদের সহিত বাস কর।'

পূর্ব্বদিবস নৌকাযোগে ঘাগ্‌গ নদী পার হইবার কালে গুরুর কাপড় চোপড় খারাপ হইয়া গিয়াছিল। সেগুলি নিকটবর্ত্তী দীর্ঘিকা হইতে পরিষ্কার করিয়া আনিবার জন্য গুরু তাঁহার অনুচরদের আদেশ করিলেন। দীর্ঘিকাটি একটি পবিত্র তীর্থ। তাই তিনি বলিলেন যে, আমার ছোট জামাগুলি যেন সেখানে ধৌত করা না হয়।' শিখেরা জিজ্ঞাসা করিল—'ইহা কোন্ তীর্থ?' গুরু উত্তর করিলেন যে,—এখানে বিখ্যাত বীর তাউ ও কুস্‌সু যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; এখানে পূজ্য রাম একটি প্রকাণ্ড ভোজ দিয়াছিলেন ; নাথু ক্ষত্রি ইহার সংস্কার করেন ও দেবতাদের মূর্ত্তিগুলি প্রাচীন মন্দিরে স্থাপন করান। ইহা হইতেই এখন ইহার নাম 'নাথুবানা' হইয়াছে। এই দীর্ঘিকায় স্নান করিয়া জমীদার মেদিনীমল দরিদ্রদের আহার বিতরণ করিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও প্রতিদিন এখানে স্নান করিতেন। একদিন প্রত্যূষে স্নান করিতে আসিয়া রমণী দেখিলেন যে, সব জল শুকাইয়া গিয়াছে, অত্যন্ত নিরাশ হইয়া তিনি প্রার্থনা করিলেন, যদি ইহা বাস্তবিকই পবিত্র হয়, তবে তাঁহার পূজার জন্য প্রয়োজনীয় জলে ইহা এখনই পূর্ণ হউক। তার পর তিনি খানিকটা কাদা তুলিবামাত্রই হু হু করিয়া জল বাহির হইয়া অনতিবিলম্বে ইহাকে পূর্ণ করিয়া ফেলিল। তদবধি কেহই আর ইহাতে শয্যা বা শয্যা-সংক্রান্ত কোন কাপড়-চোপড় কাচে না। এই তীর্থের মাহাত্ম্য এইরূপে সর্ব্বজন-বিদিত হইয়া পড়িল। তদবধি ইহাকে সকলে 'গুরুসর' বলিয়া থাকে, যেখানে গুরুর বস্ত্রাদি ধৌত করা হয়, সে স্থানকে 'ধোবা' বলা হয়।

৩০শ শাখী।

ভাই ফৈরু উদাসী গুরুর একজন প্রাচীন জলসরবরাহকারী। সে গুরু হররায় ও গুরু হরকিষণেরও অধীনে এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। সে তাহার কার্য্যে এত ব্যস্ত থাকিত যে, তাহার দীর্ঘ পাক্‌ড়ী খুলিবার ও তাহার কেশরাশি আঁচড়াইবার অবসরটুকু পর্য্যন্ত লইত না। ফলে, তাহার কেশরাশি কীটে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। একদিন (গুরুকে) সেলাম করিবার সময় তাহার মাথা হইতে একটি উকুন পড়িয়া যায়। তাহাতে সে তাহা কুড়াইয়া

* দুগ্‌গু গুরুকে কি উপহার দিয়াছিল, তাহা গ্রন্থে লেখা নাই। তবে অনুমান হয় যে, দুগ্ধই উপহার প্রদত্ত হইয়া থাকিবে।

আবার মাথায় রাখিয়া দেয়। তাহার এরূপ অদ্ভুত আচরণের কারণ কি, গুরু তাহা জানিতে চাহিলে, সে বলিল—'হে দরিদ্রের রক্ষক! এই উকুনটি গৃহ-হীন হইয়া পড়িয়াছিল, আমি কেবল তাহাকে তাহার গৃহে রাখিয়া দিলাম।' (তাহার দয়ায়) বিস্মিত হইয়া গুরু বলিলেন—'তোমার যাহা ইচ্ছা, প্রার্থনা কর।' ফৈরু বলিল—'আমি আপনার দাসের দাস। আমার দুঃখমোচনের প্রার্থনা ব্যতীত আর আমি কিছু চাহি না।' গুরু বলিলেন—'ভাই ফৈরু! কোন কালেই তোমার কোন অভাব থাকিবে না। তুমি তিন জন গুরুর রন্ধনগৃহে কাজ করিয়াছ, তজ্জন্য দরিদ্রের খাওয়াইবার জন্য তোমার নিজের একটি রন্ধন-শালা হইবে। তুমি একটি বংশের পিতা হইবে। তোমার বংশের ফকিরেরাও ধনী হইবে। গুরুর সেবা কখনও নিষ্ফল হয় না। ও ভাই ফৈরু! তুমি সাধু ব্যক্তি ; তোমার পূজা সিদ্ধ হইয়াছে। তুমি এই জগতের সকল বিপদ্ অতিক্রম করিতে পারিবে। সদ্‌গুরু তোমার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।' * (ক্রমশঃ)।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতীক্ষা।

যখন বন্ধু, নিশীথ-শয়নে
অচেতন থাকি আমি,—
নিদ্রারে কত করিয়া মিনতি,—
বলি, তার কর ধরি' নিতি নিতি
স্বপনে যেন গো আঁকে একবার
তব মুখখানি, স্বামী।
বিফলে রজনী চলে' যায় মোর,
বৃথা ভেঙ্গে যায় নিদ্রার ঘোর
এমনি করিয়া যাপি প্রতিনিশি
তোমা বঞ্চিত-যামী!

যখন প্রভাতে, তরুণ শোভাতে
অরুণ আকাশে হাসে,
আমি ভাবি মনে, ওই পথে বুঝি
তব সংবাদ আসে।

* গুরু কিরূপ ভক্তবৎসল ছিলেন, তাহা এই শাখী হইতে জানা যায়।

বুঝি উষা তার আঁচলে বাঁধিয়া,
তব লিপিখানি আনিয়াছে গিয়া
তাই এ আলোক, তাই এ পুলক,
দিকে দিকে পরকাশে !
না গো না বন্ধু, মিছা এত আশা,
জলধির তীরে মিটে না পিপাসা,
এল দিনমণি, দিনমণি মোর
সে কোন্ অস্তবাসে ?

সন্ধ্যায় সব, মৌন-নীরব,
শুনি যেন প্রাণমাঝে,
তেমনি মধুর সকরুণ সুরে
তোমারি বাঁশরী বাজে।
দূরে ঘন-নীল অরণ্য-ছায়া,
নীল মেঘকোলে গেছে মিলাইয়া,
কে জানে উহার, কোথা পর-পার,
সেখানে কি বাঁশী বাজে।
তাই তার সুর, করুণ মধুর,
এখনো পরাণে বাজে !

পারি না তো আর এমন করিয়া
কাটাইতে দিনরাতি,
পারি না তো আর পরাতে আশারে
স্বপনের মালা গাঁথি।
চিরবাঞ্ছিত, কোথা আছ তুমি !
ধর ধর দুটী হাত।
পূজা-উপহার, তোমারি এ হার,
পর পর তুমি নাথ।

শ্রীসরলাবালা দাসী।

মেঘের দেশে।

—:*:—

পিতৃ-শোক-জর্জ্জরিত হৃদয়ে যখন দারুণ অশান্তির তীব্র যাতনা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিলাম, যখন সংসার-তরঙ্গের ভীষণ উচ্ছ্বাসে কূল কিনারা পাইতেছিলাম না, সে সময়ে দার্জ্জিলিং হইতে বন্ধুবর চিঠি লিখিলেন—"একবার এখানে আসুন, হিমালয়ের হিমবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলে, বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টির অপূর্ব্ব নৈপুণ্য দেখিলে হৃদয়ে নিশ্চয়ই শান্তিলাভ করিবেন।" চিঠিখানা পাইয়া মন কেমন হইয়া গেল। ভাবিলাম স্থান-পরিবর্ত্তনে চিত্তের অবসন্নতা ও শারীরিক দুর্ব্বলতা দূর হওয়া কতকাংশে সম্ভবপর বটে, এভাবে বসিয়াই বা কি করিতেছি ? যেমন ভাবা তেমনি চিঠি লিখিলাম 'শীঘ্রই আসিতেছি।'

৮ই ভাদ্র প্রাতে জলপাইগুড়ি ষ্টেশন হইতে মিক্সড্ ট্রেণে শিলিগুড়ি রওনা হইলাম, পূর্ব্বদিন রাত্রিতে মুষলধারায় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। আজও আকাশ, মেঘাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে বৃষ্টিও হইতেছিল, এমনি এক বাদলার দিনে আমায় দার্জ্জিলিং যাত্রা করিতে হইল। জলপাইগুড়ির উত্তরে আর কোনও দিন পূর্ব্বে যাই নাই, কাজেই গাড়ী ছাড়িয়া দিলে উৎসুক নয়নে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলাম। রাস্তার দুই ধারে দিগন্ত-বিস্তৃত শস্যাচ্ছাদিত মাঠ, বাঁশের ঝাড় ও বড় বড় অপরিচিত গাছগুলি পথহারা পথিকের মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, অর্দ্ধোলঙ্গ দেহে কৃষাণগণ মাঠ চষিতেছে, ইহাদের লাঙ্গলের ফাল বংশ-নির্ম্মিত, আজকাল লৌহফালও এদেশে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এ অঞ্চলের কৃষি-পদ্ধতির সহিত নিম্নবঙ্গের কৃষি-পদ্ধতির বহু ব্যতিক্রম অনুভূত হইল। পাট, ধান, পেঁয়াজ, তামাক প্রভৃতিই এখানকার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। নিম্নবঙ্গের প্রাকৃতিক দৃশ্যের সহিত এ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন পার্থক্যও অনুভূত হইল না। কেবল মাঝে মাঝে দু' চারিটি শাল বৃক্ষ নিঃসঙ্গ পথিকের মত একটু পার্থক্য দেখাইয়া দিতেছিল। কৃষক-রমণীরা ক্ষেতের ধারে দাঁড়াইয়া গাড়ীর দিকে চাহিয়াছিল—ইহারা বুকের উপরিভাগে বাঁধিয়া কাপড় পরিধান করে। শিলিগুড়ি ষ্টেশনে যখন পৌঁছিলাম,তখন বেলা প্রায় আটটা হইবে, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। এখান হইতেই দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের আরম্ভ। গাড়ী দেখিয়াই তো আমি অবাক্, গাড়ী খুব ছোট, এ কথা অনেকের মুখেই শুনিয়াছিলাম ; কিন্তু এত ছোট বলিয়া

বুঝি উষা তার আঁচলে বাঁধিয়া,
তব লিপিখানি আনিয়াছে গিয়া
তাই এ আলোক, তাই এ পুলক,
দিকে দিকে পরকাশে !
না গো না বন্ধু, মিছা এত আশা,
জলধির তীরে মিটে না পিপাসা,
এল দিনমণি, দিনমণি মোর
সে কোন্ অস্তবাসে ?

সন্ধ্যায় সব, মৌন-নীরব,
শুনি যেন প্রাণমাঝে,
তেমনি মধুর সকরুণ সুরে
তোমারি বাঁশরী বাজে।
দূরে ঘন-নীল অরণ্য-ছায়া,
নীল মেঘকোলে গেছে মিলাইয়া,
কে জানে উহার, কোথা পর-পার,
সেখানে কি বাঁশী বাজে।
তাই তার সুর, করুণ মধুর,
এখনো পরাণে বাজে !

পারি না তো আর এমন করিয়া
কাটাইতে দিনরাতি,
পারি না তো আর পরাতে আশারে
স্বপনের মালা গাঁথি।
চিরবাঞ্ছিত, কোথা আছ তুমি !
ধর ধর দুটী হাত।
পূজা-উপহার, তোমারি এ হার,
পর পর তুমি নাথ।

শ্রীসরলাবালা দাসী।

মেঘের দেশে।

—:*:—

পিতৃ-শোক-জর্জ্জরিত হৃদয়ে যখন দারুণ অশান্তির তীব্র যাতনা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিলাম, যখন সংসার-তরঙ্গের ভীষণ উচ্ছ্বাসে কূল কিনারা পাইতেছিলাম না, সে সময়ে দার্জ্জিলিং হইতে বন্ধুবর চিঠি লিখিলেন—"একবার এখানে আসুন, হিমালয়ের হিমবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলে, বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টির অপূর্ব্ব নৈপুণ্য দেখিলে হৃদয়ে নিশ্চয়ই শান্তিলাভ করিবেন।" চিঠিখানা পাইয়া মন কেমন হইয়া গেল। ভাবিলাম স্থান-পরিবর্ত্তনে চিত্তের অবসন্নতা ও শারীরিক দুর্ব্বলতা দুর হওয়া কতকাংশে সম্ভবপর বটে, এভাবে বসিয়াই বা কি করিতেছি ? যেমন ভাবা তেমনি চিঠি লিখিলাম 'শীঘ্রই আসিতেছি।'

৮ই ভাদ্র প্রাতে জলপাইগুড়ি ষ্টেশন হইতে মিক্সড্ ট্রেণে শিলিগুড়ি রওনা হইলাম, পূর্ব্বদিন রাত্রিতে মুষলধারায় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। আজও আকাশ, মেঘাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে বৃষ্টিও হইতেছিল, এমনি এক বাদলার দিনে আমায় দার্জ্জিলিং যাত্রা করিতে হইল। জলপাইগুড়ির উত্তরে আর কোনও দিন পূর্ব্বে যাই নাই, কাজেই গাড়ী ছাড়িয়া দিলে উৎসুক নয়নে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলাম। রাস্তার দুই ধারে দিগন্ত-বিস্তৃত শস্যাচ্ছাদিত মাঠ, বাঁশের ঝাড় ও বড় বড় অপরিচিত গাছগুলি পথহারা পথিকের মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, অর্দ্ধোলঙ্গ দেহে কৃষাণগণ মাঠ চষিতেছে, ইহাদের লাঙ্গলের ফাল বংশ-নির্ম্মিত, আজকাল লৌহফালও এদেশে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এ অঞ্চলের কৃষি-পদ্ধতির সহিত নিম্নবঙ্গের কৃষি-পদ্ধতির বহু ব্যতিক্রম অনুভূত হইল। পাট, ধান, পেঁয়াজ, তামাক প্রভৃতিই এখানকার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। নিম্নবঙ্গের প্রাকৃতিক দৃশ্যের সহিত এ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন পার্থক্যও অনুভূত হইল না। কেবল মাঝে মাঝে দু' চারিটি শাল বৃক্ষ নিঃসঙ্গ পথিকের মত একটু পার্থক্য দেখাইয়া দিতেছিল। কৃষক-রমণীরা ক্ষেতের ধারে দাঁড়াইয়া গাড়ীর দিকে চাহিয়াছিল—ইহারা বুকের উপরিভাগে বাঁধিয়া কাপড় পরিধান করে। শিলিগুড়ি ষ্টেশনে যখন পৌঁছিলাম,তখন বেলা প্রায় আটটা হইবে, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। এখান হইতেই দার্জ্জিলি হিমালয়ান রেলওয়ের আরম্ভ। গাড়ী দেখিয়াই তো আমি অবাক্, গাড়ী খুব ছোট, এ কথা অনেকের মুখেই শুনিয়াছিলাম ; কিন্তু এত ছোট বলিয়া

অনুমান করিতে পারি নাই। পাল্কী হইতে আকৃতিতে অনেকটা বড়, ঝড়বৃষ্টি-নিবারণের জন্য দুইদিকে পর্দ্দা আছে, গাড়ীর দুইদিক খোলা, প্রতি গাড়ীতে ষোল জন করিয়া বসিবার নিয়ম; এতটুকু গাড়ীতে ছোট ছোট বেঞ্চে চারিজন করিয়া উপবেশন করা যে কিরূপ কষ্টকর, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরের অনুমান করা অসম্ভব। এ লাইনে মধ্যম শ্রেণীর গাড়ী নাই। বৃষ্টি যখন থামিয়া গিয়াছিল, মেঘ-ফাটা তীব্র উত্তাপ যখন বিশেষক্লান্তিজনক বোধ হইতেছিল, তখন শিলিগুড়ি হইতে গাড়ী ছাড়িল। শিলিগুড়ি সহরটি ছোট, মাঠের মধ্যে অবস্থিত, কাচারী, স্কুল, ইত্যাদি সমুদায়ই অছে, কিন্তু স্বাস্থ্য উত্তম নহে। ষ্টেশন ছাড়াইয়া কতকদূর আসিলেই মেঘমুক্ত দিবাকরের প্রখরালোকে দূরবর্ত্তী গিরিশ্রেণীর সুনীল সৌন্দর্য্যে নয়ন-মন মুগ্ধ হইল। কি সুন্দর দৃশ্য! অভ্রভেদ করিয়া নীলগিরির শেখরগুলি গগনের গায় চিত্রবৎ শোভমান, দূর হইতে পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য যেরূপ মোহনীয় নিকটে তেমন নহে।

নিকটে বন্ধুর শিলাময় কণ্টাকাকীর্ণ, আর দূর হইতে নীলবর্ণের শোভনীয় সৌন্দর্য্য। শিলিগুড়ির পাদদেশ ধৌত করিয়া বিপুলকলেবরা কল-প্রবাহিনী মহানন্দা বহিয়া চলিয়াছে, রেলওয়ে ব্রিজ হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত ইহার বক্রগতি দেখা যাইতেছিল। বর্ষা-সমাগমে বারিপাতের আধিক্যের সহিত এ সমুদয় পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর যৌবন-শ্রী-বিকশিত হয়, এখন পূর্ণ বর্ষা নয়। কাজেই তত ভীষণত্ব নাই,—নদীদেহের অধিকাংশই বিশুদ্ধ বালুকাপূর্ণ এবং উপলমণ্ডিত কেবল এক পার্শ্ব দিয়া কল্ কল্ ছল্ ছল্ রবে মহানন্দায় ক্ষীণ ধারা বহিয়া চলিয়াছে।

ক্রমে আমরা সুক্‌না ষ্টেশনে উপনীত হইলাম, ইহা শিলিগুড়ি হইতে আট মাইল দূরবর্ত্তী। এই ষ্টেশনের অল্পদূর হইতেই হিমালয়ের সূত্রপাত। শুনিলাম, এখানকার স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ নাকি এখানে খুব বেশী, হইবার সম্ভবও বটে; কারণ, ইহা হিমালয়ের একেবারে পাদদেশে অবস্থিত। ষ্টেশনটি ছোট হইলেও দেখিতে নিতান্ত মন্দ নহে। সুক্‌নার পর কিয়দ্দুর পর্য্যন্ত নিবিড় অরণ্যানী, অরণ্যের গভীরতা এত বেশী যে, সহসা যখন গাড়ী ধীরে ধীরে পর্ব্বতারোহণ করিতে থাকে, তখন বাহিরের দৃশ্যাবলী দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় না যে, কখন গাড়ী, পর্ব্বতে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিল। এখান হইতেই প্রকৃতির অতুলনীয় শোভা। গাড়ী আঁকিয়া বাঁকিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, আর নিম্নে যতদূর দৃষ্টি চলে, বৃক্ষরাজি-পরিপূর্ণ অধিত্যকা

প্রদেশ। শ্যামল প্রান্তর কি সুন্দর, কি মহৎ! কোথাও বাঁশের ঝাড় বাতাসে দুলিতেছে, বন্য কদলীবৃক্ষের প্রশস্ত পত্রাবলী ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, সকলি সতেজ ও সবল। পাহাড়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতা-গুল্মগুলিকেও যেন সমতল ভূমির অপেক্ষা সুন্দর ও বৃহৎ বলিয়া মনে হইল। এমনি অত্যাশ্চর্য্য সুকৌশলের সহিত পর্ব্বতগাত্র কটিয়া সুপ্রশস্ত পথ ও রেলওয়ে-লাইন প্রস্তুত করা হইয়াছে যে, দর্শকমাত্রেই ইংরেজ-ইঞ্জিনিয়ারের অপূর্ব্বনির্ম্মাণ-কৌশলের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। রঙ্গটঙ্গ ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া যখন আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলাম, তখন সুদূরপর্ব্বতগাত্রে চা-বাগানের সারি,চা-কর-দিগের বাঙ্‌লো,কুলীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরশ্রেণী আলেখ্যবৎ আমাদের পদতলে শত শত ফিট নীচে দেখা যাইতে লাগিল। ক্রমে আমরা চুনভাটিলুপঘুরিয়া তিনধেরিয়া (Tindhari) ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। সমতলভূমি হইতে ইহার উচ্চতা ২৮২২ ফিট। এখান হইতে নয়নসমক্ষে যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-যবনিকা উদ্ঘাটিত হইল, তাহার বর্ণনা অসম্ভব। গাড়ী হইতে নামিয়া ষ্টেশনের বারান্দায় দাঁড়াইয়া কি দেখিলাম! বুঝি, এমন দৃশ্য আর কোথাও দেখি নাই। দেওঘরের অনতিদূরবর্ত্তী ত্রিকূটপর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিকের শোভা দেখিয়া একদিন মুগ্ধ হইয়াছিলাম,—কিন্তু এ দৃশ্যের সহিত তাহার তুলনাই হয় না।

সবুজ প্রান্তর হইতে কেমন সুন্দর-বিস্তৃতা মহানন্দা নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া সর্প-গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। এখান হইতে রৌদ্র-দীপ্ত হইয়া রজত-রেখার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। মহানন্দা হইতে আরও দূরে সমসূত্রে বিপুলকায়া ত্রিস্রোতা প্রবাহিতা; প্রান্তরমধ্যস্থ উভয় নদীর এই বক্রগতি সৌন্দর্য্য-গৌরবে পথিককে বিমুগ্ধ করিয়া ফেলে।

ক্রমশঃই আমরা উঠিতে আরম্ভ করিলাম। ট্রেণ ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিতেছে, নিম্নে যে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আসিতেছি, যে পুলের নীচে দিয়া চলিয়াছি, আবার কিয়ৎক্ষণপরে তাহার উপর দিয়াই গাড়ী চলিতেছে, কোথাও দুই তিনটা লাইন পশ্চাদ্গামী হইয়া থামিয়া গিয়াছে, সেখানে গাড়ী একটু পিছু হটিয়া আবার চলিতেছে। গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে, নিম্নে সহস্র ফিট গভীর উপত্যকাপ্রদেশ, দেখিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। কি সুন্দর হরিৎ-লতা-পল্লবসমাচ্ছন্ন বিটপি-শ্রেণী, কি সুন্দর লতাপাতায় মধুর মিলন, কোথাও নির্ঝরিণী পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া শিলা হইতে শিলান্তরে লুটিয়া ছুটিয়া পড়িয়া কল

কল রবে নামিয়া চলিয়াছে। আহা! কি সুন্দর! উপলখণ্ডে আহত হইয়া বহুধারায় বিভক্ত হওয়ায়, কলনাদিনী নির্ঝরিণীর সৌন্দর্য্য আরও মনোহারিণী বোধ হইতেছিল। "পাগ্‌লা ঝোরার" কাছে গাড়ী খানিক দাঁড়াইল, ত্বরিতপদে গাড়ীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া সে মহিম-মণ্ডিত দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। তখন মেঘের স্বচ্ছ আবরণে চারিদিক্ ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাতে চতুর্দ্দিকের বিজনতা আরও শতগুণে বেশী বলিয়া বোধ হইতেছিল! কেবল পাগ্‌লা ঝোরার ঝর ঝর্ রব, সে নীরবতা ভাঙ্গিয়া দিতেছিল। পাগ্‌লা ঝোরা প্রকৃতই পাগ্‌লা ঝোরা; দিন নাই, রাত নাই, কোন্ সুদূর দেশ হইতে—কোন্ স্বপ্ন-কাহিনী বুকে করিয়া, কোন্ প্রিয়তমের উদ্দেশে সে একাগ্র চিত্তে "শত বাধা বিঘ্ন দলি' চরণে" ছুটিয়া চলিয়াছে! দুই ধারে বন্য-কুসুম-সুরভিতা নব-যৌবন-শ্রী-বিকশিতা লতিকা-সুন্দরীরা লুটোপুটি খাইয়া বলিতেছে, "ওগো প্রিয়তম! আমাদের দেখ, আমাদের কেন ত্যাগ কর?" কিন্তু হায়! পাগল যাঁহার প্রেমে পাগল, তার কাছে কি এ ক্ষুদ্র লতার ফাঁসী বাধা মানে? মানুষ যদি এমনি একমনে তাঁহাকে ডাকিতে পারিত, যদি এমনি নির্ম্মল, এমনি পবিত্রলালসা-কলুষ-বিহীন প্রেম তাহাদের থাকিত, তাহা হইলে বুঝি ভক্তের ভগবান্ দেখা দিতেন, তাহা হইলে বুঝি, মানবের এত কষ্ট থাকিত না! যখন আমরা সুখের মধ্যে থাকি; তখন ভগবান্‌কে আমরা প্রাণ ভরিয়া ধন্যবাদ দিই, কিন্তু দুঃখের বিকট বিদ্রূপে তাহা পারি না কেন? তখন কেন মুক্তকণ্ঠে বলি না—

"হ'ক সুখ হ'ক দুঃখ তোমারি সে দান,
কভু বা বিকাশে ঊষা কভু অবসান।"

আমরা চলিতে লাগিলাম। মেঘমালা কখনও ঊর্দ্ধে, কখনও নীচে, কখনও গায়ে আসিয়া খেলিয়া যাইতে লাগিল। কোথাও বিশাল শিলা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ভয় হয়—বুঝি এই পড়িল। কত বন, কত লতা, কত বিবিধ বর্ণের কুসুমরাশি, কোন্ দিক্ দেখিবে? প্রতি-পদ-বিক্ষেপেই কোন না কোন নির্ঝরিণীর সহিত সাক্ষাৎ হইতেছিল, তাহারা যেন বলিতেছিল—"এস ওগো ক্ষুধিত-তৃষিত পান্থ! এস একবার আমাদের এই সুশীতল বারি-রাশি পান কর এবং আমাদের দেখ।" নির্ঝরের সহিত বালিকাদের বেশ তুলনা হয়। উভয়েই নির্ম্মল, উভয়েই চঞ্চল, উভয়েই ভবিষ্যৎ-চিন্তা-বিহীন। কে জানে, কোথায় নির্ঝরের শেষ? আর কেই বা বলিতে পারে, বালিকাজীবনের

শেষশান্তি কোথায়? পাহাড়ের গায় ভুটিয়াদের ছোট ছোট ভুট্টার ক্ষেত; স্বাস্থ্যের সুন্দর মূর্ত্তি ভুটিয়া বালকবালিকাগণ গাড়ীর তামাসা দেখিতেছিল। কোথাও স্বর্ণ ও রৌপ্যের অদ্ভুতালঙ্কারবিভূষিতা, কোটরগতনয়না, বলিষ্ঠদেহা তরুণ-যৌবন-শ্রী-বিকশিতা ভুটিয়া ও লেপ্‌চা সুন্দরীগণ পথ আলো করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের চেপ্টা নাক ও পুরুষোচিত চাল্-চলনে যেন কেমন একটা বিকট সৌন্দর্য্যের ভাব, হৃদয়ে উদয় হইতেছিল, সে সৌন্দর্য্যে মাদকতা নাই, বরং বীভৎসতাই বহুপরিমাণে বিদ্যমান আছে। বেলা প্রায় ১॥ ঘটিকার সময় কার্সিয়াঙ্গে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল, এখানে গাড়ী অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। এখানেও বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বাস করিয়া থাকেন এবং অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির বাড়ীও এখানে আছে। G. C. Bannerjee কোম্পানীর দোকানগুলি এখানকার দেখিবার জিনিষ বটে। এমন কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নাই, যাহা সেখানে না পাওয়া যায়। কার্সিয়াঙ্গে খাদ্যদ্রব্যাদি তেমন মিলে না। আমরা যখন ঘুম ষ্টেশনে উপনীত হইলাম, তখন মেঘভেদ করিয়া সূর্য্যদেব দেখা দিয়াছেন, রৌদ্রালোকে চারিদিকের পাহাড়গুলি পরিষ্কার দেখা যাইতে লাগিল। পূর্ব্বে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইলেই একটী প্রাচীনা ভুটিয়া রমণী, যাত্রিগণের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিত, আজ কয়েক বৎসর হইল, সেই রমণী, কালকবলে নিপতিত হইয়াছে। তাহার নাম ছিল—ঘুমের ডাকিনী, (The witch of Ghoom)। রমণী, মৃত্যুর পূর্ব্বে নিজের অর্থব্যয়ে ঘুমে একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছে। ডাকিনীর পরিবর্ত্তে এখানে একটী অদ্ভুত বামন-বীর দেখিলাম। ইহার মাথার বেণী প্রায় পাদস্পর্শ করিয়াছে। সময়ে এ ব্যক্তির সাহেবদের কৃপাদৃষ্টিপাতে (The Dwarf of Ghoom)নামে পরিচিত হওয়া অসম্ভব নহে। ঘুম হইতে আমরা ক্রমশঃ নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিলাম। কারণ, দার্জ্জিলিং ঘুম হইতে অনেক নীচু। প্রায় ২½ মাইল দূর হইতেই দার্জ্জিলিং আমাদের নয়ন-পথে পতিত হইল। সে মধুর দৃশ্য, জীবনে ভুলিতে পারিব না। মনে হইতে লাগিল, কে যেন একখানা স্বপ্নের ছবি পাহাড়ের গায়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। পাহাড়ের উপরের ও নীচের বাড়ীগুলি বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। অপরাহ্ণে প্রায় ৪ ঘটিকার সময় দার্জ্জিলিং পঁহুছিলাম—হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল; মেল্-ট্রেণে আসিলে আরও দুই তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে পঁহুছিতে পারিতাম।

বাসায় পঁহুছিয়া আহারান্তে বিশ্রামের পর কৌতূহলপূর্ণ চিত্তে নগর

দেখিতে বাহির হইলাম। তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়াছিল, অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের লোহিত আভায় গগনের ঊর্দ্ধভাগে রক্তিমাভ মেঘগুলি ক্রীড়া করিতেছিল, আর আমাদের পদনিম্নে কোয়াসার স্বচ্ছ আবরণের ন্যায় শ্বেত-স্বচ্ছ মেঘগুলি ক্রীড়া করিতেছিল। ক্রমে আমরা চৌরাস্তায় উপনীত হইলাম—এস্থানে সাহেব-মেমদের মিলনস্থান। পর্ব্বতোপরি সুপ্রশস্ত ময়দানপার্শ্বে সুন্দর সুন্দর বাড়ী ও দোকানশ্রেণী। দুই ধারে সারি সারি বেঞ্চ পাতা; তাহাতে দলে দলে রূপ-যৌবন-গর্ব্বিতা মেম-সাহেবগণ পরিচ্ছদের ছটায় ও রূপের প্রভায় চারিদিক্ আলোকিত করিয়া বসিয়া আছেন; কেহ বা ভ্রমণ করিতেছেন। দু'চারিটি বঙ্গমহিলাও দেখিলাম। কোন বাধা বিঘ্ন নাই—কালায় গোরায় এখানে তাদৃশ পার্থক্য বোধ হইল না। এক পার্শ্বে একটী ফোয়ারা—ইহা ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট ইডেনসাহেবের স্মৃতিরক্ষার্থ সংস্থাপিত। প্রফুল্ল কমলের মত হাসিমুখে বালক-বালিকাগণ ক্রীড়া করিতেছে, তাহাদের উজ্জ্বল নয়ন, উল্লাসচঞ্চলতা, শৈশবের নির্ম্মল আনন্দের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। হায়! কোথায় সেই দিন! চৌ-রাস্তার মধ্যস্থলে 'অব্জারভেটরি হিল'। হিলের চারিদিক্ বেড়িয়া চক্রাকারে সুন্দররাজপথ। এই পথ বড়ই রমণীয়। হিলের পার্শ্বে কত সুন্দর সুন্দর যত্নপালিত গাছের সারি, তাহাদের পল্লবে-পল্লবে পাতায়-পাতায় নব-যৌবনশ্রী বিকশিত—বসন্তের হরিৎ সুষমা বিভাষিত। এ পথের পার্শ্বে স্থানে স্থানে বসিবার ঘর আছে। দেখিলাম সে সকল নির্জ্জন গৃহে বসিয়া প্রেমিক-প্রেমিকা তাহাদের হৃদয়ের উৎস খুলিয়া দিতেছে,কলহাস্যে সে বিজন ভূমি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। পথের ধারে পাহাড়ের ঢালু দিকে রেলিং দিয়া ঘেরা, নিম্নে বহু বাড়ী ঘর। কিয়দ্-দূর অগ্রসর হইলেই দূরস্থিত সমগ্র লিবং একখানি ছবির মত দেখা যাইতে লাগিল। সুপ্রশস্ত গোলাকার ক্রীড়াপ্রাঙ্গন, বাড়ী ঘর তরুশ্রেণী সকলি যেন ইন্দ্রজালের সম্মোহন দৃশ্যের ন্যায় আঁখি তৃপ্তিকর। যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবলি গিরি-শ্রেণী, পাহাড়ের গায়ে পাহাড়, তার পরে পাহাড়, অবশেষে শেষ গিরিশ্রেণী নীলগগনের অনন্ত নীলিমার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। একটী হইতে আর একটী শিখর উঁচু, সবই যেন বলিতেছে 'ওগো! একবার আমায় দেখ. আমি কতদূর! ঐ দূর সিকিমের গিরিশ্রেণী, ঐ নিম্ন অধিত্যকার গায়ে ভুটিয়া বস্তি—তাহাদের দেবপূজার স্থানের"ঝাণ্ডার" বস্ত্রাগ্রভাগ দৃষ্ট হইতেছে। ক্রমে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমরা হিলের উপরে আরোহণ করিলাম। এখান হইতে দার্জ্জিলিঙ্গের সমগ্রস্থান দেখা যায় বলিয়াই ইহার নাম 'অব্জারভেটরি হিল'

হইয়াছে। ইহার ঊর্দ্ধভাগ হইতে চারিদিকের সৌন্দর্য্য পরম রমণীয় বোধ হইতেছিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল; চন্দ্রদেব আকাশে ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন; নির্ম্মলগগনে তারা হাসিতেছিল; আর, ঊর্দ্ধে জলা পাহাড়ের গায়ে বাড়ীতে বাড়ীতে আলোকমালাগুলি নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলিতেছিল। বোটানিক্যাল গার্ডেন, ছোটলাট সাহেবের বাড়ী, বার্চ্চহিল প্রভৃতি দার্জ্জিলিঙ্গের সমগ্র স্থানই এখান হইতে দৃষ্ট হয়। কথিত আছে যে, পূর্ব্বকালে এই পাহাড়ের উপরিভাগে "দুর্জ্জয়লিঙ্গ"-নামক শিবলিঙ্গ সংস্থাপিত ছিলেন, তাঁহার নাম হইতেই নাকি এ স্থানের নাম দাজিলিং হইয়াছে। এখনও এ স্থানে বহু অত্যদ্ভুত দেবমূর্ত্তি দেখিলাম। চারি পার্শ্বে অসংখ্য নিশান, এখানে ভুটিয়ারা ধর্ম্মার্থ আসিয়া থাকে, এক জন লোককে উহার চতুর্দ্দিকে মালা-হস্তে কয়েক বার প্রদক্ষিণ করিতে দেখিলাম। এই হিলের নিম্নে এক পার্শ্বে একটী গুহা। এই গুহার গভীরত্ব এপর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। ইহার প্রবেশদ্বার সংকীর্ণ হইলেও ভিতরে ইহা নিতান্ত অপ্রশস্ত নয়। একটী গল্প শুনিলাম যে, একবার দুইজন সাহেব নাকি ইহার দৈর্ঘ্য নির্ণয় করিতে অবতরণ করিয়া আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই, তদবধি ইহার নিম্নে কেহ আর যায় না। আমরাও বাহির হইতেই ইহা দেখিয়া ফিরিলাম। ছোটলাট সাহেবের বাড়ী দ্রাবারির সম্মুখে সশস্ত্র প্রহরী দণ্ডায়মান, বাড়ীটি কলিকাতার প্রাসাদের সহিত তুলনীয় না হইলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব অনুপমেয়। এখানে প্রত্যেক রাস্তার পার্শ্বেই একখণ্ড কাষ্ঠফলকে সে রাস্তায় কোন্ কোন্ বাড়ী আছে, তাহা লিখিত থাকায় খুঁজিয়া লইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক।

৯ই জুন। ভোরে গাত্রোত্থান করিয়া দেখি—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। আমাদের বাড়ীর গায়ে শ্বেত-স্বচ্ছ মেঘমালা ক্রীড়া করিতেছে, চতুর্দ্দিকে কিছুই দৃষ্ট হয় না; সবই ম্লান—সবই অন্ধকার। সে যাহা হউক,বাসায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা বেড়াইতে বাহির হইয়া সমাধি-ক্ষেত্র দর্শন করিতে মনন করিলাম। সমাধিভূমির মত সাম্যসংস্থাপক স্থান জগতে কোথায়? আজ যাহাদিগের সমাধি দেখিতে আসিয়াছি,একদিন তাহারাও আমাদেরই মত ছিল। কত গর্ব্বে, কত আনন্দে,কত উৎসাহে তাহাদের হৃদয় প্রফুল্ল ছিল—কিন্তু আজি সব নীরব।. সাহেবদের সমাধিস্থল দেখিতে, আমার বড়ই ভাল লাগে; মৃত-ব্যক্তির প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করিতে ইঁহারা জানেন। প্রতি স্মারকলিপিতে মৃতব্যক্তির আত্মীয়গণের কত না গভীর প্রীতি ও স্নেহ প্রকাশ পাইতেছে!

জীবিত থাকিতে যাঁহারা বড় প্রিয় ছিল, মৃত্যুর পরে তাঁহাদের স্মৃতি কি রমণীয় নহে? কোন্ দুঃখিনী মাতা মৃত পুত্রের মধুর স্মৃতি হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারেন? কোন্ পতি-বিয়োগ-বিধুরা রমণী তদীয় প্রিয়তমের মধুর কাহিনী ভুলিতে চাহেন? কোন্ প্রকৃত প্রেমিক বিপত্নীক জীবনসঙ্গিনীর প্রেমের গাথা বিস্মৃত হইতে পারগ? কে কাহাকে কতদূর স্নেহ করিতেন ও ভালবাসিতেন, মৃত্যুর পরে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই যে আমাদের নয়ন-সমক্ষে সমাধি-শ্রেণী—হায়! কতজনের কত স্নেহ, কত প্রীতি, কত ভালবাসা, কত ভক্তি ইহাদের সহিত বিজড়িত রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? দেহান্তে শ্মশানভস্মের উপর 'স্মারকলিপিসংরক্ষণ ও মৃত্যুদিনে তাহার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনে হৃদয়ে যেমন শান্তির উদ্রেক হয় ও শোকেরও লাঘব হয়, আমার বিশ্বাস যে, মৃতব্যক্তির আত্মারও তাহাতে শান্তিলাভ হয়। যে, একদিন হৃদয়-চুরি করিয়া ভালবাসিয়াছিল ও যাহাকে 'সারাখানি' মনঃপ্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি, তাহার কথা যে, ভুলিতে পারে, সে ভালবাসিতে জানে না। জীবনে মরণে যে প্রেম অটুট অক্ষয়, তাহাই প্রেম-সংজ্ঞা-জ্ঞাপক, তাহাই ভাল-বাসা; নচেৎ আর যাহা,তাহা ধরণীর ধূলা, হায়! ধরায় মিলাবে। একটী একটী করিয়া সমাধি দেখিতে আরম্ভ করিলাম। প্রতি সমাধির পার্শ্বে নানাজাতীয় পুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে। কোথাও ডালিয়া সুন্দরী, লোহিত-রূপ-প্রভায় হৃদয়ের শোকগাথা প্রকাশ করিতেছে।

পরলোকে যাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহাদের হৃদয়ে কখন শান্তি থাকিতে পারে না। আজ যাহাকে চিতার অগ্নিতে বিসর্জ্জন দিয়াছি, এ দেহান্তে আর কি তাহার দেখা পাইব না?

"এ দেহ হয়ত মাটী, আত্মাও কি হয় মাটী?
সেও কি মাটীর কণা মাটিতে মিশায়?"

এ কথা মিথ্যা। অবিনশ্বর আত্মার সহিত দেহান্তে মিলিব, মিলিব—আহা! নিশ্চয় মিলিব'। তাঁহারা আমাদের পূর্ব্বে পরম-পিতার স্নেহময় কোলে গিয়াছেন মাত্র, "Though gone from us, not wholly lost, but merely gone before."

সমাধিস্তম্ভের কবিতাগুলি আমাকে বড়ই মুগ্ধ করিয়াছিল। একস্থানে কয়েকটি শিশুর সমাধির উপরে শোক-কাতর পিতামাতা লিখিয়াছেন,—

They are sleeping, only sleeping
As closing flowers at night.

পতি-বিয়োগ-বিধুরা পত্নী, প্রিয়তমের সমাধির উপরে লিখিয়াছেন :—

I loved him, Ah! no tongue can tell,
How much I loved him and how well
God loved him too and thought it best
To take him to His Heavenly rest.

যেখানে প্রেমের আধিক্য, সেখানে ভাষা নীরব; আর যেখানে তাহার অল্পতা, সেখানেই বাক্যচ্ছটা। আর এক স্থানে বিশ্বাসী পিতা লিখিয়াছেন :—

Only a step removed
We soon again shall meet.

এ কথাতে হৃদয়ে শান্তি আসে এবং এ বিশ্বাসও সুন্দর। আমরা তাঁহাকে ভালবাসিতে শিখি নাই—বিশ্বাস করিতে শিখি নাই—তাই মৃত্যুকে ভয় করি। যিনি সরলবিশ্বাসী ধার্ম্মিক মহাত্মা, তিনি বলিতে পারেন :—

"ওহে মৃত্যু! তুমি মোরে কি দেখাও ভয়?
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।"

স্বর্গীয় দেশ-বিখ্যাত আনন্দমোহন বসুর একটী শিশু পুত্রের সমাধিও এখানে দেখিলাম। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ পেড্‌লার সাহেবের পত্নীর স্মারকলিপিটি বড়ই সুন্দর—

Something to love
God lends us; but when love is grown
to ripeness, that on which it throve
falls off, and love is left alone.

একে একে সমাধিফলকের স্মৃতিফলকগুলি দেখিতে দেখিতে, উপরে উঠিয়া রাস্তা ধরিলাম। দার্জ্জিলিঙ্গের সমাধিক্ষেত্রটি বড়ই সুন্দর। প্রকৃতি-সুন্দরীর স্নেহময় কোলে নীরব সমাধিক্ষেত্র,হৃদয়ে শান্তির ভাব আনয়ন করে। গম্ভীর নির্জনতা এখানে দেদীপ্যমান, জন-কোলাহল এখানে নীরব। পাছে মৃতব্যক্তিদের শান্তির নিদ্রা ভঙ্গ হয়, এজন্য জড়প্রকৃতিও যেন ভীত ও চকিত। একটী মেম-সাহেব আমাদের নিকট একটী সমাধির খোঁজ লইলেন। কোনও

কোনও সমাধির উপর পুষ্প বিকীর্ণ দেখিলাম; বোধ হয়, আত্মীয়েরা মৃত্যুর দিনে উহা দিয়া গিয়াছে। সামাধিক্ষেত্র দেখিতে দেখিতে, বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, কাজেই সত্বর বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

অপরাহ্ণে 'বোটানিক্যাল গার্ডেন' দেখিতে গমন করিলাম। উহা আমাদের বাসার অনতিদূরে অবস্থিত। ধীরে ধীরে ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখে অবতরণ করিতে করিতে ওখানে পৌঁছিলাম,—আমাদের নিম্নে পুঞ্জীকৃত মেঘমালা বিকাশ পাইতেছিল। সুন্দর শ্রেণীবদ্ধ বিটপি-শ্রেণী;—বড়ই শোভাময়। সেই ইডেন সেনিটেরিয়মের ঠিক্ নীচে এবং জেলের অনতিদূরে অবস্থিত। শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের সহিত বৃহত্বে ও অন্যান্য বিষয়ে ইহার তুলনা না হইলেও, প্রাকৃতিক শোভাসম্পদে ইহা অতুলনীয়। চারিদিকে বেড়িয়া উঁচু বৃক্ষশ্রেণী, শ্যামলতৃণাচ্ছাদিত লতা-কুঞ্জ, প্রস্ফুটিতপুষ্পবৃক্ষশ্রেণী, সকলই সুন্দর—সকলই রমণীয়। গার্ডেনের একপার্শ্বে একটী ছোট যাদুঘর আছে। উহাতে মৃতসর্পের সুদীর্ঘ দেহ ও নানাজাতীয় পতঙ্গের দৃশ্য বেশ দর্শনযোগ্য। আমরা যাদুঘর হইতে কিছুদূর অগ্রসর হইলেই, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া একটী কাষ্ঠগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম ও তিন বন্ধুতে গল্প যুড়িয়া দিলাম, গৃহমধ্যস্থিত টেবিলের উপরে কত জনে নাম খোদিত করিয়া গিয়াছে। হায়! প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্মৃতিকে জগতে চিরস্থায়ী রাখিবার জন্য ব্যাকুল; কিন্তু মাতা বসুন্ধরা কি তাহা মনে রাখেন? সেই বর্ষার দারুণ বর্ষণে,—নীরব নিস্তব্ধ হিমালয়বক্ষে বাদলার অন্ধকারের মধ্যে আমরা হৃদয়ের উৎস খুলিয়া দিয়াছিলাম—সে কথার আদি ছিল না, অন্ত ছিল না—তাহা এক আশ্চর্য্যভাব-বিকাশমাত্র। পুঞ্জীভূত মেঘজাল আমাদের নিম্নস্থ পর্ব্বতগাত্রে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল,—চা-বাগানের কুলীরা কাজ করিতেছিল; আর উচ্চে আমরা মেঘরাশির বর্ষণে অস্থির। বৃষ্টি একটু কমিয়া আসিলে—উদ্যানমধ্যস্থ Glass house মধ্যে সযত্নে রক্ষিত নানাজাতীয় সুন্দর সুন্দর পুষ্পতরুশ্রেণী দেখিলাম, কোথাও লতা ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে—তাহার পাতায় পাতায় পুষ্পস্তবক, দ্রাক্ষালতায় থোপে থোপে ফল ফলিয়াছে—দেখিতে সুন্দর ও মনোহর। বসন্তের সময় ইহা দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর হয়। Lloyd সাহেবনামক একজন ইংরেজ ভদ্রলোক—এই উদ্যানসংলগ্ন ভূমি, গবর্ণমেণ্টকে দান করায় তাঁহার নামানুযায়ী ইহা Lloyd Botanic Garden নামে পরিচিত। সন্ধ্যার অন্ধকারের সহিত চারিদিকে শ্বেত স্বচ্ছ কুয়াসার আবরণে ও

মেঘের ঘোরালো আঁধারে যখন চারিদিকে কৃষ্ণবর্ণের আস্তরণে ঢাকিয়া যাইতেছিল—তখন আমরা বাসায় ফিরিলাম।

১০ই জুন। অদ্য প্রত্যূষে বার্চ্চহিল (Birch Hill) দেখিতে গমন করিলাম, উহা আমাদের বাসা হইতে প্রায় ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। আজ দিনটি বেশ, আকাশ পরিষ্কার, সূর্য্যকিরণে সমগ্র দার্জ্জিলিং হাস্যময় বোধ হইতেছিল। বার্চ্চহিলে নানাজাতীয় উচ্চ উচ্চ শোভাময় বিটপি-শ্রেণী সুদীর্ঘ ও সুপুষ্ট লতাসমূহ বেড়িয়া রহিয়াছে। পাহাড়ের চারিদিক্ বেড়িয়া ক্রমশঃ রাস্তা দিয়া উঁচুতে উঠিতে হয়। এ স্থানটি বড়ই নীরব ও নির্জ্জন; আমাদের সহিত এক জন ভদ্রলোকেরও সাক্ষাৎ হইল না। মাঝে মাঝে পার্ব্বত্য বিহঙ্গের মধুর কণ্ঠরবে সে নীরবতা ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। এক স্থানে একটী কুকুরের সমাধি, সমাধিটী শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত; কিন্তু উহার ঊর্দ্ধাংশ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বহু পরিমাণে সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সমাধিগাত্রে কুকুরের প্রশংসাসূচক বাক্যের সহিত যে একটী অতি সুন্দর কবিতা লিখিত আছে, তাহরা উদ্ধৃত করিবার লোভসংবরণ করিতে পারিলাম না। কবিতা এই,—

If God be love, what rests beneath,
Is not without a spark divine.

ক্রমে ঘুরিতে ঘুরিতে আমরা হিলের সর্ব্বোচ্চ স্থানে একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত ঘরের মধ্যে উপবেশন করিলাম। আমাদের নয়নসমক্ষে অগণন গিরিশ্রেণী ক্রমোচ্চভাবে দণ্ডায়মান—সে শোভা ভাষায় বর্ণনা করা অসাধ্য। পার্ব্বত্য সুশীতল সমীরণ আমাদের শ্রম-কাতর দেহকে পলকমধ্যে সুশীতল করিয়াছিল। এই গৃহে বহু নাম খোদিত। কেহ পেন্‌সিল দ্বারা, কেহ কয়লা দ্বারা, কেহ চক্‌খড়ি দ্বারা, নিজ নিজ নাম অঙ্কিত করিয়াছে। বার্চ্চহিল হইতে বাসায় ফিরিতে বেলা প্রায় বারটা বাজিয়া গিয়াছিল, কিন্তু দার্জ্জিলেঙ্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যরাজি আমাকে এমনই মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল যে, আহারাদির পরে ঘণ্টা দুই বিশ্রাম করিয়াই পুনরায় জলাপাহাড় দেখিতে বাহির হইলাম। আমাদের বাসা হইতে ঊর্দ্ধে মেঘমেলা-বিভূষিত জলা পাহাড়ের সৌন্দর্য্য এক অপূর্ব্ব স্বপ্নময় দেশের ন্যায় বোধ হইতেছিল। জলা পাহাড়ের উপর ইংরেজের সৈন্য-নিবাস। জলা পাহাড়ে উঠিতে বিশেষ পরিশ্রম বোধ হইতেছিল।

পাহাড়ের উপর হইতে দার্জ্জিলিঙ্গের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাকৃতিক দৃশ্য এমন বিরাট ও মনোমোহকর দেখায় যে, সে সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি ভাষার সাহায্যে

প্রকৃতভাবে পাঠকের নেত্রপথে বিকাশ করা অসম্ভব। অতি শীতল বাতাস প্রবাহিত হইয়া, প্রাণের মধ্যে এমন একটা সজীবতা ও প্রফুল্লতা আনিয়া দিতেছিল যে, সমতল ভূমির জীব আমরা তাহা নিম্ন ভূমিতে কোন দিন অনুভব করিতে পারি নাই। ইংরেজ সৈনিকগণ, মনের আনন্দে ক্রীড়া করিতেছিলেন। আমরা ক্রীড়াপ্রাঙ্গণের সন্নিকটে দাঁড়াইয়া কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত তাহা দর্শন করিয়া বাসার দিকে ফিরিয়া চলিলাম; জলাপাহাড়ের উচ্চতা ৭,৫০০ ফিট।

দার্জ্জিলিঙ্গের অন্যান্য দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে ভুটিয়া বস্তী, বাজার, ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত (কাকঝোড়া), কুচবিহার মহারাজের ও বর্দ্ধমানের মহারাজের বাটীও দ্রষ্টব্য। বর্ষার সময়ে কিংবা বৃষ্টির পরে সশব্দে যখন জল পতিত হইতে থাকে, তখন কাকঝোড়ার সৌন্দর্য্য বড়ই মনোহর হয়। দার্জ্জিলিং হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘা, এভারেষ্টপ্রভৃতি হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ-সমূহ দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রতি রবিবারে এখানে হাট বসে। সে দিন বহু তিব্বতীয়, ভুটিয়া ও নেপালী নরনারীর মিলন হয়,—সে এক চমৎকারদৃশ্য। এখানে তিব্বতীয় নানাবিধ মূর্ত্তি ও আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দ্রব্যাদিও ক্রয় করিতে পারা যায়। সাধারণতঃ লোকে দার্জ্জিলিং আসিয়া লাউইফ জুবিলী সেনিটারিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহা ১৮৮৭খ্রীষ্টাব্দে কতিপয় বদান্য জমিদার ও রাজসাহীবিভাগের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার লাউইফ সাহেবের উদ্যোগে নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে সর্ব্বশ্রেণীর লোকের পক্ষেই থাকিবার বিশেষ সুবন্দোবস্ত। সেনিটারিয়ম্ সাধারণ ও হিন্দু এই দুই ভাগে বিভক্ত। সাধারণ বিভাগে সাহেবী ফ্যাসানে থাকিতে পারা যায়, আমরা এ স্থানে উভয় বিভাগের দৈনিক ব্যয়ের হিসাব দিলাম।

	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	তৃতীয় শ্রেণী
সাধারণ বিভাগ	৫৲	৪৲	১।০
হিন্দু বিভাগ	৩৸০	২৷৷৵০	১।০

সেনিটারিয়মের সংসৃষ্ট একটী পুস্তকালয় আছে। ইহাতে পর্য্যটকগণের বিশেষ সুবিধা হয়। এপ্রিল মাস হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত সেনিটারিয়ম্ খোলা থাকে, সেনিটারিয়মে থাকিতে হইলে, বিছানা আনা প্রয়োজন। কারণ, এখান হইতে বিছানা দেওয়া হয় না। সেনিটারিয়মের বন্দোবস্ত

খুব ভাল, ভ্রমণকারীকে কোনওরূপ কষ্টই ভোগ করিতে হয় না। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার পাল L. M. S. ইহার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত আছেন। কাজেই কাহারও পীড়াদি হইলেও, চিকিৎসার জন্য কোনরূপ কষ্ট পাইতে হয় না।

দার্জ্জিলিঙ্গে একটী ব্রাহ্মসমাজগৃহ আছে। রবিবারে আমরা তথায় গমন করিলাম। সৌভাগ্যের বিষয়,—সে সময় কলিকাতার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। আমরা যে দিন সমাজে গিয়াছিলাম, সে দিবস শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। সে দিন তাঁহার উপদেশ এমনই সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল যে, তাহা জীবনে কখন ভুলিতে পারিব না। তাঁহার সে উপদেশের মধ্যে ধর্ম্মের সংকীর্ণতার পরিবর্ত্তে এমন এক উদার বিশ্বজনীন প্রেমের আভাস ছিল যে, তাহাতে সর্ব্বধর্ম্মী লোকেরই হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে। প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী তিব্বতপ্রত্যাগত শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস C. I. E. বাহাদুরের সহিত একদিন সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি রেল ষ্টেশনের অনতিদূরে Lhassa Villa নামক বাটীতে থাকেন। তাঁহার মধুর সম্ভাষণে বড়ই প্রীত হইলাম। আমার যাওয়ার অব্যবহিত পরে এক লামা আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। দাস মহাশয়কে আমি তৎপ্রণীত তিব্বতভ্রমণসংক্রান্ত বহি দু'খানার বাঙ্গালায় অনুবাদ প্রকাশ করিতে অনুরোধ করায় বলিলেন, "I have done my duty, এখন উহা আপনাদের কাজ।" এ বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার যুবার ন্যায় কঠোর পরিশ্রম আমাদের ন্যায় অলস যুবকগণের নিকট বিস্ময়ের বিষয়। তৎসংকলিত বিরাট তিব্বতীয় অভিধান দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি।

দার্জ্জিলিঙ্গে আমি আমার প্রিয়তম বন্ধু শ্রীযুক্ত অ—বাবুর শ্বশুর কালা হাসপাতালের ডাক্তার রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাসায় অতিথি হইয়াছিলাম। সুশীলা বন্ধু-পত্নী, পুত্র-কন্যা-শোক-জর্জ্জরিত হৃদয়েও আমার সুখ সুবিধার জন্য যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা চিরদিন হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে। সত্য সত্যই রমণী দেবী, যদি সংসারের দারুণ ঝড় ঝঞ্ঝায় হতভাগ্য পুরুষের কোন আশ্রয় থাকে—সে,কেবল মহিম-মণ্ডিতা রমণীর মঙ্গলময় স্নেহ ও প্রীতিপাত্র। নিবারণ বাবুর মত উদার প্রকৃতির অতিথি-সেবক দার্জ্জিলিঙ্গের ন্যায় শৈত্য-প্রদেশে অতি বিরল দেখা যায়। তিনি দার্জ্জিলিঙ্গের

একটী জীবন্ত ইতিহাস। তাঁহার নিকট দার্জ্জিলিঙ্গ-সম্বন্ধে বহু বিষয় অবগত হইতে পারা যায়।

তাঁহার প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, নরওয়ে হইতে Monrad Ans এবং Rubenson-নামক দুইটি যুবক, কাঞ্চনজঙ্ঘার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিবার জন্য আসিয়াছিল এবং গত বৎসর প্রায় পঞ্চাশ জন তিব্বতীয় কুলী ও বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া তদুদ্দেশে যাত্রা করিয়া কাঞ্চনজঙ্ঘার দ্বিতীয় শৃঙ্গ পেক্র শৃঙ্গে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাহাদের সেই অভিযানে দুই জন কুলী, মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। Rubenson সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, চিকিৎসার্থ কালা-হাসপাতালে নিবারণ বাবুর ও তৎকালীন দার্জ্জিলিঙের সিবিল সার্জ্জন Oakley সাহেবের তত্ত্বাবধান ছিল। Rubenson বলিয়াছিলেন, "জীবনে এমন দুঃসাহসের কার্য্য কখন করিব না। ওখান হইতে ফিরিতে পারিব, তাহা কখনও কল্পনা করিতে পারি নাই। আমরা লম্বা এক গাছা দড়ি, প্রত্যেকের কটিদেশ হইতে জড়াইয়া তবে আরোহণ করিতাম। কাঞ্চনজঙ্ঘার সর্ব্বোচ্চ স্থানে আরোহণ করা মানুষের অসাধ্য।" নিবারণ বাবুকে উহারা বহু ফটো দিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয়, তাহা তাঁহার নিকট পাওয়া গেল না—নচেৎ উহা দেখিবার জিনিস ছিল বটে।

১৩ই জুন। অদ্য দার্জ্জিলিঙ্গ পরিত্যগ করিব। এত দিন কি যেন এক মধুর স্বপ্নের মধ্য দিয়া দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছিল। বেলা ১১টার সময় ষ্টেশনে আসিলাম। এত দিন যে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া দিন কাটাইয়াছি, আজ বিদায়ের দিনে গাড়ী যখন ষ্টেশন ছাড়িয়া কিছু দূর অগ্রসর হইল, তখন সে বিরাট গিরিসম্রাট্ আবার নয়নপথে পতিত হইল। হায়! সে বিধি-মহিম-মণ্ডিত অপূর্ব্ব দৃশ্য চিরলোভনীয় ও রমণীয়। সূর্য্যকিরণমণ্ডিত স্তরে স্তরে কাঞ্চনজঙ্ঘা, তাহার চিরতুষারাবৃত, উন্নতশীর্ষ অন্যান্য গিরিশ্রেণীর সম্মুখ হইতে স্বকীয় স্বতন্ত্রতা ও মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দিতেছিল। সে কি এক মহাদৃশ্য! সে কি এক কল্পনাতীত স্বপ্নরাজ্য, তাহা হৃদয়ে আঁকিয়া রাখিবার। কল্পনাবলে মুহূর্ত্তমধ্যে আমি সেই গিরির উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া সমগ্র ভারতকে (যেন একখানা ছবির মত) দেখিতেছিলাম। হায়—গিরিরাজ! তুমি যে ভারতকে একদিন জ্ঞান-গৌরবে—ব্রহ্মণ্য শক্তিতে ও বেদ-বিদ্যায় চিরগৌরবময় ও চিরমহিম-ময় দেখিয়াছে, আর কি সে, অতীত গৌরবমণ্ডিত দীন ভারত, নব তেজে নব জ্ঞানে নব শিক্ষায় নব প্রভায় চির-দীপ্তিময় হইবে

না? কোন কোন স্থানে স্খলিত তুষারময় কাঞ্চনজঙ্ঘার কৃষ্ণদেহ দেখা যাইতে ছিল। কাঞ্চনজঙ্ঘাকে আমার নিকট জগদীশ্বরের রচিত একটী মহতী কবিতা বলিয়া বোধ হইতেছিল। ক্রমে গাড়ী ছুটিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল—দার্জ্জিলিং দূরে সরিয়া গেল, কুয়াসার ঘন আস্তরণে কাঞ্চনজঙ্ঘা নয়নপথ হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। হায়! এমন করিয়াই, জীবনের মধুর স্বপ্ন কোথায় মিলাইয়া যায়, কে জানে? বাহুল্যভয়ে আমরা এখানে আর দার্জ্জিলিঙ্গের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিলাম না।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

দুঃখিনী।

নবম পরিচ্ছেদ।

আজ ঘটীটা, কাল বাটীটা, পরশ্ব থালাখানি, এমনই করিয়া এক এক দিন এক একটা জিনিস বিক্রয় করিয়া রামসত্যের সংসার চলিতে লাগিল। পূর্ব্বে যে সামান্য জমিটুকু ছিল, তাহা খাজনার বাকীতে নিলাম হইয়া গিয়াছে। কত কষ্টে যে দিন যাইতেছে, তাহা আর বলিয়া কি হইবে? কিন্তু, দুঃখিনী সে সময়েও একটু একটু উপার্জ্জনের পথ দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে মনে করিল, "যে খাইতে পায় না, তাহার আবার লজ্জা কি? শ্বশুরবাড়ীতে যাইতে পারিব না, সেখানে গেলে মহাবিপদ্। যে প্রকারে হউক, কিছু উপার্জ্জন করিতেই হইবে।" এই সকল কথা চিন্তা করিয়া,সে, একটী উপায় স্থির করিল। ইতঃপূর্ব্বেই সে, জামা সেলাই করিতে শিখিয়াছিল; এখন বাজার হইতে কাপড় কিনিয়া আনিয়া, সে, জামা সেলাই আরম্ভ করিল। পাড়ার এক জন লোক, দুঃখিনীকে বড় স্নেহ করিত, সেই লোকটি কাপড় কিনিয়া আনিয়া দিত, দুঃখিনী পীরাণ সেলাই করিয়া আবার তাহার নিকট দিত, সে বাজারে বিক্রয় করিয়া সেলায়ের মজুরী আনিয়া দুঃখিনীকে দিত; কিন্তু লোকে জানিতে পারিত না যে, দুঃখিনী সেলায়ের কাজ করিয়া পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে। কিন্তু ইহাতে তার মাসে কত হয়? সমস্ত দিনের মধ্যে দুঃখিনী অতি কম সময়ই সেলাই করিতে পারিত, তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া, পিসী পূর্ব্বেই সরিয়া পড়িয়াছিল। দুঃখিনীকে একাকিনী সমস্ত কার্য্য করিতে হইত। সংসারের সমস্ত কার্য্য করিতে হয়, তাহার পরে

প্রায়ই ধান ভানিয়া চাউল প্রস্তুত করিতে হয়। এমন সঙ্গতি নাই যে, এক দিনে ৫ কাঠা ধান সংগ্রহ করিয়া ভানিয়া রাখে, কাজেই প্রায় প্রত্যহই ধান ভানিতে হইত। সারা দিন সংসারের কাজে পিতার শুশ্রূষায় চলিয়া যাইত; ছোট ভাইটীর খোঁজ করিতে হইত। রাত্রিতে পিতা আহার করিয়া বিছানায় বসিলে তাঁহাকে রামায়ণ, কি মহাভারত পড়িয়া শোনাইতে হইত।[৩] দুঃখিনী পিতাকে রামায়ণ বা মহাভারত না শোনাইয়া কোন দিনও শয়ন করিত না। পিতা যতক্ষণ জাগ্রৎ থাকিতেন, ততক্ষণ সে রামায়ণ পড়িত, কোন কোন স্থানে আবার ব্যাখ্যা করিয়া পিতাকে বুঝাইয়া দিত এবং মাঝে মাঝে তাঁহাকে তামাক সাজিয়া খাওয়াইত। বৃদ্ধ রামসত্য এক একদিন দুঃখনীর এই ব্যবহার দেখিয়া আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিতেন, তাঁহার প্রাণের মধ্যে যে, কি এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হইত, তাহা কি বলিয়া প্রকাশ করিব? পিতা নিদ্রিত হইলে এবং ভ্রাতা আহার করিয়া চলিয়া গেলে, দুঃখিনী পীরাণ লইয়া বসিত। দুঃখিনী তো তখনও ২৩ বৎসরে পড়ে নাই। অল্পক্ষণ সেলাই করিলে, হয়, তাহার প্রদীপের তৈল ফুরাইয়া যাইত, না হয় তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইত। কাজেই ৪।৫ দিনের কমে একটী পীরাণ সেলাই শেষ হইত না; মজুরীও ।০ আনার বেশী পাওয়া যাইত না; কারণ, সেলাই খুব ভাল হইত না। কাজেই ব্যয়-নির্ব্বাহে তাহার অতি কষ্ট হইল। কিন্তু উপায় কি? একমাত্র উপায় রসিক। সে প্রতিদিনই রসিককে কত বুঝায়; কিন্তু অতি অল্পবয়সেই রসিক একেবারে অধঃপাতে গিয়াছিল। বলিয়াছি, দুঃখিনীর বয়স ২১ বৎসর এবং রসিকের বয়স ১৯ বৎসর। কিন্তু এই বয়সেই সে, সমস্ত কুক্রিয়াতেই দক্ষ হইয়াছে। দুঃখিনীর যদি একটী সন্তান থাকিত, তাহা হইলেও তাহারই মুখের দিকে চাহিতে পারিত, কিন্তু এত বয়সেও তাহার সন্তান হয় নাই। এখন কাজেই ছোট ভাইকেই সে তাহার জীবনের অবলম্বন মনে করিল। এক শ্বশুরকুলে রমানাথ। তাহার পরিচয় আর পাঠকপাঠিকাদিগকে দিতে হইবে না। রমানাথ একজন কু-চরিত্র দলের প্রধান লোক; সে এখন বাটীতে আড্ডা করিয়া বসিয়াছে, কত ভদ্রলোকের সন্তানের সর্ব্বনাশ করিতেছে, কত কুল-স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করিতেছে। দুঃখিনী সেইজন্য না খাইয়া মরিবে, তাহাও ভাল মনে করিয়াছিল, তবুও শ্বশুরের ঘর আর করিবে না। কিন্তু রসিক মানুষ না হইলে, আর চলে না। দুঃখিনী এতদিন পর্য্যন্ত রসিকের প্রতি একটীও কর্কশ বাক্যপ্রয়োগ করে নাই। বরঞ্চ রামসত্য অনেক সময়ে

রসিককে গালাগালি দিয়াছেন; কিন্তু দুঃখিনী রামসত্যকে নিষেধ করিয়াছে। দুঃখিনীর বিশ্বাস, গালাগালিতে লোককে ভাল করিতে পারা যায় না; তাই সে ভাল কথা বলিয়া রসিকের মনকে সৎপথে আসিতে চেষ্টা করিত; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। মধ্যে একদিন গ্রামে একদল যাত্রাওয়ালা আসিয়াছিল, রসিক নিজে একটু গান গাইতে পারিত এবং যাত্রার অধিকারীর সহিত একদিন একস্থানে বসিয়া গাঁজা মদ খাইয়াছিল। রতনেই রতন চেনে; রসিক কাহাকেও কিছু না বলিয়া যাত্রাওয়ালার সহিত একদিন চলিয়া গেল। সমস্ত দিনের মধ্যে বাটীতে আসিল না; কিন্তু এ তাহার পক্ষে নূতন ঘটনা নহে। সন্ধ্যার সময় রামসত্য শুনিলেন—রসিক, যাত্রার দলের সহিত চলিয়া গিয়াছে; রামসত্য কাঁদিতে লাগিলেন। দুঃখিনীর বড়ই কষ্ট হইল; যেমনই হউক, তবুও ভাইটী নিকটে ছিল, নিতান্ত বিপদে পড়িলে অবশ্যই ফিরিয়া চাহিত। কিন্তু এটা সামান্য বিপদ্; ইহা অপেক্ষাও আর একটী বিপদ্ আসিয়া দুঃখিনীর স্কন্ধে চাপিয়া পড়িল। রসিকের গৃহত্যাগের কয়েক দিন পরেই রামসত্যের একটু জ্বর হইল। জ্বর অবস্থায় একদিন প্রাতে তাঁহার মুখ দিয়া হঠাৎ প্রায় দেড় পোয়া রক্ত উঠিল এবং তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। আর তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল না। দুঃখিনীর সংসারের শেষ অবলম্বন আজ চলিয়া গেল! আজ এ সংসারে দুঃখিনী আশ্রয়হীনা। তাহার আপনার বলিবার যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা কেহই জিজ্ঞাসা করেন না। এক আত্মীয় রসিক, সে কোথায় চলিয়া গেল। হায়! আজ পিতার সৎকার কে করে? দুঃখিনীর কাঁদিবার অবকাশ কৈ? দুঃখিনী ভাবিল—"আগে পিতার সৎকার করি, তাহার পরে বসিয়া কাঁদিব। আমার কাঁদিবার দিন তো সম্মুখে রহিয়াছে—" এই ভাবিয়া দুঃখিনী প্রতিবেশীদিগের দুই একজনকে তাহার শ্বশুরবাটীতে সংবাদ দিতে পাঠাইয়া দিল; সেখান হইতে সংবাদ পাইবামাত্র রমানাথ আসিল। কিন্তু এক গোলমাল বাধিয়া উঠিল; রামসত্যের গলা দিয়া রক্ত উঠিয়া মৃত্যু হইয়াছে, শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। প্রায়শ্চিত্ত না করিলে, কেহ সৎকার করিতে সম্মত নহেন। দুঃখিনী মহাবিপদে পড়িল; কোথায় টাকা পাইবে? কি করে, অনন্যোপায় হইয়া রমানাথের শরণাপন্ন হইল। রমানাথ অনেক অনুনয়বিনয়ের পর প্রায়শ্চিত্তের খরচ দিতে স্বীকার করিল; যথাবিধি কার্য্য হইয়া রামসত্যের সৎকার হইয়া গেল।

এখন দুঃখিনীর কি হইবে? দিনান্তে দুঃখিনী যথাবিধি পিতার

শ্রাদ্ধাদি করিল। রসিক তো উপস্থিত নাই, তাহার সংবাদও নাই। দুঃখিনী একা, আর এক ভয়ানক চিন্তায় পড়িল। নিজের থাকিবার স্থান কৈ? এই বাটীতে একা নিবাস করা নিরাপদ নহে। পূর্ব্বে যে প্রতিবেশীর কথা বলিয়াছি, তাহাদের বাটীর মেয়েরা এ কয়দিন আসিয়া দুঃখিনীর সহিত একত্র বাস করিত। কিন্তু পরের মেয়ে ছেলে কয় দিন পরের বাড়ী থাকে, কাজেই দুঃখিনী তাহার প্রতিবেশী সেই ভদ্র লোকটীর সহিত পরামর্শ করিতে গেল। তিনি বলিলেন, "বাটী বিক্রয় করিয়া যাহা পাও, তাহা দ্বারা কর্জ শোধ দিয়া আমার বাটীতে আসিয়া বাস কর। আমি তোমাকে কন্যার মত দেখিব." দুঃখিনী এ কথা বুঝিল। কিন্তু তাহার মনে আরও অনেক কথা উঠিল। সে বলিল—"বাবা, বিক্রয় করিলে, কি মহাজনের ঋণ শোধ হইবে?"

প্রতিবেশী। সমস্ত হইবে না, কথঞ্চিৎ তো শোধ হইবে।

দুঃ। কিন্তু বাড়ী বিক্রয় করিব কিরূপে? বাড়ী যে রসিকের। তাহার বাড়ী বিক্রয় করিবার আমার যে অধিকার নাই!

প্রতি। মহাজন যে দুই চারিদিনের মধ্যেই নালিশ করিয়া বাড়ী বিক্রী করিয়া লইবে, তখন কি হইবে? রামসত্যের ঋণের দায়ে তাহার বাড়ী বিক্রয় হইবে। তুমি তাহা আটকাইবে কি দিয়া?

দুঃ। তবে কি রসিক দেশে আসিয়া দাঁড়াইবার স্থান পাইবে না, এই বলিয়া দুঃখিনী কাঁদিতে লাগিল।

প্রতিবেশী তখন এইরূপ বলিতে লাগিলেনঃ—

"মা! তোমাকে কাঁদাইবার জন্যে এ কথা বলিতেছি না। ভাল কথা বলিতেছি। তোমার বয়স অল্প; এ বয়সে নানা বিপদ্; তোমার একজন মুরুব্বি চাই। সংসারে কত প্রলোভন আছে। শেষে কি জাতি মান সব যাইবে? আমি তোমার পিতার সমান বয়সী, তুমি আমার মেয়ের মত। আমি যাহা বলিতেছি, তাহাই ভাল। তুমি বাটী বিক্রয় করিয়া, আমার বাড়ীতে আসিয়া বাস কর।

এ কথা, দুঃখিনীর মনে ভাল বোধ হইল না। দুঃখিনী সমস্ত পারে; কিন্তু অন্যের গলগ্রহ হইতে পারে না; আরও অনেক কথা তাহার মনে হইল। সে বলিল—"দেখুন, বাড়ী আমি কোন রকমে রাখিতে পারিলেই ভাল হয়। রসিক অবশ্যই দেশে ফিরিবে; জগদীশ্বর তাহার সুমতি দিবেন। তাহার বিবাহ দিয়া আবার আমি সংসার পাতিব। ঐ আশা ছাড়িয়া দিলে যে, আমি

বাঁচি না। সে, আমার জীবনে একমাত্র আশা। আর একটী কথা আছে। আপনি অসম্ভব মনে করিতে পারেন; কিন্তু আমি স্থির করিয়াছি; মহাজনের ঋণ আমি শোধ করিব, অথচ বাটী বেচিব না। আমার শরীরে কি বল নাই? পিতা তো আমার জন্যই ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। যদি আমি শীঘ্র মরিয়া না যাই, তবে এ ঋণ আমি শোধ করিব। যদি বলেন, কেমন করিয়া ঋণ শোধ করিব? তাহা ঠিক করিয়াছি; কিন্তু আপনাকে না জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছু করিতে পারি না, সেই জন্য আপনাকে বলিতে আসিয়াছি। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আপনি সাহায্য করিলেই, আমি কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিব। আমার চরিত্রের জন্য আপনি ভয় করিবেন না। আমার মাথার উপরে পরমেশ্বর আছেন। আমি অনেক দিন হইতে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। আমি কিছুতেই কুপথে যাইব না। আমি মনে করিয়াছি—আমাদের বাটীতে একটি পাঠশালা করিব; আমি যে লেখা পড়া জানি, তাহাতে আমি ছেলে মেয়েদিগকে পড়াইতে পারিব। আমাদের গ্রামে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আমার এখানে লেখা পড়া শিখিবে। এ কাজ কি মন্দ, এ কি দোষের কাজ? আমার জীবনে ইহা অপেক্ষা ভাল কাজ আর হইতে পারে না। আমি কি এ সংসারে আসিয়া কোন কাজই করিব না! এত দিন তো কষ্টে গেল; যাক্—তাতে আমার দুঃখ নাই; কিন্তু আপনি আমার এই কাজের সহায়তা করিবেন বলুন! আমার জীবন আমি এই কাজে নিযুক্ত করিব। মাথার উপর ভগবান্ আছেন। ইহাতে আমার দুই কাজ হইবে; ছেলে মেয়েদের পড়াইয়া মাসে মাসে যাহা পাইব, তাহাতে আমার খরচ চলিবে, এবং মহাজনের ঋণও শোধ করিতে পারিব। দেখুন, আমার হাত পা সবই আছে, তবে কেন আপনার গলগ্রহ হইয়া থাকিব? এত দিন কেমন করিয়া সংসার চলিল? আপনি কি আমার এ উপায় মন্দ বলেন?"

প্রতিবেশী রামকৃষ্ণদাস যদিও সেকেলে লোক, কিন্তু লেখাপড়ার কি ধার ধারেন! তিনি সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। তিনি বুঝিলেন, এ জগতে দুঃখিনীর মতন মেয়ে কমই জন্মে। তিনি বলিলেন—"মা! অন্য কেহ তোমার এ কথায় আপত্তি করিতে পারে; কিন্তু মা! মা-দুর্গার আশীর্ব্বাদে আমি বুড়া হইলেও, তোমাদের মত লেখাপড়া-জানা লোকের কথা কিছু কিছু বুঝি। আমি সম্মত আছি। আগামী কল্য হইতেই আমি গ্রামের ছেলেপিলেকে সমস্ত বুঝাইয়া দিব; তাহাদের প্রত্যেকের মাহিয়ানা স্থির করিয়া দিব; কিন্তু,

মা! একটী কথা তোমাকে রাখিতে হইবে। তুমি প্রতিদিন আমার এখানে আসিয়া আহার করিবে, আমার এখনে রাত্রিতে থাকিবে। তুমি বাটী বিক্রয় করিও না; তাহার যাহা কিছু করিতে হয়, মহাজনকে ডাকিয়া তোমার সম্মুখেই করা যাইবে। তোমার মত বুদ্ধিমতী মেয়ে যে গ্রামে আছে, সে গ্রাম ধন্য।"

দুঃখিনী এ কথা আর অস্বীকার করিতে পারিল না। পরদিনই রামকৃষ্ণ, গ্রামের বাটীতে বাটীতে এ সংবাদ দিলেন। সকলেই জানিত, দুঃখিনী বেশ লেখাপড়া জানে। কাজেই কেহ বড় বেশী আপত্তি করিল না; তবে দুই চারি জন লোক ঠাট্টা-তামাসা করিতে লাগিল। কিন্তু দুঃখিনী সে কথায় কর্ণপাত করিল না।

দশম পরিচ্ছেদ।

চারি পাঁচ দিনের মধ্যেই বৃদ্ধ রামকৃষ্ণের যত্নে প্রথমে পাড়ার ১০।১২টি বালক, দুঃখিনীর বাটীতে উপস্থিত হইতে লাগিল। দুঃখিনী বড়ঘরের বারান্দায় তাহাদিগকে পড়াইতে লাগিল। গ্রামের কত লোক আসিয়া দুঃখিনীর এই নূতন পাঠশালা দেখিতে আরম্ভ করিল। সকলেই তাহার পড়াইবার রীতি এবং তাহার সদ্ব্যবহার দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইতে লাগিল। পাড়ার যে লোক, একদিন দুঃখিনীর পাঠশালা দেখিতে আসিত, সেই তাহার পর দিন হইতে নিজের শিশুসন্তানটিকে পাঠশালায় পাঠইয়া দিত।

একদিন গ্রামের সেই মহাজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন অপরাহ্ণ। পাঠশালার ছুটী হইয়াছে; বালকসকল বাটী চলিয়া গিয়াছে। দুঃখিনী বারান্দা পরিষ্কার করিতেছেন। দুঃখিনী যদিও রামকৃষ্ণের বাটীতে বাস করিত, তবু প্রায় সমস্ত দিন বাটীতে থাকিত, এবং তাঁহাদের বাটী দেখিলে বোধ হইত, যেন মা লক্ষ্মীর আবাসস্থল। অপরিষ্কার থাকা দুঃখিনীর স্বভাবই নহে। মহাজনকে আসিতে দেখিয়াই দুঃখিনী প্রথমে বসিবার এক খানি সামান্য আসন দিয়া কাঁদিতে লাগিল। মহাজন লোকটী নিতান্ত মন্দ নহেন; দুঃখিনীর কান্না দেখিয়া তাঁহার মনে একটু দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন, দুঃখিনী! তোমার সমূহ বিপদ্; সে রসিক ছোঁড়া যদি থাকিত, তাহা হইলেও আশা ছিল। তা দেখ, আমি ন্যায্য টাকা পাইব, আমার টাকাগুলি দেওয়ার উপায় করা, তোমার অবশ্যই কর্ত্তব্য।

আমি এত দিন কিছুই বলি নাই; কিন্তু এখন তো টাকা না পাইলে, আর চলে না। আর, রসিক যে মানুষ—সে যদি কোন দিন এই ভদ্রাসন-খানিই বিক্রয় করিয়া ফেলে, তাহা হইলে আমার টাকা সমস্তই মারা যাইবে। তা তুমি আর বাড়ী ঘর লইয়া কি করিবে? একা মানুষ, পেটের ভাত এক রকম চলিয়া যাইবে। আর—তুমি যে দু'দশটী ছেলে পড়াও, তাহাতে যাহা পাইবে, তাহাতেই তোমার বেশ চলিবে। তোমার পিতার এই বাটীখানি বিক্রয় করিয়া লইলে আমার কেবল সিকি টাকা ওয়াশিল হইবে।

দুঃখিনী। আপনি যা বলিলেন, সে কথা ঠিক্; কিন্তু আমি একটী উপায় বলিতেছি। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে অপনার ঋণ শোধ করিব। রসিক ঋণ শোধ দিতে পারিবে, আমি পারিব না? আমি সামান্যরূপ লেখাপড়া শিখিয়াছি, আমি সেলায়ের কাজ জানি, আমি না হয় পরের বাড়ী দাসীর কাজ করিব, তাও স্বীকার; কিন্তু বাবার ঋণ আমি কিছুতেই থাকিতে দিব না। আমার জন্যেই বাবা এত টাকা ধার করিয়াছিলেন। আমি এ টাকা শোধ করিব। আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন। আমাকে সময় দিন, আমি ধীরে ধীরে আপনার সমস্ত টাকা শোধ করিব।

মহা কোথায় পাইবে?

দুঃ। কেন, আমার শরীর খাটাইয়া পয়সা রোজগার করিব?

মহা। তবে কি এখন তুমি ভদ্রলোকের মেয়ে লইয়া পরের বাড়ী চাকরীর কাজ করিবে?

দু'। তাতে দোষ কি? তবুও তো মনে বুঝিব, আমি পরের গলগ্রহ হই নাই। তবুও আমি আমার বাপের ঋণ শোধ করিতেছি, মনে করিব।

মহা। তায় কি হয়! এই তুমি ছেলে কয়টি পড়াইতেছ, তাহাতেই কত জন কথা বলিতেছে। কেহ কেহ তোমাকে পাগড়ী বাঁধিয়া কাছারীতে যাইতে বলিতেছে।

দুঃ। ও সব কথা শুনিয়া কি করিব? আপনি একটা কাজ করিবেন। এখন হইতে আমার নিকট আপনি আর সুদ পাইবেন না। আমি আপনার আসল টাকা শোধ করিতে পারি; কিন্তু মাসে মাসে সুদ দিতে হইলে পারিব না। এই ভিক্ষা আমি আপনার নিকট চাই।

মহা। তবে খৎ-খানিকে বদ্‌লাইয়া দিতে হয়।

দুঃ। দেখুন, আমি খৎ বুঝি না, আপনি যত টাকা পাইবেন, আমাকে আগামী কল্য বলিয়া যাইবেন, আমি শোধ করিব। খৎ দিয়া কি হইবে?

মহা। তবুও একটা লেখাপড়া করিতে হয়।

দুঃ। তা করুন, আমার আপত্তি নাই। তবে রামকৃষ্ণ কাকাকে একবার জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

মহা। মা! তুমি মাসে মাসে কত টাকা দিতে পারিবে? আর, কোথায়ই পাইবে? একটা কথা বলি। ধর্ম্মের দিকে যেন দৃষ্টি থাকে; তুমি ধর্ম্ম নষ্ট করিলে, টাকা পাইব না।

দুঃখিনী শিহরিয়া উঠিল, দুঃখিনীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। সে বলিল—আপনি তাহা মনে করিবেন না! ভগবান্ আমার সহায়।

মহা। তবুও বলিতে হয়। আমরা অনেক দেখিয়াছি, শুনিয়াছি। সংসারে তোমাদের নানা আপদ্।

দুঃ। আপনার আশীর্ব্বাদে সে ভয় করি না। আমি মাসে মাসে আপনাকে ১০ টাকা দিব; পরে আরও বেশী দিতে পারিব।

মহাজন, মনে মনে দুঃখিনীকে প্রশংসা করিতে করিতে, চলিয়া গেলেন। এদিকে বেলাও শেষ হইল। দুঃখিনী ভাবিতে লাগিলেন, মহাজনকে তো মাসে মাসে দশ টাকা দিব বলিলাম,—এখন এ টাকা কোথায় পাইব, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। দেখি, আমি কি কি কাজ করিতে পারি।"

ক্রমশঃ।

শ্রীজলধর সেন।

কৃত্রিম সুবর্ণ।

ইতিহাস-পাঠকের নিকট কৃত্রিম সুবর্ণের বিষয় নূতন নহে। কৃত্রিম সুবর্ণ প্রস্তুত করিতে গিয়া কেহ কেহ রাজরোষে পতিত ও প্রাণদণ্ড ভোগ করিয়াছেন। ইউরোপের ইতিহাসে এইরূপ কথা পাওয়া যায়। আমাদের ইতিহাস নাই, এইরূপ দণ্ডের কথা রূপকথায়ও প্রচলিত নাই, কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে অন্য ধাতু হইতে যে সুবর্ণ প্রস্তুত হইত অথবা সেই রঞ্জিত ধাতুকে যে সুবর্ণ বলা যাইত তাহার পরিচয় বহু গ্রন্থে আছে। এই গ্রন্থের মধ্যে অধিকাংশই অধুনা রসগ্রন্থ নামে পরিচিত। রসগ্রন্থের ব্যবহার দেশীয় বৈদ্যগণই (চিকিৎসক জাতি নহে) করিয়া থাকেন। এই রসগ্রন্থগুলি পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়, এক শ্রেণীর তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর গবেষণার ফলে রসশাস্ত্র এককালে বহু উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

আমরা এই অতীতের কথা ছাড়িয়া বর্ত্তমানে আসিলেও দেখিতে পাই ধাতুন্তরকে সুবর্ণে পরিণতির চেষ্টা এখনও চলিতেছে এবং অশিক্ষিতেরা "মন্ত্রশক্তির" উপর আস্থা স্থাপন করিয়া প্রবঞ্চিত হইতেছে। পক্ষান্তরে, শিক্ষিত সমাজও "বুজরুকি" বলিয়া এটাকে আর উড়াইয়া দিতে পারিতেছেন না। শিক্ষা ও সভ্যতার লীলাভূমি আমেরিকার কোন বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন—"স্বর্ণ ও রৌপ্য অভিন্ন ধাতু। উত্তাপের তারতম্যে এরূপ ঘটিয়া থাকে।" ইহার উপর কথাটী বলিবার "যো" নাই; সুতরাং দেখা যাইতেছে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, সভ্য ও অসভ্য সকলেই বিশ্বাস করেন যে, কৃত্রিম উপায়ে সুবর্ণ প্রস্তুত হইতে পারে।

কৃত্রিম স্বর্ণের বিষয়ে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে যাহা লিপিবদ্ধ আছে, তাহার কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া আজ পাঠকপাঠিকাগণকে উপহার দিতেছি। তবে একথা ঠিক যে হয়তঃ এই কৃত্রিম স্বর্ণের আশায় কেহ কেহ কিছু অর্থ ব্যয় করিবেন; কিন্তু কৃতকার্য্য যে হইবেন না তাহা নিশ্চিত। তবে প্রবঞ্চকের মধুরাশ্বাসে কেহ প্রতারিত না হয়েন, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আয়ুর্ব্বেদের পরিভাষায় একটা বচন আছে—

"সুবর্ণাভাবতো রৌপ্যং রৌপ্যাভাবে চ তীক্ষ্ণকং।"

পাঠক মহাশয়, গৃহিণীর অলঙ্কারের ব্যবস্থায় একথা প্রমাণ করিবার চেষ্টা দেখিবেন না। কোন ঔষধ প্রস্তুত করিতেই সুবর্ণের অভাব ঘটিলে তৎস্থলে তদ্‌গুণ বহুল রৌপ্য বা লৌহ ব্যবহার করিবে—এই ব্যবস্থা ধাতুর

ভস্মাবস্থায় হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এরূপ গুণ-সাদৃশ্য থাকিলেই যে এক জাতীয় দ্রব্য বলিতে হইবে, তাহা নহে। অভাবে দ্রব্য-গ্রহণের তালিকায় এরূপ ৫০।৬০টী দ্রব্যের প্রতিনিধির উল্লেখ আছে। * কিন্তু এরূপ স্থলেও কৃত্রিম স্বর্ণের উল্লেখ নাই।

প্রথমেই সুবর্ণের প্রকার ভেদের বিষয় লিপিবদ্ধ করিলাম—

প্রাকৃতং সহজং বহ্নিসম্ভূতং খনিসম্ভবং।
রসেন্দ্রবেধসঞ্জাতং স্বর্ণং পঞ্চবিধং স্মৃতম্ ॥ (রসরত্ন সমু)

স্বর্ণ পাঁচ প্রকার ; যথা ১। প্রাকৃত, ২। সহজ, ৩। বহ্নিজাত, ৪। খনিজ, ও ৫। রসেন্দ্র (পারদ) বেধজাত।

১। প্রাকৃত স্বর্ণ—ব্রহ্মাণ্ডের আবরক স্বর্ণ। (রসরত্ন সমু)

২। সহজ স্বর্ণ—ব্রহ্মার আবরক জরায়ু। (রসরত্ন সমু)

৩। বহ্নিজাত স্বর্ণ—শিবের সুদুঃসহ তেজ অগ্নি ধারণ করেন, সেই তেজ স্বর্ণরূপে পরিণত হয়। ইহাই মেরুরূপে আছে। (রসরত্ন সমু)

এই তিন প্রকার স্বর্ণ দিব্য।

৪। খনিজ স্বর্ণ—বিভিন্ন পর্ব্বতের খনি হইতে জাত স্বর্ণ। (রসরত্ন সমু)

৫। বেধজ স্বর্ণ—পারদবেধ জাত স্বর্ণ (ইহা কৃত্রিম), ইহা খনিজ স্বর্ণের তুল্য স্বর্ণ নহে। (রসরত্ন সমুচ্চয়)

রাজ নিঘণ্টুকারের মতে স্বর্ণ ত্রিবিধ যথা ;—

তত্রৈকং রসবেধজং তদপরং জাতং স্বয়ং ভূমিজং।
কিঞ্চান্যদ্দ্রবলোহসঙ্করভবং চেতি ত্রিধা কাঞ্চনং ॥

১। রসবেধজ। ২। ভূমিসঞ্জাত (খনিজ)। ৩। বহুধাতুযোগে প্রস্তুত।

এতন্মধ্যে গুণে রসবেধজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, খনিজ মধ্যম এবং মিলিত ধাতু-প্রস্তুত স্বর্ণ অধম।

এতন্মধ্যে বেধজ স্বর্ণের বর্ণ রক্তপীত, খনিজ স্বর্ণের বর্ণ রক্ত এবং বহু ধাতুযোগে কৃত স্বর্ণের বর্ণ গৌরাভ।

তদাদ্যং কিল রক্তপীতমপরং রক্তং ততোঽন্যদ্যথা,
গৌরাভং তদিতি ক্রমেণ গদিতং স্যাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বোত্তমম্ ॥

* এই স্থানে লিখিত আছে "মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ" মধুর অভাবে গুড় প্রদান করিবে। এটী আয়ুর্ব্বেদের ব্যবস্থা—গুণ-সাদৃশ্য অনুসারে। ধর্ম্মকার্য্যে এরূপ প্রতিনিধি চলিতে পারে কিনা তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন। রঘুনন্দন "তথাহি আয়ুর্ব্বেদে" বলিয়া এই ব্যবস্থা স্বীকার করিয়াছেন।—লেখক।

অকৃত্রিম বিশুদ্ধ স্বর্ণ পরীক্ষা ;—

"দাহেঽতিরক্তমথ যচ্চ সিতং ছিদায়াং
কাশ্মীর কান্তিশ্চ বিভাতি নিকাষ পট্টে।
স্নিগ্ধঞ্চ গৌরবমুপৈতি চ যত্তুলায়াং
জানীত দেবকনকং মৃদু রক্ত পীতম্ ॥" (রাজনি)

যে স্বর্ণ পোড়াইলে রক্তবর্ণ, কাটিলে শ্বেতবর্ণ এবং নিকষ প্রস্তরে ঘর্ষণ করিলে কুঙ্কুম বর্ণ হয়, যাহা স্নিগ্ধ, ওজনে অন্য ধাতু অপেক্ষা গুরু, মৃদু এবং রক্তপীত বর্ণ তাহা দিব্য স্বর্ণ।

পূর্ব্বে রসরত্ন সমুচ্চয়ের মতে যে পাঁচ প্রকার স্বর্ণের উল্লেখ করা হইয়াছে তন্মধ্যে বহ্নিজাত স্বর্ণ সম্বন্ধে পৌরাণিকদিগের সহিত একটু মতভেদ আছে। পৌরাণিকেরা বলেন—অগ্নি শিববীর্য্য ধারণে অসমর্থ হইয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। গঙ্গা তাহা পর্ব্বতে রক্ষা করেন। পর্ব্বতে উহাই স্বর্ণরূপে পরিণত হয়।

যে যাহা হউক, বর্ত্তমান সময়ে আমরা কেবল এক প্রকার স্বর্ণই দেখিতে পাই, ইহা খনিজ। বোধ হয় এইজন্য রাজনিঘণ্টুকারও স্বাভাবিক স্বর্ণকে এক প্রকারই বলিয়াছেন। তবে কৃত্রিম সুবর্ণ সম্বন্ধে দুইটী মত আছে। রসরত্ন সমুচ্চয়কারের মতে কেবল বেধজ স্বর্ণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, কিন্তু রসার্ণব ও রাজ নিঘণ্টুতে বেধজ ও নানা ধাতুযোগে প্রস্তুত স্বর্ণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই বেধজ ও নানা ধাতুযোগে স্বর্ণ কিরূপে প্রস্তুত হইত, তাহাই এক্ষণে আলোচনা করিতে হইবে।

রসরত্ন সমুচ্চয়ে বেধ-কর্ম্মাদির যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা গ্রন্থকারের পরীক্ষিত কিনা সন্দেহ। গ্রন্থকার বলিয়াছেন—এই অধ্যায় সোমদেবের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। অধ্যায়ের আরম্ভে—

"কথ্যতে সোমদেবেন মুগ্ধবৈদ্য প্রবুদ্ধয়ে।
পরিভাষা রসেন্দ্রস্য শাস্ত্রৈঃ সিদ্ধৈশ্চভাষিতা ॥"

অধ্যায়-শেষে—

"রস-নিগম মহাব্ধেঃ সোমদেবঃ সমস্তাৎ
স্ফুটতর পরিভাষা নাম রত্নানি হৃত্বা।"

আদি ও অন্ত এই উভয় স্থলেই সোমদেবের নাম দৃষ্ট হয়। সোমদেব কে, কোন্ সময়ের লোক, কোথায় নিবাস প্রভৃতির আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। তবে এখানে সোমদেবের নাম উল্লেখের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। রসরত্ন সমুচ্চয়কার এই মত কেবল সঙ্কলিত করিয়াছেন। পরীক্ষা করিয়াছিলেন কিনা, তাহার পরিচয় কিছুই পাওয়া যায় না। রসার্ণব-তন্ত্র রসরত্ন অপেক্ষা

প্রাচীন গ্রন্থ, তাহাতেও সুবর্ণ তিন প্রকার বেধজ, ধাতুমিলনজাত ও খনিজ বলিয়া লিখিত আছে। রসার্ণব তন্ত্রের বক্তা শিব, শ্রোত্রী পার্ব্বতী। রসার্ণবের মতও পরীক্ষিত কিনা, তাহার উল্লেখও কোথাও নাই।

এক্ষণে এ বিষয়ে প্রাচীন মতগুলি সংগ্রহ করিতেছি—

চন্দ্রানল দল।—তেন বা বদ্ধরসেন বান্যলোহেন বা সাধিতমন্তলোহম্।

সিতং চ পীতদ্রুপাগতং তদ্ দলং হি চন্দ্রানলয়োঃ প্রসিদ্ধং॥
আমাসকৃতবন্ধেন রসেন সহ যোজিতম্।
সাধিতং বান্যলোহেন সিতং পীতঞ্চ তদ্দলম্॥—

মারিত পারদ বা বদ্ধ পারদ কিম্বা অন্য ধাতু দ্বারা সাধিত শুভ্র ধাতু যদি পীতবর্ণ ধারণ করে, তবে তাহাকে চন্দ্রানল দল বলা যায়। চন্দ্রানল দল শব্দের চলিত শব্দ কিছু পাওয়া যায় নাই দল শব্দের আভিধানিক অর্থ—পত্র, শস্ত্রাচ্ছদ, অর্দ্ধ, খণ্ড। শব্দকল্পদ্রুমে সুবর্ণ লক্ষণে যে দল শব্দ আছে, তাহার অর্থে লিখিত আছে—দোষৎ ইতি ভাষা। উদাহরণ,—সিত ধাতু বঙ্গ ও তাম্রযোগে কাংস্য হয়। ভাল কাংস্যের বর্ণ কখন কখন ঈষৎ পীত দেখায়। বদ্ধ রসসাধিত বঙ্গ হইতে স্বর্ণবঙ্গ প্রস্তুত হয়। স্বর্ণবঙ্গের বর্ণ উজ্জ্বল স্বর্ণ সদৃশ হয়। উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ের অর্থ-সঙ্গতি অনুসারে ধাতুর বর্ণ পরিবর্ত্তনের উল্লেখ মাত্র স্বীকার করা যাইতেছে। এইরূপ বর্ণ-পরিবর্ত্তন হইলেই সর্ব্বত্র তাহাকে সুবর্ণ বলা হয় না।

পিঞ্জরী।—লোহং লোহান্তরে ক্ষিপ্তং ঘ্মাতং নির্ব্বাপিতং দ্রবে॥
পাণ্ডুপীতপ্রভংজাতং পিঞ্জরীতাভি ধীয়তে॥

একটী ধাতুতে অন্য ধাতু নিক্ষেপ করিয়া কোষ্ঠিযন্ত্রে ধমন করিয়া (কোষ্ঠিযন্ত্রহাপর, ধমন—কর্ম্মকারের জাঁতা দ্বারা বাতাস দেওয়া) কোনও দ্রব দ্রব্যে নিক্ষেপ করিলে যদি পাণ্ডুপীতপ্রভ হয়, তাহা হইলে তাহাকে পিঞ্জরী বলা যায়।

পিঞ্জর শব্দের আভিধানিক অর্থ হরিতাল (অমর)। পিঞ্জরী শব্দে স্বর্ণকে বুঝায়, ইহা রাজ নিঘণ্টুকারের মত। এখানে পিঞ্জরী শব্দটীকে একটী পারিভাষিক সংজ্ঞা বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ এইরূপ পাণ্ডুপীতপ্রভ দ্রব্যই কালক্রমে কৃত্রিম সুবর্ণে পরিণত হইয়াছিল এবং পিঞ্জরী শব্দটীও কালক্রমে সুবর্ণের পর্য্যায়রূপে পরিণত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

চুল্লকা*—পতঙ্গী কল্কতো জাতা লোহে তারত্বহেমতা।
দিনানি কতিচিৎ স্থিত্বা যাত্যসৌ চুল্লকা মতা॥

* পাঠান্তরে নাম বল্লিকা, কুল্লকা, খল্লিকা, ফুল্লিকা, উল্লক।

পতঙ্গী কল্ক দ্বারা ধাতুদ্রব্যের রৌপ্যত্ব ও স্বর্ণত্ব প্রাপ্তি ঘটে। ইহা কয়েক দিন থাকিয়া পরে নষ্ট হয়। ইহার নাম চুল্লক। পতঙ্গী রাগ প্রস্তুত বিধি—লৌহকে বহুকাল রঞ্জিত করিয়া রাখিলে বা বহুকাল ধমন করিলে, তাহা হইতে যে নির্য্যাস বাহির হয় তাহার নাম পতঙ্গী রাগ।

সুসিদ্ধ বীজ ধাত্বাদি জারণেন রসস্যাহি।
পীতাদি রাগ জননং রঞ্জনং পরিকীর্ত্তিতম্॥—রঞ্জন।

সুসিদ্ধ বীজধাতু প্রভৃতি দ্বারা জারণ করিলে পারদের পীতাদি বর্ণ উৎপন্ন হয়। ইহার নাম রঞ্জন। বীজ ধাতু সাধন-প্রণালী নির্ব্বাপণ বিশেষ দ্বারা (অর্থাৎ বাঁকনল দ্বারা সাধ্য ধাতুতে অন্য ধাতু নিঃক্ষেপের নাম নির্ব্বাপণ) যখন কোন ধাতু বিশেষের বর্ণ প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে বীজ বলা যায়। এই বীজ দ্বারা পারদের বর্ণ পরিবর্ত্তন হয়।

এ পর্য্যন্ত যে সমুদায় শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে কোথায় কোনও ধাতুর সুবর্ণত্ব-প্রাপ্তির কথা নাই। কেবল "চুল্লকা" লক্ষণে এইরূপ একটা কথা আছে; কিন্তু এই লক্ষণটীও মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, চুল্লকা দ্বারা কোন কোন ধাতুর বাহ্যিক বর্ণ কিয়ৎকালের জন্য পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। গিল্‌টি ভিন্ন ইহা আর অন্য কিছু নহে।

স্বর্ণবঙ্গ দেখিতে উজ্জ্বল সুবর্ণের মত। কোন কোন গ্রন্থে ইহাকে মৃগাঙ্ক বলা হইয়াছে। এই জিনিষটী দেখিতে সুবর্ণের মত হইলেও ওজন বা অন্যান্য ধর্ম্ম সুবর্ণের মত নহে। সুবর্ণে অগ্নিতাপ দিলে আরও উজ্জ্বল হয়, কিন্তু ইহাতে একটু অধিক তাপ লাগিলে—ইহা ক্রমে পাণ্ডু ও শ্বেত হইয়া শেষে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে।

মুদ্রাশঙ্ক নামক একটা জিনিষ আছে। ইহাও কৃত্রিম। ওজনে খুব গুরু, দেখিতে সোণারই মত, কিন্তু তাপ দিলে বর্ণান্তর ঘটে।

গরুড় পুরাণে একটী বচন পাওয়া যায়, তাহাতে সীসককে সুবর্ণে পরিণত করিবার বিধান আছে যথা—

* * * * সুবর্ণকরণং শৃণু।
পীতং ধুস্তূর পুষ্পঞ্চ সীসকঞ্চ পলদ্বয়ম্।
* পাঠা লাঙ্গল শাখা চ মূলমাবর্ত্তনাদ্ভবেৎ॥ শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত পাঠ।

বঙ্গবাসীর পাঠ—লাঙ্গলিকায়াঃ শাখাঞ্চ স্বর্ণকৃদহনাদ্ভবেৎ॥

অর্থাৎ সুবর্ণ করণ বিধান শ্রবণ কর। পল পরিমিত পীত ধুস্তূরপুষ্প একপল পরিমিত সীসক, একপল পাঠা (আকনাদি), একপল ঈশলাঙ্গলিয়ার শাখা তিন পল ঈশলাঙ্গলিয়ার মূল মিশাইয়া আবর্ত্তন করিলে স্বর্ণ হয়।

গরুড় পুরাণের ১৮৮ অধ্যায়টী চিকিৎসা-বিষয়ক, অথচ ইহার ২১।২২।২৩। ২৪ শ্লোকে ঐন্দ্রজালিক কথা, তামাকে রূপা করা, সীসককে সোণা করা, ভেকের নৃত্য ও গর্জ্জন এবং দৃষ্টি বিভ্রম জন্মান প্রভৃতি দৃষ্ট হয়।

পাঠকপাঠিকা সময় ও সুযোগের অভাবে এত সহজ বিধানেও স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে পারি নাই। সময় ও সুযোগ হইলেও পীত ধুস্তূর পাইবেন কি? কেহ যদি পরীক্ষা করেন, তবে জানাইবেন।

মাতৃকা-ভেদ তন্ত্রে দুই প্রকার স্বর্ণ প্রস্তুতের কথা আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

ঈশ্বর উবাচ—

(ক) গ্রানীয় পারদং দেবি, স্থাপয়েৎ প্রস্তরোপরি।
তস্যোপরি জপেন্মন্ত্রং সর্ব্ববন্ধময়াত্মকম্॥
সার্দ্ধ সহস্রং দেবেশি প্রজপেৎ সাধকাগ্রণীঃ।
স্বয়ম্ভূ পুষ্প সংযুক্তেবস্ত্রে চারুণ সন্নিভে॥
সংস্থাপ্য পারদং দেবি মৃৎপাত্র যুগলে শিবে।
পুষ্প যুক্তেন সূত্রেণ বদ্ধীয়াৎ বহু যত্নতঃ॥
মৃত্তিকয়া রজেনৈব বানস্য পরমেশ্বরি।
লেপয়েদ্ বহুযত্নেন রৌদ্রে শুষ্কানি কারয়েৎ॥
পুনশ্চ লেপয়েদ্ধীমান্ ততো বহ্নৌ বিনিঃক্ষিপেৎ।
অষ্টমী নবমী রাত্রৌ ক্ষিপেন্নৈব সুরেশ্বরি॥

(খ) অথবা পরমেশানি, মৃৎপাত্রে স্থাপয়েদ্রসম্।
বলীরসেন তদ্দ্রব্যং শোধরেদ্বহু যত্নতঃ॥
ঘৃতনারা রসেনৈব তথৈব শোধনং চরেৎ।
এবং কৃতে গুটিকাং যদি স্যাদ্দৃঢ় বন্ধনম্॥
ধুস্তূরঞ্চ সমানীয় মধ্যে শুল্বঞ্চ কারয়েৎ।
কৃষ্ণাখ্যা তুলসী যোগে তথা ঘৃতকুমারিকাঃ॥
এবং কৃতে বহ্নিযোগে ভস্মসাৎ জায়তে কিল।
ভস্মযোগে ভবেৎ স্বর্ণং ধনদায়াঃ প্রসাদতঃ॥
বিবর্ণং জায়তে দ্রব্যং যদি পূজাং ন চারয়েৎ।

মন্ত্রের সাধনা ব্যতীত এই স্বর্ণ প্রস্তুত হইতে পারে না; সুতরাং ইহার অক্ষরার্থ করা বৃথা। বিশেষতঃ অসিদ্ধ ব্যক্তির তন্ত্রার্থ গ্রহণ করা অনুচিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বর্ত্তমান রসশাস্ত্র এক শ্রেণীর তান্ত্রিকগণের যত্নে উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই শ্রেণীর তান্ত্রিকেরা এই রসায়ন শাস্ত্রের বলে নানাবিধ ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া দেখাইয়া লোক মুগ্ধ করিত। আমার বোধ হয়, এই সুবর্ণ প্রস্তুত করাও প্রথমে ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়ারই অন্তর্ভুক্ত ছিল; পরে কালক্রমে তাহা রসগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে এবং তদধস্তন কালে চিকিৎসা গ্রন্থ হইতে একেবারে তাহা লুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে বেধ-কর্ম্ম বিষয়ে ২।৪টী কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। *

১। "শিলাচতুষ্কং গন্ধেশৌ কাচ কূপ্যাং সুবর্ণ কৃৎ।"
২। "শিলয়ানিহতো নাগো বঙ্গং বা তালকেন শুদ্ধেন
ক্রমশঃ পীতে শুক্লে ক্রমশঃ মেতৎ সমৃদ্দিষ্টং।"

রসেন্দ্র চিন্তমণিতে মুখ্যভাবে এইকথা দুইটী আছে। (১) চারিভাগ মনঃশিলা, ১ ভাগ পারদ, ১ ভাগ গন্ধক কাচকূপীতে পাক করিলে সুবর্ণ কর হইয়া থাকে। (২) মনঃশিলাদ্বারা ভস্মীকৃত সীসক ও বিশুদ্ধ হরিতাল দ্বারা মারিত বঙ্গ যোগে পারদে পীতত্ব ও শুক্লত্ব সংক্রমণ হয়।

গ্রন্থকার এইস্থানে বলিয়াছেন;—"ইত্যাদীনি কর্ম্মাণি পুনঃ কেবলমীশ্বরৈকানুগ্রহসাধ্যত্বাৎ ন প্রপঞ্চিতানি" এই সমুদায় কর্ম্ম ঈশ্বরানুগ্রহ সাধ্য, এইজন্য এস্থলে আর অধিক বলা হইল না। ভালই হইয়াছে। কাহারও যদি ঈশ্বরানুগ্রহ থাকে চেষ্টা করিতে পারেন; কিন্তু কিরূপ সাধক হইলে ঈশ্বরানুগ্রহ হয় তাহা রসরত্ন সমুচ্চয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ে পাঠ করিবেন।

রসরত্ন সমুচ্চয়ের মতে বেধ কর্ম্ম পাঁচ প্রকার, যথা—লেপ, ক্ষেপ, কুন্ত, ধূম ও শব্দ বেধ।

১। লেপবেধ=লেপ দ্বারা ধাতুর স্বর্ণত্ব ও রৌপ্যত্ব প্রাপ্তি হয়। যথা—
"লেপেন কুরুতে লোহং স্বর্ণং বা রজতং তথা।"

২। ক্ষেপবেধ=দ্রুত (গলিত) ধাতুতে কোন দ্রব্য প্রক্ষেপ দ্বারা স্বর্ণত্বাদি জননের নাম ক্ষেপবেধ, যথা—
"প্রক্ষেপনং দ্রুতে লোহে বেধঃ স্যাৎ ক্ষেপসংজ্ঞকঃ।"

* বেধ-কর্ম্ম প্রস্তাবটি বড় জটিল। ইহা সরল ভাবে প্রকাশ করিবার কল্পনা রহিল এবং কৃত্রিম সুবর্ণ প্রস্তুত বিষয়ে নূতন যে সমুদায় তথ্যের সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাও বিস্তারিত বর্ণনা করিব।—লেখক

৩। কুন্তবেধ=সন্দংশ যন্ত্রধৃত পারদ দ্বারা গলিত ধাতু গ্রহণ ও সুবর্ণত্ব জননের নাম কুন্তবেধ।

"সন্দংশ ধৃত সূতেন দ্রুত দ্রব্যাহুতিশ্চয়া।
সুবর্ণত্বাদি করণং কুন্তবেধঃ স উচ্যতে॥"

৪। ধূমবেধ=অগ্নিতে রস নিঃক্ষেপ করিলে তাহা ধূমাকারে উত্থিত হইতে থাকে এবং তদ্বারা স্বর্ণত্ব জননের নাম ধূমবেধ।

"বহ্নৌ ধূমায়মানেঽস্মিন্ প্রক্ষিপ্তরস ধূমতঃ।
স্বর্ণাদ্যাপদনং লোহে ধূমবেধ স ঈরিতঃ॥

৫। শব্দবেধ=মুখে পারদ রাখিয়া ফুঁ দিলে অল্প পরিমিত ধাতুকে যে স্বর্ণ বা রৌপ্যে পরিণত করা যায়, ইহার নাম শব্দবেধ।

"মুখস্থিতরসেনাল্পলোহস্য ধমনাৎ খলু।
স্বর্ণরূপ্যত্ব জননং শব্দবেধঃ সকীর্ত্তিতঃ॥"

রসরত্ন সমুচ্চয়ে এই পাঁচ প্রকার বেধবিধি স্বীকৃত হইয়াছে সত্য; কিন্তু কিরূপ বিধানে এবং কিরূপ দ্রব্যসম্ভারে এই কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে তাহা লিখিত হয় নাই।

এখনও সন্ন্যাসী-বেশধারী কতকগুলি প্রবঞ্চক এই বেধকর্ম্ম দেখাইয়া লোককে প্রবঞ্চিত করে। ফুঁ দিয়া, আগুণে ফেলিয়া বা কোনরূপ পূজা পাঠ করিয়া স্বর্ণ প্রস্তুত অনেকে দেখিয়াছেন, অনেকে শুনিয়াছেন কিন্তু পরিণামে প্রবঞ্চনা ধরা পড়িয়াছে।

যাহা হউক—কোনকালে এইরূপ স্বর্ণ প্রস্তুত হইত কিনা জানি না; কিন্তু এখন প্রস্তুত হইতে পারে না। যেহেতু আমাদের প্রতি ঈশ্বরানুগ্রহের অত্যন্তাভাব। তবে তিনি যাহা করেন, তাহা মঙ্গলের নিমিত্ত। ইহা মনে রাখিয়া কেহ আর প্রবঞ্চকের মধুরাশ্বাসে মুগ্ধ হইবেন না। পক্ষান্তরে কৃত্রিম সুবর্ণ করিবার চেষ্টা সুবর্ণ প্রসব না করিতে পারিলেও যে তাহা হইতে নানা সুফল লাভ হইয়াছে, তাহা ইতিহাস-পাঠকের অবিজ্ঞাত নহে। এইরূপ চেষ্টাই বর্ত্তমান রসায়ন-শাস্ত্রের উন্নতির অন্যতম কারণ।

শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন।

শাখীনামা।

৩১শ শাখী।

একদিন একটি রমণীকে 'ঝাঁট' দিতে দেখিয়া গুরু তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সে উত্তর করিল যে, সে একাদশী। তাহার সম্মানার্থ হিন্দু বৈষ্ণবেরা ঠিক নিয়মিত রূপে একটি উপবাসোৎসব করে। গুরু বলিলেন—"আমরা এক অদৃশ্য পরমেশ্বরে বিশ্বাস করি। তজ্জন্য এই উপবাস পালনের বিধি পালন করিতে পারি না; কিন্তু ইহার পালনে নিষেধও করিব না। প্রতি বৎসর নির্জ্জলা উপবাসের দিনে এই স্থানে একটি প্রকাণ্ড হাট বসিবে ও বহু লোকে এই উপবাস পালন করিবে।"

৩২শ শাখী।

দেওয়ালী উৎসব ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হওয়ায় বহুসংখ্যক শিখ ও সাধু পুরুষ এইস্থানে আসিতে লাগিলেন। কড়াহ্ প্রসাদ ও অন্যান্য খাদ্য-দ্রব্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া সকলকে বিলান হইল। গুরু বলিলেন—"বহুসংখ্যক শিখ সকল স্থান হইতেই বাঞ্জর প্রদেশস্থ এই মন্দিরে সমবেত হইবে। কিন্তু এই প্রদেশের অতি অল্প লোকেই শিখধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে। এই উপলক্ষে এইস্থানে প্রতি বৎসর একটি প্রকাণ্ড হাট বসিবে। দামামা বাজান হইবে, পবিত্র 'গ্রন্থ সাহেব' পঠিত হইবে, পূত মন্ত্রচয় গীত হইবে, ধ্বজা উড্ডীয়মান হইবে, সুশৃঙ্খলায় অশ্ব ও হস্তী চালান হইবে, ঘোষণা দ্বারা একত্রিত করিয়া দরিদ্রদিগকে আহার্য্য বিতরণ করা হইবে।"

শিখেরা বলিল—"হে দরিদ্রের রক্ষক! গুরুর ভবিষ্যৎ কাশী জঙ্গলদেশ * ও বাঞ্জরদেশ আমরা দেখিয়াছি। যেখানে কৈরাণ (কৌরব?) ও পাণ্ডনদের (পাণ্ডব?) মধ্যে ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল, আমরা সেই কুলযৈত্র ক্ষেত্র (কুরুক্ষেত্র?) দেখিতে বাসনা করি।" গুরু উত্তর করিলেন, "আগামী পৌর্ণমাসীতে বাবা নানকের সাম্বৎসরিক উৎসব করিবার জন্য তিনি আর এক পক্ষকাল তথায় থাকিয়া পরে যাত্রা করিবেন।"

উৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ও সাধুদের আহার্য্য প্রস্তুতের জন্য গুরু তাঁহার তাঁবুর সন্নিকটে কতকগুলি উনুন প্রস্তুত করিতে বলিলেন। কি কি খাদ্য করা যায়, গুরু তাহা মিশ্র তাজী মলকে জিজ্ঞাসা করিলে, মিশ্র—'ক্ষীর' (অর্থাৎ চিনি, দুগ্ধ ও চাউল মিশ্রিত করিয়া একরূপ খিচুড়ি) করিবার কথা বলিলেন;

* ২৯শ শাখী দ্রষ্টব্য।

তিনি আরও বলিলেন "কড়াহ্ প্রসাদ বাবা নানকের প্রিয় খাদ্য ছিল।" গুরু উভয়ই প্রস্তুতের আদেশ করিয়া বলিলেন—"(পূর্ব্বে) এখানে মহারাজ রামচন্দ্রজী একটি বৃহৎ 'যাগ' করিয়াছিলেন, আর ইহা বাবা নানকের সাম্বৎসরিক উৎসব সুতরাং উভয়বিধ খাদ্য প্রস্তুত করাই যুক্তিসঙ্গত।"

এতদুপলক্ষে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ সংগৃহীত হইল ও চব্বিশ ঘণ্টা ধরিয়া ক্ষীর, কড়াহ্ প্রসাদ, পুরি (লুচি) ও কচুড়ি প্রস্তুত করা হইতে লাগিল। পরদিন প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ ও সাধুরা আসিয়া পংক্তিবদ্ধ হইয়া উপবেশন করিয়া আহার করিলেন। বাস্তবিক সেদিন যে কেহ আসিয়াছিল, সেই অভ্যর্থিত হইয়াছিল। বাবা নানকের সাম্বৎসরিক উৎসবের 'যাগ' এইরূপে সম্পন্ন হইল। এই বৃহৎ ভোজ উপলক্ষ করিয়া আজও তথায় সকলে গুরুর নাম স্মরণ করে।

৩৩শ শাখী !

গুরু সাধারণের ব্যবহারার্থ একটি কূপ খনন করিবার জন্য ও দীর্ঘিকা পরিষ্কার করিবার জন্য মসন্দ দুগ্‌গুকে কতকগুলি স্বর্ণমোহর প্রদান করিলেন। দুগ্‌গু এই গ্রামের জমীদার, কাজেই সেই এ কার্য্যের উপযুক্ত লোক। গুরু তাহাকে এ কার্য্য সাধুভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য বলিয়া দিলেন, আরও সাবধান করিয়া দিলেন যে, এই টাকা সাধারণকে দান করিবার উদ্দেশ্যেই গৃহীত হয়, কাজেই এ অর্থের কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করিলেই তাহার অধঃপতন অনিবার্য্য, আর এরূপ অসদ্ব্যবহার দ্বারা অনেক বড় লোকের অধঃপতন ঘটিয়াছে। দুগ্‌গু কিন্তু সাধুভাবে কার্য্য করিল না। গুরু যে স্থানে কূপ খনন করিতে বলিয়াছিলেন, সে তাহা সে স্থানে খনন না করিয়া আপনার গৃহেই খনন করাইল। কূপটি কিন্তু একেবারে বুজিয়া গেল, তাহার নিজের যে একটি কূপ ছিল, তাহাও সেই সঙ্গে ঐরূপে নষ্ট হইল। আঠার জন লোক লইয়া দুগ্‌গুর পরিবার। সে বৃহৎ পরিবারও অল্পকাল মধ্যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। তাহার ঔর্দ্ধদেহিক সৎকার করিবে, বংশে তাহার এমন একটিও লোক রহিল না। তাহার উন্মুনে ইক্ষু বৃক্ষ জন্মিল। সে সর্ব্বপ্রকারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। (এই সব দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া, যন্ত্রণায় দগ্ধ হইয়া) দুগ্‌গু অনতি বিলম্বে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ভাই ফৈরুর জনৈক শিষ্য ভাই তহলদাস তাহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইল।

৩৪শ শাখী।

অতঃপর গুরু খানোবাড়ী গ্রামের সন্নিকটে মার্কণ্ড, সরস্বতী, ঘাগ্‌গর নদী-ত্রয়ের সঙ্গম স্থলে তাঁবু খাটাইলেন। এই গ্রামটি এখন বৃটিশদের রাজ্যান্ত-র্গত। মাতঙ্গ ঋষি প্রাচীন কালের সাধু। তিনি এখানে তপস্যা করিয়া-ছিলেন। ইহা ত্রিবেণী বলিয়াও পূজিত। এখন ইহাকে সঙ্গম বলে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধর্ম্ম-বিক্রয়।

১

নির্ম্মল-সলিলা, কলনাদিনী সরস্বতী বহিয়া যাইতেছে। তীরে শ্যামল বিটপীশ্রেণী দ্বিপ্রহরের রৌদ্রতপ্ত পক্ষীকুলকে আশ্রয়প্রদান করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চতুর্দ্দিক নীরব, নিস্পন্দ, কচ্চিৎ কোনও বৃক্ষের পত্রান্তরাল হইতে দোয়েলা ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছে। এমন সময় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ স্নান সমাপন করিয়া সরস্বতীর উত্তপ্ত বালুকাময় তটভূমি পার হইয়া গৃহে ফিরিতেছিল।

ব্রাহ্মণের নাম সত্যানন্দ। সত্যানন্দের গৃহিণী এবং একটি সপ্তমবর্ষীয়া কন্যা ব্যতীত সংসারে আর কেহই ছিল না। ব্রাহ্মণ-দম্পতী পল্লী-প্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে বাস করিত। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া ভিক্ষার্থে পল্লীমধ্যে প্রবেশ করিত এবং দুই এক ঘণ্টা ভ্রমণ করিয়া যাহা কিছু সংগ্রহ করিত; তদ্দারা কোনওরূপে ক্ষুদ্র পরিবারের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিত।

অদ্য সত্যানন্দ প্রখর রৌদ্র সহ্য করিয়া বেশীদূর ভ্রমণ করিতে পারে নাই। সামান্য ভ্রমণেই যৎকিঞ্চিৎ চাউল সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল, তাহাই লইয়া গৃহে ফিরিল এবং গৃহিণীকে শীঘ্র শীঘ্র রন্ধন করিতে বলিয়া পুণ্যতোয়া সরস্বতীতে স্নানার্থ গমন করিল।

স্নান সমাপনান্তে গৃহে ফিরিয়া সত্যানন্দ দেখিল, একজন অতিথি তাহাদের কুটীরদ্বারে উপস্থিত। সত্যানন্দকে দেখিবা মাত্র অতিথি ক্ষীণস্বরে বলিয়া উঠিল, "বাবা, তিনদিন কিছু খাই নাই, আমায় দুটো খেতে দাও।"

উদারহৃদয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সত্যানন্দ অতিথিকে বসিতে বলিয়া তাড়াতাড়ি কুটীর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাত হয়েছে কি?"

গৃহিণী ব্রাহ্মণকে উৎকণ্ঠিত দেখিয়া বলিল, "এই হলো। আজি যে বড় তাড়াতাড়ি দেখিতেছি।" সত্যানন্দ বলিল, "তাড়াতাড়ি আমার জন্য নয়। দ্বারে একজন অতিথি উপস্থিত, দুটো খাইতে চায়।" গৃহিণী সানন্দে বলিয়া উঠিল, "তাঁহাকে ভিতরে লইয়া আইস, আজি আমাদের বড় শুভদিন।"

সত্যানন্দ একখানি শুষ্কবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পরিত্যক্ত বসনখানি একটি বৃক্ষকাণ্ডে মেলিয়া দিল। পরে বহির্দ্বার হইতে অতিথিকে কুটীর মধ্যে লইয়া আসিয়া বসিতে আসন প্রদান করিল।

সত্যানন্দের গৃহিণী অন্নপূর্ণা সানন্দ চিত্তে সেই দ্বিপ্রহরের রৌদ্র-প্রপীড়িত উপবাস-কাতর ক্ষুধার্ত্ত অতিথিকে যথাসাধ্য ভোজন করাইল। অতিথি আহারান্তে দুই হাত তুলিয়া ব্রাহ্মণকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

২

এমন করিয়া ভিক্ষার অন্নে কতদিন চলে? প্রতিদিন ভিক্ষাই বা কে দেয়? ব্রাহ্মণ যেদিন ভিক্ষা পাইত, সেইদিন স্ত্রীকন্যার উদরান্নের সংস্থান হইত, যেদিন ভিক্ষা পাইত না বা ভিক্ষায় বাহির হইতে পারিত না, সেইদিন অনশন।

ক্রমে এই অনশনই বাড়িতে লাগিল, ব্রাহ্মণ চারিদিকে অন্ধকার দেখিল। বালিকা কন্যা যখন ক্ষুধার জ্বালায় ক্রন্দন করিত, ব্রাহ্মণ তখন উন্মত্তের ন্যায় অস্থির হইত।

এমন সময় একদিন ব্রাহ্মণ শুনিল যে, সেই দেশের রাজা এই ঘোষণা করিয়াছেন যে, যিনি নিজের ধর্ম্ম বিক্রয় করিবেন, তিনি সেই বিক্রীত ধর্ম্মের সমপরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা লাভ করিবেন।

সত্যানন্দ সেদিন গৃহে আসিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিল "একটা কথা শুনিয়াছ? আজি এক নূতন সংবাদ শুনিয়া আসিলাম।" অন্নপূর্ণা বিষণ্ণভাবে উত্তর করিল, "এমন কি কথা?" সত্যানন্দ বলিল, "আমাদের মহারাজা আজি গ্রামে গ্রামে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি ধর্ম্ম বিক্রয়েচ্ছু ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে ধর্ম্ম ক্রয় করিবেন। যিনি যে পরিমাণ ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা একটি বিল্বপত্রে লিখিয়া লইয়া যাইবেন; মহারাজা তাহার সমপরিমাণ স্বর্ণদান করিবেন।"

এই কথা শুনিয়া অন্নপূর্ণা প্রফুল্লস্বরে বলিল, "তাহা হইলে তুমি যাও না

কেন? আমাদের যে ধর্ম্মটুকু আছে, তাহা বিক্রয় করিয়া এস গে, যা সামান্য অর্থ পাওয়া যাবে তাহাতে ত কিছুদিন চলিবে।" সত্যানন্দ হাসিয়া বলিল, "আমাদের আবার ধর্ম্ম কোথায়, যে বিক্রয় করিতে যাইব!" অন্নপূর্ণা বলিল, "কেন, দুইমাস হইল একদিন একজন অতিথির সেবা করিয়াছিলাম, সেই ধর্ম্মটুকু বিক্রয় করিব।" সত্যানন্দ বলিল, "কোথায় কবে একদিন অতিথিসেবা করিয়াছিলে, তাহা কি গণনার মধ্যে, আর তাহাতে কিই বা হইয়াছে? উহার জন্য হয়ত কিছুই মিলিবে না?"

অন্নপূর্ণা সে কথা শুনিল না, বলিল—"যা পাওয়া যায়, তাই ভাল। তুমি যাও।"

অগত্যা সত্যানন্দ স্বীকৃত হইল এবং আহারাদি সমাপনান্তে "শ্রীদুর্গা" জপিতে জপিতে যাত্রা করিল।

৩

বেলা একটার সময় সত্যানন্দ রাজভবনে উপস্থিত হইল। দেখিল চারিদিকে মহা সমারোহ। অতি বিস্তীর্ণ সভামণ্ডপে শ্বেত প্রস্তরের বেদীর উপর রত্নসিংহাসনে মহারাজ বিরাজ করিতেছেন। শিরোপরি বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত, সুরঞ্জিত ঝালর-মণ্ডিত চন্দ্রাতপ শোভা পাইতেছে। একদিকে পৃথগাসনে শুভ্রবস্ত্র পরিহিত জনৈক কর্ম্মচারী মানদণ্ড ধারণ করতঃ উপস্থিত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর ধর্ম্ম ওজন করিয়া লইতেছেন এবং তৎপরিমাণ স্বর্ণখণ্ড দান করিতেছেন। উন্মুক্ত, শাণিত কৃপাণধারী প্রতিহারীগণ চারিধারে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

সত্যানন্দ দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল—কত ব্রাহ্মণ তাঁহাদের উপার্জ্জিত ধর্ম্ম বিক্রয় করিয়া গেলেন; কতজন বিক্রয়াশায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। কেহ বা অন্নসত্র প্রদান করিয়াছিলেন, এখন কালের করাল স্রোত-প্রবাহে পথের ভিখারী হইয়াছেন, তাই আজি অর্থলালসায় দীনবেশে সেই ধর্ম্মটুকু বিক্রয় করিতে আসিয়াছেন। কেহ বা পান্থনিবাস স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই ধর্ম্ম বিক্রয় করিতে আসিয়াছেন।

সমস্ত ঘটনা দর্শন করিয়া, সত্যানন্দ বিস্ময়াপন্ন হইল। তাহার সামান্য ধর্ম্ম লইয়া সে আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। নীরবে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল।

কয়েক ঘণ্টা অতীত হইল। উপস্থিত ব্রাহ্মণমণ্ডলী প্রায় সকলেই স্ব স্ব প্রাপ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া গমন করিল। তখন সত্যানন্দ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া

স্বীয় ধর্ম্ম-লিখিত বিল্বপত্রখানি সঙ্কুচিতভাবে কর্ম্মচারীর হস্তে প্রদান করিল।

একজন সামান্য অতিথি-সেবার ধর্ম্ম বিক্রয় করিতে আসিয়াছে দেখিয়া, কর্ম্মচারী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত বিল্বপত্রটি মানদণ্ডে স্থাপন করিল। প্রথমে সামান্য একখণ্ড স্বর্ণ প্রদান করিল; কিন্তু বিল্বপত্র উঠিল না। পুনরায় আর একখণ্ড স্বর্ণ প্রদান করিল, তবুও বিল্বপত্র উঠিল না। কর্ম্মচারী আশ্চর্য্য বোধ করিল। তখন সে একে একে অনেক স্বর্ণখণ্ড প্রদান করিল; কিন্তু বিল্বপত্র সমভাবেই রহিল। সভাস্থ জনমণ্ডলী বিস্ময়াভিভূত!

মহারাজা বিস্মিত হইলেন, ভাবিলেন, এত ধর্ম্ম ক্রয় করিলাম, আর এক জনের অতিথিসেবার ধর্ম্ম ক্রয় করিতে পারিব না। তিনি কোষাধ্যক্ষকে আদেশ করিলেন, "আমার ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত কর। যত স্বর্ণ আছে, আনয়ন করিয়া মানদণ্ডে স্থাপিত কর।"

রাজাজ্ঞা তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল; তবুও বিল্বপত্র উঠিল না। মহারাজ অধীর হইলেন। আসন হইতে নামিয়া বলিলেন, "আমার অন্তঃপুর মধ্যে যত স্বর্ণালঙ্কার আছে, আনয়ন কর।"

তদ্দণ্ডে অন্তঃপুর হইতে সমস্ত অলঙ্কার আনীত হইল; কিন্তু বিল্বপত্রের সমপরিমাণ স্বর্ণ হইল না। বিল্বপত্র ঊর্দ্ধে উঠিল না।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সত্যানন্দ তখন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,"মহারাজ! আমি ধর্ম্ম বিক্রয় করিব না। আমার বিল্বপত্র ফিরাইয়া দিউন।" তাহার নয়নদ্বয় হইতে দরদরধারে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছিল।

মহারাজ বিস্ময়াপ্লুত নয়নে কিয়ৎক্ষণ সত্যানন্দের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন; তৎপরে কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়া বাষ্পগদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, আপনি ধন্য! আপনার তুল্য ধার্ম্মিক আর কেহ নাই।"

সত্যানন্দ নীরব নিস্পন্দ। তাহার কর্ণে কে যেন বলিতেছিল—

গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ॥

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ তালুকদার।

নূতন।

হে নূতন, হে নিত্য-সুন্দর;
কহ মোরে, কোথা তব পূর্ণতার দেশ?
কোন দূর ভবিষ্যৎ পারে,
এ ক্রম-বিকাশ তব হ'য়ে যাবে শেষ।
পুরাতন যাহা আছে ভবে,
ভাল ত লাগে না তার একটানা গান;
দিন যত দূরে চলে যায়,
এ ধরার নূতনত্ব চাহে কিছু প্রাণ।
মরণের তীরে আসি জীব
দেখে যায়, মরিয়াও ফুরায় না খেলা;
আবার সুদীর্ঘ কর্ম্মপথ—
আবার নূতন করে বেড়ে যায় বেলা।
পুরাতন হয়ে যায় সব,
আবার নূতন যেন থাকে কিছু বাকী;
প্রাণে পুন নূতন উৎসব,
মরিয়া জাগিছে জীব নূতনত্ব মাখি।
শীতান্তে, নূতন শাখা 'পরে
আবার নূতন করে বাসা বাঁধে পাখী;
বসন্তে ফিরিয়া আসে পুন
বর্ষের নূতন গান—কুহু কুহু ডাকি'।

শ্রীঅকিঞ্চন দাস।

ব্রাহ্মণ চাঁদরায়।

গত ১৩১৪ সালের ফাল্গুন মাসের "জাহ্নবী"তে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় "বিক্রমপুরে চাঁদরায় ও কেদার রায়ের কীর্ত্তি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই সুন্দর প্রবন্ধটির মধ্যে একস্থানে যোগেন্দ্র বাবু একটি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এই ভ্রমের জন্য আমরা কেবল যোগেন্দ্র বাবুকেই দায়ী করিতে চাহি না; বাঙ্গালার গৌরব "বিশ্বকোষ" নামক মূল্যবান গ্রন্থে, সম্পাদক মাননীয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া

ঐরূপ ভ্রমপূর্ণ মতই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যোগেন্দ্র বাবুর ভ্রম, বিশ্বকোষের ভ্রমেরই প্রতিচ্ছায়া মাত্র; সুতরাং আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে যোগেন্দ্র বাবুর কথার উত্তরে কিছু না বলিয়া, "বিশ্বকোষ"-সম্পাদক মহাশয় যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুর থানার অধীন বাগাঁচড়া নামক একখানি প্রাচীন গণ্ডগ্রামের মধ্যস্থলে "চাঁদরায়ের ভিটা" বলিয়া প্রায় ২৫।৩০ বিঘা জমি বর্ত্তমান সময়ে জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। এই জঙ্গল রাশি রাশি ইষ্টকস্তূপের উপর বিদ্যমান থাকিয়া বাগাঁচড়া গ্রামটিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে এবং ব্যাঘ্র, বন্যবরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণের আবাসভূমিরূপে পরিণত হইয়াছে। স্থানীয় লোকে এই বৃহৎ বাটীর যেরূপ স্থান নির্দ্দেশ করে, তাহাতে বোধ হয় পূর্ব্বাংশ অন্তঃপুর, পশ্চিমাংশ পূজার বাটী এবং দক্ষিণাংশ দপ্তরখানা ইত্যাদিতে পূর্ণ ছিল। অন্তঃপুর ও পূজার বাটীর ঠিক মধ্যস্থলে চারিটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত থাকার চিহ্ন অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমের মন্দির তিনটি পড়িয়া গিয়াছে, তথাপি দেওয়ালের কিছু কিছু এখনও বর্ত্তমান। উত্তর দিকের মন্দিরটির চূড়া পড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু দেওয়াল চারিখানি অদ্যাপি দণ্ডায়মান থাকিয়া চাঁদরায়ের নাম রক্ষা করিতেছে। মন্দিরের উপর এক বৃহৎ বটবৃক্ষ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান আছে এবং অসংখ্য মূল বেষ্টন করিয়া মন্দিরের ভিত্তিচতুষ্টয় দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। দেখিলে বোধ হয়, একখানি ইষ্টকও আর স্থানচ্যুত হইতে দিবে না। যেন ভগবানের আশীর্ব্বাদ চাঁদরায়ের কীর্ত্তির শেষ চিহ্ন মন্দিরটিকে বুকে করিয়া বসিয়া আছে। মন্দিরটির সম্মুখভিত্তি ইষ্টকে খোদিত নানারূপ দেবদেবী, রথ, ফুল, ফল, জীব-জন্তুর চিত্রে সুশোভিত। এই মন্দিরেরই পূর্ব্বদ্বারে "শাকে বারমতঙ্গবাণ" ইত্যাদি শ্লোকটি লিখিত আছে। শ্লোকের শেষে "চাঁদরায়ো দদৌ" লিখিত থাকায় এবং লোকে ইহাকে চাঁদরায়ের বাটী বলিয়া পরিচয় দেওয়ায়, ইহা যে কোন একজন চাঁদরায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত তাহা বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু সে চাঁদরায় কে?

"বিশ্বকোষ"—সম্পাদক মহাশয় অনুমান করেন, এই মন্দির প্রতিষ্ঠাতা চাঁদরায় বঙ্গের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিখ্যাত বারভুঁইয়ার একজন। ইনি বিক্রম-পুর অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। শ্রীপুর ইঁহার রাজধানী ছিল। বিক্রমপুরের এই বিখ্যাত চাঁদরায়ের পরিচয় সম্বন্ধে "বিশ্বকোষে" লিখিত হইয়াছে যে,

"আকবর বাদসাহের রাজত্বের দেড়শত বর্ষ পূর্ব্বে নিম রায় নামে এক ব্যক্তি কর্ণাট হইতে আসিয়া বিক্রমপুরের অন্তর্গত আরা ফুলবাড়িয়া নামক গ্রামে বাস করেন। এখানকার বঙ্গাধিপের আদেশে তিনিই বংশানুক্রমে ভূঁইয়া উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি জাতিতে দেব উপাধিধারী কায়স্থ ছিলেন।"

বাগাঁচড়ার চাঁদরায় সম্বন্ধে এ প্রদেশে যে সকল প্রবাদ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বিশ্বকোষে নিম্নলিখিত দুইটি আলোচিত হইয়াছে। ১ম—অন্নদা-মঙ্গলের "প্রিয় জ্ঞাতি জগন্নাথ রায় চাঁদরায়" এই শ্লোকার্দ্ধের উপর নির্ভর করিয়া অনেকে বলেন, বাগাঁচড়ার চাঁদরায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জ্ঞাতি ছিলেন। ২য়—নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মশাসন গ্রামের কেহ কেহ বলেন, এই চাঁদরায় নদীয়ার রাজা রুদ্ররামের দেওয়ান ছিলেন। রুদ্ররামের ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মশাসন গ্রাম এই চাঁদরায় কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। এই প্রবাদ দুইটি সম্বন্ধে বিশ্বকোষে লিখিত হইয়াছে যে, "প্রথমটি নিতান্ত অমূলক। কারণ ১৫৮৭ শকের চাঁদরায় কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক হওয়া সম্ভবপর নহে। দ্বিতীয়টি কতদূর সত্য তৎপক্ষেও সন্দেহ আছে। মন্দির-নির্ম্মাতা চাঁদরায় রুদ্রের দেওয়ান হইলে, তিনি কেবল নিজ নামে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে সাহসী হইতেন না। তাহা হইলে রুদ্রের নামও উৎকীর্ণ থাকিত। * * * ঐ মন্দিরের কারুকার্য্যের সহিত রাজবাড়ীর মঠের কতক সৌসাদৃশ্য থাকায় এবং ঐ সময়ে চাঁদরায়ের পরাক্রম বিক্রমপুরে বিস্তৃত হওয়ায় এইমাত্র অনুমান হয় যে, তিনি কোন সময়ে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন, প্রত্যাবর্ত্তন কালে উড়িষ্যার অনুকরণে বাগাচড়ার জঙ্গল কাটাইয়া বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা ও তদুপলক্ষে ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া যান। পরে ঐ ব্রহ্মোত্তর ব্রাহ্মণ-শাসন নামে খ্যাত হয়।"

"বিশ্বকোষ"-সম্পাদক মহাশয়ের এই "অনুমানের" উপর নির্ভর করিয়া এ প্রদেশের লোক বাগাঁচড়ার চাঁদরায়কে বিক্রমপুরের চাঁদরায় বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। এক নামের দুই ব্যক্তির একই রূপ কীর্ত্তিকাহিনী পরবর্ত্তী সময়ে একের উপরেই আরোপিত হইয়া থাকে—ক্ষুদ্র প্রাণ মহাপ্রাণে ডুবিয়া যায়। অনেক ক্ষুদ্র কালিদাস, বৃহৎ কালিদাসে ডুবিয়া গিয়াছেন, অনেক ক্ষুদ্র ব্যাস, বেদব্যাসের অঙ্গে অঙ্গ-সমর্পণ করিয়াছেন, বাঙ্গালার অনেক ছোটখাটো রামপ্রসাদ সাধক রামপ্রসাদের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছেন। আজ বিশ্বকোষের "অনুমানে" বাগাঁচড়ার ক্ষুদ্র চাঁদরায়ও বিখ্যাত বারভুঁইয়ার

অন্যতম ভূঁইয়া চাঁদরায়ের সহিত মিশিতে বসিয়াছেন। এখানে এই চাঁদরায় সম্বন্ধে যতপ্রকার গল্প প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বিশ্বকোষের আলোচ্য দুইটি গল্প-সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, চাঁদরায়কে কিছু দীর্ঘজীবি স্বীকার করিলেই ১মটিকে "নিতান্ত অমূলক" বলা চলে না। ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে লিখিয়াছেন, "আমিনের পেশকার বসু বিশ্বনাথ।" এই বিশ্বনাথ বসুও বাগাঁচড়া নিবাসী ছিলেন। বিশ্বনাথের বংশধরগণ অদ্যাপি বাগাঁচড়ায় বাস করিতেছেন। ধনে, মানে, বিদ্যা, বুদ্ধিতে তাঁহারা বিশ্বনাথ বসুর সময় হইতেই সম্মানিত। ইঁহারাও ইঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের মুখে শুনিয়া আসিতেছেন যে, বাগাঁচড়ার চাঁদরায় নদীয়া-রাজবংশেরই জ্ঞাতি। না হইলেও বিশেষ যায় আসে না। এই চাঁদরায় কৃষ্ণচন্দ্রের জ্ঞাতি না হইলেই কি বিক্রমপুরের চাঁদরায় হইবেন? "দ্বিতীয়টী কতদূর সত্য তৎপক্ষেও সন্দেহ" করিবার পূর্ব্বে ইহাও বিবেচ্য ছিল যে, কোন রাজার কোন কর্ম্মচারী নিজের বাটীর মধ্যে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেও কি নিজের নাম তাহাতে উৎকীর্ণ করিতে অধিকারী নহেন? রাজা রুদ্ররাম শ্রীক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন করিয়া এই চাঁদরায় কর্ত্তৃক "ব্রহ্মশাসন" (ব্রাহ্মণশাসন নহে) প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন, একথা লোকে বলে; মন্দির প্রতিষ্ঠা চাঁদরায়ের নিজের। এই জন্যই আমার বিশ্বাস বিশ্বকোষের "অনুমান" সংশয়শূন্য নহে।

প্রাচীন ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে স্থানীয় গল্পগুলি যে একেবারেই ভিত্তিহীন, এ কথা সাহস করিয়া বলা চলে না। এই চাঁদরায় সম্বন্ধে এখানে যে সকল গল্প প্রচলিত আছে, আমাদের বিশ্বাস সেগুলিও সত্য ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং সেগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া অনুমানের আশ্রয় লওয়া যুক্তিযুক্ত নহে।

বাগাঁচড়ার চাঁদরায়ের বাটীর দক্ষিণ দ্বার হইতে হরিনদী পর্য্যন্ত * আট হাত প্রস্থ এক রাস্তার চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান। এখানকার লোকে ইহাকে "চাঁদরায়ের জাঙ্গাল"বলে। শুনিতে পাওয়া যায়.এই রাস্তা দিয়া চাঁদরায় প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে যাইতেন এবং এই পথে চাঁদরায়ের রথ চলিত। চাঁদরায় যদি বিক্রমপুরবাসী হইতেন, তাহা হইলে তিনি প্রত্যহ হরিনদীর নিম্নে গঙ্গাস্নান করিতেন, এ প্রবাদ আসিল কোথা হইতে? চাঁদরায়ের পূজার বাটীর সম-

* জাহ্নবী ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা ১৩৭ পৃষ্ঠায় "হরিনদী" দেখুন।

চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণকে এখনও লোকে "রক্তকুণ্ড" বলে। এ সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, চাঁদরায়ের বাটীতে দুর্গোৎসবাদি "বার মাসে তের পার্ব্বণ" হইত। শাক্ত চাঁদরায়ের শক্তি পূজায় এত বলিদান হইত যে, এই স্থানে প্রচুর রক্ত জমিয়া যাইত; তাই ইহার নাম "রক্তকুণ্ড"। বিক্রমপুরের চাঁদরায় কি বাগাঁচড়ায় আসিয়া বাস করিয়াছিলেন?

বাগাঁচড়ার এই চাঁদরায় তাঁহার গুরুর শাপে নির্ব্বংশ হইয়াছিলেন। প্রবাদ এই যে, এই চাঁদরায়ের বাটীর একখানি ইষ্টকও যে গ্রহণ করিবে, সেও চাঁদরায়ের ন্যায় নির্ব্বংশ হইবে। তাই কেহ ইহার একখানি ইষ্টকও গ্রহণ করে না। অনেকের বিশ্বাস এই চাঁদরায়ের বাটীতে প্রচুর অর্থ প্রোথিত আছে, যক্ষে তাহা রক্ষা করিয়া থাকে। চাঁদরায়ের গুরু বীরাচারী তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। এই সিদ্ধ ব্যক্তি এখানকার শ্রীশ্রীবাগ্দেবী ঠাকুরাণীর সেবা করিতেন এবং এইস্থানেই সিদ্ধ হন। চাঁদরায় এই বীরাচারী সাধকের শিষ্য হইলেও সুরা-বিদ্বেষী ছিলেন। তাই কোন সময়ে সুরাপায়ী গুরুর অপমান করায় গুরুর শাপে তিনি নির্ব্বংশ হইয়াছেন। চাঁদরায় নির্ব্বংশ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার গুরুর বংশ এখনও বাগাঁচড়ায় বাস করিয়া শ্রীশ্রীবাগ্দেবী ঠাকুরাণীর সেবা করিতেছেন। জাহ্নবীর প্রিয় লেখক যোগেন্দ্র বাবুর ২য় প্রবন্ধ (জাহ্নবী, ৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা) হইতে অবগত হওয়া যায় যে, "মাঐসারে দিগম্বরীর বাড়ী প্রসিদ্ধ * * মাঐসারে চাঁদকেদার রায়ের গুরু গোসাঞি ভট্টাচার্য্য সিদ্ধিলাভ করেন।" এই গুরুর কথাতেই বুঝিতে পারা যায় যে বিক্রমপুরের চাঁদরায় বাগাঁচড়ার চাঁদরায় নহেন। কেন না এক ব্যক্তির কখনও দুইজন গুরু হইতে পারে না।

এই বাগাঁচড়ার ৺শ্যামাকান্ত রায় নামক একজন শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণকে আমি দেখিয়াছি। এই শ্যামাকান্তের কন্যা অদ্যাপি বর্ত্তমান। প্রবাদ এইরূপ যে, এই শ্যামাকান্তের পূর্ব্বপুরুষ রামভদ্র রায়কে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার জন্য চাঁদরায় আনয়ন করাইয়াছিলেন। পরে তাঁহার পুত্র হওয়ায় রামভদ্রকে আর পোষ্যপুত্র লওয়া হয় নাই; কিন্তু একেবারে পরিত্যাগ করিতেও পারেন নাই। তাই তাঁহাকে কিছু ভূমি-সম্পত্তি দান করিয়া ও নিজ বাটীর সন্নিকটেই একটি পৃথক্ বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া বাস করাইয়াছিলেন। ইহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখি না। এই বাটীও চাঁদরায়ের বাটীর ইষ্টকের ন্যায় ইষ্টক দ্বারা প্রস্তুত। এরূপ

ইষ্টক ;চাঁদরায়ের বাটী ও এই শ্যামাকান্ত রায়ের বাটী ব্যতীত বাগাঁচড়া বা নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামেও দেখা যায় না। এখন দেখিতে হইবে,শাণ্ডিল্যগোত্রীয় একজন ব্রাহ্মণ-বালককে যিনি পোষ্যপুত্র গ্রহণ জন্য আনয়ন করিয়াছিলেন, তিনি কখনই ব্রাহ্মণেতর জাতি হইতে পারেন না। অবশ্যই তিনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন, একথা স্বীকার্য্য; কিন্তু বিক্রমপুরের বারভুঁইয়ার চাঁদরায় কায়স্থ ছিলেন, একথা বিশ্বকোষেই লিখিত হইয়াছে; সুতরাং আমরা, এক্ষণে বোধ হয়, নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, বাগাঁচড়ার চাঁদরায় ও বিক্রমপুরের চাঁদরায় দুইজন সমসাময়িক পৃথক ব্যক্তি। একজন কায়স্থ ও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী, অপর ব্যক্তি ব্রাহ্মণ ও সামান্য জমিদার।

বিশ্বকোষের অনুমানে আর একটি সন্দেহের কারণ এই যে, বিক্রমপুরের চাঁদরায় নবদ্বীপরাজের বাটীর সন্নিকটে তাঁহার জমিদারীতে ব্রাহ্মণগণকে ভূমিদান ও শিবমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিলেন, অথচ নবদ্বীপ-রাজবংশ তাহাতে কোন কথাই কহিলেন না, ইহা কতকটা অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। বিশেষতঃ নবদ্বীপরাজের জমিদারীতে বিক্রমপুরের চাঁদরায় কিরূপে নিজের নামে ভূমি দান করিলেন? নবদ্বীপরাজের সম্পত্তি দান করিবার অধিকার বিক্রমপুরের চাঁদরায়ের ছিল কি?

বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে যথেষ্ট সম্মান করি এবং তাঁহার "বিশ্বকোষ"কেও প্রাণের সহিত ভালবাসি। তাই একজনের ক্ষুদ্র কীর্ত্তি আর একজনের কীর্ত্তিরূপে বিশ্বকোষে ঘোষিত হওয়ায়, দুঃখের সহিত এতগুলি কথা লিখিত হইল। ভরসা করি, নগেন্দ্রবাবু বিশ্বকোষের গৌরব-রক্ষার্থে পরিশিষ্টে এই ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবেন।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজয়াদশমী।

বিজয়াদশমী আজি ; অশ্রু-সন্ধ্যা তার
চিরন্তন কাহিনী সে এনেছে বহিয়া।—
উৎসবান্ত-সঙ্গীতের যেন মূর্চ্ছনার
ক্ষীণ স্মৃতিটুকু সম রহিয়া রহিয়া
কাঁপিছে জাহ্নবীজলে চন্দ্রকরহার।
থামিয়াছে সানা'য়ের বিষাদ রাগিণী,
শেষ দীপ নিভে গেছে, মণ্ডপ আঁধার,

স্তব্ধ-শূন্য জেগে আছে—সে স্মৃতিবাহিনী।
হায় মাগো, এসেছিলি তুই কি অভয়া
সত্য এ অভাগা বঙ্গে বরাভয় হাতে?
না শুধু এ উপহাস নিষ্ঠুর, নিদয়া!
—চির-বিসর্জ্জন বুঝি বহুপূর্ব্ব রাতে
হয়েছে সে প্রতিমার, তারি ভ্রান্তিময়!
মূঢ় মোরা, প্রতি বর্ষে করি অভিনয়!

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

উদ্ভিদের দুষ্টামি।

যাঁহারা গ্রাম্যপথে হাঁটিয়াছেন তাঁহারা অনেক সময় দেখিয়াছেন যে, পথের দুই পার্শ্বে ছোট উদ্ভিদ, মেঝো উদ্ভিদ ও বড় উদ্ভিদ পথকে প্রায় অথবা সম্পূর্ণরূপে অনেক সময় বন্ধ করিয়া থাকে। যাহারা ছোট তাহারা পথের উপরে প্রায় আসে না; তবে কখন কখন বেড়া নাড়িয়া গৃহস্থের মন বুঝে। যাহারা বড় তাহারা একমানুষের কিছু উপরে অর্থাৎ ৩।৪ হাত উপরে ডালপালা মেলিয়া পথ আঁধার করিয়া ফেলে। যাহারা ছোট, তাহাদের কথাই আজি বলিতেছি।

সেদিন আমি এক গ্রাম্যপথে চলিতে চলিতে দেখি যে, ছোট ছোট ঘাস ও কাঁটাগাছ পথের ধার পর্য্যন্ত আসিয়াছে; আর তাহাদিগের মধ্যে যাহারা একটু সবল তাহারা পথের মধ্যেও স্থানে স্থানে আসিয়াছে। পথটী ১২।১৩ ইঞ্চি প্রশস্ত ছিল, এখন ৬।৭ ইঞ্চি প্রশস্ত আছে; অর্থাৎ পথের মধ্যস্থলে একটু একপেয়ে পথ মাত্র আছে। উহার উভয় পার্শ্বে ২।৩ অঙ্গুলি স্থান উক্ত সবল ঘাসেরা স্থানে স্থানে দখল করিয়া লইয়াছে। ঠিক মাঝখানে যে এক-পেয়ে পথটী আছে, তথায় এক এক স্থানে এক একটী মাত্র তৃণ ঘাস গজাইয়া উঠিয়াছে। পার্শ্বের চিত্র দেখুন। কক স্থান আসল পথ, কখ স্থানে কোন কোন সবল ঘাস ও কাঁটা দখল করিতে আরম্ভ করিয়াছে। খ খ স্থানে এখনও একপেয়ে পথ আছে; কিন্তু তাহার মধ্যে গ গ স্থানে এক একটী তৃণ ঘাস গজাইতেছে। বিস্ময়ের কথা এই যে গ গ স্থানের তৃণ ঘাসগুলি অতি কাহিল ও ছোট।

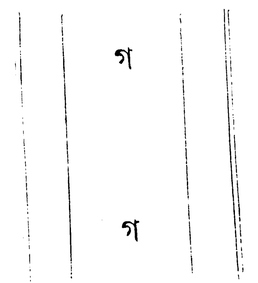

এখন কথাটা বিবেচনা করুন। পূর্ব্বে ক নামক দুইটী লাইনের ডাইনে ও বামে উদ্ভিদেরা থাকিত, ক ক স্থানে আসিতে সাহসী হইত না; কারণ লোকের পদতলে পড়িয়া উদ্ভিদ-জন্ম ফুরাইয়া যাইবার আশঙ্কা ছিল। পরে যখন লোক চলাচল কম হইল, তখন উহাদিগেরও সাহস বাড়িয়া গেল। উহারা কি লোক চলাচল করা বুঝিতে পারে? যাহা হউক লোক-চলাচল কমিলে উহারা কখ স্থানে ক্রমে দখল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। খখ স্থানে লোক চলিতেইছে। সেখানে আসিতে কোন উদ্ভিদের সাহসে কুলায় না। সবলেরাও সেখানে দখল করিতে যায় নাই। গিয়াছে কাহারা? যাহারা দুর্ব্বল ও ছোট। এ কথার উত্তর কি? ঐ ছোট ছোট দুর্ব্বল তৃণ ঘাসেরা পথিকের পায়ের চাপ ভয় করে না। তাহারা তো মরিয়াই আছে; আর তাহারা মরণের ভয় রাখে না। তাহাদিগের স্বজাতীয়গণ পথিকের আচরণ বুঝিবার নিমিত্ত অর্থাৎ পথিক তাহাদিগকে পদদলিত করিয়া যায় কিনা, ইহাই দেখিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে বিপদের স্থানে আগে পাঠাইয়া দিয়াছে এবং তাহারাও আহ্লাদের সহিত স্বজাতির উদ্দেশ্যসাধন করিবার নিমিত্ত আপন জীবন বিসর্জ্জন দিতে অগ্রসর হইয়াছে অথবা তাহারা স্বজাতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত না হইলেও নিজেই সাধারণের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এ কাজে সবলেরা যায় নাই; গিয়াছে ছোট ও দুর্ব্বলেরা।

এ ভাষ্যকে কল্পনার খেলা বলিতে পার, কিন্তু এ ভাষ্য মনে উদয় হয়। বিজ্ঞান বলিবে ঐ পথে পার্শ্ববর্ত্তী উদ্ভিদের বীজ পূর্ব্বেও পড়িত এখনও পড়ে; পূর্ব্বে উহা পদদলিত হইত, তাই গজাইতে পারিত না। এখন লোকচলাচল কম হওয়ায় উদ্ভিদেরা কখ স্থান প্রায় অধিকার করিয়াছে। আর খখ স্থান অধিকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রকৃত রহস্য ইহাই। তাহা হয় হউক; কিন্তু খখ স্থান মধ্যে দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র ঘাসেরা আগে গিয়াছে কেন? সবলেরা ঐ স্থানে আগে যায় নাই কেন? এ প্রশ্নের উত্তর কি?

উদ্ভিদের অনেক নিন্দা করিয়াছে। পরনিন্দা না করিলে জীবনটা নীরস বোধ হয়। আজি ইহাদিগের ব্যবহার দৃষ্টে আমার নিন্দুকের মুখও বন্ধ হইয়া আসিতেছে। আবার যদি মুখ খুলিতে পারি, তবে অতঃপর পূর্ব্বের সুর আলাপ করিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীশশধর রায়।

ফলশ্রুতি।*

(সমালোচনা)

আমাদের যতদূর মনে হয়, এরূপ গবেষণাপূর্ণ, সমালোচন-মূলক বৃহৎ গ্রন্থ, এই প্রথম বাহির হইয়াছে—বলিলেও বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। শ্রদ্ধেয় লেখক বহুদিন পূর্ব্বে "কাব্য-সুন্দরী"তে একদিন তাঁহার সৌন্দর্য্যগ্রাহিতা ও সমালোচনীশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। আবার, আজিও এই "ফলশ্রুতি"তে তাঁহার চিন্তাশীলতার ও বহুদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। দুঃখের বিষয় ক্ষীণ-কলেবরা "জাহ্নবী"তে ইহার সম্যক্ আলোচনা করিবার স্থান নাই। যাঁহারা "কথামালা" সায় করিয়াছেন—তাঁহারাই, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র, লোক-হৃদয়ের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন—তাহা, কাহারও অবিদিত নাই; কিন্তু, তাঁহার লোকবিমোহিনী সৃষ্টিতে আমরা লাভবান্, কি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি, সে কথা বিশেষরূপে, বোধ হয়, কেহই আলোচনা করিয়া দেখি না, বা দেখিতেও ইচ্ছা করি নাই। "ফলশ্রুতি" সেই সূক্ষ্মদর্শিতা, সেই গুরুতর কথা—আজ আমাদের সম্মুখে অকুতোভয়ে ধরিয়াছেন এবং ধরিয়া যে যথার্থ বন্ধুর কার্য্য করিয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র। আমাদের সেই রামমনোমোহিনী সীতা, পতিব্রতা সাবিত্রী, সাধ্বী দময়ন্তী ও ঔপন্যাসিকগুণ-শোভিতা শকুন্তলা প্রভৃতির প্রতিকৃতি আর দেখা যায় না; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের আশীর্ব্বাদে ও অনুকরণে এখন ঘরে ঘরে দাম্ভিকা "ভ্রমর" বিরাজমানা—এ কথা অস্বীকার করিবার যো নাই। আমরা দেখিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের "সেই মুহূর্ত্তে যদি কক্ষমধ্যে বজ্রপতন হইত" প্রভৃতির ন্যায় এক একটী কথা, গ্রন্থকারের উপর যেমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে—তেমনই তাঁহার-বর্ণিত নভেলী জীবন, এখন গৃহস্থের বার আনা গৃহে বিরাজিত হইয়াছে। সংসারী ব্যক্তির পক্ষে তাহা কতদূর চিত্তাকর্ষক ও সহনীয়, যাঁহারা ভুক্তভোগী, তাঁহারাই তাহা বিদিত আছেন। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র, সংসারে নিত্য-পর্য্যবেক্ষিত "রোহিণী গোবিন্দলালের" যে চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহাতে

* শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা; গুরুদাস বাবুর দোকানে পাওয়া যায়।

নূতন সৃষ্টি কিছুই নাই; কিন্তু "কালো ভোম্‌রা" আমাদের দেশের নহে—তাহা বিলাতী ছাঁচে ঢালা, বৈদেশিক ঢঙে আঁকা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই অপূর্ব্ব "ফলশ্রুতির" প্রকৃত পরিচয়ের স্থানাভাব। তবে, গ্রন্থকর্ত্তার প্রতি সুবিচার প্রদর্শনোদ্দেশ্যে, পাঠক-পাঠিকার গোচরার্থ গ্রন্থান্তর্গত স্থান উদ্ধৃত হইল।

জানকী-বিষয়ে গ্রন্থপ্রণেতার মতামত কিরূপ দেখুন—

রামচন্দ্র তাঁহার (সীতাদেবীর) দীপ্তি আরও, প্রভাসিত করিবার জন্য তাঁহাকে বনবাসে দিলেন; চুপিচুপি জনকালয়ে পাঠাইলেন না। * * * তখন সে সীতা কি? জগতের আরাধ্যা স্বর্ণময়ী প্রতিমা—যে স্বর্ণময়ী প্রতিমাকে স্বয়ং নারায়ণ রামচন্দ্র, স্বর্ণসিংহাসনে বসাইয়া প্রতিদিন পূজা করিতেন।—ইহা রামায়ণ-অধ্যায়নের ফল।

উল্লিখিত উদ্ধৃত অংশের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের "কুন্দ" চরিত্র ও তৎসঙ্গে আনুষঙ্গিক "ম্যাকবেথের" সংক্ষিপ্ত কথাও দেখুন—

বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষের উপক্রম তত মন্দ নহে; কিন্তু কুন্দকে নগেন্দ্র লাভ করিয়া যখন গৃহে আসিলেন, তখন হইতে তাঁহার কুপ্রবৃত্তি দেখা দিল। কুন্দও নগেন্দ্রের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইল। সেই পাপপ্রেমের অভিনয় অভ্যাসবশতঃ ক্রমশই প্রবর্দ্ধিত হইয়া গ্রন্থখানিকে বিষময় করিয়া তুলিল। আবার—এরূপ দেখা যায়, গ্রন্থের উপক্রমে পাপচিত্র এবং অভ্যাসেও সেই পাপচিত্রেরই এত প্রবৃদ্ধি যে, তাহাই পাঠকের হৃদয়াধিকার করিয়া ফেলে। সে গ্রন্থের শেষভাগে যদি সামান্যতঃ পুণ্যচিত্র অঙ্কিত হয়, এবং সে পুণ্যচরিত্রের তত বৃদ্ধিসাধন না হয়, তবে তাহার অধ্যয়নফলে সেই পাপাধিকারই প্রবল হইয়া দাঁড়ায়। ম্যাক্‌বেথ নাটকের এই দশা।

রবীন্দ্রনাথ বাবুর "রাজর্ষি" সম্পর্কেও তিনি নির্ভীক-ভাবে—গাম্ভীর্য্য-সহকারে গুরু-গম্ভীর ভাষায় কি বলিয়া রাখিয়াছেন—তাহা পাঠকের বিচার্য্য।

"গ্রন্থের প্রথম ভাগ যে কিরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা আমরা প্রদর্শন করিলাম। এই মুখপাত ভাল দেখাইয়া গ্রন্থকার যেন আমাদের ক্ষুধা আরও উদ্রিক্ত করিয়া দিলেন। সে ক্ষুধা নিবারণ হইল না, ইহাই আমাদের দুঃখ।

* * * আবার দেখুন, গোবিন্দমাণিক্য প্রথমভাগে যেরূপ চরিত্রদৃঢ়তা, সৎসাহস, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা, অপক্ষপাতিতা, ঔদার্য্য প্রভৃতি গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন, তার পর দুই বৎসর রাজকার্য্যপরিচালনে কি তাহার স্ফূর্ত্তি হয় নাই।

* * * তাহা গ্রন্থকার যদি পাশাপাশি দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলে পাপ চিত্রের কলঙ্ক এবং পুণ্য চরিত্রের পবিত্রতা শতাংশে বর্দ্ধিত হইত।

* * * কৌশল যদি অকৃতকার্য্য হয়, তবে কি প্রয়োগকারীকে তত কৌশলী বলা যায়? *

* * * রামচন্দ্রকে ব্যাস মহাভারতে ব্রহ্মার মুখ দিয়া রাজর্ষিধর্ম্মা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন; শুনিয়াছি সেই রাজর্ষিপ্রতিম রামের রাজ্য বড় সুখের রাজ্য ছিল। রাজর্ষি ব্যাস তাহা কিরূপে এত সুখময় করিয়াছিলেন, রামায়ণে যদিও তাহার বিশেষ ঐতিহাসিক বিবরণ নাই; কিন্তু কাব্যবিভ্রমগুণে, সেই কাব্যের ঘটনাবলি-অঙ্কিত সরস চিত্রে আমাদের কল্পনা এত পূর্ণ হয় যে, আমরা অনুমানে যেন রামরাজত্বের সুখানুভব করিতে পারি।

* * * তিনি বিনা রক্তপাতে রাজ্য ত্যাগ করিয়া গেলেন। এরূপ কার্য্যে গৌরব ও মহত্ত্ব আছে বটে, কিন্তু রাজার পক্ষে নহে। এ কার্য্যে সাধুর গৌরব আছে বটে, কিন্তু রাজার গৌরব নাই। সিংহাসনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নহে।

* * * অযোধ্যাকাণ্ড পর্য্যন্ত, বলিতে গেলে, রামায়ণের এক ভাগ শেষ হইয়াছে। সেখানে আমরা দশরথ, কৈকেয়ী প্রভৃতির চরিত্র একপ্রকার শেষ করিয়াছি।

* * * গ্রন্থে রসের খেলা খুব কম। এ গ্রন্থের একমাত্র রস হিংসা। এই হিংসার খেলা একবার মাত্র বাড়িয়াছিল। গ্রন্থের প্রারম্ভে এই হিংসা জোর করিয়া উঠিয়াছিল। রঘুপতির বিদ্বেষভাব যত প্রতিরুদ্ধ হইতেছে, জয়সিংহ ও নক্ষত্ররায় তাহা যতই বিকল করিতেছে, পাঠকের মনে তাহাদের ঘাত-প্রতিঘাত ততই লাগিতেছে। ঘাত-প্রতিঘাতেই রসের বৃদ্ধিসাধন হয়; কিন্তু যে উপাখ্যানে ঘটনার বিরোধ নাই, যাহাতে প্রকৃতির সহিত প্রকৃতির সংগ্রাম নাই, হৃদয়ের বিপক্ষে হৃদয়ের যুদ্ধ নাই, তরঙ্গ-তুফান নাই, সে উপাখ্যান নিতান্ত রসহীন।

* * * বাঙ্গালা-সাহিত্যে এখন এইরূপ দোষগ্রস্ত অনেক নাটক নভেল প্রকাশিত হইতেছে। তন্মধ্য হইতে আমরা কেবল একখানি একজন প্রসিদ্ধ লেখকের গ্রন্থ বাছিয়া লইয়া বিস্তারিত সমালোচনায়, তাহার অভ্যাস-দোষ দেখাইলাম। এই দোষবশতঃ এ গ্রন্থের যেমন অধ্যয়নফল দূষিত হইয়াছে, তদ্রূপ সেই সকল নাটকনভেলেরও অধ্যয়নফল দূষিত।"

তুলনায় সমালোচনা, নাকি, অধিকতর ফলবতী হয়—তাই গ্রন্থকার, কেমন দেখাইতেছেন—পাঠকপাঠিকারা, বিবেচনা করিয়া দেখুন;—

* * * সেই অপূর্ব্বতা-হেতু সীতা-চরিত্র, অপরাপর সতীচরিত্র হইতে প্রভিন্ন হইয়া গিয়াছে। সীতা সতী বটেন; কিন্তু সতী দময়ন্তী নহেন, সাধ্বী সাবিত্রী নহেন, সতী ভবানী নহেন। অভ্যাসগুণে ইঁহারা বিভিন্ন ধরণের সতী। দুইটি আম্রবৃক্ষ সদৃশ বটে, কিন্তু ঠিক্ সমান বা এক নহে; উভয়েরই পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্যই প্রতি বৃক্ষকে নববেশ প্রদান করে।

* * * মুকুলেই দেখা গিয়াছিল, সীতা সাবিত্রী চরিত্র কিরূপ কুসুমে প্রস্ফুটিত হইবে। সেই মুকুলেই বিসদৃশ কুসুমের চিহ্ন দেখা গিয়াছিল। ইহাই অপূর্ব্বতা।"

অবশেষে গ্রন্থকারের "গ্রন্থের অধিকার ও অর্থবাদের" কথা, স্বল্পমাত্রই উদ্ধার করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি:—

* * * গ্রন্থমাত্রেরই অধিকার আছে। কারণ, গ্রন্থস্থ বিষয় ও প্রসঙ্গের অধিকার আছে। কোন প্রসঙ্গই অসীম নহে।কোন প্রসঙ্গমাত্রেরই যদি নির্দ্দিষ্ট সীমা ও অধিকার থাকে, তবে তাহার সমালোচনাতে সেই অধিকারমধ্যে আবদ্ধ থাকা উচিত।

* * যিনি যে জাতীয় কবি, তাঁহাকে তজ্জাতীয় কবির সহিত তুলনা করাই উচিত। গরুর যে সকল গুণ আছে, তাহা গরুকেই প্রাধান্য দিয়াছে; তদ্রূপ ঘোড়ার গুণ ঘোড়াকেই প্রাধান্য দিয়াছে। তাই বলিয়া, যিনি গরুকে ঘোড়ার গুণ দিয়া বিচার করিবেন, তিনি কি ঠিক্ বিচারকর্ত্তা? তদ্রূপ আমরা যদি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেনের কবিতার সহিত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতার তুলনা করি, তাহা হইলে কি ঠিক্ বিচার করা হইল? ঈশ্বর গুপ্ত যে রসে প্রধান, নবীন সেনের কবিতায় তাহা নাই এবং নবীনচন্দ্র সেনের কবিতায় যাহা আছে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বা ভারতচন্দ্রের কবিতায় তাহা নাই।

বেণী-বন্ধন।

"এস কৃষ্ণা, এস দেবি, রাজরাজেন্দ্রাণী—"
কহিলা আনন্দগর্ব্বে বীর বৃকোদর,
শত্রু-রক্তে কোকনদ দুটি শূন্য পাণি,
রঞ্জিত রুধির-রাগে স্ফুরিত অধর।
"দুঃশাসন হৃদিরক্তে জুড়ায়েছি জ্বালা—
রক্ত নহে—সুধা আজি করিয়াছি পান,—
মুক্ত কাদম্বিনী-কেশে অয়ি রাজবালা,
রেখেছ প্রদীপ্ত করি যেই অপমান
আজি তার শেষ! দেবি পূর্ণ তব পণ;
শত্রু-রক্তে মুক্ত কেশে বিরচিব বেণী!"
ভাতিল জ্যোৎস্না-হাস্যে কৃষ্ণার আনন,
দাঁড়াইলা সভা মাঝে গর্ব্বে যাজ্ঞসেনী।
বীর বিরচিল বেণী—মৌন সভাস্থল;
কৃষ্ণার কমল নেত্র অশ্রু-ছল-ছল!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

দুঃখিনী।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মহাজন চলিয়া গেলেন। দুঃখিনী তখন সেই শূন্য গৃহের দাবায় বসিয়া আকাশপাতাল ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাবনার কি অন্ত আছে—জনম-দুঃখিনী দুঃখিনীর জীবন দুঃখময়। তাঁহার যদি নিজের ভাবনাই ভাবিতে হইত তাহা হইলেও কথা ছিল না; ভগবানের রাজ্যে বাঙ্গালী বিধবার একবেলার হবিষ্যান্ন ভাবনার কথা নহে—দুঃখিনী তাহা সংগ্রহ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার অনন্ত ভাবনা।

প্রথম ভাবনা—রসিক। সংসারে তাঁহার এখন রসিক ব্যতীত আর কেহই ছিল না। আজ যদি রসিক বাড়ীতে থাকিত, তাহা হইলে দুঃখিনী কাহাকে ভয় করেন। সেই রসিক নিরুদ্দেশ। যাহাকে বুকের রক্ত দিয়া মানুষ করিয়াছে, যাহার জন্য দুঃখিনী প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারেন, সেই রসিক—সেই তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন রসিক কোথায় চলিয়া গেল, বাঁচিয়া আছে কি মারা গিয়াছে তাহাও দুঃখিনী জানিতে পারিলেন না। কতদিন গিয়াছে, কত রাত্রি গিয়াছে, বাহিরে কাহারও পায়ের শব্দ পাইলে দুঃখিনী নিশ্বাস বন্ধ করিয়া কাণ পাতিয়া থাকেন—ঐ বুঝি রসিক ডাকিবে—"দিদি"; কিন্তু সেই 'দিদি'-ডাক দুঃখিনী আজ কতদিন শুনিতে পান নাই। রসিক যদি বাঁচিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার না জানি বিদেশে পরের কাছে কত কষ্ট হইতেছে; হয়ত সে অনাহারে কতদিন কাটাইতেছে, হয়ত সে বৃক্ষতলে ভূমিশয্যায় নিশাযাপন করিতেছে। দুঃখিনী আর ভাবিতে পারিলেন না; তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মস্থান হইতে আকুল ক্রন্দনধ্বনি উঠিতে লাগিল। সেই গোধূলি সময়ে নির্জ্জন গৃহের দাবায় বসিয়া, তিনি দেখিতে লাগিলেন রসিক যেন মলিন বসনে, শুষ্ক মুখে কোথায় কোন্ দূরদেশে কোন্ অজ্ঞাত পথে চলিতেছে। দুঃখিনী হৃদয়ভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"বাবা!"

কিছুক্ষণ এইভাবেই কাটিয়া গেল। তখন আবার আর এক ভাবনা উপস্থিত হইল—মহাজন। মহাজনকে ত তিনি বলিয়া দিলেন যে, মাসে দশ টাকা করিয়া ঋণ শোধ দিবেন, কিন্তু টাকা কোথায়? দশটাকা ত দুই চারি পয়সা নয়। মাসে দশ টাকা কোথা হইতে আসিবে? গ্রামের ছেলেরা যে

বেতন দিবে, তাহাতে কি আর মাসে দশ টাকা হইবে? সকলেই দরিদ্রের সন্তান, দুই আনা এক আনার অধিক বেতন দিবার সামর্থ্য কাহারও নাই; বিশেষ তিনি ত আর অধিক শিক্ষা দিতে পারিবেন না, সামান্য ক, খ পড়াইয়া তিনি দুই এই এক আনার অধিক কি প্রত্যাশা করিতে পারেন?

তাহার পর তাঁহার এই পাঠশালা চলিবে কিনা কে বলিতে পারে? তিনি ছেলেদের যদি রীতিমত শিক্ষা দিতে না পারেন, তাহা হইলে দশদিন পরে সকলেই ছেলে ছাড়াইয়া লইয়া যাইবে; তখন কি হইবে?

তখন কি হইবে? এই প্রশ্ন যেন দুঃখিনীর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিল, তাঁহার মনে হইল এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবার জন্য কে যেন প্রস্তুত হইয়াছেন।

তখন কি হইবে? দুঃখিনীর বুকের মধ্য হইতে কে যেন দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল,—কে যেন দৈববাণী করিল—"তখন যাহা হইবার হইবে। সে কথা ভাবিবার তুমি কে? তুমি কাজ করিয়া যাও, তখন যাহা হয় আমি ভাবিব।"

দুঃখিনী তখন যুক্তকরে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিলেন কাঁদিয়া, বলিলেন "তুমি যে হও, তুমি যেখানে থাক, তোমার কথা শুনিব; আমার ভাবনা তুমি ভাবিবে? তুমিই ভাব প্রভু; আমি আর ভাবিব না। আমি কে? আমি কতটুকু। তুমি কে, তাহা জানি না, তোমাকে কোনদিন ডাকি নাই, তোমার কথা কোনদিন ভাবি নাই, তোমার উপর নির্ভর করিতে শিখি নাই; তাই আজ তুমি আমার দর্পচূর্ণ করিলে। আজ হইতে আর ভাবিব না—আর আমি দুঃখিনী নহি।"

এমন সময় রাস্তায় ও পাড়ার সদানন্দ ক্ষেপা গান ধরিল—

"পাঁচের ঘরে এসে আমি তোমাহারা!
নইলে, তুমি আর আমি অভেদ তারা!"

দুঃখিনী চমকিয়া উঠিলেন, তাহার হৃদয়ের মধ্যে ধ্বনিত হইল "তুমি আমি অভেদ তারা!" দিশেহারা হইয়া দুঃখিনী ডাকিলেন—"সদা কাকা!"

সদানন্দের কর্ণে এ ডাক পৌঁছিল, সে উত্তর করিল "যাই মা!"

বলিতে বলিতে সদানন্দ উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার পরই ঘরের দাবার দিকে চাহিয়া ক্ষেপার নয়ন পলকশূন্য হইল—সে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল! সে কি দেখিতেছিল তাহা আমরা বলিতে পারি না।

অল্পক্ষণ চাহিয়াই সদানন্দ সেই উঠানে বসিয়া পড়িল, তাহার পর ভূমিতে

মাথা নোয়াইয়া কাহাকে প্রণাম করিল। প্রণামান্তে উঠিয়াই করযোড়ে গান ধরিল—

"সদানন্দময়ী হোয়ে গো মা,
নিরানন্দে থেক না।"

দুঃখিনীর তখন সংজ্ঞা হইল; সে বলিলেন "ওকি, সদা কাকা, কাকে প্রণাম কোরছো; ও কি বোক্‌চো।"

সদানন্দ তখন ও গান ছাড়িয়া দিয়া আবার গান ধরিল—

"বাজীকরের মেয়ে, বলি তোমায় গো;
তুমি এমন কোরে বাজী দেখায়ে,
কত ভুলাবে আমায় গো!"

সদানন্দের তখন কি মনে হইল; সে গান ছাড়িয়া বলিতে লাগিল "মা, তোরে ত চিনেছি! তুই আর ত চাপা দিতে পারলি না মা! এইবার আমি মা পেয়েছি!"

আবার গান—

"তোরা কে দেখ্‌বি রে আয়,
দিন বোয়ে যায়,
সদানন্দ মা পেয়েছে।"

দুঃখিনী সদানন্দের গানে বাধা দিয়া বলিলেন "সদা কাকা, তুমি ও কি আবোল তাবোল বক্‌চো, চল, আমাকে রামকৃষ্ণ কাকার বাড়ীতে রেখে আস্‌বে চল। এই ভর সন্ধ্যার সময় আমার একলা যেতে ভয় করে।"

সদানন্দ আবার গান ধরিল,

"আমার একলা যেতে ভয় করে,
চল গুরু, যাই দু'জন পারে।"

সদানন্দ বলিল "মা, তোর কোন ভয় নাই, এই ছেলে সদানন্দ তোর সঙ্গে পারে যাবে। আর দেখ্‌, যে কয়দিন এই খেয়া ঘাটে বোসে থাক্‌তে হবে, সে কয়দিন এই সদানন্দ তোর পাহারায় রৈল। বুঝ্‌লি মা! আজ মায়ে পোয়ে চেনা হোয়ে গেল। দেখ্‌ মা, তোকে চুপে চুপে বলি, ও রূপ আর কাউকে দেখাস্‌ নে মা!"

দুঃখিনীকে সন্ধ্যার সময়ও না দেখিয়া রামকৃষ্ণের মেয়ে এই সময় আসিয়া ডাকিল—"দিদি!" তাহার পর উঠানে সদানন্দকে দেখিয়া বলিল "তাই ত,

আমি বলি, এত দেরী কেন, ক্ষেপীর সঙ্গে ক্ষেপা এসে জুঠেছে। চল্ দিদি, বাড়ী চল্ ; সদা কাকা, আমাদের বাড়ী চল। গান শুনবো।"

"চল্, বেটিরা চল্" বলিয়া সদানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল। মেয়ে দুইটীকে আগে করিয়া সদানন্দ বাটী হইতে বাহির হইল ; রাস্তায় আসিয়াই সে গান ধরিল—

"ধীরে ধীরে চল মা শ্যামা,
আমি যে তোর সঙ্গে যাবো।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দুঃখিনীর পাঠশালায় আর ছেলে ধরে না ; গ্রামের যত ছোট ছেলে সকলে আসিয়া ঐ পাঠশালায় পড়া আরম্ভ করিয়াছে। গ্রামে যে পুরাতন পাঠশালা ছিল; তাহা উঠিয়া গেল, গুরুমহাশয় স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

দুঃখিনীর পাঠশালা, না চাঁদের হাট। পাঠশালার নাম শুনিলে ছেলেদের গায়ে জ্বর আসিত। সেই মুণ্ডিত-মস্তক গুরুমহাশয়, তাঁহার সেই রক্তনেত্র, তাঁহার সেই দুই হস্ত দীর্ঘ বেত্রযষ্টি, তাঁহার সেই গগনভেদী চীৎকার ও গর্জ্জন। ছেলেরা পাঠশালার কথা মনে করিলে ভয়ে অধীর হইত। আর দুঃখিনীর পাঠশালা,—সে গুরুমহাশয়ও নাই, সে বেতও নাই, সে হাঁক ডাকও নাই—সে সকল কিছুই নাই।

ছেলেরা পাঠশালায় আসিলে,দুঃখিনী কাহাকেও বা কোলে করিয়া আদর করিলেন, কাহাকে বা বুকে চাপিয়া ধরিলেন, কাহারও বা মুখচুম্বন করিলেন। যে ছেলের গায়ে ধূলা লাগিয়াছে, নিজের অঞ্চল দিয়া সেই ধূলা ঝাড়িয়া দিলেন। যে ভাল করিয়া কাপড় পরিতে পারে নাই, তাহার কাপড় খুলিয়া আবার সুন্দর করিয়া পরাইয়া দিলেন। কেহ আসিয়াই বলিল "দিদি, আমি এসেছি।" অমনি দুঃখিনী তাহাকে কোলে তুলিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মী দাদা আমার, সোণার চাঁদ আমার, এসেছে ; বেশ বেশ, বইএনেছ। "বলত ক, খ, গ।" কেহ আসিয়া বলিল "পিসিমা, আমি আজ ত্রিশ পর্য্যন্ত গণতে শিখেছি, শুন্‌বে।" অমনি দুঃখিনী তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "বলত বাবা, উনিশ, কুড়ি, তার পর কি?" বালক অমনি বলিয়া উঠিল "একুশ, বাইশ তেইশ।"

দুঃখিনীর পাঠশালায় ছোট ছোট ছেলেদের বই ছিল না ; পাততাড়ি ছিল না; সব মুখে মুখে। প্রাতঃকাল হইতে আটটা বেলা পর্য্যন্ত দুঃখিনী এই ছোট-ছোট ছেলেদের লইয়া খেলা করিতেন এবং তাহারই মধ্যে বর্ণপরিচয়, বানান, গণিত প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন। ছেলেরা বুঝিতেও পারিত না যে, তাহারা পড়িতেছে ; তাহারা এ পড়াটীকে খেলারই অন্তর্গত করিয়া লইয়াছিল।

আটটার পরই ছোট ছেলেদের ছুটী হইত ; তখন দুঃখিনী অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সের ছেলেদের পড়া বলিয়া দিতেন। এই সকল ছেলেরা প্রাতঃকালেই পাঠশালায় আসিত। তাহারা প্রথমে ব্যায়াম করিত ; তাহার পর হাত-পা ধুইয়া আসিয়া পড়িতে বসিত। ছোট ছেলেরা বিদায় হইয়া গেলে, দুঃখিনী তাহাদের পড়া জিজ্ঞাসা করিতেন, নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেন।

পাঠশালা দুই বেলাই বসিত। অপরাহ্ণ কালে পড়াশুনা বন্ধ, তখন ছেলেরা কেবল খেলা করিত ; দুঃখিনী তাহাদের খেলা দেখিতেন। খেলা লইয়া তর্ক উপস্থিত হইলে, তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। কোন কোন দিন কোন ছেলে উচ্চৈঃস্বরে রামায়ণ কি মহাভারত পাঠ করিত, সকলে তাহা শুনিত। কোনদিন বা দুঃখিনী নিজেই রামায়ণ বা মহাভারতের গল্প বলিতেন ; কবিতা আবৃত্তি করিতেন, কোনদিন বা তিনি নানা প্রকার জীব জন্তুর কথা বলিতেন, নানা দেশের কথা বলিতেন। দুঃখিনী ইংরাজী জানিতেন না ; বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত যে কয়েকখানি পুস্তক পড়িয়াছিলেন, তাহা হইতেই তিনি উপদেশ দিতেন।

অপরাহ্ণ কালে গ্রামের বৃদ্ধেরা দুঃখিনীর এই পাঠশালায় আসিতেন, তাঁহার এই শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়া তাঁহারা চমৎকৃত হইতেন।

আর ক্ষেপা সদানন্দ,—সে এই পবিত্র বিদ্যা-মন্দিরের ইন্‌স্পেক্টর হইয়াছিল। যতক্ষণ ছেলেরা পড়াশুনা করিত বা লেখা করিত, ততক্ষণ সে তাহাদের উপর দৃষ্টি রাখিত। প্রাতঃকাল হইতে বেলা দশটা পর্য্যন্ত সে এই বিদ্যালয়ের প্রহরীর কার্য্য করিত। কোন্ ছেলে কোথায় গেল, কে কি করিল, সমস্ত সে দেখিত। দশটা বাজিলে ছেলেরা যখন চলিয়া যাইত, তখন সে সমস্ত বাড়ীটা পরিস্কার করিত ; দুঃখিনী তাহাতে বাধা দিলে তাঁহার উপর রাগ করিত, অভিমান করিত। তাহার পর দুঃখিনী যখন বাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া রামকৃষ্ণের বাড়ীতে স্নান আহারের জন্য যাইতেন, তখন সদানন্দ তাঁহার অনুসরণ করিত। দুঃখিনী রামকৃষ্ণের বাড়ীতে পৌঁছিলে, সদানন্দ

চীৎকার করিয়া বলিত—"মা, ছুটীই—।" তাহার পর সে এ বাড়ী ও বাড়ী, ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইত তাহাই খাইত ; রামকৃষ্ণ বা দুঃখিনী আহার করিতে বলিলে সে খাইত না, বলিত "ভিক্ষার জিনিস না হোলে আমার পেট ভরে না।"

অপরাহ্ণ কালে আবার যথাসময়ে সদানন্দ হাজির! সন্ধ্যার সময় দুঃখিনীকে রামকৃষ্ণের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া সে দুঃখিনীর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিত এবং তাঁহার দাবায় শয়ন করিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গান করিত, তাহার পর নিদ্রিত হইত।

সদানন্দ একটা নূতন গান বাঁধিয়াছিল। অনেকদিন সন্ধ্যার পর সে দুঃখিনীর ঘরের দাবায় একাকী বসিয়া গায়িত—

আমার এ পাঠশালার ছেলেগুলো পড়ে না।
কত কথা বলি—তারা শোনে না।
আমি বলি ওরে তোরা লেখা পড়া কররে,
সাধু-সঙ্গে থাক্ সদা, উপদেশ ধররে,
জ্ঞান উপার্জ্জন কর, আনন্দেতে কাল হর,
ধর্ম্মপথে থাক সদা, কোন কষ্ট হবে না—হবে না।
ছ'টি ছেলে ধাড়ি তারা নিজেরা পড়িবে না,
ভাল ছেলে এলে তাদের ঘরে যেতে দেবে না,
সদা করে গোলমাল, শান্ত রয় না ক্ষণকাল,
দিবানিশি বকাবকি ছাড়া তারা রয়না, রবে না।
'সদা' বলে গুরুগিরি করা হোলো বড় দায়,
এই, ছেলে ছটার হাতে পোড়ে প্রাণটা শেষে নাহি যায় ;
যে দিয়েছে গুরুগিরি,
কেঁদে তারি পায়ে ধরি,
বোল্‌বো ওগো এ ঝক্‌মারি, আমার দ্বারা হোলো না—হবার না।

ক্রমশঃ।

শ্রীজলধর সেন।

বিক্রমপুরের মেয়েলি বারব্রত।

শিক্ষা ও সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একদিন যে প্রাচীন প্রথাগুলি সমাজ-তরুকে লতার মত দৃঢ়রূপে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা দূর হইয়া যাইতেছে। যে সুন্দর সুরুচি-সঙ্গত বারব্রতের ছড়ার মধুর আবৃত্তিতে নিবিড়-তরু-ছায়া-সমাচ্ছন্ন পল্লীগুলির নিভৃত কুটীর প্রাঙ্গণ প্রতিধ্বনিত হইত, যাহার উৎসাহে বালিকাগণ ও বয়স্কা গৃহিনীগণ একদিন প্রচুর আমোদ ও শান্তি অনুভব করিতেন, এখন ক্রমশঃই তাহা অস্তগমনোন্মুখ। আমরা এখানে বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রচলিত অবিবাহিতা বালিকাদিগের আচরনীয় কতকগুলি বারব্রতের কাহিনী সংকলিত করিয়া প্রকাশ করিলাম এবং বিবাহিতা বয়স্কা স্ত্রীলোকদিগের ব্রতাদির বিষয় কেবল উল্লেখ করিয়া গেলাম, কারণ সে সকল অধিকাংশই পৌরাণিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, কাজেই সে গুলির সহিত বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের প্রচলিত ব্রতাদির সঙ্গে এক হইবার সম্ভাবনাই বেশী। শীতের কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন প্রভাতে সূর্য্যদেব পূর্ব্বগগনে দেখা দিবার অনেক পূর্ব্বে ছোট ছোট অবিবাহিতা বালিকাগণ পুকুরপাড়ে বসিয়া যখন সমস্বরে ছড়া আওড়াইতে আওড়াইতে মাঘমণ্ডল ব্রতের সূর্য্যদেবকে উঠাইতে থাকে, তখন সে ছড়া শুনিতে বড়ই মনোহর লাগে।

মাঘমণ্ডলের ব্রত।

সারা মাঘমাস এই ব্রত (বর্ত্ত) করিবার নিয়ম। পাঁচ বৎসর কাল এই ব্রত করিতে হয়। ইট, চাউল, অঙ্গার, বিল্বপত্র, হলুদ ইত্যাদি গুঁড়া করিয়া যথাক্রমে পাঁচ বৎসর পাঁচটি মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া মেয়েরা এই ব্রত করিয়া থাকে। মণ্ডলের উপরাংশে সূর্য্য, সর্ব্বনিম্নে অর্দ্ধচন্দ্র এবং মধ্যে মণ্ডল অঙ্কিত করিতে হয়। শেষ বৎসর অর্থাৎ পাঁচ বৎসরের পর ব্রত সাঙ্গ হয়। তখন বালিকাগণ ঘাট হইতে ছড়া পাড়িয়া পরে বাড়ীতে আসিয়া মণ্ডল মধ্যে লাড়ু, মধু, ঘৃত প্রভৃতি অর্পণপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠে ব্রত শেষ করে ;—

মাঘমণ্ডল সোণার কুণ্ডল
সোণার কুণ্ডলে ঢাইলা (ঢালিয়া) ঘি,

বড় মাইন্‌ষের (মানুষের) পুতের ঝি।
সোণার কুণ্ডলে ঢাইলা মৌ (১)
বড় মাইন্‌ষের পুতের বৌ।
সোণার কুণ্ডলে ঢাইলা লাড়ু,
শাখার আগে সোণার খাড়ু। (২)
চন্দন কাষ্ঠে রাধি,
জিরা তুষ ফিকি, (৩)
দোলায় আসি গোড়ায় (ঘোড়ায়) যাই
আঁকে (৪) বইসা (বসিয়া) দইভাত খাই।
চন্দ্রে সূর্য্যে দিয়া ফুল,
ভইরা (ভরে) উঠুক তিন কুল।

ব্রতিনীর কামনা এই মন্ত্রের মধ্যে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত রহিয়াছে। সে কি চায়? একান্নবর্ত্তী পরিবারের পুত্রবধূ হইতে ও বর্ত্তমান যুগের সীমন্তিনীগণের মত পাচকঠাকুরের হস্তে রন্ধনকার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া দূরে থাকা অপেক্ষা রন্ধনের ভার লইবার জন্যই সে ইচ্ছুক,আর তার শেষ কামনা—যেন পিতৃমাতৃ ও ভাতৃ এই তিন কুলের মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে বংশ বৃদ্ধি পায়।

আমরা এখানে সূর্য্য উঠাইবার ছড়াও উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সূর্য্য উঠাইবার ছড়া।

ওঠ ওঠ সূর্য্যদেব ঝিকিমিকি দিয়া,
না উঠিতে পারি আমি ইয়লের (১) লাগিয়া,
ইয়লের পঞ্চকোটি শিয়রে থুইয়া (২),
সূর্য্য উঠ্‌বেন কোনখান দিয়া ?
বামুন বাড়ীর ঘাটা দিয়া।
বামুনদের মাইয়ারা (মেয়ে) বড় শেয়ান, (৩)

(১) মধু (২) বালা (৩) রাঁধিবার সময় চুল্লির ভিতর জিরা তুষ নিক্ষেপ করা ;—বোধ হয় সম্পদ-বোধার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে। (৪) আঁকে অর্থাৎ মণ্ডলের মধ্যে। ব্রত-সমাপ্তির বৎসরে মণ্ডলে বসিয়া দুধভাত খাইতে হয়। আর 'দোলায় আসি গোড়ায় যাই"এই ঘোড়ার অংশ পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, সেকালের বিক্রমপুরবাসিনী নারীদিগের মধ্যে বোধ হয় অশ্বারোহণ প্রচলিত ছিল।

পৈতা যোগায় বেহান বেহান (৪)।
ওঠ ওঠ সূর্য্যরে ঝিকিমিকি দিয়া।

* * * * *

সূর্য্য ওঠ্‌বেন কোন্‌খান দিয়া ?
বটগাছটির আগা দিয়া,
নবীন পৈতা গলায় দিয়া,
কামরাঙা সিন্দুর কপালে দিয়া,
লাল গামছা কাঁধে কইরা (করিয়া)
ওঠ ওঠ সূর্য্যরে ঝিকিমিকি দিয়া।

* * * * *

সূর্য্য ওঠ্‌বেন কোন্‌খান দিয়া ?
বৈদ্য বাড়ীর ঘাটা দিয়া!
বৈদ্যের মাইয়ারা বড় শেয়ান,
সন্ধ্যা পূজা করে বেহান বেহান।
তার গোতলাইনা (৫) জল পুষ্করিণীতে ভাসে,
তাহা দেইখা (দেখিয়া) মালিনী ঝি খট্‌খটাইয়া হাসে।
হাসচ্‌ ক্যেনলো মাইলানী (মালিনী) ঝি তুইত আমার সই,
মাঘমণ্ডলের বর্ত্ত কর্‌তে ঘাট পাইমু কই ?
আছে আছেলো ঘাট শূদ্রবাড়ীর ঘাট

* * * * *

আমের বউল (৬) আসেরে লোচা লোচা (৭)
বাপ ভাইরে দিমু আমরা তসরের কোচা (৮)
দে দে আম গাছটি ঝল্লই (৯) দে,
দুকুড়ি ছয়টা আম লিখিয়া দে,
লিখিতে পড়িতে গোটা হইল উনা (১০)
কাইটা কুইটা ফালালো সিপাইর কাণের সোণা,
সিপাইর কাণের সোণা না লো লড়িয়ার (১১) পিত্তল,
এই বর্ত্ত করি আমরা মাঘের শীতল।

(১) কুয়াসা (২) রাখিয়া (৩) শেয়ানা (৪) ভোর (৫) ঘোলা (৬) মুকুল (৭) থোপা থোপা (৮) কাপড় (৯) ঝুলে পড়া (১০) কম (১১) খারাপ, কৃত্রিম।

মাঘের জল ফুটি টল মল করে,
উইড়া (উড়িয়া) যাইতে পক্ষীটি পুইড়া পুইড়া মরে।
হাতে লইলে ফটিক জ্বলে।
বট গাছটি মেল্‌লো পাত,

* * * * *

বট গাছটি মেল্‌লো পাত,
সূর্য্য ঠাকুর জগন্নাথ।

এই ব্রতের ছড়াগুলি অত্যন্ত দীর্ঘ, সে সকলের পূর্ণরূপে উল্লেখ করিতে গেলে উহা দ্বারাই একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচিত হইতে পারে। এ সকল ছড়ার মধ্যে অনাবশ্যক বাক্যচ্ছটা এবং অর্থহীন বহু শব্দের সংযোজনা থাকিলেও এবং কোন প্রকার ছন্দের মাধুর্য্য না থাকিলেও মাঘের দারুণ শীতের প্রভাতে পল্লীবাসিনী বালিকাগণের মুখে সুরের ঝঙ্কারের সহিত ইহা যখন উচ্চারিত হইতে থাকে, তখন আবৃত্তির মাধুর্য্যে আপনা হইতেই শ্রোতার মন মুগ্ধ করিয়া ফেলে; সে সময়ে ইহার রচনা বা অর্থের জন্য কাহারো একটা মনোযোগ থাকে না। এসকলের মধ্যে একেবারেই কোন সত্য নিহিত নাই, তাহাই বা কিরূপে বলিতে পারি? যেমন বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র রমণীকণ্ঠোচ্চারিত দুরন্ত শিশুকে ঘুম পাড়াইবার ছড়া,—

"খোকা ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে?" ইত্যাদি—

হইতে বর্গীর হাঙ্গামার চিত্রটা আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যায়, তেমনি বিক্রমপুরের প্রচলিত "থুয়া ব্রত" হইতেও একটা প্রাচীন ঐতিহাসিক চিত্র অলক্ষ্যে আমাদের হৃদয়ে ছায়াপাত করে। সূক্ষ্ম মনোবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা দেখিতে গেলে, ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই অতি গুপ্তভাবে লুক্কায়িত যে সত্য আছে, তাহার অর্থ সুস্পষ্ট প্রকাশ হইয়া পড়ে।

থুয়া ব্রত।

সমগ্র অগ্রহায়ণ মাসে এই ব্রত করিবার নিয়ম এবং চারি বৎসরে ইহার সমাপ্তি হয়। প্রতিদিন ভোরে কিছু না খাইয়া মাটির মধ্যে একটী গোলাকার গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার চারি পারে চারিটি এবং মধ্যে একটী "থুয়া" (মাটির স্তূপ) বসাইয়া ছড়া বা মন্ত্র পড়িতে হয়। ছড়া এই,—

থুয়া পূজে থুয়ানী (১)
আগুণ মাসের বৌয়ানী (২)
হাতে ঝাড়ি (৩) কাখে কলসী।

থুয়া পূজিয়া ঘরে গেলেন, মাকে নমস্কার করিতে,—মা কি আশীর্ব্বাদ কল্লেন?

আকালে (৪) ভাতন্তি (৫) হইও,
সকালে পুতন্তি (৬) হইও,
রণে আইয়ো (৭) হইও
জলে সায়তি (৮) হইও

ভাদ্রমাসের গঙ্গাজল যেমন ভরপূর থাকে,
তুমি তেমন ভরপূর থাইকো (থাকিও)।

তুষতুষালি।

সমগ্র পৌষমাস এই ব্রত করিবার নিয়ম, থুয়া ব্রতের মত এই ব্রতেও ব্রতিনী প্রাতে কিছু না খাইয়া তুষ ও গোবর দ্বারা একেকটি পিণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া মন্ত্র পাঠ করতঃ তাহার পূজা করে। মন্ত্র এইরূপ,—

তুষ তুষালি কাঁধে ছাতি,
বাপের ধন লাতিপাতি (৯)
ভাইর ধন লাস পাশ,
সোয়ামির ধন টগর বগর (১০)
পুতের ধন অতি ঝগর (১১)
অষ্টবর্ণের (১২) গোবর,
নবান্নের তুষ,
বিয়া কর স্বর্গের উপর,

(১) ব্রতিনী (২) বধূগণ (৩) গাড়ু (৪) দুর্ভিক্ষ (৫) ভাতন্তি অর্থাৎ বহু অন্নবিশিষ্ট,—অন্নদানপরায়ণা অন্নপূর্ণা হইও অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের সময়েও যেন তোমার ভাণ্ডার পূর্ণ থাকে। (৬) পুত্রবতী (৭) এয়ো, অর্থাৎ যদি তোমার স্বামী যুদ্ধেও যায় তথাপি তুমি এয়ো থেকো, ইহার অর্থে বুঝায় যেন স্বামী রণজয়ী হইয়া আইসে। বোধ হয়, যখন এই ব্রত প্রচলিত হয়, তৎকালে বিক্রমপুরবাসীগণ যুদ্ধ করিতে যাইতেন; চাঁদকেদার রায়ের মাতৃভূমিতে ইহা অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয় না। (৮) সায়তি অর্থাৎ তুমি জলে পূর্ণ হইও।
(৯) বৎসামান্য (১০) প্রচুর (১১) কলহপূর্ণ (১২) বলদ (১৩) চুল্লী। (১৪) অর্থাৎ

গাই বিয়ন্ত,
আখা (১৩) জ্বলন্ত,
ঢেঁকি পড়ন্ত,
সন্ধি বিলাস (১৪),
পাট কাপড়খানা রাত্রিবাস। (১৫)

স্ত্রীলোকের পক্ষে চিরদিনই যে পিতৃধন, ভ্রাতৃধন ও পুত্রধন অপেক্ষা স্বামীর ধন আদরণীয় ও তাহাতেই স্ত্রীলোকের অধিকার বেশী, এই ব্রতের ছড়া হইতে কি তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না? এ সকল ছড়া যে নারীসুলভ অন্তর্দৃষ্টির সহিত রচিত তাহাতে সন্দেহ করিবার কি কোন কারণ আছে?

ফাগুন কুণা।

সারা ফাল্গুন মাস ব্যাপিয়া এই ব্রত করিবার রীতি প্রচলিত আছে। চারিবৎসরে ইহা সাঙ্গ হয়। প্রত্যূষে ফল্গু দ্বারা মণ্ডলাঙ্কিত করিয়া এই ব্রতের মন্ত্রোচ্চারণ করিতে হয়। মন্ত্রের শেষ চরণেই ব্রতিনীর কামনা পরিব্যক্ত রহিয়াছে।

ফাগুণ কুণা গুণ ফাগুণা,
গুণনিধি ছৈল (১) গুয়া (২) লইল পান,
ঘাটে দোলা পথে ঘোড়া,
উঠানে ফাগুন কুণা,
খাটালে (৩) খাট,
মাইজালে (৪) ভোজন পাট (৫)
তিল-তুলসী রাত্রে,
দ্বি-তুলসী পাত্রে,
ইন্দ্র রাজা জিজ্ঞাসা করেন ধর্ম্মরাজার ঠাই (৬)

এমন পরিবারে তোমার বিবাহ হউক যেখানে গাই বিয়ন্ত, আখা জ্বলন্ত এবং ঢেঁকি পড়ন্ত, আর বিলাসিতার মধ্যে সন্ধি—সংসারে যাহাদের সহিত ঘর করিতে হইবে, তা কে জানে ভাই-ভাজ, কে জানে স্বামীপুত্র, কে জানে যা-নন্দ, দেবর-ভাশুর, শ্বশুর-শাশুড়ী, আর কে জানে পাড়াপড়শী, তাহাদের সঙ্গে সন্ধি অর্থাৎ প্রীতি এবং (১৫) রাত্রিবাসের কাপড়খানা পাট কাপড় হইলেই হ'ল'—সে যুগ এখন কোথায়?

(১) ছোলা (২) সুপারি (৩) পশ্চাৎ দুয়ারে (৪) গৃহের পশ্চাৎদিকের অংশে (৫) স্থান (৬) কাছে (৭) বালিকারা।

ঐ পাড়ার বালিরা (৭) কিসের বর্ত্ত করে?
চাইর (চারি) বছর ধইরা (ধরিয়া) তারা ফাগুণ কুণা করে।
ভাই আমার লক্ষীশ্বর,
বাপ আমার রাজা।
ফাগুণ কুণায় দিয়া ফুল,
ভইরা উঠুক তিন কুল।

তারাব্রত।

মাঘ মাসের প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে এই ব্রত করিতে হয়। প্রতিদিন একেকটি মণ্ডলের মধ্যে চন্দ্র, সূর্য্য ইত্যাদি অঙ্কিত করিবার নিয়ম। প্রথম বৎসর চারিটি, দ্বিতীয় বৎসরে আরও চারিটি, তৃতীয় বৎসরে আরও চারিটি সরা খই, গুড়, মোয়া, (মোদক) ক্ষীরের লাড়ু ইত্যাদি দ্বারা পূর্ণ করিয়া মণ্ডলের চারিধারে রাখিতে হয়—এই ব্রতও চারিবর্ষে সাঙ্গ হইয়া থাকে। সংক্রান্তি-দিবসে অন্নের পরিবর্ত্তে দধি ও খই ভোজন করিতে হয়। মন্ত্র বা ছড়া এইরূপে কথিত হইয়া থাকে;—

এক তারা দুই তারা * * * ষোলতারা পূজি।
ষোল ষোল তারা তোমরা হইয়ো সাক্ষী।
ঘৃত দিয়া করি আমি পঞ্চগ্রাসী (১)।
সাগর আন কাগর আন (২)
ষোল দ্বারের ভূজ্যি (৩) আন,
ষোল ঘরের ষোল ব্রতী,
আমি তাদের অধিপতি।

শঙ্কর জিজ্ঞাসেন—গৌরী তারা পূজি কি কি ফল পায়? গৌরী বলেন,

শঙ্কর হেন স্বামী পায়,
কার্ত্তিক গণেশ পুত্র পায়,
লক্ষ্মী সরস্বতী কন্যা পায়,
নন্দী ভৃঙ্গী নফর পায়,
জয়া বিজয়া দাসী পায়।

(১) পঞ্চগ্রাস ভোজন করা। (২) "সাগর আন কাগর আন' অর্থে ব্রতের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আনয়নের অর্থ বুঝাইতেছে। (৩) ভোজ্যি (৪) নর্ত্তকী।

ষোল ব্রতীর হাতে ষোল সরা দিয়া,
আমি যাই ইন্দ্রপুরে নাটুয়া (৪) হইয়া।

ব্রতের ফল শ্লোকেই ব্যাখ্যাত রহিয়াছে।

যমপুকুরের ব্রত।

বিক্রমপুরে যমপুকুরের ব্রতের প্রচলন খুব বেশী। কার্ত্তিক মাস এই ব্রতের সময়। ঘরের বহির্ভাগে একটী ছোট পুকুর কাটিয়া তাহার চারি পার্শ্বে ধান, মানকচু, হলুদ ও কলাগাছ রোপণ করিয়া প্রাতে কিছু না খাইয়া এক মাসকাল এই ব্রত করিবার নিয়ম। মাটির দ্বারা কাক, চিল, কুম্ভীর, যমরাজার মা ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া খনিত পুকুরের জলে স্নান করাইতে হয়। ব্রতকথা এইরূপ;—এক শ্বাশুরী তাহার পুত্রবধূকে এই ব্রত করিতে না দেওয়ার পাপে, মৃত্যুর পরে তাহার প্রেতাত্মার উদ্ধার হয় না। পরে তিনি পুত্রকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন যে বধূকে ঐ ব্রত করিতে না দেওয়ায় তাঁহার প্রেতাত্মার উদ্ধার হইতেছে না। পুত্র স্বপ্ন দেখিয়া স্ত্রীকে ঐ ব্রত করিতে অনুরোধ করিল; কিন্তু বধূ এখন সুযোগ বুঝিয়া বলিল যে সোণার পুতুল ও দুধের পুকুর না হইলে সে ব্রত করিবে না। মাতৃ-মুক্তি-প্রয়াসী সন্তান অবশেষে স্ত্রীর প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে বাধ্য হন, তৎপরে বধূ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রত করে। মন্ত্র এই;—

ওলো ওলো ক্ষুদিরা ধাই, ধানতলা না দিলি ঠাঁই,
" " " " মানতলা " "
" " " " কলাতলা " "
" " " " হলুদতলা " " ইত্যাদি।

জীবিতকালে শ্বাশুরী বধূকে ব্রত করিতে দেয় নাই, কাজেই শাশুরী বধূ কর্ত্তৃক তুচ্ছার্থে "ক্ষুদিরা ধাই" প্রভৃতি অবজ্ঞাসূচক সম্বোধনে সম্বোধিত হইয়াছেন। এই ব্রত দ্বারা বালিকাদের কোমল হৃদয়ে শৈশব হইতেই শাশুরীর প্রতি যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব সঞ্চার করিয়া দেয়, তাহা কোনরূপেই অভিপ্রেত নহে। প্রাচীন কালে শাশুরীগণ পুত্রবধূর প্রতি যে সকল নির্ম্মম অত্যাচার করিতেন, বোধ হয় তাহারি ফলে কোনও সুচতুর পুত্রবধূ কর্ত্তৃক এই ব্রত প্রবর্ত্তিত হইয়া সেকালের বধূগণের সান্ত্বনার কতকটা কারণ হইয়াছিল। ব্রতের ফল—শাশুরীর সদ্গতি লাভ।

নাটাই মঙ্গলচণ্ড।

অগ্রহায়ণ মাসে প্রতি রবিবারে এই ব্রত করিতে হয় এবং ব্রতশেষে পিষ্টক ভক্ষণ করিবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এই ব্রতকথা কবিকঙ্কণ মুকুন্দ রামের চণ্ডীনামক বিখ্যাত গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে—ব্রতের ফল চণ্ডীর অনুগ্রহ-লাভ।

মনসা ব্রত।

শ্রাবণ মাসে এই ব্রত করিবার নিয়ম, চারি বৎসরে ইহার সমাপ্তি হয়। ব্রতকথা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং কেতকী ক্ষেমানন্দ প্রণীত লখীন্দর বেহুলার কাহিনী হইতে ইহা গৃহীত। শ্রাবণ মাসের শুক্লা ও কৃষ্ণা পঞ্চমী এবং আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে এই ব্রত করিতে হয়। সর্পভয় নিবারণের নিমিত্তই এই ব্রত করিয়া থাকে।

ত্রিভুবন চতুর্থী।

মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীর পূর্ব্বদিন এই ব্রত করিতে হয়, ইহাও চারি বৎসর করিবার নিয়ম। কাঁটালের পাতার উপর নিম্নলিখিত রূপ লিখিতে হয়—

আগুণের চাউল, পেঁযের সরাটোপা, মাঘের পাণি,
অমুকে যে বর্ত্ত করে ত্রিভুবনে জানি।

কোন কোন স্থানে ইহাকে বরদা চতুর্থীও বলে। এতদ্ব্যতীত বয়স্কা স্ত্রীলোকগণ জামাই ষষ্ঠী, শীতলা-নিস্তারিনী, জ্বরাজ্বরি, (জ্বরারির অপভ্রংশ নয় ত? এই ব্রত সাধারণতঃ জ্বর নিবারণোদ্দেশে করা হয়) প্রভৃতি করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া আশ্বিন কিম্বা কার্ত্তিকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, অগ্রহায়ণ মাসে ইয়াতলি, চৈত্রমাসে ঝলকা ব্রত করা হইয়া থাকে। শীতলা বসন্তরোগের, ঝলকা ওলাউঠার, ইয়াতলি ফোটপাঁচড়া ইত্যাদির প্রতিষেধস্বরূপ করা হয়। পৌরাণিক ব্রত সকলের মধ্যে জলদান, ফলদান, অনন্তব্রত, ললিতা সপ্তমী, দুর্ব্বাষ্টমী, তালনবমী—এগুলি সধবা ও বিধবা উভয়েরই করণীয়, আর সাবিত্রী-ব্রত, অক্ষয়সিন্দুর, পঞ্চমীব্রত, দধি-সংক্রান্তি, এয়োসংক্রান্তি ব্রত সধবাগণ করিয়া থাকেন।

নিরাকুল পরমেশ্বরী, মুস্কিল আসান প্রভৃতি আরও কয়েকটি ব্রত বিক্রম-পুরের স্থানবিশেষে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, এই ব্রত দুইটির কথা অত্যন্ত দীর্ঘও সুন্দর। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, সেজন্য এবার আর উল্লেখ করিলাম না, বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

দিন দিন এই বারব্রতগুলি উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই অর্থহীন এ সকল ছড়াপাঁচালীকে নিতান্ত তুচ্ছজ্ঞানে ঘৃণা করিয়া আসিতেছেন এবং নিজ নিজ কন্যাভগিনীগণকে যত্নপূর্ব্বক উহাদের নিকট হইতে দূরে রাখিতেছেন; ইহা যে কোন্ হিসাবে ন্যায়সঙ্গত তাহা বুঝিতে পারি না। যাহা এতদিন বংশপরম্পরায় শত বাধা-বিঘ্ন ও পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়াও আপনার অস্তিত্ব কোনও রূপে রক্ষা করিয়া আসিতেছে তাহা কোন প্রকারেই উপেক্ষনীয় নহে। আপনার দেশকে ও আপনার মাতৃভূমিকে ভাল করিয়া জানিতে হইলে. তাহার প্রত্যেক বিষয়কেই তুচ্ছ না করিয়া সাদরে গ্রহণ করতঃ উহার ভালমন্দ বিচার পূর্ব্বক যত্নের সহিত গ্রন্থিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। নবীন সভ্যতার সংঘর্ষে এ সকল ব্রত যাহাতে লুপ্ত হইয়া যাইতে না পারে, সেজন্য আমাদের সর্ব্বতোভাবে মননিবেশ করা উচিত।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

হেমন্তের পল্লী-ছবি।

মধুর হেমন্ত-প্রাতে আমার পল্লী জননীর কুটীরদ্বারে উপনীত হইয়া,তাঁহার স্নিগ্ধ অভিরাম মূর্ত্তি দেখিয়া মায়ের সেই শস্যশ্যামল চরণতলে, আমার প্রবাস-ক্লেশ-দগ্ধ প্রাণ, মুগ্ধভাবে লুটাইয়া পড়িল। আমার তৃষিত নয়ন মায়ের সেই মোহিনী বেশ দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অনিমিষভাবে সে শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিল। কে বলে আমার জননী কাঙ্গালিনী, কে বলে আমার জননী দীনা ও হীনা? মা আমার শিশির-স্নাতা হইয়া বালার্ক সিন্দূর-ফোঁটা ধারণ করিয়াছেন এবং হরিৎ বসনাবৃত হইয়া তাঁহার সুবর্ণ অঞ্চলখানি মাঠে মাঠে ধান্যক্ষেত্রে বিছাইয়া দিয়া হাসিতেছেন। এই অতুল শস্যপ্রসবিনী, অনন্ত সম্পদশালিনী জননীকে আমি কখনই কাঙ্গালিনীরূপে ধ্যান করিতে পারি না। ধনীর গগনস্পর্শী প্রসাদ শিখরারূঢ় হইয়া বহু জনাকীর্ণ নগরের কর্ম্ম-কোলাহলের ভিতরে যে আনন্দ,যে তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই; আজ আমার এই ক্ষুদ্র পল্লীর ক্ষুদ্র কুটীরদ্বারে সেই অভিনব সুখ—অনির্ব্বচনীয় শান্তি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি।

পল্লীপ্রান্তে সুবিশাল তিন্তিড়ী বৃক্ষে কোড়াল পাখী চিৎকার করিয়া ঊষা-গমন বার্ত্তা পল্লীবাসীকে জানাইয়া দিল, দোয়েল, ফিঙ্গা, সালিক প্রভৃতি বিহঙ্গ

ঊষাকীর্ত্তন করিয়া সুপ্তোত্থিতের কর্ণে সুধাবর্ষণ করিল। পল্লীবধূরা প্রিয়তমের অঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া ক্লিষ্টমনে আকুল কুন্তল ও বসন সংযত করিয়া লইয়া, বেলা হইল ভয়ে 'সরম-জড়িত চরণে' কলসী-কক্ষে দলে দলে পুষ্করিণীর ঘাটে আসিয়া সম্মিলিত হইল; যেন তাহারা ঊষাবধূকে সম্ভাষণ করিয়া কলহাস্যে পল্লীপথ মুখরিত করিতে করিতে পূর্ণকুম্ভ কক্ষে হেলিয়া দুলিয়া আপন আপন কলসীতে 'চলৎ চলৎ খলৎ খলৎ' রাগিনী তুলিয়া চলিয়া গেল। রাখালগণ ধেনুর পাল লইয়া গোচারণের মাঠে যাইতে যাইতে মধুর সুরে গাহিল-"আয়রে কানাই, আয় গোঠে যাই, বাজায়ে মোহন বেণু"। তাহাদের সেই সঙ্গীত-লহরী কর্ণে প্রবেশ করিয়া কত যুগযুগান্তরের মধুর স্মৃতি মনে জাগাইয়া তুলিল। গৃহস্থের ঘরে ঘরে গো-দোহনের মধুর শব্দে প্রাণে পুলকের সঞ্চার হইল।

ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল এবং ক্ষুদ্র পল্লীটি ধীরে ধীরে কর্ম্মচঞ্চল হইয়া পড়িল; কিন্তু তাহার ভিতরে নগরের সেই ব্যাকুল অস্থিরতা এবং ভীষণ চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইল না। ধীবররমণীগণ মৎস্য লইয়া প্রতি বাড়ীতে ভ্রমণ করিয়া কুলবধূদের নিকট তাহা ধান্যের বিনিময়ে গোপনে বিক্রয় করিতে লাগিল; গোয়ালিনীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃৎভাণ্ডপূর্ণ দধি মাথায় করিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে লাগিল, পল্লী ফিরিওয়ালা পান তৈল লবণ চিনি ডাল পাড়ায় পাড়ায় হাঁকিয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে নিত্যাবশ্যকীয় তৈজসসম্ভার ঘরে বসিয়াই সকলে পাইতেছে। দেখিলাম, কোনও বিলাস সামগ্রীর প্রতি কাহারও কোনও ঝোঁক নাই বলিয়া সে সকল দ্রব্য গ্রামে প্রবেশ করিতে পারে না। দেশের মোটা ভাত ও মোটা কাপড়েই সকলে সুখী।

নদীর ঘাটের এক প্রান্তদেশে রজক আপনার মনে 'হিস্ হিস্' রব তুলিয়া কাপড় কাচিতেছে। স্নানের ঘাটে পুনরায় রমণীগণ সম্মিলিত হইতে লাগিল। বালকবালিকারা জলক্রীড়ায় নদীর জল কর্দ্দমাক্ত করিয়া তুলিল; তাহাদের জননীরা উহাদিগকে বাক্যে নিবৃত্ত করিতে সক্ষম না হইয়া হাল ছাড়িয়া দিলেন, যুবতীরা কেহ কেহ স্বামীসোহাগের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া স্নানের কথা, গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তনের কথা বিস্মৃত হইয়া গেলেন; কেহ কেহবা সমবয়স্কাদিগের নিকট আপন দুর্ভাগ্যের কথা বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। কোনও সুন্দরী জলে আপন সৌন্দর্য্যের প্রতিবিম্ব দেখিয়া মুচ্‌কি হাসিলেন, চঞ্চলস্বভাবা রমণী স্রোতে কলসী ভাসাইয়া তাহা আনিবার অছিলায়, ক্ষুদ্র বীচিমালায় চন্দ্রকিরণের ঝিকি-মিকি

খেলার ন্যায় একটু সন্তরণ করিয়া লইলেন; মুখরাগণ ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া নদী-সৈকত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন; কাহারো মুণ্ডপাত, কাহারো জীবন্তে নরক এবং কাহারো বা সর্ব্বনাশের ব্যবস্থা চলিতে লাগিল।

গাভীগণ বৃক্ষছায়ায় শুইয়া চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতেছে এবং কেহবা আপন বৎসের গাত্র লেহন করিতেছে। রাখাল নিকটবর্ত্তী বৃক্ষারোহন করিয়া আপন মনে বংশীনিনাদ দ্বারা স্তব্ধ মধ্যাহ্নের কর্কশ নীরবতায় মধুসিঞ্চন করিতেছে। চাষিগণ পক্কধান্য ছেদন করিতেছে এবং মার্ত্তণ্ড-তাপ-ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া সহাস্যমুখে তাহা মস্তকে গ্রহণ করিয়া গৃহ-প্রাঙ্গণে আনিয়া সজ্জিত করিতেছে।

পল্লীবধূ সন্ধ্যা সমাগম দেখিয়া প্রজ্জ্বলিত দীপ হস্তে গৃহে গৃহে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়া ও সুমঙ্গল শঙ্খধ্বনি করিয়া পাড়া মুখরিত করিলেন; প্রাচীনারা ধূপ-ধূনা জ্বালিয়া মঙ্গলারতীর আয়োজন করিলেন, গাভীগণ হাম্বারবে গৃহে প্রত্যাগমন করিল; পাখীগুলি কাকলী তুলিয়া আপন আপন কুলায় প্রবেশ করিল।

বৃদ্ধ ঠাকুরমা বালকবালিকা-বেষ্টিতা হইয়া "এক যে রাজা"—বলিয়া গল্প জুড়িয়া দিলেন। কৃষক দিনমানে পরিশ্রম করিয়া যে সকল ধান কাটিয়া আনিয়া পুঞ্জীকৃত করিয়া রখিয়াছিল, এখন তাহা গোসাহায্যে মারাইয়া ধান গুলিকে বাছিয়া বাহির করিতেছে, কৃষক-বধূ মাঝে মাঝে স্বামীর ধূম্রপানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, তাহার পরিশ্রমে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে এবং আপন হস্তে সেই ধান উঠাইয়া লইয়া লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া রাখিতেছে। বর্ষব্যাপী-ক্ষুৎপিপাসা কাতর কৃষকের শীর্ণ মুখে এখন একটু-হাসির ক্ষীণরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

হেমন্তের এই সুন্দর দিনে এই মধুর দৃশ্য দেখিয়া আমার মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। প্রতি গৃহে, প্রতি মাঠে, প্রতি দৃশ্যে আজ আমার দেশ-জননীর মোহিনীমূর্ত্তি দেখিয়া আমার মন তাঁহারই চরণে বিলীন হইয়া গেল। আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বার বার তাঁহার পুণ্যচরণে প্রণাম করিলাম এবং বলিলাম——

"তোমার বুকে জনম আমার,
তোমার বুকে বাস,
জনম জনম যেন, মাগো,
হই তোমার দাস।

শ্রীললিতকৃষ্ণ ঘোষ।

কাব্য ও দর্শনের সমস্যা।

নক্ষত্রমণ্ডিত আকাশ দেখিতেছিলাম। কি বিপুল কাণ্ড! কি বিরাট ব্যাপার! গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, তারার শ্রেণী! তারার পরে তারা, তার পরে তারা, লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী—কে ইয়ত্তা করিবে? আর ওই যে নীহারিকা, উহার মধ্যে কত তারা কে জানে? কতক গঠিত হইতেছে কতক বা এখনও হয়-ই নাই; গর্ভস্থ ডিম্বের ন্যায় কেবল অনন্ত ছায়া-পথের ভিতর লুক্কায়িত। এই যে আমাদের পৃথিবী অগণিত নদ-নদী-সাগর-পর্ব্বত-প্রান্তর-মরু পরিপূর্ণ—বিচিত্র জীব নিষেবিত, ইহার বিশালতাই আমরা সম্পূর্ণ-রূপে অনুভব করিতে পারি না। আর এরূপ পৃথিবী—এর চেয়ে লক্ষ লক্ষ কোটী গুণ বৃহৎ কত পৃথিবী আছে! অনেকে হয় ত এতদূরে যে, সে স্থান হইতে এ পর্য্যন্ত অনেকে এ পৃথিবীতে পৌঁছায় নাই! আর অগণিত পৃথিবী তারা, গ্রহ, নক্ষত্র ইহারা সকলে মিলিয়া এই বিশাল অনন্ত শূন্যে কি প্রচণ্ড বেগেই আবর্ত্তন করিতেছে। হয় ত পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাতে কত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। কি বিপুল কাণ্ড! ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়, মন অবসন্ন হইয়া পড়ে!

ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল, এই যে বিশাল অনন্ত আকাশের কথা—তারা গ্রহ নক্ষত্রের কথা, এসব ভাবিতেছে কে? যে এ সব চিন্তা করিতেছে সেও ত সামান্য শক্তি নয়? এই অনন্ত কাণ্ড—বিরাট ব্যাপার এ যে ধারনায় আনিতে পারে, কল্পনা করিতেও সাহস পায়, সেও ত নিতান্ত ক্ষুদ্র বস্তু নহে; বরং সেও ইহাদিগেরই মত একটা অনন্ত ব্যাপার! এই আমার মধ্যে যে ভাবিতেছে, সে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের নক্ষত্ররাশির ন্যায় কত চিন্তা, কত ভাব, কত কল্পনার সমষ্টি তাহারই বা কে ইয়ত্তা করিতে পারে? তাহার অতীত কি বিস্তীর্ণ—তাহার ভবিষ্যৎ কি গভীর রহস্যময়—আর তাহার বর্ত্তমান কি বৈচিত্র্যের লীলাভূমি!

ঐ বিশাল ব্রহ্মাণ্ড এবং এই আমার বিচিত্র মন ইহারাই বা কোথা হইতে আসিল? ঐ যে কোটী কোটী তারার সমষ্টি উহাই বা কি শক্তি হইতে উদ্ভূত, কি শক্তি বলে ধৃত হইয়া আছে? এই আমার বিচিত্র মন ইহারই বা উৎপত্তিস্থিতির কারণ কি? আমার মন যে ঐ বিপুল

ব্রহ্মাণ্ডের কথা ভাবিতেছে, তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হইতেছে? আমার মন যখন ঐ বিশ্বের বিষয় ভাবিতে পারিতেছে, তখন নিশ্চয় আমার মনের সঙ্গে আর ঐ বিশ্বের সঙ্গে কি একটা সামঞ্জস্য বা সম্বন্ধ আছে; নহিলে আমার ভাবা সম্ভব হইতে পারিত না। সে সম্বন্ধই বা কে স্থাপন করিল? আমার বিচিত্র মন এবং ঐ বিপুল ব্রহ্মাণ্ড এই দুইয়ের পরপারে কোন অনন্ত বিচিত্র শক্তি রহিয়াছে, যাহা ইহাদিগকে নিয়মিত চালিত করিতেছে—ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ঘটাইতেছে।

তিনই রহস্য! তিনটীই বিষম সমস্যা। কে এই রহস্যের ভেদ করিবে? কিরূপে এই সমস্যার সমাধান হইবে?

প্রথম বা বাহিরের সেই রহস্যকে আমরা সংক্ষেপে নাম দিব জগৎ বা ব্রহ্মাণ্ড। দ্বিতীয় বা অভ্যন্তরের রহস্যকে বলিব জীব বা আত্মা। তৃতীয় বা জীব ও জগতের পরপারের সেই রহস্যকে বলিব ব্রহ্ম বা অনন্ত।

জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম। এই তিন বিপুল রহস্য—এই তিন জটিল সমস্যা। মানুষকে এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। ইহাদিগের পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইবে।

আমি কে? আমার ভিতর এ চিন্তা করিতেছে কে? আমার ভিতর এই যে কত কল্পনা, কত চিন্তা, কত অনুভূতি, কত ইচ্ছা, কত স্মৃতি, আশা, উল্লাস, আনন্দ এ সবের প্রসূতি কে? এই বিভিন্ন বৈচিত্র্যের ভিতর ডুবিয়া আমি ত দিশাহারা হইয়া যাই নাই—আমি ত ইহাদিগের ঘূর্ণীপাকের ভিতর নিক্ষিপ্ত হইয়া দিশাহারা হইয়া যাইতেছি না! এই বৈচিত্র্য, এই বিভিন্ন ভাবরাশি ইহারা কোন ঐক্যের ভিতর সংযত হইয়া আছে—কোন এক মিলন রজ্জুতে ইহাদিগের সকলকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে? সে ঐক্য কি? ইহাই হইতেছে—প্রথম সমস্যা। ইহাকেই আমরা বলিতেছি জীব বা আত্মার সমস্যা।

এই যে আমার মন চিন্তা করিতেছে, ভাবিতেছে, ইচ্ছা করিতেছে কাহাকে লইয়া? কাহাকে অবলম্বন করিয়া আত্মা বা জীব এই কল্পনা, ইচ্ছা, চিন্তা, ক্রিয়ায় বিকাশ পাইতেছে? আত্মা বা জীব যদি শুধু এক থাকিত—তবে ত তাহার এই চিন্তা, ভাব বা শক্তির অবসরই হইতে পারিত না। একটা কিছু আছে বলিয়া বোধ হইতেছে, যাহার উপর নির্ভর করিয়া সে এই আত্মক্ষমতার পরিচয় দিতেছে। সে একটা কিছু কি? আমার

যাহা কিছু সকলই ত সেই একটা কিছুর ভিতর। আমার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের বিষয়ীভূত যত কিছু সবই সেই প্রকাণ্ড একটা কিছুর ভিতর। এই বিপুল একটা কিছুর নামই আমরা বলিতেছি—জগৎ। এই জগতই বা কি? ইহার স্বরূপ কি? প্রকৃতি কি? ইহার সঙ্গে আমার এই বিচিত্র সম্বন্ধের কারণ কি? ইহাই—দ্বিতীয় রহস্য। এই রহস্যের নাম আমরা বলিব—'জগৎ-রহস্য'।

আবার, এই যে জীব ও জগৎ, ইহাদিগের পরস্পরের সম্বন্ধ-নির্ণয় করিতে যাইয়া আর একটা রহস্য আসিয়া পড়ে। জীব ও জগতের এই পরস্পরের সম্বন্ধের কারণ কি? আপাততঃ জীব ও জগৎ ইহাদের সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাপার বলিয়াই ত বোধ হয়। একটী অন্তরের, আর একটী বাহিরের। একটী চিন্তা করিতেছে,—আর একটী চিন্তার বিষয় বা উপলক্ষ্য। একটী স্ব-প্রকাশ, আর একটীকে প্রকাশ করিয়া তুলিতে হইতেছে। তবে কেমন করিয়া এই দুই আপাতবিভিন্ন ব্যাপারের ভিতর এমন মিল বা ঐক্য হইল—এমন সম্বন্ধ স্থাপিত হইল? সে ঐক্যের মূল কোথায়? সে সামঞ্জস্যের আধার কিরূপ? সুতরাং দেখিতে পাইতেছি যে, জীব-রহস্য ও জগৎ-রহস্যের সমাধান করিতে যাইয়া আর একটী বিপুল রহস্য আমাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িতেছে। এই জগৎ বা জীবকে দেখিলেই আমাদের সম্পূর্ণ দেখা হইল না—ইহার বাহিরে আর একটা কিছু দেখিতে হইবে। এই যে ব্রহ্মাণ্ড ও আত্মা ইহাদিগকে বুঝিলেই ত হইবে না, ইহার উপরে আরও বুঝিবার বস্তু আছে। এই স্ব-প্রকাশ ও অ-প্রকাশ ইহার ভিতরেই সব কথার মীমাংসা হইতে পারে না—ইহাদিগের অন্তরালে বোধ হয় কোন পূর্ণ প্রকাশ আছে—যাহার মীমাংসা করিতে হইবে—যাহার মীমাংসাতেই ইহাদিগের মীমাংসা সাধিত হইবে। এই যে রহস্যের উপর রহস্য—অতীন্দ্রিয় গভীর দুর্জ্ঞেয় রহস্য ইহা কি? এই যে আলো ও অন্ধকারের পর-পারবর্ত্তী দুর্নিরীক্ষ্য অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ ইহার স্বরূপ কি? ইহা আমাদিগকে বলিতে হইবে। দৃশ্যমান্ ও চিন্ত্যমান্ সমস্ত অতিক্রম করিয়া সেই রহস্যময় অজ্ঞাত রাজ্যের সংবাদ আনয়নের চেষ্টা করিতে হইবে। নহিলে কিছুরই মীমাংসা হইবে না—কেন না সমস্ত মীমাংসার—সমস্ত রহস্যের মূল বা আদি বোধ হয় তাহাই। এই রহস্যের উপর রহস্য—বিপুল দুর্জ্ঞেয় রহস্যকেই আমরা বলিতেছি—ব্রহ্ম রহস্য।

সাধারণতঃ আমরা দুই প্রকার সত্তার অনুভব করিতেছি। একটী বহির্জ্জগতের অপরটী অন্তর্জ্জগতের। একটী বহিরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, অন্যটী অন্তরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। একটী নিজে প্রকাশ হইতে পারিতেছে অন্যটী তাহা পারিতেছে না—অন্যের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। একটী ক্রিয়া করিতেছে, অন্যটী ক্রিয়ার বস্তু বা বিষয়। একটী দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, আঘ্রান ও মনন করিতেছে—অন্যটী দৃশ্য, স্পৃশ্য, শ্রাব্য, ঘ্রেয় ও মননের বিষয়। একটী কর্ত্তা (Subject) ; অন্যটী ক্রিয়ার বিষয় বা বস্তু (Object)। সহজ কথায় একটীকে আমরা বলি চৈতন্য, অন্যটীকে বলি জড়। আপাতদৃষ্টিতে জগৎ এই দুইরূপ সত্তার লীলাভূমি—জড় ও চৈতন্যের সঙ্গমস্থল। আমার এই ক্ষুদ্র দেহই তাহার প্রমাণস্থল। আমার এই বাহিরের দেহে জড়ের বিকাশ—আর আমার ভিতরে থাকিয়া যে এই দেহের উপর লীলা করিতেছে—ইচ্ছা করিতেছে, কার্য্য করিতেছে, চালনা করিতেছে তাহাকেই ত বলিতেছি চৈতন্য। এইরূপ জগতের সর্ব্বত্র। এই জড় ও চৈতন্যের সম্বন্ধ কি? জগদ্‌রচনা কিরূপে হইয়াছে? কেবল কি জড়ই সত্য—চৈতন্য তাহারই প্রকারভেদ মাত্র? অথবা চৈতন্যই সত্য, জড় তাহার বহির্ব্বিকার মাত্র? অথবা ইহারা দুইই সত্য—এই দুই বিভিন্ন সত্তার সংযোগে সৃষ্টির রচনা হইয়াছে। ব্রহ্ম কি? তাহা জড় বা চৈতন্য? জড় বা চৈতন্যের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কি? এক কথায় সেই পরপারবর্ত্তী দুর্জ্ঞেয় অনন্তের সঙ্গে এই দৃশ্যমান্ ও চিন্ত্যমান জড় ও চৈতন্য সত্তার সম্বন্ধ কি? এই যে কর্ত্তা (Subject) ও বিষয় (Object) ইহাদের সঙ্গে সেই অনন্ত রহস্যের কি লীলা চলিতেছে?

ইহাই প্রশ্ন—ইহাই সমস্যা। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। মানব-সৃষ্টির প্রথম হইতে মানুষের জ্ঞানোন্মেষের আরম্ভ হইতেই, তাহার সম্মুখে এই প্রশ্ন—এই সমস্যা আসিয়া পড়িয়াছে। মানব-জ্ঞানও ইহার উত্তর দিতে—ইহার সমাধান করিতে চেষ্টা করিতেছে। নানাভাবে, নানা আকারে, নানা ভাষায় মানুষের এই চেষ্টা ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছে। এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়া সে থাকিতেই পারে না,—এই রহস্যের সমাধানের চেষ্টা না করিয়া সে বাঁচিতেই পারে না। কাব্য, দর্শন ও বিজ্ঞান বিভিন্ন ভাবে এই প্রশ্নেরই উত্তর চেষ্টা—এই রহস্যেরই সমাধানের প্রয়াস করিতেছে। কাব্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের ভিতর দিয়াই মানব-জ্ঞান তাহার

সম্মুখস্থ এই বিরাট রহস্যের আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কাব্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের ভিতর দিয়াই তাহার যুগযুগান্তরের তপস্যার ফল ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছে।

জড় ও চৈতন্য, অপ্রকাশ ও স্বপ্রকাশ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয়, সসীম ও অসীম—কিরূপে ইহাদের রহস্য বুঝিতে হইবে? কি প্রণালীতে এই মায়ারাজ্যের সংবাদ আনিতে হইবে—কোন পথ দিয়া প্রবেশ করিলে, এই স্বপ্নের দেশের সকল রহস্য অবগত হওয়া যাইবে? সাধারণতঃ দুইটী প্রণালী আছে বলিয়া দেখা যায়। একটীকে আমরা বলিতে পারি—নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে গমন বা আরোহণপ্রণালী—অপরটীকে বলিতে পারি ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে অবতরণ বা অবরোহণ প্রণালী। একটী জড়ের ভিতর দিয়া চৈতন্যে গমন—সসীমের ভিতর দিয়া অসীমে পৌঁছিবার চেষ্টা—স্থূলের ভিতর দিয়া সূক্ষ্মকে বুঝিবার উদ্যম ; অপরটী চৈতন্য হইতে জড়ে আগমনের প্রয়াস—অনন্তের জ্যোতিতে সান্তের পরীক্ষা—সূক্ষ্মের ভিতর দিয়া স্থূলকে বুঝিবার সাধনা। প্রথমটী বা জড় হইতে চৈতন্যে—স্থূলের ভিতর দিয়া সূক্ষ্মে যাইবার যে চেষ্টা, ইহা প্রধানতঃ বিজ্ঞানের ; দ্বিতীয়টী বা চৈতন্য হইতে জড়ে—সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে আসিবার যে উদ্যম—সেটী হইতেছে প্রধানতঃ দর্শনের প্রণালী। গঙ্গার প্রবাহকে জানিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করা যায়। দুইটী পথ আছে। হিমালয়ে গঙ্গার উৎপত্তি স্থান হইতে ক্রমাগত সাগর-সঙ্গমে আসিতে পারি অথবা সাগর-সঙ্গম হইতে উজান বাহিয়া হিমালয়ে গোমুখীতে যাইতে পারি। এই গোমুখী হইতে সমুদ্রে নামিবার পথ—দর্শনের, আর সাগর-সঙ্গম হইতে গোমুখীতে উঠিবার পথ—বিজ্ঞানের।

এই যে জড়, এই যে সসীম, এই যে স্থূল ইহা আমরা কিরূপ দেখিতে পাইতেছি? আপাতদৃষ্টিতে আমরা দেখিতেছি—ইহা বৈচিত্র্যের রঙ্গভূমি। ইহার ভিতর যেন বন্ধন নাই, শৃঙ্খলা নাই, ঐক্য নাই। ইহা যেন নানাভাব ও অনুভূতির কেবল সমষ্টি মাত্র। ইহারা যেন পরস্পর বিপরীত-ধর্ম্মী কতকগুলি বস্তুর সংগ্রাম-দৃশ্য মাত্র ; ইহারা যেন কতকগুলি সত্তার কেবল ঘাত-প্রতিঘাত মাত্র—যেন কোন নিয়মই ইহাদিগের ভিতর কার্য্য করিতেছে না। তবে এই বিপুল পরস্পর-বিরোধের সমষ্টি কিরূপে চলিতেছে? কিসে ইহাদিগকে ধৃত করিয়া আছে? বিজ্ঞান তাহাই খুঁজিতেছে—তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিতেছে। বিজ্ঞানের দৃষ্টি সাধারণের দৃষ্টি নয়—অনুসন্ধানের

দৃষ্টি পর্য্যবেক্ষণের দৃষ্টি। বিজ্ঞান যতই অনুসন্ধান করিতেছে, যতই পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে, যতই এই বিশ্বরহস্য অধ্যয়ন করিতেছে, ততই দেখিতে পাইতেছে যে এই স্থূল বা জড় কেবল একটা বিশৃঙ্খল ব্যাপার নয়—তাহা নিয়মবন্ধনহীন, কতকগুলি সত্তার সংগ্রামভূমি নয়, তাহাদের ভিতর নিয়ম আছে—তাহাদের ভিতর শৃঙ্খলা আছে। আপাতদৃষ্টিতে বিরোধের সমস্যা যতই জটীল বলিয়া বোধ হউক না কেন—তাহারা যে একটা বৃহতের ভিতর সুসম্বদ্ধ তাহা বেস বুঝিতে পারা যায়। তাই আধুনিক বিজ্ঞান আর জগতকে কেবল বৈচিত্র্যের লীলাভূমি বলিয়াই দেখে না—এই বৈচিত্র্যের ভিতর একটা মহান্ ঐক্যের ছায়া দেখিতে পায়। আধুনিক বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই বহুর ভিতর হইতে যেন একেরই আভাস দেখিতে পাইতেছে। বিশৃঙ্খল, অসম্বদ্ধ, বহুধা জড় ও স্থূলের ভিতর দিয়া যতই উপরে উঠিতেছে ততই বিজ্ঞানের নিকট এই রহস্য যেন পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। ততই যেন বৈচিত্র্যের ভিতর ঐক্য, বহুর ভিতর এক, বিশৃঙ্খলার ভিতর শৃঙ্খলা দেখিতে পাইতেছে। অন্ধকার স্থূলের রাজ্য দিয়া যতই অগ্রসর হইতেছেন, ততই যেন সূক্ষ্ম জগতের জ্যোতির ছায়া বৈজ্ঞানিক অনুভব করিতে পারিতেছেন। ক্রমশঃ

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

অমরকণ্টক।

অনেক দিন হইতেই আমাদের অমরকণ্টক যাইবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু পথ বড় কষ্টকর বলিয়া এবং উপযুক্ত সুযোগ ও সঙ্গীর অভাবে যাওয়া ঘটে নাই। শেষে এক চৈত্রমাসে আমাদের যাইবার স্থির হইল; কারণ এই সময়ই যাইবার প্রশস্ত সময়; শীতের কঠোর প্রভাব দূর হইয়াছে ও একটু একটু বসন্তের হাওয়া বহিতেছে, সময় বড় সুন্দর ও সুবিধাজনক। গ্রীষ্মের সময় সে পার্ব্বত্য প্রদেশে দিবসে ভ্রমণ করা বড়ই কষ্টকর হইবে এবং বন্য জন্তুর উপদ্রববশতঃ রাত্রিকালে যাওয়াও নিরাপদ নহে, এই সব বিবেচনা করিয়া অনেক বাধাবিঘ্ন, আপত্তি-নিরুৎসাহ ও অক্ষম বন্ধুগণের সুপরামর্শ অতিক্রম করিয়া আমরা একদিন অপরাহ্ণে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

অমরকণ্টকই কবি কালিদাসের মেঘদূতে উল্লিখিত আম্রকুট। বিন্ধ্য-পর্ব্বতের সৈকল শাখার এক প্রশস্ত মালভূমিই আম্রকুট শিখর বলিয়া পরিচিত এবং ইহাই পুণ্যতোয়া নর্ম্মদার উৎপত্তি স্থান।

বিলাসপুর হইতে অপরাহ্ণ ৫টার সময় যে কাটনী মেল ছাড়ে, আমরা তাহাতেই যাত্রা করিলাম। কিছুক্ষণ পরেই সন্ধ্যা হইল; জ্যোৎস্না-স্নাত সেই গিরি-নদী-উপত্যকার মধ্য দিয়া বাষ্পযান যেন উল্লসিত হইয়াই গমন করিতেছিল; পথে পাহাড়ের কোলে ফোটা ষ্টেশন; অমৃতলাল নামক একজন স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা এইখানে একটী দেশলাইয়ের কল খুলিয়াছেন। স্থানটী আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত; আমরা একবার এখানে আসিয়া এই কল দেখিয়া গিয়াছিলাম এবং মহাত্মা অমৃতলালের আতিথ্য উপভোগ করিয়াছিলাম; তিনি অতি সদাশয় ব্যক্তি, যে কেহ তাঁহার কারখানা দেখিতে আসিলে, তিনি তাঁহাকে অতি যত্ন সহকারে সমস্ত দেখান এবং পরিশেষে বিশেষভাবে অতিথিসৎকারের বন্দোবস্ত করেন।

এই পরিচিত গিরি ও বন অতিক্রম করিয়া গাড়ী ক্রমে ছুটিতে লাগিল; বাসন্তী চন্দ্রিকার স্নিগ্ধালোকে সে পার্ব্বত্য প্রদেশ যেন কি এক অপরূপ ভাব ধারণ করিল, পাহাড়ের পর পাহাড় মধ্যে মধ্যে ক্ষীণসলিলা স্রোতস্বিনী। হঠাৎ গাড়ী এক অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করিল, প্রায় পাঁচ মিনিট পরে আবার যখন বাহিরে আসিল, বুঝিলাম যে উহা একটী টানেল। ইহার কিছুক্ষণ পরে প্রায় রাত্রি ৯টার সময় আমরা পেণ্ডারারোড ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। এই খানে আমরা নামিলাম; কারণ এইখান হইতেই অমরকণ্টক যাইবার রাস্তা। ষ্টেশনটী ছোট, কিন্তু বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

অমরকণ্টক বা আম্রকুট এখান হইতে প্রায় ২২ মাইল। আমাদের পরিচিত জনৈক ভদ্রলোকের একটী বাংলা আছে, পূর্ব্ব হইতেই সেইখানে রাত্রি যাপন করিবার স্থির হইয়াছিল। আমরা রাত্রে সেই খানেই আহারাদি করিলাম, স্থির হইল যে অতি প্রত্যূষে যাত্রা করিতে হইবে।

যোগাড় করিয়া বাহির হইতে আমাদের প্রায় ৪টা বাজিয়া গেল। আমরা তিনটী ভদ্র পরিবার ছিলাম, বাকী কতকগুলি স্ত্রীলোক যাত্রী এবং আমাদের চাপরাণী চাকর ইত্যাদি। আমরা তিন খানি গরুর গাড়ী ও তিন চারিটী ঘোড়া লইলাম। পেণ্ডারারোডে ইহা ভাড়া পাওয়া যায়; গাড়ীওয়ালা ও ঘোড়াওয়ালারা সাধারণতঃ দৈনিক ১৲ টাকা হিসাবে লয়। ইহা

ভিন্ন অন্য কোন যান পাওয়া যায় না।

অল্পক্ষণ পরেই প্রভাত হইল এবং আমাদের গাড়ীগুলি মহুয়া শাল প্রভৃতি বৃক্ষরাজিপরিপূর্ণ বনপথ দিয়া চলিতে লাগিল। সে পথে মানুষ চলিতে বড় দেখিলাম না। সজীব প্রাণীর মধ্যে পক্ষীগণের কলরব, মধ্যে মধ্যে দুই একটী স্ত্রীলোককে মুক্তার ন্যায় পতিত মহুয়া ফুল কুড়াইতে দেখিলাম; অনেক দরিদ্র লোক ইহাতে রুটি প্রস্তুত করিয়া খায়। কখনও বা আমরা একটু ফাঁকা জায়গা বা দুই একটী গ্রাম দেখিতে পাইলাম; কিন্তু মন সর্ব্বদা সেই সম্মুখের উচ্চ পাহাড়টীর উপর পড়িয়া আছে; উহার পশ্চাতে সেই বাঞ্ছিত স্থান; মনে হইতে লাগিল কতক্ষণে উহার শিখরে যাইব।

বেলা প্রায় ৯টার সময় আমরা পাখারিয়া নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলাম; এইখানে গাড়ী পরিত্যাগ করা হইল; গাড়োয়ানেরা বলিল—"গাড়ী আর যাইতে পারিবে না, কারণ পথ বড় বন্ধুর।" খাটিয়ার পায়া কাটিয়া স্ত্রীলোকদিগের জন্য ডুলি তৈয়ার করা হইল; স্ত্রীলোকেরা ডুলিতে ও পুরুষেরা ঘোড়ায় আশ্রয় লইল; চাকর ও অন্যান্য যাত্রী পদব্রজেই যাইতে লাগিল।

আমাদের সঙ্গে যে পাহাড়ী পথ-প্রদর্শক ছিল, পথ সংক্ষেপ করিবার জন্য সে এক জঙ্গলময় খারাপ রাস্তা দিয়া আমাদের লইয়া যাইতে লাগিল। তখন আমরা জানিতাম না যে অন্যদিকে ভাল পথ আছে, সেই পথে যাইলে প্রায় ২।৩ মাইল বেশী যাইতে হয়, এই জন্য বেহারারাও এই সংক্ষিপ্ত পথ আশ্রয় করিল। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাকে পথ বলা যায় না; মধ্যে মধ্যে মনুষ্য গমনাগমনের চিহ্ন একবারে নাই; তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা হয়; আবার সকলে মিলিত হইলে যাওয়া হয়। পথ বড় কণ্টকাকীর্ণ ও প্রস্তর খণ্ডে পরিপূর্ণ; সুতরাং সে পথে যাওয়া বড়ই কষ্টকর। পথ খারাপ বলিয়া ঘোড়া ও বেহারা কখনও কখনও আরোহীদিগকে বহন করিতে অক্ষম হয়, তখন সকলকেই আবার পদব্রজে যাইতে হয়। কখনও পদব্রজে, কখনও সওয়ারীতে এইরূপে আমরা সে বনপথ অতিক্রম করিয়া "আম্বানালায়" পৌঁছিলাম। দুইধারে দুই উন্নত গিরি, মধ্যে আম্রবৃক্ষ পরিশোভিত বনভূমির মধ্য দিয়া এক পার্ব্বত্য তটিনী প্রবাহিত ইহাকেই আম্বানালা বলে, ইহাই সেই ছন্নোপান্ত—আম্রকুটের সানুদেশ। স্থানটী বড়ই মনোরম। অমরকণ্টক যাইবার পথে সকল যাত্রীরই ইহা একটী বিশ্রামের স্থান। নালার কিছু

উপরেই একটী সন্ন্যাসী আছেন, তিনি একরকম গৃহস্থ; একটী সন্ন্যাসিনী ও কতকগুলি দুগ্ধবতী গাভী এই লইয়াই তাঁহার সংসার। সন্ন্যাসিনীরই মুখে শুনিলাম, তিনি কোন দেশ হইতে তীর্থ ভ্রমণ করিতে আসিয়া শেষে এই সন্ন্যাসীর গৃহস্থাশ্রমের সঙ্গিনী হইয়াছেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর সম্মুখে ধুনী জ্বালিয়া বসিয়া আছেন ও সন্ন্যাসিনী গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা। আমাদিগকে দেখিয়া সমাদর করিয়া বসাইলেন ও ছেলেদের জন্য তাঁহার সেই গৃহপালিত গাভীর দুগ্ধ দিলেন; আমরা তাঁহাকে কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া 'নালার' ধারে আসিলাম। কিছু জলযোগ ও বিশ্রামের পর পুনরায় গমনের উদ্যোগ করিলাম।

বেলা প্রায় ২টা বাজিয়াছে; কিন্তু বৃক্ষপত্রের ঘনচ্ছায়া বশতঃ আমরা রৌদ্রের প্রখরতা কিছু অনুভব করিতে পারি নাই। এইবার অত্যন্ত চড়াই আরম্ভ হইল। কিছু উপরে উঠিতেই একখানি প্রস্তর প্রোথিত দেখিলাম, ইহাই ইংরাজ অধিকারের সীমা। ইহার পরই রেওয়ার করদ রাজ্য। অমরকণ্টক এখন রেওয়া রাজ্যের অন্তর্গত। পূর্ব্বে ইহা ইংরাজের অধিকার ভুক্ত ছিল; কিন্তু পুনরায় ইহা রেওয়ার মহারাজাকে দেওয়া হইয়াছে।

আমরা ক্রমেই উপরে উঠিতে লাগিলাম, এই পথ বড় কষ্টসাধ্য, ক্রমাগত 'চড়াই' এর উপর 'চড়াই'। পথ অতি নির্জ্জন; দুইধারে বিস্তৃত অরণ্য ক্বচিৎ দূরে গিরির উপরে ভুঁইয়াদের ক্ষুদ্র পল্লী দেখা যাইতেছে; কোনও শব্দ শুনা যাইতেছে না, চারিদিকেই নিস্তব্ধ বনরাজি। কখনও কখনও হঠাৎ আমরা কতকগুলি বলদ ও তাহাদের সহযাত্রী লোকের সম্মুখীন হই; দেখিলে অনেক ভরসা হয়; এই লোকেরা বনচর, চলিত কথায় ইহাদিগকে বনজারা বলে। ইহাদের কোনও নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই; বনের উৎপন্ন ফল মূলাদি লইয়া গ্রামে গ্রামে যায় ও সেখান হইতে শস্যাদি ক্রয় করিয়া অন্য গ্রাম বা সহরে যাইয়া বিক্রয় করে। ইহাদের সঙ্গে প্রায় ১০০।২০০ বলদ থাকে; সম্মুখে ও পশ্চাতে দুই বলিষ্ঠ ও ঋজু-শৃঙ্গ বলদ মধ্যের অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল বলদগণকে শার্দ্দূলাদির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেছে; বলদের উপরে বোঝা; কোনটীর উপরে বনজারা শিশু আমাদের প্রতি বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চাহিতে চাহিতে যাইতেছে, কোনওটীর উপর বা পথক্লিষ্টা বনচর-বধূ আশ্রয় লইয়াছে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা বেশ সুশ্রী; তবে নিয়ত পথশ্রমের জন্য ও বাহিরে থাকার জন্য একটু অপরিষ্কার বলিয়া

বোধ হয়। শীত গ্রীষ্ম সকল সময়েই ভ্রমণ করিতেছে, পথের মধ্যে পণ্যের বস্তা দিয়া ঘর বাঁধিয়া রাত্রি যাপন করে।

প্রায় ৪।৫ মাইল চড়াইয়ের পর আমরা এক প্রশস্ত মালভূমির উপর আসিয়া পড়িলাম। ইহার উপর আমরা বেশ সুমন্দ স্নিগ্ধকর বায়ু উপভোগ করিলাম। আমাদের পথ পর্য্যটনের অনেক অবসাদ দূর হইল। এই স্থান সমুদ্র হইতে প্রায় ৩৫০০ ফিট উচ্চ, গ্রীষ্মাবাসের ইহা একটী বেশ জায়গা হইতে পারে; কিন্তু পথ বড় দুর্গম বলিয়া কেহ আসিতে চায় না। এই মালভূমি হইতে কিছু অবতরণ করিতেই কতকগুলি মন্দির ও কুটীর আমাদের চক্ষুগোচর হইল। বুঝিলাম ইহাই সেই অভীষ্ট স্থান; এই দীর্ঘ পথ পর্য্যটনের পর সহসা এই কুটীর ও মন্দির রাজি দেখিয়া মন যেন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সহযাত্রীগণ সমস্বরে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল—"নর্ম্মদা মায়িকী জয়"। সে স্থানে পৌঁছিতে বেলা প্রায় ৫টা বাজিয়া গিয়াছিল; অস্ত গমনোন্মুখ সূর্য্যরশ্মি দুই একটী উচ্চতর গিরি-শিখরে খেলা করিতেছিল; নিম্নস্থ বনরাজী ক্রমে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। অনেকগুলি বাসা খুঁজিয়া আমরা তিনটী বাসা করিলাম; এখানকার ঘরগুলি বড় ক্ষুদ্র ও অন্ধকারময়, সুবিধামত ঘর পাওয়া দুষ্কর। এ ক্ষুদ্র পল্লীতে গৃহ সংখ্যা বড় জোর ২০।২৫টী মন্দির সংখ্যাও তদ্রূপ; লোক সংখ্যা প্রায় ১০০ জন, তন্মধ্যে ৫০ জন প্রায় সাধু সন্ন্যাসী; ২।৩ খানি দোকান আছে তাহাতেই যাত্রীদের ব্যবহার্য্য চাল, ডাল, আটা, ঘি ইত্যাদি পাওয়া যায়। রেওয়ার মহারাজার ১টী পুলীশ থানা ও ধর্ম্মশালা আছে; ধর্ম্মশালাটী বড় ছোট ও অপরিষ্কার বলিয়া আমরা সেখানে যাই নাই। এখানে সপ্তাহে একবার ডাক আসে ও যায়।

এই খানে পৌঁছিয়াই যেন আমাদের সকল ক্লেশ দূর হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মন্দিরগুলি দেখিতে লাগিলাম; ছোট খাট অনেক মন্দির একটী মন্দির খুব পুরাতন, প্রবাদ যে অঙ্গাধীপ কর্ণ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অত প্রাচীন না হইতে পারে, কিন্তু ৩০০।৪০০ বৎসর পূর্ব্বে যে নির্ম্মিত, তাহা বেশ বলা যাইতে পারে। মন্দিরগুলি বড় বড় পাথরে নির্ম্মিত এবং অধিকাংশ মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। দুই একটীতে বিষ্ণুমূর্ত্তি, কোনটীতে বা সূর্য্যদেবের এবং কোনটীতে বা বুদ্ধমূর্ত্তি বিরাজিত।

আমাদের বাসা পৌঁছিতে প্রায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল; আমাদের বাসা নর্ম্মদা কুণ্ডের খুব নিকটেই হইয়াছিল; পাশ দিয়া "কপিলা" নাম্নী

নর্ম্মদার একটী ক্ষুদ্র উপনদী প্রবাহিতা, ইহাকে নর্ম্মদার সখী বলে; নর্ম্মদা কুণ্ডের একটু নিম্নেই নর্ম্মদার অতি ক্ষীণ ধারার সহিত মিলিয়াছে; এই সঙ্গম-স্থানকে "কোটীতীর্থ" বলে; এ স্থানে যাত্রীরা প্রয়াগের ন্যায় মস্তক মুণ্ডন করে।

সন্ধ্যার পর নর্ম্মদা দেবীর মন্দিরে আরতি দেখিতে যাইলাম, নর্ম্মদা মায়ীর মন্দির নর্ম্মদা কুণ্ডের উপরেই অবস্থিত। নর্ম্মদার মন্দিরের সম্মুখেই অমরনাথ মহাদেবের মন্দির। দুই মন্দিরে যুগপৎ আরতি আরম্ভ হইল ও যাত্রীরা মধ্যস্থিত চত্বরে দাঁড়াইয়া গদ গদ হৃদয়ে কেহ ঘণ্টা বাজাইতে লাগিল, কেহ বা কৃতাঞ্জলি হইয়া স্তব করিতে লাগিল। মন্দিরের চত্বর খুব ছোট, এখানে দাঁড়াইয়া উভয় মন্দিরেই যুগপৎ আরতি দেখা যায়। নর্ম্মদার কৃষ্ণ প্রস্তরময়ী দেবীমূর্ত্তি ও অমরনাথ শিবলিঙ্গের আরতি প্রায় ১ ঘণ্টা পরে শেষ হইল; আমরা ও অন্যান্য যাত্রীরা যে যাহার বাসায় ফিরিলাম। যাত্রী সংখ্যা এখানে বেশী হয় না; গড়ে ১০।১২টী। গত মাঘ পূর্ণিমার মেলায় শুনিলাম অনেক যাত্রী আসিয়াছিল।

পরদিন প্রভাতে আমরা "কপিলধারা" নামক নর্ম্মদার এক জলপ্রপাত দেখিতে যাইলাম; ইহা অমরকণ্টক হইতে ৫।৬ মাইল পশ্চিমে। এই স্থানে নর্ম্মদা আম্রকূটের মালভূমি হইতে নিম্নস্থ শিলাময় সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্যপথে অবতরণ করিতেছে, এই প্রপাতে যাইবার পথের চতুঃপার্শ্বস্থ দৃশ্য বড় রমণীয়, দুইধারে শরাই, শাল, হরিতকী, আমলকী প্রভৃতি বৃক্ষশোভিত উপত্যকার পর উপত্যকা, ছোট বড় কত জলধারা নর্ম্মদার সহিত মিলিতেছে; স্বচ্ছসলিলা নর্ম্মদা যেন পথ না পাইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া কত কষ্টে বহিতেছে।

ক্রমে আমরা সেই "উপল বিষমা" রেবার অবতরণস্থলে আসিয়া পৌঁছিলাম; সাধুদের দুই চারিটী কুটীর, সুমিষ্ট তুঁত ও কদলী বৃক্ষ ও দুইধারে প্রস্ফুটিত গোলাপের গাছ ও মধ্যে সেই প্রস্তরময়ী রেবা। স্থানটি অতি নির্জ্জন ও মনোহর, যেন কোনও মুনির তপোবন। এই খানে এক সাধু বাস করিতেন; দ্বাদশবর্ষ বাসের পর সম্প্রতি ব্যাঘ্র হস্তে নিহত হইয়াছেন।

আমরা উপর হইতে নীচে নামিয়া সকলে নর্ম্মদার সেই জলপ্রপাতের নীচে মাথা রাখিয়া স্নান করিলাম। জল এত শীতল যে সে স্থানে অধিক্ষণ দাঁড়ান যায় না, মনে হয় যেন উপর হইতে শিলাবৃষ্টি হইতেছে।

এই ধারার প্রায় আরও এক মাইল নিম্নে আর একটি ধারা, ইহার নাম "দুধধারা"। প্রবাদ যে কোনও ঋষি এই ধারার জলপান করিয়াই জীবন

ধারণ করিতেন। এজন্য ভক্তবৎসলা নর্ম্মদা দিবা দ্বিপ্রহরে এই স্থানে দুগ্ধের ধারা হইয়া বহিতেন। এই প্রপাতটি প্রায় ৫ হাত উচ্চ একটি বৃহৎ প্রস্তরের দুই পার্শ্ব দিয়া দুগ্ধের ন্যায় দুইটি শুভ্র ধারা পড়িতেছে। এ স্থানে নর্ম্মদার শোভা বড় সুন্দর; বিন্ধ্যপাদ-প্রবাহিতা শীর্ণকায়া রেবাকে বাস্তবিকই মাতঙ্গদেহে রচনা রেখার ন্যায় মনে হয়।

আম্রকূটের দক্ষিণপ্রান্তে "শোনভদ্র" নামক আর একটী নদীর উৎপত্তি স্থান; এ স্থানটী অমরকণ্টক হইতে প্রায় ১ মাইল দক্ষিণে; নদীটীর উৎপত্তি বড় সুন্দর; প্রথমে একটু শেঁত শেঁতে জায়গা, চারিদিকে গোলে বকাওলী ফুলের গাছ, তারপর একটু ধারা, তারপর আরও ২।১ টী ধারা মিলিয়া একবারে ৪০০।৫০০ ফিট নীচে পড়িতেছে; যে স্থানে পড়িতেছে সে স্থানটিও অরণ্যময় পার্ব্বত্য প্রদেশ। এ জায়গাটি এত উচ্চ যে নীচে নজর হয় না। একটু দূর হইতে এই নিম্নস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশকে ধূমাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায় দেখায়।

এই স্থান হইতে নর্ম্মদার উৎপত্তিস্থান পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য দেশ, সুন্দর ফুল ও ফলের বৃক্ষরাজিতে আচ্ছন্ন; এই পাহাড়ের উপরে অসংখ্য আম্রবৃক্ষ। ইহারা স্বভাবোৎপন্ন এবং আম্রকূট নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। এই স্থানটিকে 'নর্ম্মদা মায়ীকা বাগিচা' বলে; মায়ীর বাগিচায় কোনও জিনিষের অভাব নাই; আম, জাম, কলা, ভুঁত, চার, তেন্দু প্রভৃতি সুমিষ্ট ফলের গাছ; কচলার, মহুলীন, "গোলেবকাওলী" প্রভৃতি কত সুন্দর ফুলের গাছ; ইহা ভিন্ন আরও কত সুন্দর সুন্দর পত্র বিশিষ্ট ছোট ছোট লতা ও গাছ, তাহার নির্ণয় করা যায় না। বনে অনেক রকম পাখী দিবা দ্বিপ্রহরেও যেন প্রকৃতির স্তোত্র গাহিতেছিল। এই মায়ীর বাগিচাতেই সেই প্রসিদ্ধ গোলেবকাওলী ফুলের গাছ পাওয়া যায়; ইহার পাতা অনেকটা হলুদ পাতার ন্যায়; সুগন্ধময় সাদা সাদা ফুল হয়। ইহা হইতে চক্ষু রোগের অমোঘ ঔষধ প্রস্তুত হয় বলিয়া প্রবাদ।

অমর কণ্টকের যে স্থান হইতে নর্ম্মদার উৎপত্তি হইয়াছে, সে স্থানটির উপর একটি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে ও একটি পুষ্করিণীর মত কুণ্ড চারিদিকে খনিত হইয়াছে। এই কুণ্ডে সর্ব্বদাই জল থাকে; এজন্য নর্ম্মদার উৎপত্তি প্রস্রবণটি দেখা যায় না। এই কুণ্ডের চারিদিকে বেশ বাঁধা ঘাট; প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যা বঈএর বংশের তুকাজী রাও হোলকারের সাহায্যে

নির্ম্মিত। অনেক যাত্রী গৃহের অভাবে এই বাঁধা ঘাটের উপরেই রাত্রিযাপন করে। এখানকার জলবায়ু যে খুব উৎকৃষ্ট, তাহা আর বলিতে হইবে না। দিনের বেলায় বসন্তের মত মৃদুমন্দ হাওয়া ও চৈত্রমাসের রাত্রেও পৌষ মাসের মত বিষম শীত। আমরা লেপ ও অন্যান্য গরম কাপড় লইয়া গিয়াছিলাম; কিন্তু শীত এত প্রবল যে তাহা পর্য্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয় নাই।

এখানে একজন পাণ্ডা আছেন, অন্যান্য তীর্থস্থানের ন্যায় পাণ্ডা অত্যাচারী নন। যাহা দেওয়া যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট। যে সাধু সন্ন্যাসীরা আছেন তাঁহারা অবশ্য সকলেই যাত্রীর আশায় থাকেন। যাত্রীরা তাঁহাদিগকে খাইতে না দিলে, তাঁহাদের আহারের আর অন্য উপায় নাই। দুই চারিটি মন্দিরের জন্য রেওয়ার মহারাজার বৃত্তি বাঁধা আছে। গত ২ বৎসর হইতে রেওয়ার মহারাজ এখানে মাঘী পূর্ণিমায় প্রতি বৎসর একটি মেলা স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন।

এখানে কতকগুলি "পরিক্রমাবাসী" পরিব্রাজকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল; ইঁহারা সকলেই সংসারত্যাগী এবং ইঁহাদের অধ্যবসায়ও আশ্চর্য্যজনক। ইঁহারা বরোচ হইতে অমরকণ্টক হইয়া পুনরায় বরোচ পর্য্যন্ত নর্ম্মদার তীরে তীরে নর্ম্মদা পরিক্রমণ করিতেছেন। এই পথ প্রায় ১৫০০।১৬০০ মাইল এবং পরিক্রমণে প্রায় ৩ বৎসর লাগে। সাধারণতঃ নর্ম্মদার উত্তর তীরস্থ কোনও স্থান হইতে পরিক্রমণ আরম্ভ হয় এবং দক্ষিণ তীর ঘুরিয়া পুনরায় সেই স্থানে আসিলে পরিক্রমণ সম্পূর্ণ হয়। অমরকণ্টক হইতে মাণ্ডালার ৬০ মাইল পথ বড় দুর্গম ও কষ্টকর। ইহা ভিন্ন ইংরাজ রাজ্য ও করদ রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে যাত্রীদিগকে ভীলদস্যুদিগের হস্তে লাঞ্ছিত হইতে হয়। এই পরিক্রমকারিদিগের সহিত পরিধেয় বস্ত্র ও দুই একটা লোটা বাঁটলোই ভিন্ন আর কোনও দ্রব্য বড় থাকে না; কিন্তু এই ভীলদস্যুদিগের হস্তে এসব ত যায়ই, এমন কি গলায় পৈতা গাছটির পর্য্যন্ত নিস্তার নাই। পরিব্রাজকগণ দস্যুর কৃপা আকর্ষণ করিবার জন্য "মামা" সম্বোধনে আপ্যায়িত করেন, কিন্তু দস্যুরা ভুলিবার নয়—তাহারাও "তোমারা মামীকা ঘাঘরা সিনে কে ওয়াস্তে" বলিয়া পরিব্রাজকদিগের পৈতাগুলি পর্য্যন্ত কাড়িয়া লয়। এই পরিক্রমকারিদিগের মধ্যে একটি মধ্যবয়স্কা গুজরাটী স্ত্রীলোক দেখিলাম। কথার ভাবে বুঝিলাম যে স্বামীপুত্র হীন হইয়া সংসারে বিরাগবশতঃ এই পরিক্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন। মুখের সেই ক্লেশচ্ছায়ার

মধ্যে দৃঢ়তার ভাব দেখিলেই স্পষ্ট বোধ হয় যে ইনি এই পরিক্রমণ সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবেন।

যাঁহারা প্রকৃতির মধুর সৌন্দর্য্য দেখিতে চাহেন তাঁহাদের এস্থান দেখা উচিত; যাঁহারা সেই শঙ্কর স্বেদোদ্ভবা রেবার মহিমা দেখিবার জন্য উৎসুক তাঁহারা এখানে আসিবেন। গঙ্গার যেমন হরিদ্বারে, প্রয়াগে ও সাগরসঙ্গমে মাহাত্ম্য; নর্ম্মদারও সেইরূপ অমরকণ্টকে, ভৃগুক্ষেত্রে (জব্বলপুরের নিকট) ওঙ্কারেশ্বরে (খাণ্ডোয়ার নিকট)। হরিদ্বারের ন্যায় অমরকণ্টকেরও প্রসিদ্ধি। অবশ্য পথ কিছু কষ্টকর; ৪।৫ মাইল পথ 'চড়াই', বাকীপথ গরুর গাড়ীতে আসা যাইতে পারে। কিন্তু এস্থানের শোভা দেখিলে, সে সব কষ্ট কষ্ট বলিয়াই বোধ হয় না। অনেককে দেখিয়াছি, পথ হইতে গৃহে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু এস্থানে আসিয়া যাইতে চাহেন নাই এবং ফিরিয়া যাইয়া আবার আসিবার জন্য লালায়িত হইয়াছেন। প্রত্যাবর্ত্তনের দিন প্রভাতে নর্ম্মদাকুণ্ডে স্নান করিয়া আমরা ফিরিলাম। পুনরায় সেই সুন্দর ও কঠিন পথ অতিক্রম করিয়া আমরা যখন পেণ্ডরারোড ষ্টেশনে পৌঁছিলাম, তখন পশ্চাতের শৈল-মালা সন্ধ্যার সুনীল অম্বরে মিশিয়া যাইতেছিল; সদ্য-জাগ্রতের ন্যায় আম্রকূটসম্ভবা পুণ্যতোয়া বেরার স্মৃতি স্বপ্নের মত বোধ হইতেছিল। আমরা সেই পবিত্র স্থানকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া প্রায় রাত্রি ১ টার সময় আবার ট্রেনে চড়িলাম।

শ্রীমতী সরলাবালা দে।

স্বপ্ন-শেষে।

স্বপন হ'তে জাগিনু যবে স্বামী
দেখিনু চাহি পথের মাঝে, তপনহীন মরুর সাঁঝে
দাঁড়ায়ে একা অন্ধকারে আমি।
নাহিক কারো স্নেহের আঁখি, নয়ন-নীর লবে যে ঢাকি
ক্ষণে ক্ষণে ঘনায়ে আসে যামী,
স্বপন হ'তে জাগিনু যবে স্বামী।

জীবন হ'তে ফিরানু যবে নয়ন
দেখিনু চাহি অতল নীর নাহিক তল নাহিক তীর
ঊর্ম্মি মাঝে দিক্ দিগন্ত মগন,
ভুবন-ভরা অন্ধকার আকাশে ঘন মেঘের ভার
তরণী মোর কোথায় হবে লগন।
জীবন হ'তে ফিরানু যবে নয়ন।

বজ্র যখন পড়িল ঘরের প'রে
বিরাট তব বিশ্বে চাহি দেখিনু স্থান কোথাও নাহি
দাঁড়াব যেথায় সাঁঝের বেলা ফিরে,
রৌদ্রতাপে তুহিনপাতে সলিল ধারে ঝঞ্ঝাবাতে
পথের মাঝে দাঁড়ানু নত শিরে,
বজ্র যখন পড়িল আসি ঘরে!

পাথেয় যখন দেখিনু পথ চলিতে
দেখিনু শুধু দুহাত তুলি ক'রেছি জমা পথের ধূলি
নয়ন অন্ধ করেছি তাহার কণাতে,
খুঁজিতে গিয়া পারের কড়ি দেখিনু নি'ছি ফাঁসীর দড়ী
সঙ্গীহীন পথের ধারে মরিতে,
পাথেয় যখন দেখিনু পথ চলিতে।

ডাকিনু তখন কাঁদিয়া "নাথ নাথ
কোথায় তুমি কোথায় তুমি প্রভু, সখা, জীবনস্বামী—
দেহ আমায় তোমার অভয় সাথ
মৃত্যু হ'তে—তম হ'তে লহ আমায় তোমার পথে
অন্ধজনার ধরহ আসি হাত"
ডাকিনু তখন কাঁদিয়া নাথ নাথ!

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

সম্পদ্-নারায়ণ-ব্রত।

সম্পদ্-নারায়ণ একটি প্রচলিত ব্রত। চৈত্র মাসের মহাবিষুবসংক্রান্তি হইতে এই ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এক মাস পর্য্যন্ত স্নানান্তে সম্পদ্-নারায়ণ-ব্রতচারিণী মহিলা এই ব্রতকথা প্রতিদিন কহিয়া থাকেন। চৈত্রের সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ হইয়া বৈশাখের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত এই ব্রত-কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই ব্রতে তেত্রিশ নৈবেদ্য, তেত্রিশ তাম্বূল ও সমস্ত দ্রব্য তেত্রিশ ভাগে দিতে হয় এবং বাহুতে কার্পাসের ডোর ধারণ করিতে হয়।

ব্রত-কথা।

এক রাজা ও তাঁহার এক শুদ্ধচারিণী রাজমহিষী ছিলেন। রাজমহিষীর হঠাৎ মতিভ্রম ঘটিল; তিনি বিপুল ঐশ্বর্য্য-নিমগ্না থাকিয়া বারব্রত ইত্যাদি ভুলে গেলেন। এই ছিদ্র পাইয়া রাজপুরীতে অলক্ষ্মী প্রবেশ করিল। একদিন রাজা, স্নানাগারে স্নান না করিয়া অঙ্গনে বসিয়া স্নান করিতেছিলেন, এইসময়ে একটা কৃষ্ণবর্ণ কুকুর আসিয়া সেই স্নাও জল-গুলি চাটিয়া খাইতে লাগিল। কুকুরজাতি নিতান্ত অ-শুচি। পবিত্র রাজদেহ-ধৌত জলগুলি স্পর্শ করায় সেই ছিদ্রে রাজার শরীরে শনিপ্রবেশ করিল। দিন দিনই রাজ্য, শ্রীহীন হইতে লাগিল। ঘোড়াশালের ঘোড়া, হাতীশালের হাতী মরিতে লাগিল। সর্ব্বত্রই প্রজাবিদ্রোহ। রাজ্য অন্য রাজার হাতে বাঁধা পড়িল। প্রজাদ্রোহে ও রাজ্যনাশে রাজা, চিন্তায় ও অনিদ্রায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। রাণী রাজাকে বল্লেন, "চল আমরা এই দুঃসময়ে কুটুম্ববাড়ী গিয়া থাকি।" রাজা তাহাতে সম্মত হলেন। শনির কোপে মতিচ্ছন্ন রাজারাণী পেছনের দরজা দিয়ে বাহির হয়ে কুটুম্ববাড়ী চল্লেন। আগে তাঁহারা রাণীর বাপের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। তথায় রাজ-অন্তঃপুরে সংবাদ গেল, রাজার মেয়ে ও জামাই এসেছেন। তথাকার রাজা ও রাণী বল্লেন, "আমাদের মেয়ে জামাই আস্‌লে সঙ্গে সৈন্যসামন্ত আস্‌ত, লোকজন, পাইকশিখ কতই আস্‌ত; কোথাকার কে এসেছে, দু'সের চাল দে, একসের ডাল দে, বাহির মণ্ডপে বাসা দে"। দাসদাসীরা তাহাই করিল। তাহা দেখিয়া সেই দরিদ্র রাজারাণী, তাহাদের দেওয়া চালডাল-গুলি বাহির মণ্ডপে পুতিয়া রাখিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। তার পর

রাজা ভগিনীর বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলেন। তথায় রাজ-ভগিনীর অন্তঃপুরে সংবাদ গেল, "আপনার ভাই ও ভাই-বৌ' এসেছেন।" রাজভগিনী বল্লেন, "আমার ভাই ভাই-বৌ আস্‌লে সঙ্গে হাতী আস্‌ত, ঘোড়া আস্‌ত, পাইক শিখ, সৈন্যসামন্ত কতই আস্‌ত, কোথাকার কে এসেছে, দু'সের চাল দে, একসের ডাল দে, বাহির মণ্ডপে বাসা দে।" দাসদাসীরা তাহাই করিল। দরিদ্রা রাণী ভাই দেখে রাজাকে কহিলেন, "সম্পদের যারো ভাই, বিপদের কেহ নাই, চল রাজা দেশে যাই।" সেই দু'সের চাল, একসের ডাল, বাহির মণ্ডপে পুতিয়া রাখিয়া রাজা তাহার মাসীর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হলেন। তথায় রাজ-অন্তঃপুরে সংবাদ গেল, "রাণীর বোন্-পুত ও বোন্-পুতের বৌ এসেছেন।" তথাকার রাণী বল্লেন, "আমার বোন্-পুত ও বোন্-পুতের বৌ আস্‌লে সঙ্গে সৈন্যসামন্ত, লোকলস্কর, হাতীঘোড়া কতই আস্‌ত; কোথাকার কোন্ বেটাবেটি এসেছে, দু'সের চাল দে, একসের ডাল দে, বাহির মণ্ডপে বাসা দে।"

তাহা দেখিয়া রাণী কহিলেন, "সম্পদের যারো ভাই, বিপদের কেহ নাই, চল রাজা দেশে যাই।" তাঁরা তথাকারও চালডালগুলি পুতিয়া রাখিলেন। এরূপে রাজা বহু কুটুম্ব-বাড়ী ভ্রমণ করে' মহাদুঃখে অভিভূত হয়ে পড়্‌লেন। অবশেষে রাজা ও রাণী এক বাদসাহের বাড়ী গিয়া আশ্রয় পাইলেন। তথায় সিধাসামগ্রী পেয়ে নিজে রসুই করে' খেতে' লাগলেন। রাণী তথায় বেগমের সহচরীরূপে রহিলেন। এইভাবে এক বৎসর গেল। একদিন বেগম কতকগুলি স্বর্ণালঙ্কার পরিষ্কার ক'র্‌বার জন্য রাণীর নিকট দিলেন। রাণী অলঙ্কার মাজিতেছিলেন, হঠাৎ দেয়ালের আঁকা ময়ূরে সোনার হার গিলিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া রাণী আশ্চর্য্য ও চিন্তিত হইয়া কাঁদ্‌তে লাগলেন। বেগম জিজ্ঞাসা কল্লেন্ "তুমি কাঁদ্‌ছ কেন?" রাণী বল্লেন "যে জন্য কাঁদ্‌ছি, তুমি কি তা বিশ্বাস কর্‌বে?" বেগম বল্লেন, "বিশ্বাস কর্‌ব না কেন, তুমি আগে খুলে বলই না শুনি।" তখন রাণী বল্লেন, "আমি গহনাগুলি মাজিতেছিলাম, হঠাৎ সোনার হার-ছড়া দেয়ালের আঁকা ময়ূরে গিলে ফেলেছে।" বেগম বল্লেন, "আঁকা ময়ূরে কিরূপে সোনার হার গিলিবে? তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। তুমিই তাহা লইয়াছ, শীঘ্র হার ফেলে দেও, নতুবা শাস্তি পাইবে।" সে কথায় রাণী লজ্জিতা ও অপমানিতা হইয়া রাজাকে বলিলেন, "ছিলেম রাজ-রাণী, হলেম কাঙ্গালিনী, কপালগুণে

সব ফলে, আঁকা ময়ূরে হার গেলে।" রাণী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লেন, "গহনা ধুইতেছিলাম, দালানের আঁকা ময়ূর উড়ে এসে সোণার হার-ছড়া গিলে ফেলেছে। বেগম আমাকে চোর বল্লেন, কত গালি দিয়ে বল্লেন—'হার না দিলে, শাস্তি পাইতে হইবে।' অপমান আর কত সহিব?" রাজা বলিলেন, "চল আমরা অন্যত্র চলিয়া যাই, এখানে থাকিলে বিপদ্ ঘটিবে।" এই বলিয়া কাহাকেও না জানাইয়া তাঁহারা খিড়কীর দরজা দিয়া বাহির হইয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

একদিন রাজা ও রাণী এক পুষ্করিণীতে স্নান কর্‌ছিলেন, তখন চারিদিকে শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি শুন্‌তে পেলেন। রাজা একজন পথিকের নিকট জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "ভাই! আজ কি পার্ব্বণ? চারিদিকে কি জন্য কাঁসরশঙ্খের ধ্বনি উঠেছে; নারীগণ কেন ঘনঘন হুলু দিতেছে?" পথিক বলিল, "আজ মহাবিষুবসংক্রান্তি, চৈত্র যায়, বৈশাখ আস্‌ছে; মেয়েরা সম্পদ্-নারায়ণ-ব্রত কর্‌ছে, তাইতে শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি উঠেছে।" রাজা রাণীকে বল্লেন "তুমি সম্পদ্-নারায়ণ-ব্রত কর্‌না কেন?" রাণী বল্লেন, "বহুদিন যাবৎ তাহা করি না, আজ তাহা কর্‌তে ইচ্ছা হয়েছে, উপকরণ কোথা পাব?" রাণী দেখিলেন সেই পুষ্করিণীর পাড়েই একটি কাপাস গাছ। তাহা হইতে একগাছি সুতা লইয়া ডোর পাকিয়ে হাতে পরিলেন এবং রাজাকে বল্লেন, "চল রাজা, আজ তোমার বন্ধুর বাড়ী যাইব, সেখানে সম্পদ্-নারায়ণ-ব্রত করিতে পারি কিনা, দেখিব।"

রাজা বল্লেন, "আমারও বন্ধুর বাড়ী যে'তে ইচ্ছা হয়েছে, চল আজ সেখানেই যাওয়া যাক্।" রাণী ও রাজা বন্ধুর বাড়ী উপস্থিত হলেন। রাজার অবস্থা দেখিয়া রাজবন্ধু অবাক হয়ে গেলেন। পরে জিজ্ঞাসা কল্লেন "আপনার এ অবস্থা কেন?" রাজা তাঁহার দূরবস্থার কথা আদি-অন্ত বন্ধুর কাছে খুলে বল্লেন। রাজ-বন্ধু শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হ'লেন। অতি আদরের সহিত রাজাকে স্নান করাইয়া মূল্যবান্ বস্ত্র পরাইলেন। পাঁচ জন দাসীতে রাণীকে স্নান করাইয়া পট্টবস্ত্র পরাইল। রাজা বন্ধুকে বলিলেন—"আমার একটি অনুরোধ আগে রক্ষা কর্‌তে হবে। রাণী একটি ব্রত কর্‌বেন, তুমি সর্ব্বাগ্রে তাহার উদ্যোগ করাও।" তৎক্ষণাৎ সমস্ত উদ্যোগ হইল। রাণী সমস্ত তেত্রিশ ভাগে সাজাইয়া ষোড়শোপচারে সম্পদ্-নারায়ণ-ব্রত করিলেন। সম্পদ্-নারায়ণ-ব্রতের ফলে রাণীর বিকৃত চিত্ত সুস্থ হইয়া

উঠিল; যেই শুদ্ধচারিণী রাণী ছিলেন, আবার সেই শুদ্ধচারিণী হইলেন, তাঁহার হৃদয়ের গ্লানি দূর হইয়া গেল। রাজ-বন্ধু পরম সমাদরে বিপুল আয়োজন করিয়া তাঁহাদের সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। রাণী রাজাকে বলিলেন, "চল এখন স্বরাজ্যে যাই।" রাজা নিজরাজ্যে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রাজ-বন্ধু অতি যত্নের সহিত স্বর্ণচতুর্দ্দোলে রাজা ও রাণীকে আরোহণ করাইলেন, সঙ্গে বহু দাসদাসী দিলেন, পাইক শিখ, হাতী, ঘোড়া, সৈন্যবাহিনী শ্রেণী বাঁধিয়া চলিল। যাইবার সময় রাজা মাসীর বাড়ী উপস্থিত হইলেন। সংবাদ পাইয়া রাজমাসী আনন্দিতা হইয়া কহিলেন, "বোন্‌পো এলেন মাসীর বাড়ী, নিয়ে এস তাড়াতাড়ি, পাঠা মার, খাসী মার, বামুন ডেকে রসুই কর, স্নান কত্তে তেল দেও, বেলা বুঝি পড়ে গেল।" রাণী কহিলেন, "নিদানে বন্ধুর বাড়ী, সুদানে মাসীর বাড়ী, চল রাজা দেশে যাই।" রাজা কল্লেন কি, বাহির মণ্ডপ হতে পুর্ব্বের পোঁতা ডালচালগুলি তুলিয়া মাসীকে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, "মাসী গো! নিদানে পড়ে, তোমার বাড়ীতে এসেছিলাম, তুমি দুই সের চাউল, একসের ডাইল দিয়ে, বাহির মণ্ডপে বাসা দিয়েছিলে, তোমার ডালচালগুলি বুঝে লও, আমরা এখনই দেশে চলে যাব।" রাজা সেখান হতে রওনা হ'লেন। পথে ভগিনীর বাড়ী উপস্থিত হলেন। সংবাদ পাইয়া রাজভগিনী লোকজন ডাকিয়া কহিলেন, "আমার ভাই এসেছেন, অভ্যর্থনা কর্ পাঠা মার, খাসী মার, বামুন ডেকে রসুই কর, স্নান কর্ত্তে দেও তেল, বেলা বুঝি পড়ে গেল।"

রাণী বল্লেন, "নিদানে বন্ধুর বাড়ী, সুদানে ভগিনীর বাড়ী, চল রাজা দেশে যাই।" বাহির মণ্ডপ হতে ডালচালগুলি তুলিয়া দিয়া, স্নান-আহার কিছুই না করিয়া তথা হইতে তাঁহারা রওয়ানা হইলেন। এইরূপে সকল কুটুম্ববাড়ী বেড়াইয়া রাজা বাদসাহের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। রাণী বেগমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন, পথে সেই আঁকা ময়ূরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রাণীকে দেখিয়াই ময়ূর স্বর্ণহার উগারিয়া ফেলিয়া দিল; রাণী সেই স্বর্ণহার বেগমকে দিয়া তথা হতে বিদায় হলেন।

অবশেষে রাণীর সইয়ের বাড়ীতে তাঁহারা উপস্থিত হইলেন। সেখানে স্নানাহার শেষ করিয়া তাঁহারা নিজ-রাজ্যে উপস্থিত হলেন। রাজাকে আগত দেখিয়া, প্রজাগণ, আসিয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিল। বিপুল ঐশ্বর্য্যে রাজ্য আবার পূর্ণ হইয়া উঠিল।

রাজার গৌরব ও সম্মানের সীমা রহিল না। রাণী বিপুল সমারোহে সম্পদ্-নারায়ণ-ব্রত কল্লেন। এখন হ'তে প্রতি বৈশাখ মাসে ষোড়শোপচারে তেত্রিশ ভাগে সাজাইয়া বৎসর বৎসর সম্পদ্-নারায়ণ-ব্রত করিতে লাগিলেন।

এই ব্রত যে করে, তাহার অক্ষয় সম্পদ হয়। তাহার বাঞ্ছা অপূর্ণ থাকে না; তাহার সকল কার্য্য সফল হয়।

শ্রীবিন্দুবাসিনী দাসী।

আশা।

ক্ষুদ্র বন-মল্লিকার মধু-বিন্দু সম,
পরিমলপূর্ণ তুমি, ওগো প্রিয়তম!
আছ এই বক্ষমাঝে রচিয়া আসন;
বিনিদ্র হৃদয়ে স্মরি তোমারি শাসন।
অন্তরের অন্তস্তলে নিভৃত বুঝিয়া,
কত যত্ন, কত ছল, কৌশল করিয়া,
চিন্তা-আবরণে ঢাকি,—জনমের তরে—
লুকাইয়া রাখিয়াছি আমি হে তোমারে।
বুঝিতে পার না তুমি ওহে চিত্তচোর!
এ বক্ষে লেগেছে কি যে কুহকের ঘোর।
কি নেশায় মত্ত প্রাণ, সুখী কোন সুখে,
কে বুঝিবে? প্রকাশেরও ভাষা নাহি মুখে।
হৃদয়ের এইরূপ নিভৃত চিন্তায়,
মগ্ন যেন থাকি, শেষ মিলন আশায়!

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শাখীনামা।

৩৫শ শাখী।

অতঃপর গুরু পাতিয়ালার অন্তর্গত বাহির-যখ গ্রামে একটি সূত্রধরের গৃহে অবস্থান করেন। গুরুর প্রতি সূত্রধরটির এতাধিক ভক্তি ছিল যে, সে গুরুর জন্য একটি সুন্দর সিংহাসন ও একটি চন্দ্রাতপ প্রস্তুত করিয়াছিল। প্রতিদিন এই সিংহাসনের সম্মুখে প্রদীপ জ্বালিয়া ও ধূপ-ধূনায় গৃহ আমোদিত করিয়া সে সিংহাসনটি পূজা করিত। চোরের ভয়ে (অর্থাৎ পাছে চোরে তাহার এই সযত্ন-প্রস্তুত ও সপ্রেম-পূজিত সিংহাসনটি চুরি করিয়া লইয়া যায়, এই ভয়ে) সে তাহার বাটী ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইত না। সে আশা করিত যে, প্রকৃত রাজা (অর্থাৎ গুরু) একদিন তাহার গৃহে আগমন করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। গুরু এখন এই সিংহাসনের উপর বসিলেন, এবং সূত্রধরটি আনন্দে বিহ্বল হইয়া তাঁহার পদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া দিল, এবং সেই পাদোদক সে ও তাহার পরিবারবর্গ (ভক্তিসহকারে) পান করিল। গুরু সাহ্লাদে তাহাকে শিখ (ধর্ম্মে দীক্ষিত) করিয়া বলিলেন, তাহার গৃহে শিখধর্ম্ম সদা বিরাজ করিবে।

'যখ'-শব্দ ব্যাখ্যা করিবার জন্য শিখেরা গুরুকে নিবেদন করিল। তিনি বলিলেন যে, কৈরাণ ও পাণ্ডনদের বিখ্যাত যুদ্ধকালে যাহাতে কেহই যুদ্ধক্ষেত্র * ত্যাগ করিয়া পলাইতে না পারে, এই জন্য চারিজন 'যখ' (যক্ষ) কে নিযুক্ত করা হয়। তাহাদের নাম,—বাহির যখ, রাম যখ, রতন যখ, ত্রিখু যখ।

এই সময় দিল-সুখ (নামক জনৈক ব্যক্তি) বলিল—হে দরিদ্রের রক্ষক! আমার আত্মীয়বর্গের মঙ্গলেচ্ছায় আত্মোৎসর্গ করিয়া আমি কি নির্ব্বুদ্ধিতাই না করিয়াছি! তাহারা আমার সুখের দিকে আদৌ দৃক্‌পাত করে না; যে ধন আমি (অতি কষ্টে) সঞ্চয় করিয়াছি, এবং যাহা অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিতেছি, আমার এই জীবদ্দশাতেই তাহারা তাহা আপনারা ভাগ করিয়া লইতে প্রস্তুত! দেহটা (বাস্তবিক) একটা গৃহেরই ন্যায়। চক্ষু,

* ৩২শ শাখী দেখ।

কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক্—এই পঞ্চেন্দ্রিয় পাঁচজন চোরের ন্যায় দিবা রাত্রি—প্রতিনিয়তই দেহ-সম্পত্তি অপহরণ করিতেছে। গুরু বলিলেন—'দিলসুখ! প্রকৃত আনন্দ (ভগবানের) ধ্যানেই পাওয়া যায়—ধন কিম্বা নির্জ্জনতায় তাহা মেলে না। যে দিবারাত্রি তাঁহাকে ভজনা করে, সে স্বয়ং দেবতারই ন্যায় পবিত্র। গুরু নানক (১) বলেন—'তাঁহাতে ও দেবতায় কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। নানকের উপদেশ দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিতে হইবে। যে, ঈশ্বরে মনঃনিবেশ করিয়াছে, সে (পার্থিব) অভাব হইতে মুক্ত হইয়াছে, আর পৃথিবীতে বাস করিলেও সেই প্রকৃত মানুষ।'

পুনরায় তিনি সে গ্রামে আসিবেন কি না—জনবর্গ গুরুকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলেন যে, তিনি আর একবার এ গ্রামে আসিবেন।

৩২শ শাখী।

পরদিন গুরু খিতাল সহরে যাত্রা করিলেন ও ধন্ধর তীর্থে তাঁবু খাটাইলেন। সহর-বাসীরা তাঁহাকে দেখিতে আসিল। তাহাদের মধ্যে একজন যুবা-বয়স্ক সূত্রধর ছিল। সেই রাত্রিতে গুরুর তাঁবু লুণ্ঠিত হইবার ভয় থাকায়, সে গুরুকে তাহার গৃহে যাইয়া বাস করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিল। গুরু বলিলেন যে, তিনি দস্যুদের ভয় করেন না, সেইস্থানে বাস করাই, তাঁহার মতে যুক্তি-সিদ্ধ।

কোন্ কোন্ দিন গুরুর মতে পবিত্র, লোকে তাহা জানিতে চাহিলে গুরু নিম্নোক্ত দিন গুলির নাম করেন।

(১) বৈশাখী, অর্থাৎ বৈশাখ মাসের প্রথম দিবস।
(২) দেওয়ালী।
(৩) মাঘী, অর্থাৎ মাঘ মাসের প্রথম দিবস।
(৪) প্রতি পৌর্ণমাসী।

(১) প্রতি গুরুরই স্থির বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহারা একই গুরুর বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। তাই তাঁহারা যখনই কোন ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, তখনই গুরু নানকের দোহাই দিতেন। তাঁহারা আপনাদিগকে নানকের সত্তার সহিত মিশাইয়া আপনাদের ধর্ম্ম-মতকে নানকের ধর্ম্মমত বলিতেন। গুরুদের ইহাই বিশেষত্ব।

(৫) প্রতি চান্দ্র মাসের দশম দিবস। গুরু নানক ঐ দিবস জন্মগ্রহণ করেন। (২) এতদ্ব্যতীত-ও যে সকল দিনে সাধু ও পবিত্রাত্মারা ঈশ্বরসেবার জন্য একত্র হন, সে সব দিনও পবিত্র বিবেচিত হইবে।

গুরু ও তাঁহার সঙ্গত (সভা) কাপড়ের ঠিক্ 'টানা ও পোড়েনের' মত। তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। (৩)

সূত্রধর-যুবক, দশমীতে কড়াহ্ প্রসাদ ও আরও নানাপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিল। সে ভোজনপাত্র এত রকম খাদ্যপূর্ণ করিয়াছিল যে, কি যে বাদ পড়িয়াছে, তাহা লোকে ভাবিয়া উঠিতেই পারিল না। গুরু ও তৎপত্নী তাহার ভক্তির সরলতায় বিশ্বাস করিয়া অসংখ্য অনুচর সহ তাহার গৃহে গমন করিলেন। অনুচরেরা সকলে উঠান ও বারান্দায় বসিল। রেশমে মোড়া একটি 'চৌকিতে' গুরু বসিলেন। রামদাসসম্প্রদায়ের ভাই গুরুদিত্য আনন্দ (৪) পাঠ করিলে আহার্য্য পরিবেশন করা হইল। ভোজনান্তে 'ছুল্লি' পঠিত হইল। যুবা শিখ (সূত্রধর) গুরুকে কিছু উপহার দিয়া তাঁহার পদে মাথা রাখিয়া বলিল—'হে অসামান্য প্রভু! দরিদ্রের রক্ষক! আমি আপনার দাস।' গুরু বলিলেন—'যুবক! তোমার ভগবদ্বিশ্বাস অতি সুন্দর। তোমার গৃহ শিখ-ধর্ম্মের দুর্গ-স্বরূপ হইবে। এখানে ধর্ম্ম-গ্রন্থ-সকল পঠিত হইবে ও সর্ব্বদা এস্থান পূত সঙ্গীতে মুখরিত হইবে।' অতঃপর গুরু ধন্ধর তীর্থে সানুচর ফিরিয়া গেলেন।

(২) গুরু নানকের দুইখানি জন্মশাখী দৃষ্ট হয়। একখানি স্থানে স্থানে অপরটির অনুকৃতি হইলেও, উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এই দুইখানিরই মতে গুরু নানক পূর্ণিমাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দশমীতে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া কোথাও উল্লেখ দেখি না। শিখ-ইতিহাস "শিখো দে রাজ দী ব্যাখ্যা" গ্রন্থেও জন্মদিন পূর্ণিমা বলিয়া উল্লিখিত আছে। এই শাখীনামারই অন্যত্র দৃষ্ট হয় যে, নানক পৌর্ণমাসীতে আবির্ভূত হয়েন। (গত কার্ত্তিক সংখ্যায় ৩২ শ শাখীর দ্বিতীয় 'প্যারা' দ্রষ্টব্য সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এই শাখী উক্ত জন্মদিন আদৌ সত্য নহে।

(৩) দশম গুরু বলিতেন—

খালসা গুরু সে, ঔর গুরু খালসা সে হঁ।
যে এক দুসরা কা তাঁবেদার হঁ॥

অর্থাৎ খালসা গুরু হইতে জাত এবং গুরুও খালসা হইতে জাত। তাঁহারা একে অন্যের রক্ষাকর্ত্তা ও দাস।—মল্লিখিত গুরু গোবিন্দ সিংহ দ্রষ্টব্য।

(৪) শিখদের গ্রন্থ-বিশেষ।

৩৭শ শাখী।

কৈথাল হইতে যাত্রা করিয়া গুরু বর্ণা গ্রামে থামিলেন। এইখানে (অবস্থানকালে) একটি বিশ্বাসী শিখ তাঁহার খাদ্যাদি যোগাইয়াছিল। (এই সময়) তাহার গোলায় শস্যের মূল্য-নির্দ্ধারণের জন্য মোগল-সরকার হইতে একজন আমীন তথায় আগমন করে। শিখ, গুরুকে তাহার গোলা-বাড়ীতে যাইবার জন্য নিবেদন করিল। সে বলিল—"আপনি তথায় উপস্থিত থাকিলে, সে বিশেষ সাবধানতার সহিত আমার বিষয়ে ব্যবস্থা করিবে।" গুরু বলিলেন—'আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাক। তোমার কোন ভয় নাই। আমার বিভূতির প্রভাবে আমীন তোমার শস্যের (প্রকৃত) মূল্যনির্দ্ধারণে সমর্থ হইবে না।' (৫)

আমীন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও ক্ষেত্রটির মাপ ঠিক্ করিতে পারিল না। পরিশেষে বাধ্য হইয়া সে শিখকে ক্ষেত্রটির বিস্তার কত, জিজ্ঞাসা করিল। শিখ বলিল ১২৫ বিঘা; কিন্তু (সেই উত্তর শুনিয়া) আমীন (সাশ্চর্য্যে) বলিল যে, সে তিন তিন বার ইহা মাপিয়া প্রত্যেক বারেই ২৫ বিঘা মাত্র ঠিক্ করিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া শিখ বলিল, গুরুর দয়ার প্রভাবেই (তাহার) এরূপ (ভ্রম) ঘটিয়াছে। তখন আমীন গুরুর নিকট গমন করিবার জন্য প্রার্থনা করিলে, শিখটি তাহাকে গুরুর সহিত পরিচিত করিয়া দিল। গুরুকে প্রণাম করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, কেন সে ক্ষেত্রটি ঠিক্ করিয়া মাপিতে পারিল না? গুরু বলিলেন—মোহরের অক্ষরগুলি যেরূপ উল্টা, প্রত্যেকের ললাট-লিপির অক্ষরগুলিও তদ্রূপ উল্টা; কিন্তু গুরুকে প্রণাম করিলেই সেগুলি সোজা হইয়া যায়। (৬) আমীন বলিল—"আপনি আমায় শিখধর্ম্মে দীক্ষিত করুন, আমি এই ২৫ বিঘাও ছাড়িয়া দিব।" গুরু স্বীকৃত হইয়া তাহাকে শিখধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লইলেন। ক্রমশঃ।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

(৫) গুরুর অদ্ভুত ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য গ্রন্থকার এই ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছেন। এরূপ বর্ণনায় কিন্তু গুরুর প্রকৃত মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায় না, একথা ভক্ত অনেক সময়েই ভক্তির অতিশয্যে ভুলিয়া যান। শিখ গুরুরা চিরকালই যাদুবিদ্যার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন।

(৬) শিখেরা কতদূর গুরুভক্ত, তাহা এই শাখী হইতে কতকটা বুঝা যায়। তাহারা বিশ্বাস করে, গুরুর অনুকম্পা প্রভাবে বিধাতার লিপিও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। তাহাদের গুরুভক্তির গভীরতা জানিবার জন্য মল্লিখিত 'শিখ সম্প্রদায়' গ্রন্থের 'শিখগুরু খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ভাই হরপালের বিবরণ দ্রষ্টব্য। গুরুর ভক্তির জন্য শিখেরা সর্ব্বস্বত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিল।

দুঃখিনী।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

এ অধ্যায়টী দুঃখিনীর জীবনচরিতের মধ্যে না দিতে পারিলেই ভাল হইত; এ পরিচ্ছেদে যে কথা বলিতে হইবে, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি কাহারও অদৃষ্টে যেন সে দশা না হয়, কেহ যেন তেমন পরীক্ষায় না পড়েন। দুঃখিনীর জীবন যে কত কষ্টের তাহা আর বলিয়া উঠিতে পারি না। দুঃখিনী দুইবেলা স্কুলের কাজ করে, মধ্যাহ্নকালে রামকৃষ্ণের বাটীর প্রায় সমস্ত কাজই করে, রামকৃষ্ণ দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হন। রামকৃষ্ণ দুঃখিনীকে রাঁধিতে দিতেন না এবং বাটীর সকলকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহারা যেন দুঃখিনীকে কোন কাজ করিতে না বলে; ভয়, পাছে দুঃখিনী মনে করে সে রামকৃষ্ণের বাটীতে দাসীর ন্যায় রহিয়াছে; কিন্তু তাঁহাকে কোন কথা বলিতে হয় না, দুঃখিনী নিজেই সব জানেন। দুঃখিনীর ন্যায় গরুর সেবা করিতে কেহ জানে না; দুঃখিনী বাটীর কোন স্থানে জঙ্গল দেখিতে পারেন না; বাটীর ছেলেমেয়েরা অপরিষ্কার হইয়া দুঃখিনীর সম্মুখে যাইতে পারে না। দুঃখিনী আসিবার পূর্ব্বে রামকৃষ্ণের রান্নাঘরের বড়ই বে-বন্দোবস্ত ছিল। রান্নাঘরের এক কোণেই জ্বালানি কাষ্ঠের স্তূপ থাকিত। দুঃখিনী দুই তিনদিন তাহা সরাইবার কথা বলিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন, সে কথায় কেহ বড় মনোযোগ করে না; তখন নিজেই একদিন ঘরের মধ্য হইতে কাষ্ঠ বাহির করিয়া অন্য একস্থানে রাখিলেন, ঘরের মধ্যে রান্নার স্থানের চারিপাশে নিজে মাটি ঢালিয়া ছোট দেওয়াল গাঁথিতে লাগিলেন, বাটীর বধূরাও দেখিয়া-শুনিয়া এই কার্য্যে যোগ দিল। তিনি এমনই সুবন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন যে, সময়ে সময়ে রামকৃষ্ণ আনন্দে অধীর হইয়া পড়িতেন। যে বাড়ীতে আজ ছেলের ব্যামো, কাল মেয়ের ব্যামো ছিল, সে বাটীতে কিছুই নাই। দুঃখিনীর আগমনে যেন বাড়ীর দুঃখকষ্ট চলিয়া গেল; কিন্তু দুঃখিনীর দুঃখ গেল না!

ইতিপূর্ব্বেই আমরা বলিয়া রাখিয়াছি যে, দুঃখিনীর দেবর রমানাথ এখন দেশের মধ্যে প্রসিদ্ধ বদ্‌মাইস হইয়া উঠিয়াছে; বাটীতেই আড্ডা করিয়াছে, সেখানে গাঁজা গুলি মদ সব রকমই তাহাদের চলে এবং ইহাই যথেষ্ট

নহে, সেইখানে দল বাঁধিয়া বসিয়া তাহারা কত কুলমহিলার সতীত্ব নষ্টের পরামর্শ করে। সেখানে যে সমস্ত কথা হয়, তাহা মনে করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। সেই 'মুক্তিমণ্ডপে' দুঃখিনীর দুঃখের কথা উঠিল; কত ঠাট্টাতামাসা হইল, কত অন্যায় বাক্য উচ্চারিত হইল; কিন্তু যদি এই হাসি তামাসাই ইহার শেষ ফল হইত, তাহা হইলে আপত্তি ছিল না; জগতে কত জনের অদৃষ্টে কত হাসি তামাসা জুটিয়াছে। কিন্তু তাহাই নহে, বলিতে কষ্ট হয়, সেখানে বসিয়া দুরাত্মা নরপিশাচেরা দুঃখিনীর সতীত্বনাশের আয়োজন করিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। রমানাথের পূর্ব্বের আক্রোশ মনে জাগিয়া উঠিল। তাহার আর একটু আনন্দ হইল যে, এবার দুঃখিনীর পিতার মৃত্যুর সময়ে সে তাহার অনেক সাহায্য করিয়াছে। মূর্খ মনে করিল সেই কৃতজ্ঞতায় দুঃখিনী তাহার পাপ পথের পথিক হইবে। এ কথাও সে তাহার ইয়ারদিগের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিল।

রমানাথ দুই চারি দিন দুঃখিনীর বাটীতে, যাতায়াত করিতে লাগিল; দুঃখিনী রমানাথকে দেখিয়াই জড়সড় হইয়া ঘরের মধ্যে যান; রমানাথ কথা জিজ্ঞাসা করিলে নিজে উত্তর দেন না, যদি সেখানে কেহ থাকে, তবে তাহার দ্বারা উত্তর দেওয়ান, নতুবা কিছুই বলেন না, রমানাথের প্রধান অভিপ্রায় আপাততঃ দুঃখিনীকে নিজ বাটীতে লইয়া যাওয়া; এজন্য সময়ে সময়ে রমানাথ যুক্তি দেখাইতেও ত্রুটী করিত না। যুক্তিগুলি অবশ্যই ভাল, বিধবা দুঃখিনী তাহা বুঝিতেন; দুঃখিনী বুঝিতেন যে, স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম শ্বশুরশাশুড়ীর সেবা এবং তাঁহাদের অভাবে স্বামীর পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তির সেবা; কিন্তু যখনই তিনি রমানাথের কথা মনে করিতেন, তখনই শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার আশা ত্যাগ করিতেন। মনে করিতেন, সেখানে গেলে তাঁহার সমূহ বিপদ। একদিন রামকৃষ্ণের বড় মেয়ে জিজ্ঞাসা করিলে দুঃখিনী বলিয়াছিলেন, "দেখ! পৃথিবীতে যাহার স্বামী নাই, তাহার মত হতভাগিনী নাই; কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতেই স্ত্রীলোকের সমস্ত কাজ ফুরায় না। অন্যান্য দেশের মেয়েদের সঙ্গে আমাদের একটী বিষয়ে প্রভেদ আছে। আমরা বিলাতের মেয়েদের কথা শুনিয়াছি, তাহারা অনেকগুলিতে একসঙ্গে বাস করে না। এমন কি পিতা উপার্জ্জনক্ষম পুত্রের সঙ্গে একত্র বাস করেন না। ইহাতে মেয়েরা অনেক কর্ত্তব্য বুঝিতে পারে না, কাজেই স্বামীর মৃত্যুর পরে তাহারা কিছুই কর্ত্তব্য দেখিতে পায় না; তাহারা অবশ্যই আবার

সংসার বাঁধিতে বসে। বিশেষ তাহাদের দেশের সমাজের অবস্থা ভাল। আমাদের দেশে তাহা নয়; স্বামীর মৃত্যুর পরে শ্বশুরশাশুড়ী আছেন, দেবরভাসুর আছেন, তাঁহাদের সেবা করিতে হইবে, তাঁহাদের কাজ করিতে হইবে। কাজেই আমাদের কাজ ফুরায় না। তবে যে আমি কেন শ্বশুর বাড়ী যাই না, তাহার অনেক কারণ আছে, সেগুলি আর এক সময়ে বলিব।"

এই কথাতেই পাঠকপাঠিকা দুঃখিনীর কথা অনেক বুঝিতে পারিতেছেন; দুঃখিনীর হৃদয়ের অনেক সংবাদ ইহাতে পাওয়া যায়। এমন লক্ষ্মীকে কু-পথে লইয়া যাইবার জন্য হতভাগ্য রমানাথের প্রয়াস।

রমানাথ কিছুতেই দুঃখিনীকে বাটীতে লইয়া যাইবার মত করিতে পারিল না এবং স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধিরও অন্য কোন উপায় দেখিল না। শেষে স্থির হইল, বলপ্রকাশ করিয়া, দুঃখিনীকে তাহারা আড্ডায় লইয়া যাইবে। তিন চারিজন ইয়ারে এই কথা স্থির করিল; কিন্তু দৈবঘটনায় দুঃখিনী একথা শুনিতে পাইলেন। দুঃখিনীর পাঠশালার একটী বালক একদিন নিকটের এক হাটে গিয়াছিল, সেইস্থান হইতে আসিবার সময়ে সে রমানাথের দলের পাছে পাছে আসিতেছিল এবং তাহারা রাস্তায় আসিতে আসিতে দুঃখিনীর সম্বন্ধে যে সমস্ত আলাপ করিয়াছিল, বালকটী তাহা শুনিয়াছিল। বালকেরা দুঃখিনীকে বড় ভাল বাসিত এবং ভক্তি করিত। পরদিন পাঠশালায় আসিয়াই বালকটী গোপনে দুঃখিনীকে সমস্ত কথা বলিল। দুঃখিনী সেইদিন হইতে খুব সাবধানে চলিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে অনেকদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও দুঃখিনী স্বগৃহ ত্যাগ করিয়া রামকৃষ্ণের বাটীতে যাইতেন না, এখন সন্ধ্যা লাগিবার পূর্ব্বেই তিনি রামকৃষ্ণের বাটীতে যাইতেন, ভয়, পাছে সন্ধ্যার সময় বদ্‌মায়েসেরা তাঁহাকে রাস্তার মধ্যে অপমান করে বা বলপ্রকাশপূর্ব্বক লইয়া যায়। এমনই ভীতচিত্তে দুঃখিনী দিন কাটাইতে লাগিলেন। অন্য কাহাকেও তিনি একথা বলেন নাই। তবে একজনকে তিনি বলিয়াছিলেন, যাঁহাকে বলিয়াছিলেন তিনি মানুষ নহেন। দুঃখিনী এখন আর মানুষের উপর আত্মনির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। তাঁহার হৃদয় দিনে দিনে এক মহাশক্তির নিকটে অবনত হইতেছিল; তিনি যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাকে প্রকৃতপক্ষেই উন্নত করিয়াছিল। রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পড়িতে তাঁহার প্রাণে মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া-

ছিল। দুঃখিনী এখন কথায় কথায় রামায়ণ মহাভারতের কথা চিন্তা করেন, সেই মহাকাব্যের চিত্র এবং চরিত্র সকল দেখিয়া—মনে করিয়া নিজের হৃদয়ে বল পান। যখনই দুঃখিনী সংসারের চিন্তায়,—উপস্থিত বিপদে বিষণ্ণ হইয়াছেন, তখনই কে যেন তাঁহার কর্ণে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস এ জগতে আজ তিনি একাকিনী নহেন, তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য একজন আছেন; তাঁহার দুঃখ দেখিবার একজন আছেন। এ বিশ্বাস তাঁহার প্রাণে দৃঢ়বদ্ধ। তাই যখনই কোন বিপদ উপস্থিত হইত, তখনই তিনি একমনে ভগবানকে ডাকিতেন; তিনি ছাড়া বিপদের সময়ে আর কেহ সহায় নাই, ইহা দুঃখিনী জানিতেন। তাই এ বিপদের সময়ে যখন তখনই তিনি ভগবানের নাম করিতেন; তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেন। সত্যসত্যই দুঃখিনী এজগতে মানুষের উপর অতি কম নির্ভর করিতেন; সকল সময়েই তাঁহার মনে হইত তিনি একাকী নহেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য, তাঁহার দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী আর একজন আছে। যাঁহার প্রাণে এত বিশ্বাস, তিনি সহসা ভীত হন না, তাঁহার হৃদয় কোন বিপদ্‌পাতে অধীর হয় না। তাই দুঃখিনী রমানাথের এই কল্পনার কথা শুনিয়া নিজেই সাবধান হইলেন এবং একমনে ভগবানের নাম করিতে লাগিলেন।

এমনই করিয়া কয়েক দিন যায়; একদিন বাটী হইতে রামকৃষ্ণের বাটীতে যাইতে একটু রাত্রি হইয়াছে; সদানন্দ সেদিন পাঠশালায় উপস্থিত ছিল না। এমন সময়ে দুঃখিনী সভয়ে দেখিলেন, তাঁহাদের বাড়ীর নিকট দুইটী লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; তাহাদিগকে দেখিয়াই দুঃখিনী একটু পশ্চাতে সরিয়া গেলেন, মনে হইল হয় ত রমানাথের দলই তাঁহার অপেক্ষা করিতেছে। সত্যসত্যই তাহারা রমানাথের প্রেরিত দুইটী রাক্ষস। তাহারা দুঃখিনীকে হঠাৎ পশ্চাৎপদ হইতে দেখিয়া দুইজনে দৌড়িয়া দুঃখিনীকে ধরিবার জন্য আসিল। দুঃখিনী তখন কি করেন, তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে যাইয়া দ্বার বন্ধ করিতে গেলেন; কিন্তু পারিলেন না, দ্বার বন্ধ করিবার পূর্ব্বেই পাষণ্ডেরা আসিয়া উপস্থিত হইল।

দুঃখিনী বুঝিলেন, আজ এই দুর্ব্বৃত্তদিগের হস্ত হইতে এক ভগবান ব্যতীত আর কেহ তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। অন্যদিন সদানন্দ এ সময়ে কোথাও যায় না, আজ সেও উপস্থিত নাই। তখন দুঃখিনী মুহূর্ত্তের মধ্যে হৃদয়ে বল পাইলেন; কেন দৌড়াইয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া আত্মরক্ষা করিবার তাঁহার প্রবৃত্তি হইয়াছিল—তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

পাষণ্ডেরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুঃখিনীকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল। দুঃখিনী এক পাও নড়িলেন না; স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সেই সময়ের মূর্ত্তি দেখিয়া নরপিশাচগণও ক্ষণেকের জন্য স্তম্ভিত হইল, তাহারা আর অগ্রসর হইতে পারিল না।

দুঃখিনী একটি কথাও বলিলেন না, বোধ হয় তখন তাঁহার কথা বলিবার সামর্থ্যও ছিল না। সতীর তেজ তাঁহাকে শক্তিশালিনী করিয়াছিল, তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হয়, কাহার সাধ্য।

দুঃখিনী স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া, একবার কেবল দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া দ্বার দেখাইয়া দিলেন, একটি কথাও বলিলেন না। যাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল, তাহারা তখন কি করিবে, ভাবিয়া পাইতেছিল না।

একটু পরেই রমানাথের কথা সরিল, সে কঠোর স্বরে বলিল "বৌদিদি, তোমার কেউ নাই; আজ তোমারই একদিন কি আমারই একদিন। আজ তোমাকে লইয়া যাইব-ই, কে ঠেকায় দেখিব।"

এই বলিয়া সে দুই এক পদ অগ্রসর হইল। দুঃখিনী তখনও স্থিরভাবে তাহাদের দিকে চাহিয়া আছেন, তাঁহার মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নাই। কি এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি যে তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে সঞ্জাত হইয়াছিল, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

এমন সময়ে রমানাথ চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই চীৎকারে দুঃখিনীর চমক ভাঙ্গিল; তিনি দেখিলেন—সম্মুখে সদানন্দ! সদানন্দ রমানাথের গলা টিপিয়া ধরিয়াছে।

এই ব্যাপার দেখিয়া রমানাথের সঙ্গীরা যে যে দিকে পাইল, পলায়ন করিল। রমানাথ চীৎকার করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সদানন্দ তাহার গলা এমন জোরে ধরিয়াছিল যে, তাহার কথা বলিবার শক্তি ছিল না।

সদানন্দ এতক্ষণ কথা বলে নাই; যখন সে দেখিল রমানাথের সঙ্গীরা পলায়ন করিয়াছে, তখন সে বলিল "মা।"

দুঃখিনী সদানন্দের কথা বুঝিলেন; প্রাণের অন্তরালে যে কি কথা আছে তাহা আর তাঁহাকে বলিতে হইল না, তিনি বলিলেন "সদানন্দ, ওকে ছেড়ে দাও।

সদানন্দ আবার বলিল "মা!" তাহার মুখ দিয়া অন্য কথা বাহির হইল না। দুঃখিনী তখন বলিলেন "সদা-কাকা, তুমি আমি শাস্তি দিবার কে? উপরে একজন আছেন, তা কি ভুলে গেলে সদা-কাকা।"

সদানন্দ আর কথাটি বলিল না, ধীরে ধীরে রমানাথের গলা ছাড়িয়া দিল। রমানাথ তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সদানন্দ তখন মাটীর উপর বসিয়া পড়িল; সে যেন অবশন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। রমানাথের ন্যায় বলবান যুবককে আটক করিবার জন্য সে তাহার শরীরের সমস্ত বল প্রয়োগ করিয়াছিল।

দুঃখিনী তাড়াতাড়ি সদানন্দের নিকট গেলেন, তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। সদানন্দ আর স্থির থাকিতে পারিল না, তাহার মনে হইতে লাগিল স্বয়ং মা ভবানী তাহার শরীরে স্নেহ-হস্ত বুলাইতেছেন। সে তখন করজোড় করিয়া গান ধরিল—

মা, মা, বোলে আর ডাকবো না।
শ্যামা, দিয়েছ দিতেছ কত যন্ত্রণা।"

গান আর চলিল না। দুঃখিনী গানে বাধা দিয়া বলিলেন "সদা-কাকা, চল, বাড়ী যাই।"

সদানন্দ তখন গান ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দুইজনে ঘরের বাহির হইল, দুঃখিনী ঘরের তালা বন্ধ করিলেন।

তাহার পর দুঃখিনী আগে আগে চলিলেন, সদানন্দ পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল; কিন্তু সে ত চুপ করিয়া থাকিতে পারে না, রাস্তায় যাইয়াই আবার গান ধরিল—

আয় দেখি মন চুরি করি;
ওরে, তোমায় আমায় একত্র রে;
শিবের সর্ব্বস্বধন শ্যামা-চরণ
যদি আন্‌তে পারি হ'রে।

ক্রমশঃ।

শ্রীজলধর সেন।

পল্লীলক্ষ্মী।

যখন প্রভাতে উঠি অয়ি সুলোচনে,
পুষ্পসাজি-করে তোমা হেরিনু অঙ্গনে
কুসুম-চয়নে রতা; কপোল বহিয়া
উড়ে পড়ে কেশজাল দুলিয়া দুলিয়া
কর্ম্মে রতা অকুণ্ঠিতা মুখভরা হাসি
ঊষা পরায়েছে রঙ্গে রাঙ্গা পুষ্পরাশি।
ভাবিলাম সেইকালে নির্ম্মল মালিকা
পল্লীলক্ষ্মী প্রভাতের সৌন্দর্য্য-বালিকা।

তারপরে মধ্যাহ্নের দীপ্ত রবিকরে
ক্লান্ত নরনারী যবে হা হুতাশ করে,
সেইকালে শুচিস্মিতা স্নাতা এলোকেশে
হাতে লয়ে অন্নভাণ্ড আনন্দ উচ্ছ্বাসে
হেরিলাম গৃহস্থের কুটির-অঙ্গনে
কে নারী বিলায় অন্ন অম্লান বদনে!
ক্ষুধার্ত্ত-তৃষিত যত ক্লিন্ন নারীনর,
তুষ্ট মনে "মা" "মা" বলে প্রফুল্ল অন্তর।
সেইকালে ভাবিলাম, গৃহস্থ রমণী
পল্লীলক্ষ্মী মধ্যাহ্নের-অন্নদারূপিনী।

দিবা অবসানে যবে মলিন সন্ধ্যার
ক্ষীণ আলোরেখা ব্যাপ্ত করে চারিধার,
আকাশে ফুটিয়া উঠে তারকার মালা,
নদী পরপারে জাগে পূর্ণশশী কলা,
চিক্ মিক্ ঝিক্ মিক্ আলোকসম্ভার
শ্যামল বিটপী পরে কৌমুদীর হার।
গৃহস্থের কুললক্ষ্মী প্রতি ঘরে ঘরে
সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালি লক্ষ্মী নেয় ঘরে।
প্রশান্ত সে সৌন্দর্য্যের স্নিগ্ধ আবরণে
হেরিলাম গৃহলক্ষ্মী শুয়ে গৃহকোণে

অশান্ত খোকারে তার স্তন মুখে দিয়ে
'ঘুম পাড়ানিয়া' গান ধীরে গেয়ে গেয়ে
আদরে বুকের পাশে লয়ে যায় টানি,—
ঈষৎ লুণ্ঠিত ওষ্ঠ—হাসি মুখখানি।
সেইকালে ভাবিলাম,—সৌন্দর্য্যরূপিনী
পল্লীলক্ষ্মী রজনীর—জগত-জননী।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

কখন্ পোহা'বে রাতি।

ওগো, অজানা পথের সাথি!
তোমারে সঁপিয়া দিলাম সকল
কুল-মান-প্রাণ-জাতি।
ওগো, অজানা পথের সাথি!
স্নেহের পরশ—দাও করে কর,
সম্মুখে থাকি' হও অগ্রসর,
চলিব এ পথে লক্ষ্য রাখিয়া
তোমারি ও রূপ ভাতি;
ওগো, অজানা পথের সাথি!
নিকটে নিকটে তুমি সদা রাখ,
সদাই করুণা প্রকাশিয়া থাক,
একলা ফেলিয়া যেওনা চলিয়া,
নিবায়ে ক্ষুদ্র বাতি;
ওগো, অজানা পথের সাথি!
নৈশ আঁধার একি গো নিবিড়!
দুরু দুরু হিয়া কম্পিত শির,
রুদ্ধ নয়ন, স্খলিত চরণ,
কখন পোহা'বে রাতি?
ওগো, অজানা পথের সাথি!

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমিষ ও নিরামিষ।*

প্রাণিগণের আকার, আচার, ব্যবহার, বর্ণ, কর্ম্ম প্রভৃতির পার্থক্য থাকিতে পারে; কিন্তু সকল প্রাণীর আত্মা যে সমান, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মনুষ্য-হত্যা করিলে যেমন পার্থিব রাজ-বিধানানুযায়ী দণ্ডিত হইতে হয়, কীটাণুকেও হত্যা করিলে তদ্রূপ ঈশ্বরের নিকট হত্যাকারীকে দণ্ডনীয় হইতে হয়। স্বার্থপর ও স্থূলজ্ঞান মানবের নিকট কীট, পতঙ্গ-প্রভৃতির আর্ত্তনাদ তুচ্ছ হইলেও, সূক্ষ্মদর্শী করুণাময় পরমেশ্বরের নিকট উহা অসহ্য। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে নিরস্ত্র ও আশ্রিতকে হত্যা করিলে পাপ হয়। যদি মহাভারতোক্ত সুরথ রাজার বিবরণ সত্য হয়, যদি হিন্দুধর্ম্ম এখনও ভারতে বর্ত্তমান থাকে, তবে দুর্ব্বল, আশ্রিত ও নিরীহ প্রাণি-হত্যাজনিত পাপ মনুষ্যকে অবশ্য ভোগ করিতে হইবেই হইবে। আমিষভোজীকে যে হত্যাকারী বলে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

কোন্ তিথিতে কোন্ দ্রব্য আহার করা উচিত, বা কোন্ তিথিতে উপবাসাদি বিধেয়, ইত্যাদি গুরুতর তত্ত্ব যে কেবল আর্য্যঋষিগণই বুঝিয়াছিলেন, তাহা নহে। পিথাগোরস্ (Pythagorus), প্লেটো (Plato), সক্রেটিস্ (Socrates), হেসিয়ড্ (Hesiod), প্লুটার্ক (Plutarch), সেনেকা (Seneca), ক্লেমেণ্ট (Clement), এণ্টিয়োক (Antioch), নিউটন্ (Newton), ফ্রাঙ্কলিন্ (Franklin), হুফেলাণ্ড (Hufeland), প্যালি (Paley), ল্যাম্ব (Lamb), এবিমেথি (Abemethy), ডাঃ চেক্ (Dr. Cheque), লা মার্টিন (La Martine), মিচলেট (Michlet), বাফুন্ (Buffon), সফেন্-হেয়ার্ (Shopenhair) এবং অবস্তা (Avesta) প্রভৃতি পাশ্চাত্যমনীষিগণও উহা বেশ বুঝিয়াছিলেন।

(ক) সমস্ত সৃষ্টপ্রাণিগণ আহারানুযায়ী প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত। যথা;—শস্যভুক্, ফলভুক্, মাংসভুক্ ও সর্ব্বভুক্। এখন দেখা যাউক—মানবজাতি কোন্ শ্রেণীভুক্ত।

১। শারীরিক গঠন।—হাক্সলী বলেন যে, প্রাণিগণ প্রধানতঃ তিন ভাগে

* আমিষম্—অম্যতে (রুজ্যতে) অনেনেতি—অম্+টিষচ্ করণে—(যাহাতে রোগ হয়)।

বিভক্ত ; যথা ;—ক্ষুরবিশিষ্ট, 'থাঁবা'-বিশিষ্ট ও হস্তপদাদিবিশিষ্ট। ক্ষুর-বিশিষ্ট প্রাণিগণ শস্যভুক্ ও সর্ব্বভুক্। 'থাবা'-বিশিষ্ট প্রাণিগণ মাংসভুক্ এবং হস্তপদাদি-বিশিষ্ট প্রাণিগণ ফলভুক্ ; দেহের গঠনানুসারে মানবজাতি ফলভুক্।

২। অন্ত্রনালী।—মাংসভুক্ প্রাণীর অন্ত্রনালী নিতান্ত ছোট। কাহারও কাহারও বা দেহ অপেক্ষা ইহা তিন গুণ দীর্ঘ। মানবের অন্ত্রনালী, দেহের প্রায় বার গুণ।

৩। স্তন।—সর্ব্বভুক্ ও মাংসাশী প্রাণিগণের স্তন, উদরের নিম্নে অবস্থিত ; ইহা মানবের বক্ষের উপর অবস্থিত।

৪। কোলোন।—মাংসাশী প্রাণীর কোলোন্ মসৃণ, মানবের ইহা বহু ক্ষুদ্র ছিদ্র-বিশিষ্ট।

৫। জিহ্বা।—মাংসাশী প্রাণীর জিহ্বা বন্ধুর ; কিন্তু মানবের রসনা মসৃণ।

৬। ত্বক্।—মাংসাশী প্রাণীর প্রকৃত ঘর্ম্ম-নালী নাই ; কিন্তু মানবের ইহা অত্যধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

৭। লালা-নিঃসারক যন্ত্র।—মাংসাশী প্রাণীর ইহা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ; কিন্তু, মানবের ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত।

উল্লিখিত প্রমাণেই ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, মানবজাতি যথার্থই ফলভুক্। বাহুল্যভয়ে আর প্রমাণাদির অবতারণা করিলাম না।

(খ) এখন দেখা যাউক, মানবজাতির অবয়বের কার্য্যপ্রণালী কোন্ শ্রেণীভুক্ত। হাক্সলী দেখাইয়াছেন যে,—

(১) শস্যভুক্ প্রাণীর গর্ভপরিস্রব ফুল—(Placenta) ভূমিষ্ঠ হইবার সময় নির্গত হয় না।

(২) মাংসাশী প্রাণীর সন্তানপ্রসবকালে 'ফুল' বহিষ্কৃত হয় এবং জোনের ন্যায় ডিম্ব ব্যাপিয়া থাকে।

(৩) ফলভুক্ প্রাণীর সন্তানপ্রসবকালে যে ফুল নির্গত হয়, তাহা ডিম্ব ব্যাপিয়া না থাকিয়া একখানি চাকৃতির ন্যায় স্বতন্ত্রভাবে থাকে।

মনুষ্যের 'ফুল' ফলভুক্ প্রাণীর মত, অতএব মানবজাতি ফলভুক্।

(গ) এখন দেখা যাউক, সকল জীবের আহারপ্রণালী কি প্রকার।

১। শস্যভুক্-প্রাণীর আহার্য্য-গ্রহণোপযোগী ক্ষুর আছে। মাংসাশী প্রাণীর দুর্ব্বলকে হত্যা করিবার উপযুক্ত থাবা ও দন্ত আছে এবং ফলভুক্-প্রাণীর ফল তুলিতে ও খোসা ছাড়াইতে হস্তপদাদি আছে।

২। শস্যভুক্-প্রাণিগণ, ইচ্ছামত চোয়াল ঘুরাইতে ও ফিরাইতে পারে ; কিন্তু, মাংসাশী-প্রাণিগণ তাহা পারে না—কেবল একদিকে নাড়িতে পারে। মাংসাশী প্রাণিগণ প্রথমতঃ থাবা ও দন্ত দ্বারা মাংসখণ্ড টুকরা টুকরা করিয়া পরে কসের দাঁতের করাতের মত ধার দিয়া হাড় হইতে মাংস ছাড়াইয়া ভক্ষণ করে। ফলভুক্ প্রাণীরা ঠিক্ শস্যভুক্ প্রাণীর মত চর্ব্বণ করে।

৩। মাংসাশী প্রাণী লেহন করিয়া জলপান করে ; কিন্তু, মনুষ্যাদি প্রাণিগণ শস্যভুক্ প্রাণীর মত শোষণ করিয়া জলপান করে।

(ঘ) হিন্দুশাস্ত্রে আমিষ-বিষয়ে বিধান এই ;—

"মৎস্যাস্তু করতো জগ্ধ্বাসোপবাসং
ত্র্যহং বসেৎ, অজ্ঞানত-স্ত্বর্দ্ধম্।" (প্রায়শ্চিত্তবিবেক)

অর্থাৎ স্বেচ্ছায় আমিষ ভক্ষণ করিলে তিন দিবস এবং অনিচ্ছায় ভক্ষণ করিলে তদর্দ্ধেক সময় উপবাস করিতে হয়।

"মৎস্যাদঃ সর্ব্ব-মাংসাদ-স্তস্মান্মৎস্যান্
বিবর্জ্জয়েৎ।"—(মানব-ধর্ম্মসংহিতা, ৫ম অধ্যায়।)

অর্থাৎ—মৎস্যকে আহার করিলে সকল প্রাণীরই মাংসভক্ষণ করা হয় ; এইজন্য মৎস্যভক্ষণও নিষিদ্ধ।

"মৎস্য-মাংস-রতনাং বৈ দূরে তিষ্ঠতি শঙ্করঃ।"—(কাশীখণ্ড)

অর্থাৎ—মহাদেব, মৎস্য-মাংসাহারী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে দূরে থাকেন।

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকে যে, আমিষ-ভক্ষণ—ধর্ম্মবিরুদ্ধ, স্বাস্থ্যবিরুদ্ধ ও সভ্য-সমাজবিরুদ্ধ। যাঁহারা আমিষ ভক্ষণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই একবাক্যে বলিয়া থাকেন যে, আমিষ-ভক্ষণ অনুচিত এবং অভ্যাসবশতঃ তাহা ত্যাগ করা যায় না। যাঁহাদের মনের বল প্রবল, যাঁহারা ঈশ্বর প্রেমে মোহিত ও ঈশ্বরানুরাগী ; তাঁহারাই আমিষ-ভোজনে বিরত হন। তাঁহারাই প্রকৃত মনুষ্য, তাঁহারাই ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র, তাঁহারাই প্রকৃত দয়ালু ও ঈশ্বরপ্রেমিক। যাঁহারা আমিষ-ভক্ষণ করেন, তাঁহারা আমিষভক্ষণের পক্ষপাতী হইয়া, নানাপ্রকার অসার যুক্তি দেখাইয়া থাকেন। সেই গুলির খণ্ডন-হেতু নিম্নে প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করিলাম।

আমিষ ও নিরামিষ।

প্রশ্ন।—আমিষভোজন ঈশ্বরানুমোদিত হইলে, মনুষ্যের দন্ত নিরামিষ-ভোজীর মত কেন?

উত্তর।—মনুষ্যের দন্ত আমিষভোজনোপযোগী নহে। কেন না, মনুষ্য আম-মাংস-ভোজী জন্তুর মত চর্ব্বণ করিতে অক্ষম। উহা চর্ব্বণোপযোগী করিবার জন্য মানুষকে রন্ধন করিতে হয়। মাংসাশী জন্তুগণ আমমাংস ভক্ষণ করিবে, আর বুদ্ধিমান্ মনুষ্য সিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করিবে বলিয়াই যে, ঈশ্বর মনুষ্যকে বুদ্ধিশক্তি দিয়াছেন, তাহা নহে। মনুষ্য দয়া করিয়া অন্য প্রাণীকে, মাংসাশী পশুবৎ, হত্যা করিবে না এবং নিজ-প্রাণ-রক্ষার্থ উদ্ভিজ্জাদি রন্ধন করিয়া আহার করিবে বলিয়াই, মনুষ্যকে ঈশ্বর বিবেকশক্তি দিয়াছেন। মনুষ্যের দন্ত—ঠিক বনমানুষ, বানর, হনুমান্ প্রভৃতির মত। মানুষ আমিষ ভক্ষণ করিবে, ইহা যদি ঈশ্বরের আজ্ঞা হইত—তবে বনমানুষ, বানর, হনুমান প্রভৃতি লতাপাতা, ফলমূল প্রভৃতি ভক্ষণ করিত না।

প্রঃ। আমিষভক্ষণ না করিলে, শরীরে বল হইবে কি প্রকারে?

উঃ। আমিষভোজিগণই যদি বলশালী হইত, তবে নিরামিষাশী হস্তী, গণ্ডার, মহিষ, ভল্লুক, উষ্ট্র, অশ্ব, হরিণ প্রভৃতি—সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগাল, কুকুর, প্রভৃতি অপেক্ষা বলশালী ও দ্রুতগামী হইত না; অন্যান্য স্ত্রীলোক অপেক্ষা বিধবা নারীরা—নিরোগিণী, বলশালিনী, দীর্ঘজীবিনী ও ধৈর্য্যশীলা হইতেন না; হিন্দুস্থানীগণ, জাপান ও চীনের অধিবাসিগণ, গ্রীস ও ইতালী-বাসিগণ, আয়র্লণ্ডীয় শ্রমজীবিগণ, রুসীয় সৈন্য, স্মার্ণাবাসিগণ, ভারতীয় সন্ন্যাসিগণ, ইংলণ্ড ও ফিলাডেলফিয়ার বাইবেল্-খৃষ্টানসম্প্রদায় ইত্যাদি জগতের অন্যান্য লোক অপেক্ষা বলশালী হইতেন না। যদি আমিষাশীরাই বলশালী হইতেন, তবে আম-মাংসাশী সেমোইড, আস্‌টিয়াক, বুরাট, তঙ্গুসী, কেমশ্যাডেল, ল্যাপল্যাণ্ডবাসী, এস্কুইমো প্রভৃতিগণ—অসভ্য, খর্ব্ব, দুর্ব্বল ও সাহসহীন হইত না।

সংক্রামকরোগগ্রস্থকে স্পর্শ করিলে যখন রোগাক্রান্ত হইতে হয়, তখন নানাপ্রকাররোগগ্রস্থ মৎস্যাদি ভক্ষণ করিলে কি না হইতে পারে? এই-জন্যই প্রায় অনেক প্রদেশ, বিশেষতঃ উৎকল ও বঙ্গদেশ—উৎসন্নপ্রায় হইয়াছে। সুয়েজখালনির্ম্মাতা মুসো ডি. লেসেপ্স বলেন;—

"নিরামিষাশী আরব্য ও হিন্দুস্থানবাসী শ্রমজীবী না থাকিলে, য়ুরোপের

অলস ও অকর্ম্মণ্য শ্রমজীবিগণের দ্বারা এত বৃহৎ ব্যাপার কিছুতেই সম্পাদিত হইত না।" তিনি মাংসাশীদিগকে নিন্দা করিতে ত্রুটি করেন নাই।

প্রঃ। আমিষভক্ষণ না করিলে, মনুষ্য জ্ঞানবান্ হইবে কিরূপে?

উঃ। যদি আমিষভক্ষণ করিলেই, জ্ঞানসঞ্চার হইত, তবে ভারতীয় আর্য্যঋষিগণ, য়ুরোপীয় নিউটন, বেকন্, ফ্রাঙ্কলিন্, এডিসন্ প্রভৃতি মহাত্মাগণ উর্ব্বর-মস্তিষ্ক হইতেন না।

প্রঃ। মনুষ্য আমিষ পরিপাক করিবার শক্তি কোথায় পাইল?

উঃ। মনুষ্য যে কেবল আমিষ পরিপাক করিতে পারে, তাহা নহে; প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ—উভয়বিধ খাদ্যই পরিপাক করিতে পারে। জীব অভ্যাসেরই দাস। যে, যাহা অভ্যাস করিবে, তাহাই অভ্যস্ত হইবে। সিংহ-শাবক প্রভৃতি মাংসাশী জন্তুকে জন্মাবধি মাংস খাইতে না দিলে—সে কখনই মাংস খাইতে পারিবে না—মনুষ্যের তো কথাই নাই। তবেই দেখা যাইতেছে যে, অভ্যাসই পরিপাকশক্তির মূল।

প্রঃ। সর্ব্বত্র একপ্রকার উদ্ভিজ্জ খাদ্য পাওয়া যায় না কেন?

উঃ। সর্ব্বত্র উদ্ভিজ্জ খাদ্য এক প্রকার নহে বলিয়াই যে, আমিষভোজন ঈশ্বরানুমোদিত, তাহা নহে। সকল দেশের জল-বায়ু-মৃত্তিকা ও ধাতু একপ্রকার নহে, কাজেকাজেই নানা দেশে নানাপ্রকার উদ্ভিদ্ ও নানাপ্রকার প্রাণী। সকল দেশেই যে, উদ্ভিজ্জ খাদ্য পাওয়া যায়, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহা না হইলে, সকল দেশেই উদ্ভিজ্জভোজী প্রাণী দৃষ্ট হইত না।

প্রঃ। শীতপ্রধান দেশে মাংস না খাইলে চলিবে কিরূপে?

উঃ। শীতপ্রধান দেশে, যখন নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জভোজী জন্তু, অনায়াসে বাস করিতে পারে, তখন নিরামিষাশী মানুষেও, ইচ্ছা করিলে কেন না থাকিতে পারিবে? তাহা না হইলে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশীয় মানবের মত গঠনে গঠিত না হইয়া, শীতপ্রধানদেশোপযোগী আকারে মানুষ, দয়াময় পরমেশ্বর কর্ত্তৃক গঠিত হইত।

প্রঃ। আমিষভোজনে কি কোন রোগ উৎপন্ন হইতে পারে?

উঃ। আমিষভোজনে বসন্তরোগ, ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, মূত্রসম্বন্ধীয় নানাপ্রকার পীড়া, মৃগী, ক্যান্‌সার, বাত, অম্লপিত্তাধিকারের প্রায় সকল রোগ, টেপওয়ার্ম্, টাইফয়েড্ ফিভার, ব্রাইটস্ পীড়া, স্কার্লেট ফিভার্, ডিপ্‌থিরিয়া এবং সকল প্রকার রোগোৎপাদক ইউরিক্ এসিড্ নামক এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়; আমিষভোজনে অকালে দন্ত পড়িয়া যায়।

প্রঃ। কে বলে, আমিষ-ভোজনে সত্ত্বগুণের লোপ হয় ?

উঃ। তমোগুণোৎপন্ন পশু, পক্ষী, প্রভৃতি ইতর প্রাণিগণকে ভক্ষণ করিলে তমোগুণের প্রাধান্য হয় এবং সত্ত্বগুণের লোপ হইয়া থাকে। তমোগুণ হইতে কাম, ক্রোধ, লোভাদি ষড়রিপু উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যকে পশুত্বে পরিণত করে।

প্রঃ। দেবতার উদ্দেশে যে প্রাণি-বধ করা হয়, তাহার মাংসভোজনে কি পাপ হয় ?

উঃ। সকল ধর্ম্মেরই সার—অহিংসা পরম ধর্ম্ম। অসংযমী লোকগণ, বিশেষতঃ ভণ্ড বৈরাগিগণ, আপনাদের পশুত্ব রক্ষার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দোহাই দিয়া থাকে। *

শ্রীলালা কুঞ্জবিহারী বৈশ্য।

---

* "সকল প্রাণীর আত্মা সমান"—ইহার বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক প্রমাণ কি ?

(২) "আমিষ-ভোজী হত্যাকারী" যদি হয়—তবে নিরামিষ-ভুকেরও ঐ অপরাধ হইতে অব্যাহতির সম্ভাবনা কোথায় ? এতৎসম্পর্কে হিন্দুর পরম পূজ্য "শ্রীমদ্ভাগবতে" স্থানে স্থানে প্রসঙ্গোত্থ কথার অবতারণাই পর্য্যাপ্ত।

শস্য-ভক্ষণে ও বীজক্ষয়েও প্রকারান্তরে জীব-হত্যার কথা আসিয়া উপস্থিত হয়। এক একটী বীজ হইতে কত শত শস্য, সমুৎপাদিত হয় এবং তাহাতে কত শত প্রাণী রক্ষিত হয়—তাহার ইয়ত্তা কোথায় ? সুতরাং, শস্য ভোজনও গৌণ-ভাবে প্রাণি-নাশের পোষক। ইহাই ভাগবতী উক্তি। উদ্ভিজ্জভোজীরাও কি প্রকারান্তরে "হত্যাকারী" নয় ?

৩। মানবের ও পশুর যান্ত্রিক গঠন ও আকারাদির পার্থক্য দেখাইয়া মানব-জাতিকে একেবারে 'ফল-ভক্ষকের' দলভুক্ত করা, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক প্রথাসঙ্গত হয় নাই। কোন্ জাতীয় লোকেরা, নিরবচ্ছিন্ন "ফল-ভুক্" হইয়া আমরণ জীবনধারণ করিয়াছেন, বা করিতেছেন ? তদ্বিরুদ্ধে বরং প্রমাণ এই যে,—"গৌড়ে মৎস্যস্য ভোজনে" * * * "ন দোষঃ"। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে—,

"ন মাংস-ভক্ষণে দোষো, ন মদ্যে * * *।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং, নিবৃত্তিস্তু মহা-ফলা ॥"—মনু।

ইহাও মনুরই মত। "নিরামিষাহার"-বিষয়টী এখনও নির্ব্বিবাদ নয়। উহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে প্রবল যুক্তিপরম্পরা পরিদৃষ্ট হয়। আর—হিন্দু বিধবা রমণীগণ যে স্বাস্থ্যসৌভাগ্য সম্পন্না—আমিষ-ভোজন-বর্জ্জনই—তাহার অদ্বিতীয় কারণ নহে। কিন্তু 'একাহারও' (একবেলা ভোজন) এবং বিশেষতঃ সংযমই অন্যতর হেতু নয় কি ? মৎস্যাহার-ত্যাগে অনেককেই উদরাময়-রোগাক্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছে। অবশ্য অভ্যাসের গুণে অনেক তারতম্য হয় সন্দেহ নাই। লেখক মহাশয়কে অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার" গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে আমরা অনুরোধ করি।—জাং সং।

স্বপ্ন-প্রসঙ্গ।

মানুষ যতই জ্ঞানের গর্ব্ব করুক না কেন, জগতে এমন অনেক বিষয় আছে, যেখানে মানুষের বুদ্ধি সামান্যমাত্রও প্রবেশ করিতে পারে না। তাহাদের জ্ঞানের গর্ব্ব একেবারে খর্ব্ব হইয়া যায় ও আপনা হইতেই তাহারা বলিয়া উঠে "হে অনন্ত! তোমার অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্রের উপকূলে শুধু উপল-খণ্ডই কুড়াইলাম, উহাতে একবার অবগাহনও করিতে পারিলাম না।" স্বপ্ন কি ? এতৎসম্বন্ধেও ঐ কথাই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। মানবের সৃষ্টি অবধি মানব এ বিষয়ে যে একেবারেই চিন্তা করে নাই—এমন কথা নহে ; কিন্তু, সে রহস্য-উদ্ঘাটনে এ পর্য্যন্ত কেহই সমর্থ হন নাই। প্রাচীন হিন্দুগণ, কোন্ তিথিতে কোন্ বারে এবং কোন্ সময়ে কি স্বপ্ন দেখিলে, কি ফললাভ হয়, তাহা কোন কোন পুস্তকে তাঁহাদের বহুদর্শিতানুসারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন বটে এবং অনেক সময়ে তদনুযায়ী ফলও হইতে দেখা যায় ; কিন্তু স্বপ্ন কি ? এ বিষয়ে তাঁহারা নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান মনোবিজ্ঞানও এ সম্বন্ধে নীরব। তবে একথা যথার্থ যে, শারীরিক অসুস্থতা ও মানসিক দুশ্চিন্তা-নিবন্ধন আমরা অনেক সময়ে দুস্বপ্ন বা সুস্বপ্ন দেখিয়া থাকি এবং দিবসের কৃত কার্য্য মস্তিষ্ককে এমন ভাবে অধিকার করে যে, রজনীযোগে ঐগুলিই পুনরায় স্বপ্নে দর্শন করি। এই স্বপ্নগুলিকে দেহজ বলিতে পারি। এতদ্ব্যতীত আমরা আরও অনেক রকম স্বপ্ন দেখিয়া থাকি, সেগুলি কোনও রূপ চিন্তা বা কার্য্য বা ব্যাধির পরিণাম নহে। সেগুলি কি ? এখন তাহাই চিন্তার বিষয়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়—ঐরূপ স্বপ্নগুলি শেষে প্রায়ই সত্য-স্বপ্নে পরিণত হয়। আমার নিজ জীবনে যে সকল স্বপ্ন, পরে সত্যে পরিণত হইয়াছে, সেগুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

আমার বিশ্বাস, আমাদের এ সকল স্বপ্নের মূল আত্মা। এগুলিকে আত্মজ স্বপ্ন বলিতে পারি। নিদ্রিতাবস্থায় আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি যখন নিস্তেজ অবস্থায় বিরাজ করে, তখন আমাদের আত্মা, সম্ভবতঃ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং সে সময়ে ইহার কতকগুলি ক্ষমতার বিকাশ হইয়া থাকে এবং তদ্ধেতু আমরা দূরস্থিত বিষয়গুলি, স্বপ্নে অবগত হইতে পারি ; অথবা স্বপ্নাবস্থায় অপর কোন অদেহী আত্মা, আসিয়া আমাদের দেহস্থিত আত্মাকে সকল কথা বলিয়া যায়। যুক্তি দ্বারা এ সকল বিষয় স-প্রমাণ করা সম্ভব নয়, তজ্জন্য ইহাকে আমার

বিশ্বাস বলিয়া উল্লেখ করিলাম। পাঠকপাঠিকাগণ নিম্নের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত কয়টি পড়িয়া এ বিষয়ে ভালরূপ চিন্তা করিয়া দেখিলে বাধিত হইব।

(১)

গত মার্চ্চ মাসে আমি আমার বিক্রমপুরের বসত-বাটীতে ছিলাম। আমার পত্নী আমার সন্তানাদি সহ কলিকাতায় তাঁহার ভ্রাতৃগণের নিকট ছিলেন; রজনীযোগে স্বপ্ন দেখিলাম—নিলফামারী ষ্টেসনে আমার শ্বশুর মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান হইলেই, তিনি বলিলেন—"তুমি আসিয়াছ বেশ হইয়াছে, উহারা (আমার পত্নীর নাম উল্লেখ করিয়া) আমার কাছেই আছে। তুমি দেখা করিয়া আইস; কিন্তু তোমার সব কয়টি সন্তানকে দেখিতে পাইবে না।" স্বপ্ন দেখিয়া জাগরিত হইলাম। মন বড়ই উদ্বিগ্ন হইল। প্রাতে চিঠির আশায় ডাকঘরে গেলাম, চিঠি পাইলাম না। পত্নীকে স্বপ্নের বিষয় উল্লেখ করিয়া উদ্বিগ্ন মনে পত্র লিখিলাম। দুই দিন পরে কলিকাতা হইতে শ্বশুর মহাশয়ের টেলিগ্রাম পাইলাম, আমার দ্বিতীয় পুত্র কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছে। টেলিগ্রাম পাইয়া কলিকাতা আসিয়া দেখিলাম, আমার দ্বিতীয় পুত্র ও একমাত্র কন্যা আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া পরলোকে তৎপূর্ব্বেই প্রয়াণ করিয়াছে। অনুসন্ধানে জানিলাম, আমি যে রাত্রিতে স্বপ্ন দর্শন করি, সে রাত্রিতে বস্তুতঃই শ্বশুর মহাশয় নিলফামারী ষ্টেসনে ছিলেন।

(২)

আমার এক পিতৃব্য মেদিনীপুর কালেক্টরীর খাদাঞ্চী ছিলেন। ১২৯৭ সালের ৩রা চৈত্র রজনীযোগে স্বপ্ন দেখিলাম, কতকগুলি লোকে তাঁহার মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, আর আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ ক্রন্দন করিতে করিতে দৌড়িতেছি। পরদিন তারযোগে সংবাদ পাইলাম, ওলাউঠা রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

(৩)

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে আমি আগ্রা-অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে যাই। সে সময় একদিন হঠাৎ রজনীযোগে স্বপ্ন দেখিলাম, যেন আমার কোনও বন্ধু, আমাকে পত্র লিখিয়াছেন যে, "তোমার স্ত্রী অত্যন্ত পীড়িতা, তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন।" পরদিন প্রাতে আমার সর্ব্বাগ্রজের এক পত্র পাইলাম। তাহাতে সত্য সত্যই আমার স্ত্রীর সঙ্কটাপন্ন ব্যাধির সংবাদ অবগত হইলাম। তাঁহারা

তখন বাঁকিপুর-পাটনাতে বাস করিতেছিলেন, সেইদিনই বাঁকি[illegible]-পাটনায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, পত্নী কঠিন নিউমোনিয়া ও রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। দারুণ বিকার উপস্থিত!

(৪)

ঐ বৎসর জানুয়ারি মাসে আমি বরিশাল "অমরাবতী" মেসে অবস্থান করিতেছিলাম; আবশ্যক খরচপত্রের অভাব হইয়াছিল। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বিষয়কার্য্য-উপলক্ষে সে সময় আমার ভ্রাতৃগণ বাঁকিপুরে বাস করিতেন। বহুদিন তাঁহাদের সংবাদ না পাওয়ায়, অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিলাম। রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম, সর্ব্বাগ্রজ মহাশয়ের প্রেরিত রেজিষ্টার্ড পত্রের ভিতর একখানি পঞ্চাশ টাকার নোট ও তৎসঙ্গে তাঁহাদের মঙ্গল সমাচারযুক্ত একখানি চিঠি আসিয়াছে। পরদিন প্রভাতে আটটার সময় ঐরূপ একখানি পত্র পাইলাম। উহা সত্য সত্যই রেজিষ্টার্ড এবং উহার ভিতরে সত্য সত্যই একখানি পঞ্চাশ টাকার নোট ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, পত্রখানি নীলরঙ্গের লেপাফায় আবৃত ছিল। স্বপ্নেও ঐ রঙ্গের লেপাফা দেখিয়াছিলাম।

(৫)

১৯০০ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারি রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম, আমার স্ত্রী আমার নিকট আসিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত। পরদিন তাঁহার পত্রে অবগত হইলাম, তিনি "জল-বসন্ত" রোগে আক্রান্ত হইয়া বড় কষ্ট পাইতেছেন

(৬)

আমার এক ভাগিনেয় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ডেরাডুন কলেজ স্কুলে [illegible] করিত। আমাদের নিজবাসগ্রামেই আমার ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল [illegible]। ভাগিনেয় বহুদিন কোনরূপ চিঠিপত্র লেখে না, আমাদের [illegible] বাটীর সমস্ত পরিবারই চিন্তাকুল; আমি স্বপ্নে দেখিলাম—[illegible] ষ্টেসনে আমার ভাগিনেয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। তাহাকে চিঠির বিষয় জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল—"কেন? আমি তো গত মঙ্গলবার আমার নিজ[illegible] পত্র [illegible] যে, আমি শুক্রবার বাড়ী পঁহুছিব।" শেষরাত্রে [illegible] ঐ রজনী-প্রভাতেই শুক্রবার। হিসাব করিয়া দেখিলাম [illegible] হইতে পত্র লিখিলে ঐ দিন প্রভাতেই সে চিঠি পাওয়া যাইবে এবং স্বপ্নদৃষ্ট বিবরণ সত্য হইলে, ঐ দিবস সন্ধ্যার সময়ে ভাগিনেয় বাটী পঁহুছিবে।

বস্তুতঃ-ও তাহাই হইল। প্রভাতে তাহাদের বাটীতে তাহার চিঠি পঁহুছিল এবং ভাগিনেয় সন্ধ্যার সময় বাটীতে উপনীত হইল।

জীবনে শুধু এই কয়টি স্বপ্নই ফলবান্ হইয়াছে, এরূপ নহে; আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্বপ্ন দেখিলেই আমার কোন স্বপ্নটি সফল হইবে, তাহা আমি পূর্ব্বেই বেশ বুঝিতে পারি। কি প্রকারে বুঝিতে পারি, তাহা অপরকে বুঝাইতে পারিব না, উহা হৃদয়ের একটা অবস্থামাত্র, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ভবিষ্যতে আশা রহিল, আমার অপর স্বপ্ন-সহ আত্মীয়-স্বজনের দৃষ্ট স্বপ্নের বিবরণও, পরে পাঠকপাঠিকাদিগকে উপহার দিতে সমর্থ হইব।

শ্রীঅমলেন্দু গুপ্ত।

যাত্রায় আবৃত্তি।

তা'র পর * যাত্রার কথা,—যাত্রায় আজকাল যে ভাবে আবৃত্তি করা হয়, ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে সেরূপ আবৃত্তি ছিল না। শুনিয়াছি, সে কালের যাত্রায় 'মুনি গোঁসাঞি' ও 'দূতী'কেই সকলের হইয়া ঘট্‌কালি করিতে হইত। আর সকলে 'হাঁ গো বৃন্দে,' 'না গো বৃন্দে' বলিয়াই দায়ে খালাস পাইতেন। বলা বাহুল্য, সে কালে সর্ব্বপ্রথমে কৃষ্ণ যাত্রারই প্রাদুর্ভাব ছিল, তাহার পরে দুই একটা রাস যাত্রাও দেখা দিয়াছিল এবং তাহার অনেক পরে শ্রীযুক্ত লোকনাথ দাসের (লোকা ধোপার) সম-কালে নল-দময়ন্তী, শ্রীমন্তের মশান প্রভৃতি পালা গাহিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এই সকল পালায় "মুনি গোঁসাঞি" ও "দূতীর" স্থান না থাকায়, যাত্রার অভিনয়াংশে এবং ঘট্‌কালিতে অনেক উন্নতি হয়, সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার যে পুরাতন আবৃত্তি-প্রথা ছিল, তাহারও পরিবর্ত্তন হয়। প্রাচীন যাত্রায় মুনি গোঁসাঞিকে ও দূতীকে পণ্ডিত ও শাস্ত্রদর্শী হইতে হইত। অন্ততঃ যাঁহাদের সেরূপ বিদ্যা থাকিত, যাত্রার ব্যবসায়ে তাঁহারাই প্রতিষ্ঠালাভ করিতেন। কালীয়-দমন, মান, মাথুর, কলঙ্ক-ভঞ্জন প্রভৃতি যে কোন পালাই গীত হইত, তাহাতেই মুনি-গোঁসাঞি ও দূতী, কথকের ন্যায়, গান, কীর্ত্তন ও পুরাণ-ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পালাটিতে রাধাকৃষ্ণের

* গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত "বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে আবৃত্তির আদর" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—লেখক।

ঈশ্বরত্ব ও মহিমা ব্যাখ্যা করিতেন। রাধাকৃষ্ণ, সখীগণ, ব্রজবালকগণ, নন্দ, যশোদা প্রভৃতি অভিনেতারা উহাদের কথায় বা প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্ত্রোক্ত কূট-বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর-সাধক-মাত্র হইতেন। মুনি গোঁসাঞির এবং দূতীর অভিনয়াংশে অথবা প্রকৃত প্রস্তাবে আবৃত্তিতে ঐ কারণে সংস্কৃত সাধু-ভাষা এবং কথোপকথনের ভাষা উভয়েরই বাহুল্য থাকিত; সুতরাং এ আবৃত্তিতে যে, বেশ একটু গুণ-পণার প্রয়োজন হইত, তাহা সকলেই, অনুমান করিতে পারিতেছেন; কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে যতটা আবশ্যক, বাস্তবিক ততটা গুণপণা সে সকল ঘট্‌কালিতে ছিল কি না, আমার পক্ষে ঠিক বলা সম্ভব নহে। কারণ, তত প্রাচীন কালের যাত্রা দেখিবার জন্য আমি ততপূর্ব্বে জন্ম-গ্রহণ করিতে পারি নাই। প্রাচীনদিগের মুখে এ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, আর তাহা হইতে আমার যে ধারণা হইয়াছে, তাহাই আমি বলিতেছি। মুনি গোঁসাঞি ও দূতীর আবৃত্তি ব্যাখ্যা-প্রধান ছিল; কাজেই তাঁহারা অভিনয়ের পাত্রহিসাবে তদ্গত বা তন্ময় ভাবে আবৃত্তি করিয়া অভিনয়ের সফলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারিতেন না। তখনকার যাত্রায় অভিনয়-কৌশলকে প্রধানভাবে অবলম্বন না করিয়া, প্রত্যক্ষভাবে লোককে শাস্ত্রশিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা-দান এবং দেবমাহাত্ম্য-জ্ঞাপন করানই, উদ্দেশ্য ছিল। যাত্রার অধিকারীরা সেই উদ্দেশ্য পরিস্ফুট করিবার জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে সাঙ্গোপাঙ্গ কথকথাকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। অন্য অভিনেতারা কেবল ভাবোদ্রেকের সাহায্য করিবার জন্য সজীব প্রতিমার ন্যায় সাজিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন এবং 'হাঁ গো বৃন্দে' 'না গো বৃন্দে' বলিয়া কাজ সারিতেন। প্রায় সকল দলের অধিকারীই 'দূতী' বা 'মুনি গোঁসাঞি' সাজিতেন। মুনি গোঁসাঞি অর্থে কোথাও নারদ, কোথাও ব্যাস। যাত্রার 'বাসদেব'—অনেক সময়ে ভগবানের অবতার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইয়া দেখা দিতেন না—'বসন্তক' বা 'মাধব্য' হইয়া দেখা দিতেন। আসর হইতে 'বাসদেব রে বাসদেব' বলিয়া ডাকিলে, 'বাসদেব' নাচিতে নাচিতে সভাস্থলে প্রবেশ করিতেন। এ সকল কথার বিস্তৃত আলোচনার স্থান এখানে নাই। তবে বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে বলিয়া কিছু কিছু বলিতে বাধ্য হইতেছি। তবে ইহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, সকল দলেই 'বাসদেবকে' নাচিতে হইত না। আবার 'মুনি গোঁসাঞি' বা 'দূতীকে' অভিনয়ার্থ যে কথকতা করিতে হইত, তাহা রঙ্গস্থলস্থ কথোপকথনকারী নটদ্বয়, নটীদ্বয় বা নটনটীদ্বয়ের উভয়ের পক্ষ হইতেই করিতে হইত বলিয়া অভিনয়কে

সাধারণ্যে 'কথকতা' না বলিয়া ঘটকের ঘট্‌কালির সহিত সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া 'ঘট্‌কালিই' বলিত। যাহা হউক, এ ঘট্‌কালি যে, সাজপোষাকে আরত, বাদ্যযন্ত্র স যোগে কথকতা ভিন্ন কিছুই নহে, তাহা বেশ বোঝা যাইতেছে।

ঘট্‌কালি-ধরণের আবৃত্তি-প্রথা এখনও শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের দলের কৃষ্ণযাত্রায় শুনিতে পাইবেন। গোবিন্দ অধিকারীর দলের সঙ্গে এই ঘটকালি ধরণের অর্থাৎ কথকতা-প্রণালীর অভিনয় লোপ হয়। শ্রীযুক্ত লোকনাথ দাসের যাত্রার দলের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়াংশের কথোপকথনের প্রণালী পরিবর্ত্তিত হয়। কথকতা-প্রণালীর অভিনয়ে অভিনেতার ব্যাখ্যার প্রতিই আগ্রহ দেখা যাইত। তৎপরিবর্ত্তে যে প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাতে অভিনয়ের বিষয়োচিত স্বরভঙ্গীর ও অঙ্গভঙ্গীর প্রতি অভিনেতার মনোযোগ পড়িয়াছিল। পূর্ব্বের নামানুসারে তখনও ইহাকে ঘট্‌কালি বলিত। এই সময় হইতে মুনি গোঁসাঞি বা দূতী-বৎ একজন মূল গায়নের প্রয়োজনীয়তার অভাব হইতে থাকে; এই সময় হইতে ছোটবড়, প্রধান-অপ্রধান সকল অভিনেতাকেই নিজ নিজ অভিনেতব্যগুলি বিশেষ চেষ্টায় অভ্যস্ত করিতে হইত। এই সময় হইতে দ্বারবান্, ভিস্তী, ভিক্ষুক, মালী, বোপা, কোটাল, প্রভৃতি বিষয়ের অভিনেতারা অল্পে অল্পে স্বাভাবিক ভাবের অনুকরণ করিতে প্রলোভিত হইত। এই অনুকরণ-প্রবৃত্তির বশে আবৃত্তি-প্রথা, কেবল ঘট্‌কালির মত না হইয়া ক্রমশঃ উচ্চ আদর্শে উঠিতে থাকে। তখন কৃষ্ণ-যাত্রাতেও কংস-কারাগারের প্রহরী ভোজপুরী দ্বারবানের স্বর-ভঙ্গী, চা'ল্-চলন পোষাক এবং জাতি-গত প্রকৃতিরও অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়া শিখিত। শ্রীমন্তের মশানের কোটালেরা, সেকালের পুলিশের দারোগা-জমাদারের স্বর-ভঙ্গী ও চা'ল্-চলনের অনুকরণ করিত।

ক্রমশঃ ইহা এতটা প্রলোভনজনক হইয়াছিল যে, কোন অভিনেতা হুবাহু কোন নকল করিতে পারিলে, লোকে সন্তুষ্ট হইয়া বলিত—'অমুক দলের অমুক, কোটালের সঙ্ দেয় ভাল—অমুক ভোজপুরী দরওয়ানের সঙ্ দিয়েছিল চমৎকার!'—ইত্যাদি। ভাষার তখন বিশুদ্ধতা ছিল না। যে অভিনেতা, তাহা রাখিতে পারিত, সে-ই, বিশেষ প্রশংসা পাইত—অর্থাৎ দ্বারবান্ সাজিয়া ঠেট হিন্দী কথা কহা—বা প্রাদেশিক হিন্দী শুদ্ধভাবে কহিতে পারা, কোটাল সাজিয়া ভাল উর্দ্দু কহিতে পারা, একটা চমৎকারিত্বের কথা ছিল। দেবল ব্রাহ্মণ সাজিয়া বঙ্গদেশীয় উচ্চারণ অনুকরণ, কিংবা ভিক্ষুক সাজিয়

মেদিনীপুরে বা কাটোয়ার কথা নকল করিতে পারিলে, বিশেষ বাহবা পাইত। এই সময়ে ইহার নাম হয়—সঙ্। এই সকল চরিত্র ভাল করিয়া অভিনয় করিতে পারিলে, লোকে প্রশংসা করিয়া বলিত—'লোকটা সঙ্ দিচ্ছে ভাল,—সঙ্ সেজেছে ভাল—কেহ বলিত না। এই সময় যে সকল অভিনেতা রাজা, রাণী, মন্ত্রী, সেনাপতি ইত্যাদি সাজিত, তাহারা নানারূপ করিত সুরের আশ্রয় লইয়া শ্রোতৃবর্গকে প্রীত করিতে চেষ্টা করিত। রাণীর ন্যায় বয়স্থা স্ত্রীলোকের অভিনয়ে—পূর্ব্ববর্ত্তী যশোদার ক্রন্দন-সুরের ঝঙ্কার বরাবরই থাকিত। রাজকন্যারা রাধিকার কান্নার নাকীসুর অনুকরণ করিতেন বটে; কিন্তু তাহার মধ্যেও তাঁহারা একটু পদোচিত সম্ভ্রম দেখাইবার চেষ্টা করিতেন। প্রধানা সখী, কাজে কথায় চা'ল্-চলনে—প্রধানতঃ সেকালের দূতীগিরিই করিতেন, অধিকন্তু পরিহাস-রস ফুটাইবার চেষ্টা পাইতেন।

রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতিরা চা'ল্-চলনে প্রায় নায়েব-গোমস্তার চা'ল্ চালিতেন, কেহ বা জমীদারের নকলে বসিতেন, বেড়াইতেন, লোকে তা দিতেন এবং হুকুম-হাকাম করিতেন। কথকতা-মূলক অভিনয়-প্রণালীর পরিবর্ত্তনের যুগে এইরূপ হইয়াছিল। ইহা গোপালে উড়ের যাত্রার দল পর্য্যন্ত ছিল। তাহার পর যাত্রার দলে অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা বাড়িতে থাকিলে ঘট্‌কালির বিশেষ মার্জ্জনা হইতে থাকে। তখন অভিনেতারা অভিনয় করিতে করিতে, প্রয়োজন বুঝিয়া কাঁদিত, হাসিত, রাগ করিত, ভাবে ভাষায় ঐ সকল ব্যাপার ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা পাইত। এই সময়ে ঘট্‌কালির নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া 'বক্তৃতা' নাম হয়। বউ মাষ্টারের দলে রাম-বনবাসে 'ওরে রামধন! তুই হবি বনবাসী, কে আর আমারে ডাকবে মা বলে'—ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গানের দৃশ্যে রামলক্ষ্মণের বক্তৃতা সুন্দর ভাবব্যঞ্জক হইত বলিয়া, লোকে সেকালে উহা তুলনার স্থলে উল্লেখ করিত। এই সময়ে কলিকাতায় সাধারণ নাট্যশালার সূত্রপাতের যুগ। যুবকেরা নাট্যরসের নবস্বাদ পাইয়া যাত্রার বক্তৃতাকে তাচ্ছিল্য করিতে এই সময়েই শেখে। প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরা তখনও যাত্রার আকর্ষণে এতটা মুগ্ধ ছিলেন যে, তাঁহারা থিয়েটারী ধরণটাকে অতিমাত্র নিন্দা করিতেন। এই উভয়বিধ আবৃত্তি-প্রথার সংঘর্ষে পরবর্ত্তী যাত্রার দলে এক নূতন ধরণের স্বরভঙ্গী প্রবেশ করে। তাহার নামই সাধারণতঃ 'যাত্রার সুর'—'যাত্রার ঢঙ্'—ইত্যাদি হইয়াছিল। যাত্রার দলের অশিক্ষিত অভিনেতারা থিয়েটারের অনুকরণে

রসভেদে স্বরভেদ ও ভাবভেদ প্রদর্শন করিতে গিয়া যে, এক নূতন ও সহজ স্বরভঙ্গী একপ্রকার সুরের সাহায্যে গড়িয়া লইয়াছিল, তাহাই শেষকালে যাত্রার সাধারণ স্বরভঙ্গী হইয়া দাঁড়ায়। বৌকুণ্ডু, বৌমাষ্টার, পীতাম্বর পাইন, নবীন উকীল, গণেশ উকীল, হরিমোহন রায়, প্রসন্ন বাঁড়ুয্যে প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সহুরে যাত্রার দলে এই সুর ছড়াইয়া পড়ে। ইহার প্রভাব অতর্কিতে রয়াল্ বেঙ্গল এবং ন্যাশন্যাল থিয়েটারের অভিনেতৃবর্গের মধ্যেও গিয়া পড়িয়াছিল। গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে আদর্শসতীর অভিনয়ের সময়ে যম সাজিয়া ৺ মতিলাল সুর যে সুরে অভিনয় করিতেন, শুনিয়াছি তাহা বৌমাষ্টারের দলের সুরের অনুকরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই সময়ে যাত্রার দলে আবৃত্তি-প্রথা যে কিরূপ ছিল, তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইবার উপায় নাই। তবে এ কথা ঠিক যে, এই সময় হইতেই অভিনেতৃবর্গের ভাবোচিত স্বরভঙ্গীর দিকে লক্ষ্য আকৃষ্ট হইয়াছিল। তবে তাহা আদায় করিতে গিয়া লক্ষ্য স্থির করিতে না পারিয়া, সাধনা যে বিপথে চলিয়াছিল, তাহাতেও সন্দেহ নাই। যাত্রার দলের সুর-টানা অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে বহুল সাধু বাক্যের সহিত প্রাদেশিক ভাষার ও গ্রাম্য উচ্চারণের অবাধ মিশ্রণে এক অপূর্ব্ব প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

এই সময়ে কলিকাতায় সাধারণ নাট্যশালার শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। তাহার প্রভাবে পরবর্ত্তী যাত্রার দলগুলিতে আরও পরিবর্ত্তন ঘটে।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

বরকুমার-ব্রত।

আমাদের প্রবীণা রমণীসমাজের বারব্রত ও ক্রিয়াকর্ম্মগুলির বিষয়ে চিন্তা করিলে তাহা স্রোতস্বিনীর ধারার ন্যায় বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক ঐ সকল ক্রিয়াকলাপের স্তরেস্তরে দয়া, ধর্ম্ম, ভক্তি, তপস্যা, মুক্তি, সাধুতা, বিনয়, উন্নতি, উৎসাহ প্রভৃতিবিষয়ক উপদেশ যেন একাধারে গ্রথিত রহিয়াছে। এই মাঙ্গলিক ব্রতাদির মাহাত্ম্য-মাধুর্য্য সরলা রমণীগণের হৃদয় আশার আনন্দালোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিত। কালের তরঙ্গে এই পুণ্য বারব্রত-গুলি বিস্মৃতির অতলজলে নিমজ্জিত হইতেছিল; আনন্দের বিষয়, শিক্ষিত সম্প্রদায় এই সকল ক্রিয়াকলাপগুলিকে পুনর্জ্জীবিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

কুরুক্ষেত্র-সমর-প্রাঙ্গণে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতা-উপদেশে মহাবীর অর্জ্জুনকে জ্ঞান-ভক্তি ও কর্ম্মযোগের শিক্ষা দিয়াছিলেন। হয় তো তেমনই অন্তঃপুরবাসিনী হিন্দুরমণীগণের অন্তরে ধর্ম্ম ও কর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত করিবার উদ্দেশ্যে, নানাবিধ ব্রত উপলক্ষ করিয়া গার্হস্থ্যনীতির উপদেশ-প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বরকুমার-ব্রত শনিবারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সন্তানসন্ততি-লাভ-কামনায় রমণীগণ বরকুমারের অর্চ্চনা করেন। কেহ কেহ 'মানত' করিয়া আঠার মাস পর্য্যন্ত প্রতিমাসে একবার করিয়া এই ব্রত করেন; কেহ বা বৎসরান্তে, কেহ বা ছয় মাস অন্তে করিয়া থাকেন। অপুত্রের পুত্রকামনা ও পুত্রবতীর সন্তানের কল্যাণকামনাই, এই ব্রতের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রাঙ্গণে একটি স্থান পরিষ্কার করিয়া তাহার উপরে সাদা বর্ণের গুঁড়া দ্বারা বরকুমারের মূর্ত্তি রচিত হয়। একখানি কদলীর 'আগ-পাতে' আতপ চিড়া, কলা, চিনি, সন্দেশ, দধি, দুগ্ধ প্রভৃতির দ্বারা বরকুমারের ভোগ দিতে হয়। তাহা ছাড়া আতপ তণ্ডুলের নৈবেদ্যাদিও দিতে হয়। পুরোহিত অর্ঘ্যদানে ষোড়শোপচারে বরকুমারের পূজা করেন। ব্রতিনীকে ভোগের প্রসাদমাত্র ভক্ষণ করিয়া সেইদিন কাটাইতে হয়।

ব্রতকথা।

সেকালে স্বচ্ছল-অবস্থাপন্ন এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার সন্তানাদি কিছুই হয় নাই, সেজন্য ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী অত্যন্ত দুঃখিত। একদিন ব্রাহ্মণপত্নী দাসীর দ্বারা ধোপার বাড়ীতে কয়খানি মলিন বস্ত্র ধুইবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। ঝি ধোপাবাড়ীতে গিয়া ধোপানীকে ডাকিতে লাগিল; কিন্তু ধোপানী কিছুতেই সাড়া দেয় না। সে বরকুমারের ব্রত আরম্ভ করিয়াছে। ঝি বহুক্ষণ ডাকাডাকি করায় ধোপানী রাগান্বিত হইয়া বলিল, "তোমার সময় নেই, অসময় নেই, যখন ইচ্ছা তখনই আস। আমি বরকুমারের ব্রত আরম্ভ করিয়াছি, এখন এই আঁটকুড়া ঠাকুরুণের কাপড় আমি রাখ্‌তে পার্‌ব না। তাহার ঝি হয় না, পুত্র হয় না, দেওনা নাই, পাওনা নাই, বেপার নাই, সেপার নাই, এমন আঁটকুড়া ব্রাহ্মণীর কাপড় আমি ধোব না।" দাসী ম্লানমুখে বাড়ী ফিরিয়া ব্রাহ্মণীকে সকল কথা বলিল। শুনিয়া ব্রাহ্মণ-পত্নী দুঃখে অপমানে মৃতপ্রায় হইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ তখন ঘরে ছিলেন না।

তিনি বাড়ী আসিলে পর, ব্রাহ্মণী ক্ষোভেদুঃখে ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "আর সংসারে থেকে কাজ নাই, চল আমরা এখনি অরণ্যে চলে যাই। ছোট মানুষের মেয়ে ধোপানী, আমাকে আঁটকুড়া বলে গালি দিয়েছে। আমি লোককে এই পোড়ার মুখ আর দেখাব না। সংসারবাসে আমার আর আস্থা নাই। ঝিকে বাড়ী ঘর বুঝায়ে দিয়ে চল আমরা অরণ্যে বাস করিগে।" ব্রাহ্মণও ধোপানীর কথা শুনিয়া মনে বড় ব্যথা পাইলেন। তিনি সংসার-বাস ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণীকে লইয়া গহন বনে গেলেন। মধ্যাহ্ন-সময়ে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী রৌদ্র-তাপে কাতর হইয়া এক কদম গাছের তলায়, শীতল ছায়ায় বসিলেন। সেই কদমডালে বসিয়া একটী সুন্দর পুরুষ মোহনমুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বাঁশী বাজাইতেছিলেন। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কোথায় যাবেন?" ব্রাহ্মণ তাঁহার দুঃখের কথা সেই যুবককে বলিলেন। সেই যুবক শ্রদ্ধামাখা করুণনেত্রে ব্রাহ্মণীর দিকে চাহিয়া বিনয়বচনে বলিলেন—"মা! আপনারা গৃহে ফিরে গিয়া ভক্তিভাবে বরকুমার-ব্রত করুন। তবেই আপনাদের দুঃখের অবসান হবে।" সেই সুন্দর পুরুষের মুখ যেন কি এক স্বর্গীয় ভাবে ঢল ঢল করিতেছিল। তাঁহার উপদেশ শুনিয়া ব্রাহ্মণের খুব ভক্তি হইল। তিনি ব্রত গ্রহণ করিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। বাড়ী পৌঁছিয়াই ব্রাহ্মণ-পত্নী স্নান করিয়া অতি ভক্তির সহিত বরকুমারের ব্রত করিলেন। এইরূপে প্রতিমাসে ব্রত করিতে লাগিলেন। কতদিন পরে ব্রাহ্মণপত্নী গর্ভবতী হইলেন। দশমাস পূর্ণ হইলে তাঁহার একটি সুন্দর ছেলে হইল। ভগবানের কি ইচ্ছা, এই সময়-মধ্যে ব্রাহ্মণ-পত্নী বরকুমারের ব্রত ভুলিয়া গেলেন। আজ ছেলের অন্নপ্রাশন, বাড়ীতে মহা ধুম; এই শুভকার্য্যের মধ্যেও বরকুমারের অর্চ্চনা হয় নাই। ব্রাহ্মণ-পত্নী তিন মাস ব্যাপিয়া বরকুমার-ব্রতের জন্য চিড়ার ধান নূতন হাঁড়িতে ভিজাইয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে একটা বিড়াল মাছের কাঁটা ফেলিয়া রাখিয়াছে। ছেলের অন্নপ্রাশনের লগ্ন উপস্থিত, ছেলেকে স্নান করাইবার সময় উপস্থিত, দরজী ছেলের মূল্যবান্ বস্ত্র লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, স্বর্ণকার গহনা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, নাপিত ছেলের ক্ষৌরকার্য্যের জন্য দাঁড়াইয়া আছে, বাদ্যকর বাদ্যরোলে বাড়ী মাতাইয়া তুলিয়াছে। এমন সময় খেলিতে খেলিতে ব্রাহ্মণের ছেলেটি ঢলিয়া পড়িল। বাড়ীতে এই আনন্দের সময় মহা নিরানন্দ! অকস্মাৎ ছেলের মৃত্যু দেখিয়া বাড়ীতে কান্নাকাটির রোল পড়িয়া গেল। ব্রাহ্মণ মৃত

ছেলেকে নূতন হাঁড়িতে পুরিয়া, কোদাল কাঁধে ছেলেকে মাটিতে পুঁতিবার জন্য বাহির হইলেন। ব্রাহ্মণী কাঁদিতে কাঁদিতে মরা ছেলের পিছু পিছু ছুটিলেন। সকলে শ্মশানে আসিয়া গর্ত্ত করিতে লাগিল। এমন সময় যে যুবকের নিকট কদম্ব গাছের তলায় ব্রাহ্মণ বরকুমার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই যুবক বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে সেইস্থান দিয়া যাইতেছিলেন। ব্রাহ্মণকে শোকগ্রস্ত দেখিয়া যুবক শিশুর মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ আনুপূর্ব্বিক সমুদায় যুবককে বলিলেন। যুবক বলিলেন "মনে আছে, ছেলে হওয়ার উপদেশ আমিই আপনাকে দিয়াছিলাম। এখন ছেলে পেয়ে অহঙ্কারে আপনার স্ত্রী বরকুমার-ব্রত ছেড়ে দিয়েছেন, সেই পাপে ছেলে মারা গিয়াছে। তিন মাস যাবৎ বরকুমার-ব্রতের ধান আপনার স্ত্রী ভিজায়ে রেখেছেন, তাহাতে বিড়ালে মাছের কাঁটা ফেলেছে। যদি ছেলে বাঁচাইতে ইচ্ছা থাকে, তবে সেই ধানগুলি গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে, চিড়া তৈয়ার করে এখনি বরকুমার-ব্রত করিতে আপনার স্ত্রীকে বলুন।"

ব্রাহ্মণ-পত্নী, যুবকের কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ী গিয়া ভিজা ধানগুলি গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া চিড়া প্রস্তুত করিলেন। তৎপরে ষোড়শোপচারে দৃঢ়-ভক্তিতে বরকুমারের অর্চ্চনা করিলেন। ব্রতের পুষ্পদূর্ব্বাগুলি লইয়া সেই মরার গায়ে দিয়া সাত বার "জীয়ঃ জীয়ঃ" বলিয়া ডাক দিলেন, অমন-ই ছেলে বাঁচিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ-পত্নী বরকুমার-ব্রত আর চিরজীবনে ভুলিলেন না।

এই ব্রত করিলে অপুত্রের পুত্র হয়, নিধনের ধন হয়, ছেলেমেয়ে সুস্থ থাকে। বরকুমার চিরপ্রসন্ন থাকেন।

শ্রীবিন্দুবাসিনী দাসী।

শাখীনামা।

৩৮শ শাখী।

অতঃপর গুরু তথা হইতে যাত্রা করিলেন এবং রাজা কর্ণের গিরিতে উপস্থিত হইয়া অশ্ব থামাইলেন। তিনি বলিলেন—"রাজা কর্ণ কেমন মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, দেখ! প্রতিদিন তিনি সওয়া মণ স্বর্ণ বিতরণ করিতেন এবং

কোন ব্যক্তি তাঁহার শরীরের চর্ম্ম প্রার্থনা করিলে, তিনি তাহাও দান করিয়াছিলেন।" *

এইস্থানে অবস্থান করিয়া গুরু ব্রাহ্মণদের একটি মহাভোজ দিলেন। অতঃপর তিনি 'সিধ বাটী' অথবা বাবা নানকের ও গুরু হরগোবিন্দের স্মৃতিমন্দির পরিদর্শন করিলেন এবং এই কয়টি পবিত্র স্থানে যথারীতি পূজাদি সম্পন্ন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে একটি প্রকাণ্ড ভোজ দিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে তাঁহাদের পুত্রপৌত্রাদির পোষণের জন্য কিছু বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বলিলে, গুরু তাঁহাদের পালন করিবার জন্য শিখদিগের উপর তাম্রপত্রে খোদিত একটি 'হুকুম নামা' বা আদেশ পত্র লিখিয়া দিলেন।

৩৯শ শাখী।

পরদিবস গুরু একটি গ্রামে উপস্থিত হইলেন। (জিজ্ঞাসিত হইয়া, তথাকার) জমীদারেরা বলিলেন, "সে স্থানের নাম 'খারোলা'।" গুরু বলিলেন, "উহাকে আর 'খারোলা' বলিও না, 'রাখ্‌বালা' (অর্থাৎ অভিভাবক বা রক্ষাকর্ত্তা) বলিও।"

জুল্লালের লম্বরদারেরা এক্ষণে গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে মোটা চিনি, দুই ভাণ্ড দুগ্ধ, একটি সুন্দর বর্ষা উপহার প্রদান করিল এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিল যে,—যে-যে পল্লী তাহাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, তাহারা যেন সেই সব পল্লীবাসীদের সহিত 'লড়া'য়ে' বিজয়লাভ করে। বর্ষাটি দেখিয়া গুরু বড়ই প্রীত হইলেন। তিনি তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, যদি তাহারা চিরকাল বিনয়ী ও (শিখদিগের প্রতি) বিশ্বাসী থাকে, তবেই তাহারা বিজয়লাভ করিতে পারিবে। (আরও) বলিলেন—"যাহারা তোমাদের আক্রমণ করিবে, তাহারা (সকলেই তোমাদের নিকট) পরাজিত হইবে; তাহাদের (সকল) দম্ভ, লজ্জায় পরিণত হইবে।"

অতঃপর গুরু কয়েকজন বুরারকে আপনার দলে গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বে আর একবার তিনি বুরারদিগকে দলভুক্ত করিয়াছিলেন।

---

* মহাভারতের বনপর্ব্বে মহারাজ উশীনর ও তৎপুত্র মহারাজ শিবির উপাখ্যানে দেখা যায় যে, তাঁহারা উভয়েই আশ্রিতের রক্ষার জন্য সমস্ত শরীরের মাংস, এমন কি আত্মদান পর্য্যন্তও করিয়াছিলেন।—লেখক।

১৮২৫ সম্বতে * জুল্লালের জমীদারেরা একদিন অন্ধকার রজনীতে গুরুর তাঁবু আক্রমণ করিয়া, দুইজন শিখকে নিহত করে ও তাঁহার পাঁচটি অশ্ব (চুরি করিয়া) লইয়া পলাইয়া যায়। পরদিন প্রাতঃকালে গুরুর দলস্থ লোকেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করে। লম্বরদারেরা যথারীতি 'তঙ্কবা' নামক জরিমানা দিল। গুরু তাহাদিগকে বিনয়ী ও বিশ্বাসী হইতে বলিলেও তাহারা তাঁহার যে অনুশাসন মান্য করে নাই, এজন্য (দুঃখ প্রকাশ করিয়া) তাহারা গুরুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল ও কড়াহ্ প্রসাদ প্রস্তুত করিল।

গুরুর তাঁবুর সন্নিধানে তাহারা 'গুরুসর' নামে একটি গ্রামের প্রতিষ্ঠা করে।

ক্রমশঃ।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাবিত্রী।

হে সাবিত্রি, সতীত্বের শাশ্বত মূরতি
রয়েছে অঙ্কিত তব,—এ বিশ্ব-ভবনে—
নারীর হৃদয়পটে, ধন্য তুমি পতি-
ব্রতা, শিখাইছ নিতি—জীবনে-মরণে,
এক পতি বই নাই গতি ললনার,—
সতীর অনন্যগতি জন্ম-জন্মান্তর,
ত্রিলোক বিরহ,—মৃত্যু ;—মিলন অপার !
এ শিক্ষা মৌখিক নহে—কি দীপ্ত সুন্দর—
ফুটিয়া তোমার দিব্য মধুর চরিতে
মরমে ফলিত নিত্য সিন্দূরমণীর,
অমর হয়েছ তাই এ মর-মহীতে।
তব পুণ্যফলে দেবি, প্রেমে সুগভীর
সংযত-হৃদয়া নারী লভিয়া সঙ্গিনী
ধন্য আজি—স্মরি' আর তোমার কাহিনী

শ্রীরসময় লাহা।

পুনর্জীবন।

জীবন-মরণ-পথে দাঁড়ায়ে যেদিন
শিয়রে শমন আসি' হরিল চেতনা,
হে দেবি, তোমারি কোলে এ দেহ মলিন,
লুটায়ে পড়িল ধীরে। হায় কি বেদনা
বাজিল হৃদয়ে তব, না জানি ও অশ্রু
কি বিষাদ-গীতিপূর্ণ হইয়া নিমেষে
টলালে মৃত্যুর পণ। জাগিয়া নিরখি
ফুটেছে করুণ ছবি অশ্রুজলে ভেসে!
কি লাবণ্য মরি, মরি,—বিষাদ-প্রতিমা!
মৃত্যুরো হৃদয়ে দিলে করুণা সঞ্চারি।
এত প্রীতি, এত ভক্তি, এ সতীমহিমা
স্বর্গেও দুর্লভ বুঝি। বুঝালে হে নারী
কবির কল্পনা নহে—কেন সত্যবান্
মরণের পরে পুনঃ লভিলা পরাণ।

* তাহা হইলে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে। এই সময় গুরুগোবিন্দের বয়ঃক্রম তিন চারি বৎসর মাত্র।

বঙ্গীয় শব্দসিন্ধু। *

(সমালোচনা)

বড়ই আনন্দের বিষয় যে, এতকাল বাদে আবার বাঙ্গালা ভাষায় একখানা অভিধান সঙ্কলিত হইয়াছে। 'এতকাল বাদে' কথাটা ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিয়াছি ; ইংরেজদিগের প্রথম আগমনে যখন তাঁহাদিগের বাঙ্গালা শিখিবার প্রয়োজন হয়, তখন জনকয়েক সাহেব ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালা হইতে ইংরাজী অভিধান সঙ্কলন করেন। সম-সাময়িক জনকয়েক বাঙ্গালী বাঙ্গালা হইতে বাঙ্গালা অভিধানও করেন। তাহার পরে আর অভিধান হয় নাই। দু'একখানা যাহা হইয়াছে, তাহাদিগকে সংস্কৃত-বাঙ্গালা অভিধান বলিলেও চলে।

এই সকল অভিধানে দেশজ শব্দসমূহ সংগৃহীত হইয়াছিল বটে ; কিন্তু কোন একটা নিয়ম বা শৃঙ্খলার অনুসরণের অভাবে, উহাদিগের মূল্য অপেক্ষাকৃত কমিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা দেশজ সমস্ত শব্দ একত্র নিবদ্ধ করিতে হইলে তৎকালীন প্রকাশিত এইরূপ অনেকগুলি অভিধান হইতে অনেক শব্দ সহজেই পাওয়া যায়।

দুঃখের বিষয়—এ পর্য্যন্ত একার্য্যে কেহই হস্তক্ষেপ করেন নাই। এই প্রকার একখানা দেশজ শব্দ-নিবদ্ধ অভিধানের অভাবে প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্য-চর্চ্চা কত কষ্টকর হইয়াছে, তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই বিশেষ অবগত আছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পরিচালকদিগের দৃষ্টি প্রথম হইতেই এইদিকে আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহারা এই সঙ্গে সমিতি গঠন করিয়া এই কার্য্যে ব্রতী হন। তখন পরিষদ্, সমিতি গঠন করিয়া জনকতক বড় লোককে সভ্য করিলেই কার্য্য সমাধা হইবে, মনে করিতেন। এই শব্দ-সমিতি-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে ১৩১০ সালের একটী সভাতে শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "গ্রাম্য শব্দকোষ" ও শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

* বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রচলিত দেশজ, আরবী, পার্সী, উর্দ্দু, হিন্দী, পোর্টুগিজ, ডেনিস, ফ্রেঞ্চ, ইংরাজী প্রভৃতি যাবতীয় শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ, প্রকৃতি, প্রত্যয়, অর্থ, শিষ্টপ্রয়োগ-সম্বলিত বাঙ্গালা অভিধান ; শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ সঙ্কলিত। প্রকাশক মেসার্স বি, ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং, মূল্য ১।০ ।

মহাশয়ের "অপভ্রংশ-শব্দ-তালিকা" প্রদর্শিত হইলে, সমিতি উঁহাদের এই সকল প্রভূত পরিশ্রমের ফল দেখিয়া স্থির করিয়াছিলেন, "এখন ইঁহাদের কার্য্য এইভাবেই চলিতে থাকুক। পরে অন্যান্য প্রাদেশিক শব্দের তালিকা আসিলে, এ সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা হইবে।"—শব্দ-সমিতির সভ্যমণ্ডলী অতঃপর পঞ্জিকার একটী পৃষ্ঠায় শোভা-সংবর্দ্ধন করা ছাড়া আর অন্য কোন কার্য্য করেন নাই।

যখন পরিষদ্ এইরূপে নিশ্চেষ্ট ছিলেন, তখন "সুদূর পল্লীর নিভৃত-নিকুঞ্জে বসিয়া ধ্যানাসক্ত যোগীর ন্যায় বাঙ্গালা-সাহিত্যের রসাস্বাদনে নিযুক্ত একজন নিরাড়ম্বর সাহিত্যসেবী খাঁটী বাঙ্গালা শব্দ সংগ্রহ করিয়া শব্দসিন্ধু রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।" তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আমরা এই অভিনব অভিধান পাইয়াছি। ইহাতে বাঙ্গালা-সাহিত্যের যে উপকার হইল, তজ্জন্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সহস্র ধন্যবাদের পাত্র। তিনি যে, এখনও সংগ্রহ কার্য্য শেষ করেন নাই, পরিশিষ্টটীই তাহার প্রমাণ। এই পরিশিষ্টটীতে তিনি অনেক প্রয়োজনীয় শব্দ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সংগ্রহ-কার্য্যের শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য সমধিক প্রশংসনীয়।

অভিধানখানির একখানি ভূমিকা দেওয়া প্রয়োজন ছিল। সঙ্কলনকারী কোন্ কোন্ অভিধানের সাহায্য লইয়াছেন, কোন্ কোন্ প্রদেশের শব্দ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, তাহার উল্লেখ করা উচিত ছিল। বাঙ্গালা-অভিধান-সংকলন-ব্যাপারের একটি ইতিহাস দিলে কৌতূহল-তৃপ্তিকর ও ভবিষ্যৎ সঙ্কলনকারিদিগের সাহায্যজনক হইত। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের ভূমিকাটীতে বিশেষ কিছুই নাই। তিনি একস্থানে লিখিতেছেন ঃ—"এই অভিধান-সঙ্কলনের পূর্ব্বে ও সঙ্কলন-কালে তিনি কয়েকবার আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। আমি যেরূপ পরামর্শ দিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি, তিনি তাহার কোন অংশই উপেক্ষা করেন নাই।"—একটা কাঁকা কথা না দিয়া শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার উপদেশ কয়টী যদি বিবৃত করিতেন, তাহা হইলে আমাদের ও সাধারণের উপকার হইত। শাস্ত্রী মহাশয়ের আর একটী উক্তি-সম্বন্ধেও আমাদের আপত্তি আছে ঃ—"বাঙ্গালা সাহিত্যের অনন্ত ভাণ্ডারে যে সকল শব্দরত্ন বিদ্যমান, তিনি (বিদ্যাবিনোদ মহাশয়) তাহার প্রয়োজনীয় প্রায় যাবতীয় শব্দই সংগ্রহ করিয়াছেন।"

এখানে 'প্রয়োজনীয়' কথাটীর অর্থ আমরা বুঝিলাম না। যাহা একজনের

প্রয়োজনীয়, তাহা অন্যের অপ্রয়োজনীয় হইতে পারে। অভিধানে সমস্ত শব্দই সন্নিবদ্ধ থাকিবে ইহাই আমাদের ধারণা। সে হিসাবে 'প্রায় যাবতীয়' শব্দ দূরে থাকুক, ইহাতে বাঙ্গালা শব্দের অর্দ্ধেকও সন্নিবদ্ধ হইয়াছে কিনা সে বিষয়ে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ আছে।

বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে, জেলায় জেলায়, কতকথা কতভাবে কথিত হয়, তাহার সম্যক্ উপলব্ধি আমাদের অতি সামান্য মাত্র লোকেরই আছে। পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত রঙ্গপুর, ময়মনসিংহ, পাবনা প্রভৃতি স্থানের শব্দগুলি লক্ষ্য করিলে কতক ধারণা হইবে। যে কোনও একখানা বৃহৎ প্রাচীন পুঁথি লইয়া শব্দ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিলে, দেখা যাইবে এ অভিধানে তাহার কত কথা বাদ পড়িয়াছে।

ইহাতে আমি সঙ্কলনকারীকে ছোট করিবার চেষ্টা করিতেছি না; বরং তিনি যে সংগ্রহকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন—তাহা যে, কত বিশাল ও অধ্যবসায় সাপেক্ষ, তাহাই প্রতিপাদন করিতেছি। তিনি যে একক এ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন এবং এত বড় একখানা অভিধান প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার প্রগাঢ় অধ্যবসায়ের ফল।

প্রাচীন গ্রন্থ হইতে উদাহরণ-প্রয়োগ দ্বারা শব্দব্যাখ্যা, এ অভিধানের আর একটী বিশেষত্ব। ইহাতে তাঁহার প্রাচীন সাহিত্য-চর্চ্চার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

আশা করি, ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। দুঃখের বিষয়, ইহার বিশেষ বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় নাই। বন্ধু-মহলে জানিলাম, কেহই এ পুস্তকের সন্ধান জানেন না। কোন পত্রিকাতেও ইহার বিজ্ঞাপন দেখি নাই। লোকসমাজে ইহার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইলে, আমাদের বিশ্বাস প্রথম সংস্করণ শীঘ্রই নিঃশেষিত হইবে।

এখন ইহার গোটাকয়েক ত্রুটির উল্লেখ ও কতকগুলা শব্দের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আমাদের মতামত উল্লেখ করিয়া সমালোচনা শেষ করিব।

প্রথমতঃ। প্রয়োগ-স্থলে অনেক স্থানে ভুল গ্রন্থের নাম লিখিত হইয়াছে। যথা;—

(১) আঁদিসাদি—অন্নদামঙ্গলের উদাহরণ, কবিকঙ্কণ নয়।
(২) আচাভূয়া ঐ ঐ
(৩) ইলিমিলি ঐ ঐ

(৪) কেয়াকাঁদি—অন্নদামঙ্গলের উদাহরণ, কবিকঙ্কণ নয়।
(৫) কাঙ্গালী—মধুসূদন দত্তের, ভারতচন্দ্রের নয়।
(৬) পিয়া—বিদ্যাপতির, চণ্ডীদাসের নয়।
(৭) ফুয়ল ঐ ঐ
(৮) ভোখিল ঐ ঐ
(৯) কোর—বিদ্যাপতির, শিবায়নের নয়।

দ্বিতীয়তঃ। উদাহরণগুলি,উদ্ধৃত করিবার সময় তত্তৎ পুস্তকগুলি দেখিয়া করিলে নির্ভুল হইত। যথা;—

(১) কাদাখেড়ু উদাহরণ অভিধানে আছে;—

"কাদাখেড়ু খুদমাগা নারিনু রচিতে।
কি করি বাড়িছে পুঁথি বিষাদ তাহাতে॥ কৌতুকবিলাস।"

পাঠক জানেন, ইহা বিদ্যাসুন্দরে আছে। তবে পদ্যটী এইরূপ হইবে—

খুদমাগা কাদাখেড় নারিনু রচিতে।
পুঁথি বেড়ে যায় বড় খেদ বৈল চিতে॥

(২) 'কোর' উদাহরণে 'পিয়া' স্থানে 'প্রিয়া', 'ছিটাফোঁটার' উদাহরণে 'গুলি' স্থানে 'শুনি', ঠোক্না উদাহরণে ঠোক্না স্থানে ঠোক্না, এ সকল অসাবধানতার ফল।

(৩) 'মলম্বা' কথাটীর উদাহরণে, অভিধানে;—

"মলম্বা অম্বরে তাম্রপ্রভা শোভা যদি ধরে।—মেঘনাদবধ কাব্য।"

কিন্তু উক্ত গ্রন্থে আছে—

"মলম্বা অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি—"

কত প্রভেদ!

তৃতীয়তঃ। প্রাদেশিক শব্দগুলি বিশেষভাবে উল্লিখিত হয় নাই। আমাদের বোধ হয়, প্রাদেশিক শব্দ-সম্বন্ধে সাহিত্যিকগণের আর উদাসীন থাকা উচিৎ নয়। এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ না দেওয়ায় অনেক অভিধান অব্যবহার্য্য হইয়াছে; অনেক অভিধানে অনেক কথা পাওয়া যাইতেছে, যাহা আমরা কখনও শুনি নাই। বোধ হয় এগুলি অন্য প্রদেশের শব্দ। কোন্ প্রদেশে প্রচলিত, লিখিত না থাকায় উহাদের প্রয়োগ সন্ধান করা কঠিন হইয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ গোপীকৃষ্ণ মিত্রের (স্কুল বুক সোসাইটী হইতে

প্রকাশিত) একখানা ক্ষুদ্র অভিধান হইতে গোটাকতক অধুনা-অপ্রচলিত শব্দ উদ্ধৃত হইল।

অ

অটাট্যা—পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ।
অৎক—শরীরের অবয়ব, পাছু।
অত্যাল—রাংচিতাগাছ।
অন্ধু—কূপ।
অপ্তান—নিন্দা।

আ

আচ্‌কা—অমনি, বিনামূল্যে।
আচক্ষাণ—বাকৃপটুতা।
আটল—বক্র, মৎস্যধরা যন্ত্র।
আড়্—ভেলা।

আপাক—পোয়ান।

আপালী—উকুন।
আরনাম—কাঁজী, আমানী।
আরভটী—কাপক্রীড়া, বাজিকরণ।
আরমান—অপমান।

আ

আরা—তুরপুণ।
আনাত—কয়লা।
আসাগ—কটকটে ব্যাঙ।
আসিদ্ধ—কারাবদ্ধ।
আস্তুতি—চোয়ান।

ই

ইটচর—ষাঁড়।
ইড়াচিকা—বোল্‌তা।
ইস্কাতর—কৌটা, ডিবা।

এ

এড়—বধির।

ও

ওঁক—বৃষের গর্জ্জন।
ওড়ম্বা—বিদেশী, একগুয়ে।
ওতু—বিড়াল।
ওদেষ্ট—গায়কের অশ্রাব্য স্বর।
ওস্তা—সঞ্চরণ।

ঔ

ঔমীন—তিসির ক্ষেত।

বলা বাহুল্য, এগুলির একটিও বর্ত্তমান আলোচ্য অভিধানে নাই। অথচ এগুলি কোন না কোন স্থানে এখনও ব্যবহৃত হইতেছে কিম্বা ব্যবহৃত হইত।

সঙ্কলনকারী মহাশয় বোধ হয় হুগলী চব্বিশপরগণার লোক, সেজন্য সম্ভবতঃ উক্ত স্থানসমূহের প্রাদেশিক ব্যবহার অভিধানে যে পরিমাণে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, অন্য স্থানের শব্দ সে প্রকার পারেন নাই। আমাদের বক্তব্য, এগুলিতে প্রাদেশিক চিহ্ন দেওয়া উচিত। অন্য প্রদেশীয় লোকে দেখিলেই, কোন্ প্রদেশীয় শব্দ সহজে বুঝিতে পারিবে। নিম্নে এই অঞ্চলের

কতকগুলি কথা ও নদীয়া জেলায় তাহাদিগের ব্যবহার দেওয়া গেল। তাহা হইতে আমাদের মন্তব্য স্পষ্টীকৃত হইবে।

(ক) ভিন্ন শব্দাত্মক।

কলিকাতা	নদীয়া
ছ্যাঁদা	ফুটো
পায়রা	কৈতর
সবে	মোটে
কুল্লে	কেবল
খোলাম্‌কুচী	খাপ্‌রা
উনোন	আকা
আশুলো	তেলাপোকা
সিক্‌নি	পোঁটা
জাঁক	অহঙ্কার
মাগ্‌গী	আক্রা
ফাঁকে	বাহিরে

(খ) অভিন্ন শব্দাত্মক।

কলিকাতা	নদীয়া
আকুশী	আংশী
কাসুন্দী	কাসুন্
কুলুঙ্গী	কোলোঙ্গা
উকি	ওয়াক
উকুণ	ইকুন
ডালচিনি	দারচিনি
চোপ	কোপ
কুল্লী	কুলকুচো
ভেঁউচনা	ভাঙ্গান
ভেজান	আবজান
সেঁজুতি	সাজুই
নগী নাউ	
কুতুরকাতুর	ক্যাতাকুতু
হিঞ্চে	হেলাঞ্চা

চতুর্থতঃ। যে সকল সহজ প্রচলিত শব্দের উচ্চাচরণ বা সামান্য ব্যাখ্যা মাত্রই ভাব হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহাদিগের জন্য উদাহরণ প্রয়োজন নাই; কিন্তু অসাবধানতা বশতঃ তাহাদের জন্য অকারণে উদাহরণ সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থের কলেবর অযথা বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

যথা,— হাঁপ, হলফ, হাকরা, টিকী, টান, ডর, ঢের, খোপা ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে। এগুলি না দিলেই ভাল হইত।

পঞ্চমতঃ। কতগুলি শব্দের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদের মতভেদ আছে, তাহাও উল্লেখ করিতেছি।

"আখরিয়া—লেখক" যাহারা ভাল আখর দেয়, তাহাদেরও আখরিয়া বা আখুরে বলে—যথা ;—

হরিদাস বাবাজী বড় সুন্দর আখুরে।

"কহা কবি—স্বভাব কবি যথা—

সভাসদ্ তোমার ভারতচন্দ্র রায়।

কহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায়।—ভারতচন্দ্র।"

আমরা ভারতচন্দ্রের দুতিনখানি হস্তলিখিত পুঁথি ও অনেকগুলি ছাপান সংস্করণে কুত্রাপি কহাকবি পাই নাই। সর্ব্বত্রই মহাকবি পাইয়াছি।

"তবল্লক—তকল্লুবী। যথা ;—

তবল্লক ছাঁদে কবরী বাঁধে।"—চণ্ডীদাস।"

বঙ্কিম বাবুর সেই গল্পটী মনে পড়ে—কোকিলের স্বর কি রকম, না পঞ্চম স্বর—পঞ্চম স্বর কি রকম, না কোকিলের স্বর। রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় সম্পাদিত চণ্ডীদাস সংস্করণ হইতে ঐ এক ব্যাখ্যা শুনিয়া আসিতেছি; কিন্তু তকল্লুবী যে কি, তাহা কেহই খোলসা করিয়া বলেন না, এই বড় দুঃখ।

"ঝালঝোল—ঝালের ব্যঞ্জন ; তীব্র স্বাদযুক্ত ব্যঞ্জন বিশেষ—

ঝালঝোল চড়চড়ী ভাজা কৈল কত।—ভারত চন্দ্র।"

আমরা এখানে ঝাল ও ঝোল পৃথক বুঝি। ঝাল এক প্রকার অল্প জলযুক্ত ব্যঞ্জন ; ঝোল সমধিক জলযুক্ত ব্যঞ্জন। প্রয়োগ যথা—

ভেজে খাই ঝোলে দেই কিম্বা দেই ঝালে।

উদর পবিত্র হয় দেবামাত্র গালে॥—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

"আঁটুবাঁটু—অতিশয় যত্ন। যথা ;—

চলনে কতেক আঁটুবাঁটু।—ভারতচন্দ্র।"

উহার অর্থ এইরূপ বোধ হয়, আঁকিয়া বাঁকিয়া গমন ; যাহাতে আঁটু বা হাঁটু ভাঙ্গিয়া পড়ে।

"রইকাঠ—রইকাঠ বিল্বকাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত হয়।"

বেহারে ইহা তালবৃক্ষের কাণ্ড দ্বারা প্রস্তুত হয়, তথায় ইহার নাম জরাঠ্। সংস্কৃতে নাগযষ্টি।

'আক্‌কাটা' মহাশয়ের উপর অভিধানকারের অনুগ্রহ আছে তাহাকে স্থান দিয়াছেন ; কিন্তু 'মোনাকাটা' বলিতে পারেন 'কি দোষে দোষী এ দাস তব পদে।' বিশেষতঃ মোনাকাটা ইতিমধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যে আসন পাইয়াছে—

শুন শুন ঠাকুর আমার নিবেদন।

এক বেটা মোনাকাটা করে জ্বালাতন।—কৌতুকবিলাস।

"ডালা—ডল্লক শব্দজ, বংশনির্ম্মিত পাত্র বিশেষ।"

এই শব্দটীর প্রয়োগ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের একস্থানে মাত্র আছে। যথা—

ত্রিশতঞ্চ ষষ্ঠ্যধিকং ডল্লকং বস্ত্র সংযুতম্।

সভোজ্যং সোপবীতঞ্চ সোপহারং মনোহরং॥

ইহাতে ঐ কথাটীর সংস্কৃত জন্ম না বুঝাইয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের আধুনিকত্ব প্রমাণিত হয়।

"টিটি—প্রচারিত পরিজ্ঞাত।

দীনবন্ধু বাবুর নাম বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র টিটি হইয়াছিল।"

কথাটী খারাপ অর্থেই ব্যবহৃত। অপবাদগ্রস্ত লোকের নামেই উক্ত হয় ; সুতরাং ঐ উদাহরণ ঠিক হয় নাই। কথাটা Famous শব্দের পরিবর্ত্তে নহে, উহা Notorious এর প্রতিশব্দ।

"আকাট্—চুল্লী" আকাট্ শব্দের উক্ত অর্থে ব্যবহার জানি না। নদীয়া জেলায় আকা শব্দ উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ভাঙ্গন, দাঁতন, ইত্যাদি শব্দগুলির বিশেষ্যের অর্থ দেওয়া হয় নাই।

যথা ;—

নদীর ভাঙ্গনে বাগানটী গিয়াছে॥

দাঁতন—দন্তমার্জ্জন যষ্টি।

"ইয়াদ্—জ্ঞান" স্মরণ অর্থে হিন্দুস্থানে ব্যবহৃত হয়।

জাম্বু—যাবনিক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ; কিন্তু রাজ ব্যবহার-কোষে "জাম্বুদশ্চরনায়ক" আছে,—সুতরাং যাবনিক বলিবার অগ্রে ব্যুৎপত্তি দেওয়া উচিত ছিল।

"সগল্লাদ—মূল্যবান বস্ত্র বিশেষ।"

এ ব্যাখ্যার মূল্য নাই। কি প্রকার বস্ত্র, কোথায় ব্যবহার, স্ত্রী কিম্বা পুরুষের জন্য ইত্যাদি লেখা উচিৎ ছিল।

অভিধানকারেরা যত স্বনামখ্যাত শব্দ উঠাইয়া দেন ততই মঙ্গল।

"বরিহা (হিন্দী)—উৎকৃষ্ট উত্তম।

চিকণ চুড়ার ছাঁদ, কে নিলে বরিহা ফাঁদ,

আজ কেন পিঠে দোলে বেণী।"

হিন্দীতে যে শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট তাহার উচ্চারণ "বড়িয়া" (বাঙ্গালা 'বেড়ে') এখানে বরিহা সংস্কৃত বর্হ শব্দের রূপান্তর,—অর্থ ময়ূরপুচ্ছ।

"বরারর—বিশৃঙ্খল অপচয়। যথা ;—

ধরে মৎস্য ধান্য ভেঙ্গে করে বরাবর।"

"বরোব্বর করনা" হিন্দুস্থানীরা ব্যবহার করে—সমতল করার অর্থে। এখানে সেই অর্থই সঙ্গত বোধ হয়।

"পিউ—পানি, জল। যথা—

ময়ূর ময়ূরী নাচে চাতকিনী পিউ যাচে। ভারতচন্দ্র।"

পিউ অর্থ প্রিয়—হিন্দুস্থানীরা চাতককে "পিউ কাঁহা" নামে অভিহিত করে। অর্থ—প্রিয় কোথায়। বিদ্যাপতির নিম্নলিখিত উদাহরণে ঐ অর্থ ছাড়া অন্য অর্থ হইতে পারে না।

পাখী জাতি যদি হও পিয়া পাশ উড়ি যাও
সব দুঃখ কহ তছু পাশে ॥
আনি দেই মোর পিউ রাখই আমার জিউ—
কো ইহ করুণাবান।

"মুখমোড়া—নিরব থাকা।

মুখ মোড়ল ধনি করি কত রঙ্গে ॥"

অর্থ মুখ ফিরান, বিদ্যাপতির নিম্নলিখিত উদাহরণে দেখ—

উর মোড়ি বৈঠলু হরি করি পীঠ।

* * *

ইথে কাহে ধনি তুহু মোড়সি মুখ।

* * *

হেরইতে পিয়ামুখ মোড়বি গীম। ইত্যাদি—

"তালাক—দিব্য।"

Divorce অর্থে ব্যবহৃত হয়।

"কট্ট—কাঁকালি। যথা ;—

কটি কট্ট সঙ্গোমরা হস্তীছালা।—ভারতচন্দ্র।"

এখানে কট্টশব্দের কাঁকাল অর্থ কিরূপে হইতে পারে? কটিতে জড়িত এই অর্থ হইবে।

"সাজার—অবিভক্ত। যথা ;—

সাজার মা গঙ্গা পায় না।"

আমরা বিপরীত অর্থ বুঝি। আমরা সাজার অর্থে বিভক্ত বুঝি, প্রমাণ—"ভাগের মা গঙ্গা পায় না।"

"পাকল—রক্তবর্ণ।

চক্ষু করিয়া পাকল ॥" এখানে পাকল অর্থে পাকাইয়া—ঘুরাইয়া।

"আক্ষুটে—আবদারে। যেমন আখুটে ছেলে।" স্কুলবুকের অভিধানে আছে দুরন্ত, দুর্ম্মুখ, নির্দ্দয়।

ষষ্ঠতঃ। বিশেষ বিশেষ বিষয়ের বহু শব্দ সংগৃহীত হয় নাই। যথা ;—পশুদিগের ডাকিবার সঙ্কেত, গ্রাম্য ক্রীড়া সকলের নাম ও বিশেষ উপকরণের নাম, ঘরামী সূত্রধর ইত্যাদি লোকদিগের ব্যবসায়ের ব্যবহৃত শত শত শব্দ এখনও অসংগৃহীত ভাবে পড়িয়া আছে।

সমালোচকের অবস্থা বড় সঙ্কটজনক। তাঁহাকে বাধ্য হইয়া মক্ষিকা-ব্রতী হইতে হয়—বাছিয়া বাছিয়া ক্ষত স্থান দেখাইতে হয়। ইহাতে এ রকম কেহ যেন না ভাবেন যে, আলোচ্য অভিধানের সর্ব্বত্রই দোষযুক্ত। এত বড় অভিধানে যে এ কয়েকটি মাত্র ত্রুটী দেখান হইয়াছে, ইহাই এ গ্রন্থের গৌরবের বিষয়। কারণ, স্মরণ রাখা উচিত যে ইহা প্রথম সংস্করণ। সর্ব্বত্রই সঙ্কলনকারীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাবধানতার নিদর্শন পাওয়া যায়।

পরিশেষে একটী কথা উল্লেখ করিবার আছে। পূর্ব্বে সেটী ভুলিয়াছি, 'ঘোড়ার ডিম' দুনিয়ার অন্যত্র অপ্রাপ্য হইলেও অভিধানে আমরা পাইব আশা করিয়াছিলাম। সমালোচনা-কালে ইহাতে 'ঘোড়ার ডিম আছে' বলিয়া এক কথায় সমালোচনা করিবার সুবিধা না দিয়া সঙ্কলনকারী মহাশয় আমাদিগকে এতটা ভোগাইয়াছেন।

শ্রীচিত্তসুখ সান্যাল।

বোকাইনগরের ইতিবৃত্ত।

রেনেল কৃত বাঙ্গলা-দেশের প্রাচীন মানচিত্রে, ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বতটে ময়মনসিংহ জেলায় বোকাইনগর নামে একটী গ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামটী বর্ত্তমান ময়মনসিংহ-জমিদারীর অন্তর্গত নহে, কালেক্টরীর খারিজা তালুক, স্থানীয় জনকয়েক মুসলমান তালুকদার এই তালুকের অধিকারী। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১ ক্রোশ ও প্রস্থ প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ হইবে। গ্রামের অভ্যন্তরে নিরানব্বুইটী কূপ এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ১৫ টী পুষ্করিণী আছে। অধিবাসীর সংখ্যা অতি অল্প, কয়েক ঘর দরিদ্র মুসলমান ছাড়া অন্য লোক নাই। দশ বৎসর পূর্ব্বে এ স্থান ভীষণ হিংস্রজন্তুপূর্ণ নিবিড়

অরণ্যে আবৃত ছিল, তখন দিবালোকেও লোকে চলাচল করিতে ভয় পাইত। বর্ত্তমানে আবার ইহার অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। অধিবাসীগণ সমস্ত জঙ্গল কাটাইয়া স্থানটীকে চাষবাসের উপযোগী করিয়া তুলিতেছে ;

গ্রামের মধ্যস্থলে একটী প্রাচীন দুর্গের কঙ্কাল-চিহ্ন অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। কোন্ সময়ে ইহা প্রথমে নির্ম্মিত হয়, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে জনপ্রবাদ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে বঙ্গদেশে বার ভূঁইয়ার বিদ্রোহানল প্রবল হইয়া উঠিলে দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর খাজে ওস্মান নামক জনৈক সেনাপতির অধীনে একদল মোগলসৈন্য প্রেরণ করেন ; বোধ হয় এই খাজে ওস্মান কর্ত্তৃকই বর্ত্তমান কেল্লার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। রাজস্ব-নিরূপণ ভূমির বন্দোবস্তের জন্য একটী কাননগুর কার্য্যালয়ও এই সঙ্গে স্থাপিত হয়।

মোগল অধিকারের পূর্ব্বে এদেশে কোচ গারো প্রভৃতি পার্ব্বত্য অসভ্য জাতি বাস করিত। জনপ্রবাদে প্রকাশ, বোকা নামক জনৈক প্রতাপশালী কোচের নামানুসারে এস্থানের নাম বোকাইনগর হইয়াছে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বার ভূঁইয়াগণ কামরূপ রাজ্য বিভাগ করিয়া লন। * কোন কোন ঐতিহাসিক লেখক কোচ ম্যাচ গারো প্রভৃতি বারটী অসভ্য পার্ব্বত্য জাতিকেই বার ভূঁইয়া বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ইহাদিগের দ্বারা কামরূপ ও গারো পর্ব্বতের দক্ষিণভাগে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপিত হয়।

আমাদের উল্লিখিত দুর্গটী চতুর্দ্দিকে প্রায় দশ হাত প্রশস্ত উচ্চ মাটীর প্রাচীর এবং সুগভীর পরিখা দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এখনও স্থানে স্থানে প্রাচীরের চিহ্ন বিদ্যমান, কিন্তু পরিখা শুষ্ক হইয়া এখন শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে বিখ্যাত ব্রহ্মপুত্র নদ বোকাইনগরের পশ্চিমদিক দিয়া প্রবাহিত হইত। এখনও এমন দুই একটী পল্লীবৃদ্ধ জীবিত আছেন, যাঁহারা ময়মনসিংহ নগরের ছয়মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত রাজগঞ্জ গ্রামের পার্শ্ব দিয়া ব্রহ্মপুত্রকে প্রবাহিত হইতে দেখিয়াছেন। সে সময়ে ব্রহ্মপুত্রের এক ক্ষুদ্র শাখা কেল্লার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইত, তাহা এখন "বড়বিলা" নামে পরিচিত, বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে উহাতে জল থাকে না। ইহার উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ে দুইটী করিয়া চারিটী প্রকাণ্ড মাটীর স্তূপ বিদ্যমান আছে। স্থানীয় লোকেরা ঐ গুলিকে "বুরুজ" বলিয়া থাকে। পূর্ব্বে উহাদের উপরি-

* এই বার ভূঁইয়াগণ বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিক নহেন।

ভাগে স্থাপিত কামান শ্রেণীর ভিতর কালু ও কতু নামক অতি বৃহৎ দুইটি তোপ ছিল। দুর্গের ভিতর আরও কয়েকটী বুরুজের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। দুর্গের পার্শ্বে যে উচ্চ ভূমি দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বে ঐ স্থানে কেল্লাদারের আবাসবাটী ও একটী দেওয়ানখানা প্রতিষ্ঠিত ছিল।

পূর্ব্বে বোকাইনগরের কেল্লাদারের বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল, সেকালের ফৌজদারের ন্যায়—তাঁহারও সৈন্য থাকিত এবং তিনি প্রজা সাধারণের নিকট হইতে রাজসম্মানও লাভ করিতেন। কেল্লা হইতে বহির্গত হইবার সময় তাঁহার সম্মানার্থ আড়ানী, ছাতা তুরিভেরী প্রভৃতি সঙ্গে যাইত। দুর্গের ব্যবহারের জন্য গুলি বারুদ ইত্যাদি নির্ম্মেতাগণের বংশধরগণ অদ্যাপি এখানে হীনাবস্থায় অবস্থান করিতেছেন।

বাদ্‌সাহ সাজাহানের সময়ে সাহিন খাঁ নামক জনৈক ব্যক্তির উপর দুর্গরক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল। উহার প্রতিষ্ঠিত একটী মস্‌জিদের দ্বারদেশে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে "লা এলাহা ইলাল্লা মহমদো রছুল আল্লা * * * দরজমানে বাদ্‌সা সাজাহান" এই কথাগুলি পারস্য অক্ষরে খোদিত ছিল। বিগত ১৩০৪ সনের ভীষণ ভূমিকম্পে মস্‌জিদটী ধ্বংশপ্রায় হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীগণের অর্থব্যয়ে উহা পুনঃ সংস্কৃত হইয়াছে। মস্‌জিদের সম্মুখে একটী প্রাচীন দীর্ঘিকা আছে, বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে উহার জল ব্যবহারোপযোগী হয় না। সাধারণের নিকট ইহা "সহিন খাঁর তালাও" বলিয়া পরিচিত। সহিনখাঁ মুসলমান রীতি অতিক্রম করিয়া মস্‌জিদের পূর্ব্বদিকে এই জলাশয় খনন করিয়াছিলেন, তাঁহার মাতা ও সহধর্ম্মীগণ এই ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্যে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করায়, মস্‌জিদের পশ্চিমভাগে আরও একটী পুষ্করিণী খনন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

মস্‌জিদের পশ্চিম দিকে একটী ক্ষুদ্র ভগ্নপ্রায় মঠ ও "চাঁদ রায়ের তালাও" নামক আর একটী পুষ্করিণী বিদ্যমান। কিম্বদন্তীতে প্রকাশ, ময়মনসিংহ পরগণার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদারগণের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র চাঁদ রায় উক্ত মঠ নির্ম্মাণ করাইয়া উহাতে শিবলিঙ্গ স্থাপিত করেন এবং জলাশয়টীও তাঁহার দ্বারা খনিত হয়। আবার কাহারও কাহারও মতে চাঁদরায় নামক জনৈক হিন্দু সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এসকল কিম্বদন্তী হইতে প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়া অসম্ভব।

এই অঞ্চলে ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারার্থ দিল্লী হইতে নিজামুদ্দিন আউলিয়া

নামক একজন সিদ্ধ দরবেশ আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিবার নিমিত্ত আরও সাতজন দরবেশকে তিনি সঙ্গে আনয়ন করেন। ইঁহারাই এদেশের নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দু ও কোচ গারো প্রভৃতি অসভ্য জাতিকে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। উক্ত মহাপুরুষ দুর্গের ভিতরই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমাধি-ক্ষেত্র এ অঞ্চলে একটী পবিত্র স্থান বলিয়া পরিগণিত। কবরটী বহু পুরাতন বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু উহার উপরে কোনও খোদিত লিপি দৃষ্ট হয় না। সমাধিটী নষ্ট হইয়া যাইবার উপক্রম হওয়ায় সাধারণের উদ্যোগে ইহার পুনঃসংস্কার সাধিত হইয়াছে। কিছু লেখা থাকিলেও সে সময়ে উহা লুপ্ত হওয়া সম্ভব।

সমাধিটি প্রাচীর-বেষ্টিত, প্রাচীন প্রাচীরের কতকাংশ ও আলো দিবার প্রাচীন স্তম্ভটি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ঐ স্থানে প্রতি শুক্রবারে বহুলোক সমবেত হইয়া উপাসনা করিয়া থাকে। সমাধির দক্ষিণভাগে একটী বহু প্রাচীন কূপ আছে, উহার জল এখনও পানার্থ ব্যবহৃত হয়। বট প্রভৃতি কতকগুলি বহু প্রাচীন বৃক্ষ স্থানটিকে ছায়া সুশীতল ও মনোরম করিয়া অতীত ঘটনাবলীর সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান আছে। দরগার সম্মুখস্থ ভূমিতে প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসের প্রত্যেক বৃহস্পতি ও রবিবারে একটী করিয়া মেলা হয়। এই সময়ে বহুদূর হইতেও অনেক যাত্রী উপস্থিত হইয়া থাকে।

কেল্লার ভিতর দিয়া যে নদী প্রবাহিত হইত, তাহার উপরিস্থ একটী সেতুর ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। যেস্থানে উহা অবস্থিত সে স্থানে নদী এখন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। সেতুটি প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। উহার প্রায় তিন ভাগ ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। বিগত ভূমিকম্পে স্থানে স্থানে ফাটিয়া গেলেও উহার সুদৃঢ় নির্ম্মাণপ্রণালী প্রশংসনীয়।

মুসলমানাধিকারে আসিয়া বোকাইনগর শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। কিল্লাদারের ও স্থানীয় অর্থশালী ব্যক্তিগণের উৎসাহে নানাবিধ শিল্পেরও বহুল উন্নতি হইয়াছিল। তৎকালে ঐ স্থানের কাপড়, বেত্রের কারুকার্য্য ও নানাবিধ সূচীকার্য্য এ অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। এখনও খলিফা-পটি, বেনে-পটি, তামাক-পটি প্রভৃতি নাম পূর্ব্ব গৌরবের পরিচায়ক। কয়েক ঘর তন্তুবায় অদ্যাপিও এখানে বস্ত্র বয়ন দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে এ স্থানের পূর্ব্ব শিল্প-গৌরব-বৈভব পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে।

শ্রীশৌরীন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী।

সমালোচন।*

সৃষ্টিতে সমালোচন নাই; তখন কেবল বিস্ময়, কেবল আনন্দ। বিশ্বব্যাপিনী তমসার কোলে প্রথম যেদিন জ্যোতিষ্কমণ্ডল একে একে বা যুগপৎ ভাসিয়া উঠিল, তখন কেহ সাক্ষীরূপে বর্ত্তমান থাকিলে, তাঁহার চিত্ত অভাবনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইত, অবেদ্য বিস্ময়ে অভিভূত হইত। জ্যোতিষ্কগণ স্থিতিশীল হইলে কি গতিশীল হইলে ভাল হয়, মাস-রূপ বিহঙ্গের এক পক্ষ শুক্ল আর এক পক্ষ কৃষ্ণ হওয়াতে সুবিধা হইয়াছে কি অসুবিধা হইয়াছে, এ কথা ভাবিবার অবসর তখন সে কল্পিত চিত্তে স্থান পাইত না। তাহার পর বিস্ময়ের নিবিড় গাঢ়তা ক্রমে যেমন অপনীত হইতে লাগিল, জীব যেমন বিশ্বযন্ত্রে আপনার স্থান চিনিয়া, আপনার সুখ-দুঃখে আপনার ভোগের মাত্রা বুঝিয়া, প্রথমে যাহা নিরবচ্ছিন্ন অনুগ্রহ ছিল, তাহাতে আপনার একটা দাবী অনুভব করিয়া, ভালমন্দ বিচারের অবসর পাইল; তখন তাহার গায়ে একটা অতৃপ্তির বাতাস আসিয়া লাগিল, তাহার হৃদয়ে একটা সমালোচনের তড়না স্ফুরিত হইয়া উঠিল। তখন বিস্ময়ে এবং আনন্দের বিপরীত ভাব হৃদয়কে অধিকার করিতে লাগিল, কেহ সৃষ্টি-কৌশলে অসামঞ্জস্য কল্পনা করিয়া নাস্তিক হইয়া উঠিল, কেহ বা—

"স্বর্ণে ন গন্ধঃ ফলমিক্ষুদণ্ডে,
নাকারি পুষ্পং খলু চন্দনস্য।
বিদ্যাবিনোদী নহি দীর্ঘজীবী,
ধাতুঃ পুরে কোঽপি ন বুদ্ধিদাতা॥"

বলিয়া আপনাকে বিশ্বস্রষ্টা হইতেও অধিক বুদ্ধিমান মনে করিতে লাগিল।

ভারতের (অথবা জগতের) আদি কবির কণ্ঠ হইতে প্রথম যেদিন ভারতী—"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ" বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে বাহির হইলেন, তখন কবি নিজেই বুঝিবা আনন্দাতিশয্যে অভিভূত হইলেন এবং বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চারিদিক চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এ স্বর্গীয় ধ্বনি কিরূপে কোথা হইতে উত্থিত হইল!" সেই দিনের পর কত যুগযুগান্তর অতীত হইয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে কত সালঙ্কৃত মাধুর্য্যগর্ভ কবিতার কতরূপ সমালোচনা হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সেই প্রাচীন কবিতাটি পবিত্র মন্ত্রের ন্যায় সমালোচনার

* রাজসাহী-সাহিত্য-সম্মিলনে গৃহীত।

অতীত রহিয়া কণ্ঠেকণ্ঠে আজিও ধ্বনিত হইতেছে। ঈশ্বরের সৃষ্টি-কার্য্যের সমালোচনা হইয়াছে; কিন্তু বাল্মিকীর প্রথম কবিতার সমালোচনা আজিও হয় নাই।

শিশু মাতৃ-কুক্ষি হইতে ধরণীর কোলে অবতারিত হইয়াই এক অভিনব বিস্ময়ের রাজ্যে প্রবেশ করে। তখন তাহার নিকট সকলই নূতন, সকলই অপরিচিত, সকলই এক একটী বিস্ময়ের আকর। মাতা, ধাত্রী, সূতিকা-সঙ্গিনী, জল, বস্ত্র, গৃহ, দীপ-শিখা,—যাহার উপরে তাহার দৃষ্টি পড়ে, তাহাকেই সে মনে মনে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কে?" তখন ভালমন্দ বলিয়া তাহার জ্ঞান নাই, সুন্দরকুৎসিত বলিয়া তাহার বোধ নাই, খঞ্জকুব্জ সুঠাম কলেবরে তাহার ভেদ-জ্ঞান নাই; তখন সে যাহা দেখে, যাহা শুনে, তাহাই শোভন, মোহন, অপূর্ব্ব, বিস্ময়কর!

ক্রমে মানুষ, গরু, বিড়াল, কুক্কুর শিশুর পরিচিত হইতে লাগিল, ক্রমে বিস্ময়ের পরিধি দূরে সরিয়া পড়িতে লাগিল। শিশু যেদিন প্রথম বাদ্য আবিষ্কার করিল—যেদিন তাহার হাতের খাড়ু দুধের বাটীর কাণায় লাগিয়া বাজিয়া উঠিল, সেদিন কি যে তাহার আনন্দ, তাহার মুখভরা হাসি এবং পুনঃ পুনঃ সেই শব্দ উৎপাদন করিবার চেষ্টাই সে বিষয়ের প্রমাণ। শৈশবের অনন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার অনন্ত বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে; কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে একখানি ছিন্ন শিশুবোধকে ছাপার অক্ষরে গঙ্গার বন্দনা এবং গুরুদক্ষিণা পাঠ করিয়া যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম, উচ্চতম কাব্যে আজ অনুসন্ধান করিয়াও সে আনন্দ পাই না, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইল বলিয়া মনে করি না।

নিরন্ন দরিদ্র আজ হঠাৎ রাজ-ভোগের অধিকারী হইল,—যাহার শাকান্ন জুটিত না, আজ অসংখ্য উপকরণে সজ্জিত অন্ন-স্থালী তাহার সম্মুখে উপস্থিত। সে যাহা মুখে দিতেছে, তাহাই তাহার রসনা-উপাদেয় অমৃত বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, আজ তাহার বাছিয়া লইবার শক্তি বা অবসর নাই; কিন্তু কিছুদিন গেলেই আর সে অবস্থা থাকে না; তখন সে পলান্নে ঘৃতের দুর্গন্ধ পায়, সন্দেশের ভালমন্দ বিচার করে, মিষ্টান্নের দোষ বাহির করিয়া দেয়।

এই দৃষ্টান্তগুলি চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, কিছুরই আরম্ভে, বিরলত্বে বা একত্বে সমালোচনের অবসর নাই; যেখানে পরিণতি, বৈচিত্র্য এবং বহুত্ব বর্ত্তমান, সেখানেই সমালোচনা আসিয়া দেখা দেয়। আর একটুকু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, যেখানে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা আছে, যেখানে

পুরুষকার-প্রদর্শনের অবসর আছে যেখানে ভাল বা মন্দ করিবার স্বাধীনতা আছে, সেইখানেই সমালোচনা চলে, অন্যত্র নহে। কৃত্রিমতাই সমালোচনার বিষয়, প্রকৃতি ইহার অধিকারের বাহিরে। প্রকৃতির কার্য্যে আলোচনা চলে, তত্ত্বানুসন্ধান চলে, কিন্তু সমালোচনা চলে না। সমালোচনার তিনটি অঙ্গ—প্রশংসা, নিন্দা এবং আদর্শ-নির্দ্দেশ; কিন্তু প্রকৃতির কর্ণ এই তিনেতেই বধির; সুতরাং প্রকৃতিকে—সমগ্র বিশ্ব-ব্যাপারকে ছাড়িয়া—সমালোচনাকে কেবল মানবীয় কার্য্যাবলীর গণ্ডীর ভিতরে আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

কিন্তু গণ্ডীর ভিতরে আছে বলিয়া যে সমালোচনাকে কায না পাইয়া অবসর বসিয়া থাকিতে হইয়াছে, এমন নহে। মানবের কার্য্য যেখানে বর্ত্তমান, সমালোচনাও সেইখানেই রহিয়াছে; মানবের কার্য্য যেমন অশেষ, সমালোচনাও সেইরূপ অশেষ মূর্ত্তিতেই প্রকাশ পাইতেছে। এমন কার্য্য নাই, যাহা একেবারে নিন্দা-প্রশংসা-বর্জ্জিত, যাহার একটা না একটা নিন্দা বা প্রশংসা না হইতে পারে।

মানবীয় কার্য্য অশেষ হইলেও, তাহার মধ্যে কয়েকটিকে প্রধান বলা যাইতে পারে। ধর্ম্ম প্রধান বটে, কিন্তু ইহাকে গুণ বলিব কি কর্ম্ম বলিব বুঝি না; সম্ভবতঃ উভয়ই বলিতে হইবে। ধর্ম্ম কর্ম্ম হইলেও তাহা আধ্যাত্মিক সাধনের ব্যাপার, তাহার একগুণ বাহিরে প্রকাশ পাইলে, শতগুণ ভিতরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যায়; সুতরাং তাহার তলা না পাইয়া সেখানে সমালোচনা নিরস্ত—নির্ব্বাক্ থাকে। বিজ্ঞান তত্ত্বান্বেষণে ব্যাকুল, মানবের জ্ঞান-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করাই যেন তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। বিজ্ঞানের ভাগ্যে বিশ্রাম লেখা নাই, সে বহুদিনের অনুসন্ধানে যেমন একটি তত্ত্ব লাভ করিল, অমনি আর একটি নূতন তত্ত্বের সংবাদ তাহার প্রাণে আসিয়া পঁহুছিল; সে আবার তাহার পেছনে পেছনে ছুটিল। এই অনুসন্ধানেই বিজ্ঞানের আনন্দ, বিশ্রামে তাহার মৃত্যু। বিজ্ঞান এইরূপে প্রাণপাত করিয়া যে তত্ত্ব সংগ্রহ করিতেছে, তাহাই মানবজাতির স্থায়ী সম্পত্তি, তাহাই উন্নতির নিদান, তাহাই কার্য্যের নিয়ামক এবং তাহাই কার্য্যের ভালমন্দ বিচার করিবার মাপকাঠি। যে কার্য্য বিজ্ঞানের অনুমোদিত, তাহাতেই সাফল্যের আশা করা যায়; বিজ্ঞান-বিরোধী কার্য্য পণ্ডশ্রম মাত্র। বিজ্ঞানই যখন সমালোচক, অর্থাৎ কার্য্যের বিজ্ঞান-সম্মত বিচারই যখন সমালোচনা, তখন তাহার আলোচনা সম্ভাবিত হইলেও সমালোচনা সম্ভাবিত নহে। বিজ্ঞানের আলোচনায় ভ্রান্তি প্রবেশ করিতে পারে বটে, কিন্তু স্বয়ং বিজ্ঞান আবিলতাশূন্য

অগ্নি-দ্রাবিত সুবর্ণের ন্যায় শ্যামিকা-পরিবর্জ্জিত, বিশুদ্ধ। অগ্নি শীতল, এই কথা বলিলেই তাহার সমালোচনার প্রয়োজন; কিন্তু অগ্নিতে দাহিকা শক্তি আছে, একথা কেহ বলিলে যাহা বুঝি, নিজের মনে মনেও তাহাই অনুভব করি, সুতরাং ইহার আবার সমালোচনা কি? এস্থলে বিজ্ঞান বলিতে আমি—জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং অধ্যাত্মবিজ্ঞান ইত্যাদি সমস্ত বিজ্ঞানই বুঝিয়া লইতেছি।

যাহাতে উদ্ভাবনা শক্তির পরিচালনা হয়, যাহাতে মানবহৃদয়ের ভাব-সম্পদ প্রকাশিত, স্ফুরিত এবং অভিব্যক্ত হয়, যাহার সম্পাদনে কর্ত্তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে, যাহা পাঁচজনে করিলে পাঁচ রকম হয়, অথবা একজনেই পাঁচ রকম করিতে পারে, যাহার উৎকর্ষাপকর্ষ কর্ত্তার শিক্ষা, রুচি, উদ্দেশ্য, যোগ্যতা, আগ্রহ এবং অভিনিবেশের উপরে নির্ভর করে এবং যাহার ফলাফল পরোক্ষভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে সমস্ত সমাজের বা মানবমণ্ডলীর স্বার্থকে স্পর্শ করে, মানবের সুখ-সৌভাগ্যের পথকে প্রশস্ত করে, মানবের সৌন্দর্য্য-পিপাসাকে বর্দ্ধিত ও পরিতৃপ্ত করে, এমন সকল কার্য্যই সমালোচনার বিষয়ীভূত।

এ কথাগুলি ঠিক হইলে মানবীয় কার্য্যাবলীর অতি অল্প বাদে প্রায় সমস্তই সমালোচনার আমলে আসিয়া পড়ে। এমন কি, কে কিরূপে আহার করে, কে কি ভাবে চলে, কে কি প্রকারে কথা কহে, ইত্যাদি বিষয়েরও সমালোচনা লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়; সুতরাং নাম করিয়া সমালোচ্য কার্য্যের অবধি নির্দ্দেশ করা অসম্ভব; কিন্তু এ সমস্ত প্রকৃত সমালোচন-পদের বাচ্য নহে। সাধারণতঃ কাব্যাদি, সাহিত্য, চিত্র, সঙ্গীত, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য প্রভৃতি সুকুমার বিদ্যার যে সমালোচন, তাহাই সুধী-সমাজে সমালোচনা বলিয়া পরিচিত, পরিগৃহীত এবং সম্মানিত।

চিত্র, সঙ্গীত প্রভৃতি বিদ্যার কিছুই জানি না, সুতরাং যাহা দেখি, যাহা শুনি, তাহাতেই বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া থাকি। যদি কেহ সঙ্গীতচ্ছলে চেঁচাইতে থাকে, আমি মনে মনে বলি, "বা! বেশ চেঁচাইতেছে, আমি ত এমন করিতে পারি না!" বটতলার অমরকীর্ত্তি চিত্রকর স্বর্গীয় (সম্ভবতঃ এখন তিনি স্বর্গবাসী) নৃত্যলাল শীল মহাশয় আমাকে অনেক আনন্দ দিয়াছেন, বটতলার রামায়ণ মহাভারত পাইলে এখনও পাতা উল্টাইয়া ছবিগুলি দেখি। মধ্যে মধ্যে ঐ সকল ছবির হাতে মুখে লাল রঙের এক একটা পোঁছ দেখিয়া অর্থ বুঝিতে পারিতাম না, কিন্তু এমন বুঝিতে পারি ঐ গুলি রঙ্গীন ছবি। সীতার বনবাসে পড়িয়াছিলাম, সীতা পঞ্চবটীর চিত্র-দর্শনে বাস্তব দৃশ্য মনে করিয়া মূর্চ্ছিতা

হইয়াছিলেন; এক একবার মনে করিতাম, সে কি এইরূপ চিত্র? একবার কোথায় দেখিলাম, একটি ছবি হাত মেলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কিন্তু হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী নিম্নদিকে চিত্রিত আছে; তথাপি ছবি দেখিবার লালসা ছাড়িতে পারিলাম না।

কিন্তু বিদ্বান্ হইবার দুরাশায় এক সময়ে কিছু লেখাপড়া শিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, আর নিরুপলক্ষ হইয়া থাকা মানুষের স্বভাব-বিরুদ্ধ বলিয়া এখনও তাহারই নাড়াচাড়া করি, সুতরাং মাতৃভাষায় সাহিত্যের সমালোচনা দেখিবার জন্য সময়ে সময়ে মনে বড়ই আকাঙ্ক্ষা হয়। যাহার দোষগুণ জানি না, তাহার দোষগুণ জানিবার আকাঙ্ক্ষা দূষণীয় নহে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, সে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইবার কোন উপায় নাই। যাঁহারা বঙ্গভাষার প্রাণস্বরূপ, যাঁহারা বাঙ্গালীজাতির গৌরব, যাঁহারা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশের শিক্ষাগুরু ও পথপ্রদর্শক, যাঁহারা এই সম্মিলনের অনুষ্ঠান দ্বারা বাঙ্গালীর বিক্ষিপ্ত মনীষাকে কেন্দ্রীভূত করিবার প্রশংসনীয় চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন, যাঁহাদের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা দিন দিন বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর করিতেছে, তাঁহারাই যখন সমালোচনে উদাসীন, তখন বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যের এ অভাব কে দূর করিবে, এ আকাঙ্ক্ষা আর কে পূর্ণ করিবে?

শুনিয়াছি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে একটা অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়ম আছে, তাঁহারা কোন জীবিত গ্রন্থকারের গ্রন্থ সমালোচনা করিবেন না। এ শুনা কথা, সত্য কি মিথ্যা তাহা জানি না; তবে এ কথা বোধ হয় সত্য যে, উক্ত পরিষদের পত্রিকায় কোন জীবিত গ্রন্থকারের গ্রন্থের সমালোচনা হয় না। যদি এরূপ কোন নিয়ম থাকে, তাহাকে নিন্দা করা যায় না, তাহার উদ্দেশ্যে কোন দোষ আরোপ করা যায় না। বাঙ্গালা-সাহিত্যের মহারথিগণ সমবেত হইয়া যে নিয়ম অবধারিত করিয়াছেন, তাহাতে ভুলভ্রান্তির কল্পনা করিতে পারে, এমন ধৃষ্ট বাঙ্গালীর অস্তিত্ব বোধ হয় নিতান্তই বিরল; কিন্তু মানুষের একটা স্বভাব এই, যে স্থলে কোন কার্য্যের হেতুবাদ দেখা যায় না, সে সেখানে একটা হেতু কল্পনা করিয়া লয়, একটা উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিয়া বসে।

সর্ব্বত্র যেমন হইয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও সেরূপ হইয়াছে; যাহারা এই নিয়ম সম্বন্ধে চিন্তা করে, তাহারা স্পষ্ট কোন হেতুবাদ না পাইয়া একটা হেতু কল্পনা করিয়া লইতেছে। সেই কাল্পনিক হেতুটা এই—যাঁহারা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভ্য, তাঁহারা প্রায় সকলেই সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত গ্রন্থকারশ্রেণী-ভুক্ত।

অগ্নি-দ্রাবিত সুবর্ণের ন্যায় শ্যামিকা-পরিবর্জ্জিত, বিশুদ্ধ। অগ্নি শীতল, এই কথা বলিলেই তাহার সমালোচনার প্রয়োজন; কিন্তু অগ্নিতে দাহিকা শক্তি আছে, একথা কেহ বলিলে যাহা বুঝি, নিজের মনে মনেও তাহাই অনুভব করি, সুতরাং ইহার আবার সমালোচনা কি? এস্থলে বিজ্ঞান বলিতে আমি—জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং অধ্যাত্মবিজ্ঞান ইত্যাদি সমস্ত বিজ্ঞানই বুঝিয়া লইতেছি।

যাহাতে উদ্ভাবনা শক্তির পরিচালনা হয়, যাহাতে মানবহৃদয়ের ভাব-সম্পদ্ প্রকাশিত, স্ফুরিত এবং অভিব্যক্ত হয়, যাহার সম্পাদনে কর্ত্তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে, যাহা পাঁচজনে করিলে পাঁচ রকম হয়, অথবা একজনেই পাঁচ রকম করিতে পারে, যাহার উৎকর্ষাপকর্ষ কর্ত্তার শিক্ষা, রুচি, উদ্দেশ্য, যোগ্যতা, আগ্রহ এবং অভিনিবেশের উপরে নির্ভর করে এবং যাহার ফলাফল পরোক্ষভাবে বা প্রত্যক্ষ-ভাবে সমস্ত সমাজের বা মানবমণ্ডলীর স্বার্থকে স্পর্শ করে, মানবের সুখ-সৌভাগ্যের পথকে প্রশস্ত করে, মানবের সৌন্দর্য্য-পিপাসাকে বর্দ্ধিত ও পরিতৃপ্ত করে, এমন সকল কার্য্যই সমালোচনার বিষয়ীভূত।

এ কথাগুলি ঠিক হইলে মানবীয় কার্য্যাবলীর অতি অল্প বাদে প্রায় সমস্তই সমালোচনার আমলে আসিয়া পড়ে। এমন কি, কে কিরূপে আহার করে, কে কি ভাবে চলে, কে কি প্রকারে কথা কহে, ইত্যাদি বিষয়েরও সমালোচনা লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়; সুতরাং নাম করিয়া সমালোচ্য কার্য্যের অবধি নির্দ্দেশ করা অসম্ভব; কিন্তু এ সমস্ত প্রকৃত সমালোচন-পদের বাচ্য নহে। সাধারণতঃ কাব্যাদি, সাহিত্য, চিত্র, সঙ্গীত, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য প্রভৃতি সুকুমার বিদ্যার যে সমালোচন, তাহাই সুধী-সমাজে সমালোচনা বলিয়া পরিচিত, পরিগৃহীত এবং সম্মানিত।

চিত্র, সঙ্গীত প্রভৃতি বিদ্যার কিছুই জানি না, সুতরাং যাহা দেখি, যাহা শুনি, তাহাতেই বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া থাকি। যদি কেহ সঙ্গীতচ্ছলে চেঁচাইতে থাকে, আমি মনে মনে বলি, "বা! বেশ চেঁচাইতেছে, আমি ত এমন করিতে পারি না!" বটতলার অমরকীর্ত্তি চিত্রকর স্বর্গীয় (সম্ভবতঃ এখন তিনি স্বর্গবাসী) নৃত্যলাল শীল মহাশয় আমাকে অনেক আনন্দ দিয়াছেন, বটতলার রামায়ণ মহাভারত পাইলে এখনও পাতা উল্টাইয়া ছবিগুলি দেখি। মধ্যে মধ্যে ঐ সকল ছবির হাতে মুখে লাল রঙের এক একটা পোঁছ দেখিয়া অর্থ বুঝিতে পারিতাম না, কিন্তু এমন বুঝিতে পারি ঐ গুলি রঙ্গীন ছবি। সীতার বনবাসে পড়িয়াছিলাম, সীতা পঞ্চবটীর চিত্র-দর্শনে বাস্তব দৃশ্য মনে করিয়া মূর্চ্ছিতা

হইয়াছিলেন; এক একবার মনে করিতাম, সে কি এইরূপ চিত্র? একবার কোথায় দেখিলাম, একটি ছবি হাত মেলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কিন্তু হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী নিম্নদিকে চিত্রিত আছে; তথাপি ছবি দেখিবার লালসা ছাড়িতে পারিলাম না।

কিন্তু বিদ্বান্ হইবার দুরাশায় এক সময়ে কিছু লেখাপড়া শিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, আর নিরুপলক্ষ হইয়া থাকা মানুষের স্বভাব-বিরুদ্ধ বলিয়া এখনও তাহারই নাড়াচাড়া করি, সুতরাং মাতৃভাষায় সাহিত্যের সমালোচনা দেখিবার জন্য সময়ে সময়ে মনে বড়ই আকাঙ্ক্ষা হয়। যাহার দোষগুণ জানি না, তাহার দোষগুণ জানিবার আকাঙ্ক্ষা দূষণীয় নহে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, সে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইবার কোন উপায় নাই। যাঁহারা বঙ্গভাষার প্রাণস্বরূপ, যাঁহারা বাঙ্গালীজাতির গৌরব, যাঁহারা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশের শিক্ষাগুরু ও পথপ্রদর্শক, যাঁহারা এই সম্মিলনের অনুষ্ঠান দ্বারা বাঙ্গালীর বিক্ষিপ্ত মনীষাকে কেন্দ্রীভূত করিবার প্রশংসনীয় চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন, যাঁহাদের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা দিন দিন বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর করিতেছে, তাঁহারাই যখন সমালোচনে উদাসীন, তখন বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যের এ অভাব কে দূর করিবে, এ আকাঙ্ক্ষা আর কে পূর্ণ করিবে?

শুনিয়াছি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে একটা অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়ম আছে, তাঁহারা কোন জীবিত গ্রন্থকারের গ্রন্থ সমালোচনা করিবেন না। এ শুনা কথা, সত্য কি মিথ্যা তাহা জানি না; তবে এ কথা বোধ হয় সত্য যে, উক্ত পরিষদের পত্রিকায় কোন জীবিত গ্রন্থকারের গ্রন্থের সমালোচনা হয় না। যদি এরূপ কোন নিয়ম থাকে, তাহাকে নিন্দা করা যায় না, তাহার উদ্দেশ্যে কোন দোষ আরোপ করা যায় না। বাঙ্গালা-সাহিত্যের মহারথিগণ সমবেত হইয়া যে নিয়ম অবধারিত করিয়াছেন, তাহাতে ভুলভ্রান্তির কল্পনা করিতে পারে, এমন ধৃষ্ট বাঙ্গালীর অস্তিত্ব বোধ হয় নিতান্তই বিরল; কিন্তু মানুষের একটা স্বভাব এই, যে স্থলে কোন কার্য্যের হেতুবাদ দেখা যায় না, সে সেখানে একটা হেতু কল্পনা করিয়া লয়, একটা উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিয়া বসে।

সর্ব্বত্র যেমন হইয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও সেরূপ হইয়াছে; যাহারা এই নিয়ম সম্বন্ধে চিন্তা করে, তাহারা স্পষ্ট কোন হেতুবাদ না পাইয়া একটা হেতু কল্পনা করিয়া লইতেছে। সেই কাল্পনিক হেতুটা এই—যাঁহারা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভ্য, তাঁহারা প্রায় সকলেই সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত গ্রন্থকারশ্রেণী-ভুক্ত।

সমালোচনার ভার পরিষৎ গ্রহণ করিলে তাঁহাদিগের মধ্যেই পরস্পরের গ্রন্থ পরস্পরকে সমালোচনা করিতে হইবে। এরূপ করিলে একপ্রকার নিজের গ্রন্থ নিজেরই সমালোচনা করা হয়। এরূপ কাযে লাভ কি? বরং এখন লেখা হইয়া থাকুক, ভবিষ্যৎ বংশ সমালোচনা করিবে। আর একটা কথা এই, সমালোচনা করিতে বসিলেই দোষ প্রদর্শন করিতে হইবে, তখন লেখকের পক্ষ হইতে দোষকে গুণ বলিয়া সমর্থন আরম্ভ হইবে, তাহার ফলে বাদপ্রতিবাদ হইতে মনোমালিন্য, মনোমালিন্য হইতে বিরোধ, বিরোধ হইতে পরিষদের বিনাশ! সমালোচনা হইতে যখন এতটা অনিষ্টের আশঙ্কা রহিয়াছে, তখন ইহাকে দূরে রাখাই ভাল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই হেতু-প্রদর্শন কাল্পনিক মাত্র, কারণ যাঁহারা নিয়ম করিয়াছেন, তাঁহারা এ বিষয়ে কিছু বলেন নাই, বলিয়া থাকিলেও আমি তাহা শুনি নাই; কিন্তু ইহাই যদি সমালোচন-পরিত্যাগের কারণ হয়, তাহা হইলে সেজন্য পরিষদকে দোষ দেওয়া যায় না। কয়েক বৎসর মাত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে, ইহার মধ্যেই ইহা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পরে যদি সমালোচনা আরম্ভ হয়, তাহা হইলে যত সভ্য তত ভাগ হওয়া বিচিত্র নহে; কিন্তু বাঙ্গালী হইয়া কেহ এমন মারাত্মক কামনা করিতে পারে না। সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালীমাত্রেরই অতি আদরের জিনিস। ইহা বাঙ্গালী-সাহিত্য-সেবকদিগের শক্তির একটা কেন্দ্র, দাঁড়াইবার একটা সাধারণ অধিষ্ঠান-ভূমি, ভ্রাতৃত্বের একটা বন্ধন-রজ্জু। চতুর্দ্দিক যখন ঝড়-বৃষ্টিপাতে ছিন্নভিন্ন, তখন ইহাই মাথা রাখিবার স্থান। সাহিত্যের জন্যই সমালোচন, সমালোচনের জন্য সাহিত্য নহে; যদি সমালোচন সাহিত্যের উপকার না করিয়া অপকার করিতে চায়—মূলচ্ছেদ করিতে উদ্যত হয়, তবে এমন সমালোচন অবশ্যই চাই না। কোন কোন শাখাকে ছেদন করিয়াও যদি বৃক্ষকে বাঁচাইতে পারা যায়, বুদ্ধিমানের তাহাও কর্ত্তব্য।

কিন্তু এ বিপদের কি উদ্ধার নাই? এ সমস্যার কি একটা মীমাংসা হইতে পারে না? যেখানে এত প্রতিভার সম্মিলন, সেখানে কি "মরে সাপ না ভাঙ্গে নড়ি" রকমের একটা ব্যবস্থা হইতে পারে না—পরিষৎ না ভাঙ্গিয়া যায়, অথচ সমালোচন চলিতে থাকে, এমন কি কোন উপায় হইতে পারে না? আমার ত বোধ হয় পরিষৎ মনোযোগী হইলে ইহার একটা ব্যবস্থা করিতে পারেন। কোন কোন পরীক্ষায় নাকি নিয়ম আছে, কাগজে পরীক্ষার্থীর নামধাম কিছুরই উল্লেখ থাকে না, কেবল একটী সংখ্যামাত্র থাকে, পরীক্ষক জানেন না তিনি কাহার

কাগজ পরীক্ষা করিতেছেন; পরে যখন ফল বাহির হয়; তখন তাহার নামের সহিত মিলাইয়া দেখা হয়। সমালোচন ছাড়িয়া দেওয়া অপেক্ষা এই প্রথা অবলম্বনে কি দোষ হয়? সমালোচনের জন্য একটি সমিতি গঠিত হইল, পুস্তকের আগাপাছা ছাঁটিয়া কেবল মূল গ্রন্থখানি সমালোচকদিগের হাতে দেওয়া গেল এবং তাঁহারা সমালোচন করিয়া প্রবন্ধটী পরিষদের হাতে দিলেন; ইহাতে গ্রন্থকার জানিলেন না সমালোচক কে, সমালোচকও জানিলেন না গ্রন্থকার কে, অথচ সাধারণে গ্রন্থের দোষগুণ অনায়াসে জানিতে পারিল, জানিয়া উপকৃত হইল।

কেহ বলিতে পারেন, পূর্ব্বকালে সমালোচনা ছিল না, তাই বলিয়া কি প্রাচীন সাহিত্যের আদর কিছু কমিয়াছে? বর্ত্তমান প্রণালীর সমালোচন পূর্ব্ব-কালে ছিল না বটে, তবে সমালোচন যে ছিলই না, একথা বলা যায় না। কথিত আছে, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ন্যায়-শাস্ত্র সম্বন্ধে এক গ্রন্থ লিখিয়া আর একজন পণ্ডিতকে তাহা শুনাইয়াছিলেন; গ্রন্থ শুনিয়া পণ্ডিত তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন। গৌরাঙ্গ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, তিনিও ঠিক ঐ বিষয়ে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন; কিন্তু গৌরাঙ্গের গ্রন্থ যখন এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তখন সেই গ্রন্থই সকলে পড়িবে, তাঁহার গ্রন্থ কেহ পড়িবে না। গৌরাঙ্গ এই কথা শুনিয়া হাসিলেন এবং সেই পণ্ডিতকে নিশ্চিন্ত করিবার জন্য তাঁহার নিজের গ্রন্থখানি তৎক্ষণাৎ গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দিলেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, সেকালে যে কেবল সমা-লোচনা ছিল, এমন নহে, সেই সঙ্গে অসাধারণ উদারতা এবং অসীম স্বার্থত্যাগ আছে কিনা, গ্রন্থকারগণ এবং সমালোচকবর্গই বলিতে পারেন। একজন ইংরাজলেখক কবিদিগকে দাঁড়াইয়ে মোরগের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন; আমার কিন্তু বোধ হয়, পশ্চিমের বাতাস এদেশেও কিছু লাগিয়াছে।

প্রাচীন কালে বোধ হয় কেবল সমালোচন উপলক্ষ করিয়া প্রবন্ধ লিখিবার প্রথা বড় একটা ছিল না, টীকাটিপ্পনীতে প্রসঙ্গ উপলক্ষেই সচরাচর নানা গ্রন্থ-কারের মতামত সমালোচিত হইত। তখন সমালোচনার বড় বেশী প্রয়োজনও হইত না; কেন না, গ্রন্থকারগণ জীবনব্যাপী অধ্যয়ন দ্বারা যে জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেন, সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় যে সত্য আপন হৃদয়ে উপলব্ধি করিতেন, তাহা নিজেই ধীরভাবে সমালোচনা করিয়া, উপযুক্ত ভাষা, ভাব এবং অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়া পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা করিতেন, কাজেই

তাঁহাদের গ্রন্থে অন্যের সমালোচনের জন্য তেমন অবকাশ থাকিত না; কিন্তু আজকালকার এই ব্যস্ততার দিনে, এই অভিনবতার যুগে সে ভাবের কি আশা করা যায়, না তাহা সম্ভব হয়? কার্লাইল একস্থলে বলিয়াছেন, একখান ভাল গ্রন্থ লিখিতে বসিলে তাহাতে গ্রন্থকারের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়, গ্রন্থ-সমাপনান্তে কিছু দীর্ঘকাল বিশ্রাম না করিলে গ্রন্থকার পুনরায় লেখনী-গ্রহণে সমর্থ হন না। আমাদের দেশে গ্রন্থকারদিগের মধ্যে কাহারও এ অবস্থা ঘটে কিনা জানি না; কিন্তু অনেকের যে সেরূপ দুরবস্থা ঘটে না, ইহা তাঁহাদিগের লেখনীর অবিরাম গতি দেখিয়া বুঝিতে পারি। তাঁহাদের গ্রন্থ-বাহুল্য দেখিয়া অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে চতুর্ভুজ বলিব কি দশভুজ বলিব ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না। তাঁহাদের সকল গ্রন্থই যদি সমান সারবান হয়, তাঁহাদের মস্তিষ্কের সবলতা তাহা হইলে অসাধারণ বলিতে হইবে। ভগবান্ করুন, তাঁহারা দীর্ঘ-জীবী হইয়া বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধিযুক্ত, বঙ্গসমাজকে উপকৃত, এবং বাঙ্গালী-জাতিকে গৌরবান্বিত করিতে থাকুন।

কিন্তু প্রতিভার সম্ভব ত সর্ব্বত্র হয় না, বাঙ্গালীর মধ্যে প্রতিভাশালী লেখক আছেন বলিয়া আমার মত বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ গ্রন্থকার এ দেশে জন্মিতে পারেন না এ কথাত কল্পনাই করা যায় না। প্রতিভার বাক্য অর্থ অনুসরণ করে না, অর্থই প্রতিভার বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে চলে, প্রতিভার উক্তির সমর্থন করিবার জন্যই সাহিত্যের আইনকানুন বা অলঙ্কার-শাস্ত্রের সৃষ্টি, একথা অবশ্য সত্য হইতে পারে; কিন্তু যাহাদের প্রতিভা নাই, পরিশ্রম আছে, সাহিত্যের-সেবায় কি তাহারা অধিকার পাইবে না? অথবা অধিকারের অপেক্ষাই বা কে করে? তাহারা আপনাদের পথ অপনারাই প্রস্তুত করিতে জানে। পুস্তকের বিক্রয় ধরিয়া যদি সাহিত্য-বিস্তারের পরিমাণ অবধারণ করিতে হয়, তাহা হইলে আজিও বটতলা দাবী অগ্রগণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

অবশ্য বিজ্ঞানকে পায়ে ঠেলিয়া ফেলিতে পারে, প্রতিভাও এমন সর্ব্বশক্তি-শালিনী নহে। বিজ্ঞানের একটা নিয়ম এই, কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বস্তুর বিস্তার যত বাড়ে, গভীরতা তত কমে। প্রতিভাশালী লেখকদিগের গ্রন্থ-সম্বন্ধে একথা খাটে কিনা, তাহা তাঁহারা নিজেই বিচার করিয়া দেখিবেন, অন্যের কথার অপেক্ষা করিবেন না; কিন্তু আমি যে সমালোচনার প্রয়োজন মনে করিতেছি, তাহা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অপ্রতিভ অর্থাৎ প্রতিভাবিহীন লেখক এবং সাধারণ পাঠকের জন্য। সমালোচনায় যে উপকার হয়, অনেক লেখকই তাহা প্রত্যক্ষ করেন।

ইহা অতি স্বাভাবিক; নিজের দোষ সকল সময়ে নিজের চক্ষে পড়ে না, অন্যে দেখাইয়া দিলে তাহা সংশোধন করিবার অবসর ঘটে। প্রতিভা যত বড়ই হউক না কেন, তাহার কার্য্যে দোষ থাকিতে পারে না, ইহা বলিলে মানুষকে পূর্ণপ্রজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন, সৃষ্ট জীব পূর্ণপ্রজ্ঞ হইতে পারে না। যাহা হউক, প্রতিভাশালী লেখক সমালোচনের বাঁধাবাঁধি স্বীকার না করিলেও প্রতিভা যখন দুর্লভ,—সুতরাং শ্রমশালী লেখকের স্থান এবং উপকারিতা যখন সমাজে আছে, তখন অন্ততঃ তাঁহাদের উপকারের জন্যও সমালোচনার একটা ব্যবস্থা থাকা উচিত। অনেকে পুস্তক লেখেন, পুস্তক লেখার জন্য হৃদয়ের একটা অদম্য উত্তেজনাকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য। নূতন পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া গ্রন্থকারকে উপদেশ দেওয়া এবং গ্রন্থ-প্রকাশের উদ্যম হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে যাওয়া যে কি কঠিন ব্যাপার, তাহা যাঁহারা কখনও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন। যদি সমালোচনার বহুল প্রচার থাকিত, তাহা হইলে অনেক লেখকই যথাকালে এবং যথাপরিমাণে সাবধান হইতে পারিতেন, নিজের যোগ্যতা বুঝিবার একটা সুযোগ পাইতেন। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দুই একজনকে চাবুক মারিয়াছিলেন মাত্র; কিন্তু সেই চাবুক বঙ্গ-সাহিত্যের কত উপকার করিয়াছে, তাহা দেখিয়া কতজনের পৃষ্ঠ সাবধান হইয়াছে, তাহার পরিমাণ কে করিতে পারে? সময়ের একটা কথায় যত উপকার হয়, অসময়ের চাবুকেও তত উপকার করিতে পারে না। কলিকাতার নিকটস্থ কোন গ্রামে একজন ভদ্রলোক আছেন, তাঁহার এক সময়ে সখ হইল, মদের কুল্লি খাইবেন। তখন তাঁহার ধনের অভাব ছিল না, সুতরাং ইচ্ছামাত্র কলিকাতা হইতে বাড়ী পর্য্যন্ত বরফের ডাক বসিয়া গেল, প্রত্যহ পুঞ্জপুঞ্জ বরফ আসিতে লাগিল, কুল্লি জমাইবার জন্য অবিরাম উৎকট যত্ন চলিল; কিন্তু ক্রমান্বয়ে আট দিন যত্ন করিয়াও দেখা গেল, পোড়া মদ আর জমিল না। তখন একটি বন্ধুর নিকট তিনি আক্ষেপ করিলে, বন্ধুটি এক কথায় বলিয়া দিলেন, "মদ জমে না।" আট দিন আগে এই কথাটা শুনিলে তাঁহার কত উপকার হইত! সমালোচনা বর্ত্তমান থাকিলে, অনেক কথা তাহার মুখে শুনিয়া সময়ে সাবধান হওয়া যাইতে পারে।

গ্রন্থের সমালোচনা ভাবী বংশের জন্য রাখিয়া না দিয়া গ্রন্থকারের জীবিত-কালে হওয়াই ভাল—ইহাতে তাঁহার নিজেরও লাভ। অতি অল্প সংখ্যক স্বভাব-সংগীত ছাড়া প্রায় সমস্ত সাহিত্যেরই উদ্দেশ্য সমাজের শিক্ষা, সমাজের অভাব-

মোচন। সমাজের প্রয়োজন কি, তাহার সাধনে কোন্ উপায়টি প্রশস্ত এবং সেই উপায় প্রদর্শনে আমার যোগ্যতা কতকটা, এই তিন বিষয়ে জ্ঞান থাকা গ্রন্থকার মাত্রেরই অপরিহার্য্য। সমালোচনের পথ উন্মুক্ত থাকিলে এই ত্রিবিধ জ্ঞানলাভ যত সহজ হয়, নিজের সর্ব্বজ্ঞতার উপর নির্ভর করিলে ততটা সহজ হয় না। অনেক কার্য্য এমন আছে, যাহার আরম্ভেই একটা পরিষ্কার ধারণা না থাকিলে জিনিসটাত ভাল হয়ই না, সমালোচন দ্বারা পরে তাহার সংশোধনেরও সম্ভাবনা থাকে না। "এখন ত একটা গড়িয়া তুলি, পরে দোষগুণ দেখিয়া সংশোধন করিয়া লইব।"—এইরূপ ধারণা লইয়া কায করিলে 'ড্রেড্‌নটে'র মত যুদ্ধজাহাজ বা তাজমহলের মত স্মৃতিমন্দির কখনও নির্ম্মিত হইতে পারিত কিনা সন্দেহ; বরং তাহাও সম্ভব—ড্রেড্‌নট বা তাজমহল ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করা কষ্ট-সাধ্য হইলেও মানুষের পক্ষে অসাধ্য না হইতে পারে; কিন্তু একটা জাতীয় ভাষা একবার গঠিত হইয়া গেলে, আবার তাহাকে ভাঙ্গিয়া পুনর্গঠন করা কঠিন ত বটেই, সম্ভব কিনা তাঁহাই বিবেচ্য।

বঙ্গভাষা এখনও গঠনের অবস্থাতেই আছে; এ গঠন-ক্রিয়া কবে সম্পূর্ণ হইবে, কবে এই বিচিত্র প্রাসাদের উপরে চূড়া বসিবে, তাহা ত্রিকালজ্ঞ না হইলে কেহ বলিতে পারিবেন না; কিন্তু এখন যদি ইহাতে দোষ-বাহুল্য থাকিয়া যায়, এখনই যদি ইহার অঙ্গেঅঙ্গে অপূর্ণতা প্রবেশ করে, তবে ভাষা একবার জমাট বাঁধিয়া গেলে, আর তাহা দূর করিবার সুবিধা পাওয়া যাইবে না। ঝাঁটা-প্রয়োগে পার্থিব আবর্জ্জনা দূর হয় বটে, কিন্তু সাহিত্য-দেহে যে আবর্জ্জনা একবার অঙ্গীভূত হইয়া যায়, তাহা দূর করিবার ঝাঁটা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। অস্ত্র-প্রয়োগে যে রোগীর জীবন নিরাপদ রহিবে, দৃঢ়তার সহিত এমন কথা বলিবার ডাক্তারও দেখি না। তবে ভরসা আছে, বর্ত্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতেও বঙ্গীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিভা জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, কেন না, "কালোহ্যয়ং নিরবধির্ব্বিপুলা চ পৃথ্বী।" কিন্তু ভবিষ্যতে যে সকল প্রতিভাশালী মহাপুরুষ জাতীয় সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ লইয়া আবির্ভূত হইবেন, তাঁহারা যে বর্ত্তমান যুগের প্রতি ঐকান্তিক অন্ধভক্তির বশীভূত হইবেন, এখনকার সাহিত্যের ভাষা, ভাব এবং রীতিতে দোষ থাকিলে তাহা দেখিয়াও দেখিবেন না, প্রয়োজন বোধ করিলে নির্দ্দয় ভাবে ছুরী হাতে লইয়া তাহার দেহ ক্ষতবিক্ষত করিবেন না, তাহার প্রমাণ কি? বড় জোর না হয় ভক্তির আবেগে তাহার অঙ্গ স্পর্শ না করিলেন, বড় জোর না হয় প্রাচীন বলিয়া শ্রীপঞ্চমীর দিন পুষ্পচন্দনে গ্রন্থগুলির পূজা

করিলেন; কিন্তু ইহাতেই কি বর্ত্তমান লেখকদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে? ইহার জন্যই কি এত আয়োজন, এত উদ্যোগ, এত কাণ্ড? যদি ভবিষ্যতেও এদেশে প্রতিভার অভ্যুদয় হইবে বলিয়া বিশ্বাস থাকে, যদি বর্ত্তমান সাহিত্য দ্বারা বাঙ্গালীর আশা, আকাঙ্ক্ষা, শিক্ষা, সভ্যতা, চরিত্র এবং মনস্বিতাকে চিরদিনের জন্য পরিস্ফুরিত এবং পরিচালিত করিবার আশা থাকে, যদি ভারতের ভাষা-সমিতির মধ্যে আদর্শ গাম্ভীর্য্য, শক্তি, সৌন্দর্য্য, বৈচিত্র, মাধুর্য্য, ভাব-প্রবণতা এবং স্বাভাবিকতার নিমিত্ত মাতৃভাষার জন্য উচ্চ সিংহাসন রচনা করিয়া রাখিয়া যাইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে বৈচিত্র্যের মধ্যে শৃঙ্খলা আনিতে হইবে, স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া একতাস্থাপন করিতে হইবে, স্বেচ্ছাচারকে সংযত করিয়া বিজ্ঞানের আদেশের নিকট মস্তক নত করিতে হইবে। ইহা করিতে হইলেই, সমালোচনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, যাহাতে বহুলোকের কর্তৃত্ব এবং অধিকার রহিয়াছে, যাহার সম্পাদনে এবং উন্নতি-বিধানে বহুলোকের সাহচর্য্য একান্ত অনিবার্য্য, একতা এবং শৃঙ্খলার অভাবে তাহা কখন কোথায়ও সুসম্পাদিত হয় নাই, হইবেও না। এই একতা এবং শৃঙ্খলা কেবল বিজ্ঞানই দিতে পারে, আর সমালোচনাই সাহিত্যের সেই বিজ্ঞান।

প্রতিভা কেবল লেখকেরই থাকে, পাঠকের থাকিতে পারে না, এমন নহে। পাঠকের মধ্যেও প্রতিভাশালী লোক অনেক থাকেন এবং লেখনী হাতে লইলে তাঁহারাও সাহিত্য-সমাজে উচ্চাসন অধিকার করিতে পারেন; তবে কেহবা আলস্যে কেহ অমূলক ভয়ে, কেহবা অবসর ও রুচির অভাবে, আর কেহ হয়ত কালির আঁচড়ে লক্ষ্মী অসন্তুষ্ট হইবেন মনে করিয়া লেখনী গ্রহণ করেন না। যাহা হউক, পাঠকের প্রতিভা না থাকিলেও চলে, কেহ ইচ্ছা করিলে সাধারণ বুদ্ধি লইয়া পরিশ্রম করিলে গ্রন্থকারও হইতে পারে; কিন্তু বিনা প্রতিভায় পরের বুদ্ধি ধার করিয়া সমালোচক হওয়া যায় না। সাধারণ বুদ্ধিতে গালাগালি, ঝালঝাড়া, বিদ্বেষ-প্রকাশ এবং বিদ্রূপতামাসা চলিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত সমালোচনা চলিতে পারে না। সমালোচক সাহিত্য-রাজ্যের শাসক, বিচারক এবং বিধি-প্রবর্ত্তক। যাহাকে প্রতিভার উপরেও প্রভুত্ব করিতে হইবে, প্রাকৃতিক বৈষম্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, সে নিজে প্রতিভাসম্পন্ন না হইলে, সেরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টি, সেরূপ নিরপেক্ষতা, সেরূপ সহানুভূতি, সেরূপ ন্যায়পরতা এবং যুগপৎ লেখক ও পাঠকের হৃদয়ে প্রবেশ করিবার সেরূপ ক্ষমতা কোথায় পাইবে? আর তাহা যদি না থাকে, তাহা হইলে অযোগ্য বিচারকের বিচার-বিভ্রাট দেখিয়া

তাহার প্রতি সাধারণের মনে যেমন ঘৃণা ও অনাস্থা জন্মে, এইরূপ সমালোচকের প্রতিও পাঠক-সমাজের সেইভাবই জন্মিয়া থাকে।

এইজন্যই সুধী-সমাজে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবকদিগের এই সম্মিলন-সভায় সমালোচনের কথাটা তুলিবার প্রয়োজন মনে করিয়াছি। সমালোচনের প্রয়োজন ইহারা উপলব্ধি না করিলে আর কে করিবে? আবার, সমালোচনে যেরূপ প্রতিভার প্রয়োজন, তাহার প্রত্যাশা কেবল ইঁহাদের নিকটেই করি; ইঁহারা যদি এই অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যের ভার গ্রহণ না করেন, তবে এমন যোগ্য-পাত্র আর কোথায় পাইব, আর কে উপযুক্ত শক্তি লইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-তরণীর কর্ণধার হইয়া দাঁড়াইবে?

সত্যমিথ্যা জানি না, সমালোচন আরম্ভ হইলে সাহিত্যিক সভা-সমিতিগুলি আত্মবিরোধে ভাঙ্গিয়া যাইবে বলিয়া বাস্তবিকই যদি কোন আশঙ্কা থাকে, তাহা নিবারণ করিতে যতটুকু প্রতিভার প্রয়োজন, প্রয়োগ দ্বারা তাহার সার্থকতা সম্পাদন করুন। যে অবস্থা যত প্রতিকূল, প্রকৃষ্ট উপায় দ্বারা তাহাকে বশে আনিয়া ততদূর অনুকূল করাই প্রকৃত প্রতিভার কার্য্য। প্রকৃত প্রতিভাশালী লেখক নিজের দোষ দেখিলে আনন্দিত না হইয়া ক্ষুব্ধ হইবেন, অথবা বুঝিতে না পারিয়া কেহ ভ্রান্ত মত প্রকাশ করিলে, তাহার প্রতি খড়্গহস্ত হইবেন, এ কথা মনে করাও যেন প্রতিভার অবমাননা বলিয়া মনে করি। গ্রন্থ যতদিন লিখি, ততদিনই আমার; কিন্তু যেদিন উহা প্রচার করিলাম, সেদিন উহা একটা স্বতন্ত্র নাম-রূপে চিহ্নিত হইয়া পাঠকের নিকট উপস্থিত হইল, সেদিন হইতে উহা জাতীয় ভাণ্ডারের সম্পত্তি, জাতীয় জন-সাধারণের উহাতে সম্পূর্ণ এবং অবিসম্বাদিত অধিকার। যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া আমার গ্রন্থের সমালোচনা করেন এবং যে সকল দোষ আমার চক্ষে পড়ে নাই তাহা দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার উপর বিরক্ত না হইয়া, বরং তিনি যে আমি জীবিত থাকিতেই দোষ সংশোধনের এই সুযোগটা উপস্থিত করিলেন, এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত। আমার মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি যে উপকার বুঝিতে পারে, প্রতিভা তাহা দেখিতে পায় না, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, অনেক সময়েই ইহা ঘটিতে দেখা যায়, অনেক স্থলেই প্রতিভার অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পায়। ছাত্রাবস্থায় একবার একজন ইংরাজ-কবির কয়েকটি কবিতা পাঠ্য ছিল। কবিতাগুলি ভালরূপে বুঝিবার জন্য তাঁহার জীবন-চরিতখানি একবার পড়িতে হইল; কিন্তু জীবন-চরিত পড়িতে যাইয়া দেখি, কবি নিয়ত

আত্মসমর্থনেই ব্যস্ত; কোথায় কে তাঁহার কবিতার নিন্দা করিল, সর্ব্বদা যত্নসহকারে তাহাই সংগ্রহ করিতেছেন এবং অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাহারই প্রতিবাদে লেখনীচালনা করিতেছেন। তাঁহার সে সকল বাদপ্রতিবাদ কিছুই মনে নাই; কিন্তু তাঁহার কবিতা এখনও পড়িতে ভাল লাগে। পত্র লিখিয়া তাহা পড়িয়া বুঝাইবার জন্য সেই পত্রের সঙ্গে যাওয়া যেমন, তাঁহার এই ব্যবহারও সেইরূপ মনে করিয়া হাসি পাইত। অবশ্য কোন নূতন গ্রন্থ বাহির হইলে, পাঠক-সমাজে তাহা লইয়া বাদপ্রতিবাদ গ্রন্থকারের পক্ষে অতীব সুখ এবং সৌভাগ্যেরই বিষয়; কিন্তু স্বয়ং গ্রন্থকারের পক্ষে সেই বাদপ্রতিবাদে যোগ দেওয়া, অথবা ইন্দ্রজিতের ন্যায় নিজে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া প্রতিশোধের জন্য বাণ নিক্ষেপ করা, এ উভয়ই তেমন গৌরবাস্পদ বলিয়া বোধ হয় না।

বলিয়াছি, নিন্দা, প্রশংসা এবং আদর্শনির্দ্দেশ, এ তিনই প্রকৃত সমালোচনের কার্য্য; কিন্তু অনেকেরই ধারণা, সমালোচনের অর্থই কেবল নিন্দা, কেবল ভর্ৎসনা, কেবল বিদ্রূপ; এই ধারণা আছে বলিয়াই গ্রন্থকারেরা সমালোচনার নামে শিহরিয়া উঠেন এবং কেবল বিজ্ঞাপনদাতার সমালোচনেই পরিতৃপ্ত থাকা নিরাপদ মনে করেন। এরূপ ভয়ের যথেষ্ট কারণও আছে। গ্রন্থে দোষ থাকিলে তাহা এরূপ ভাষায় এবং এরূপ ভাবে দেখাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, যাহাতে লেখকের হৃদয় কিছুমাত্র ব্যথা না পায়; কিন্তু অনেকস্থলে সমালোচনা পড়িলে বোধ হয় দোষপ্রদর্শন একটা উপলক্ষ মাত্র গ্রন্থকারের হৃদয়ে যন্ত্রণা উৎপাদন করাই যেন প্রধান উদ্দেশ্য। সুস্থদেহে একটা বিস্ফোটক জন্মিলে, সুনিপুণ অস্ত্র-চিকিৎসকের কর্ত্তব্য, এমন ভাবে অস্ত্রটি প্রয়োগ করেন, যাহাতে রোগী কিছুমাত্র যন্ত্রণা অনুভব না করে, এইরূপে যন্ত্রণার পরিহারের জন্য কত রকম বোধ-হারক ঔষধেরও আবিষ্কার হইয়াছে; কিন্তু একটি বিস্ফোটকের চিকিৎসা করিতে যাইয়া যদি রোগীর সর্ব্বাঙ্গ কাটিয়া ক্ষতবিক্ষত করেন, তাহা হইলে রোগী কি চিকিৎসককে আশীর্ব্বাদ করিবে, না এরূপ চিকিৎসা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ মনে করিবে? বাক্যাঘাতের যন্ত্রণা যে অস্ত্রাঘাতের যন্ত্রণা হইতে কিছু ন্যূন, এমন কথা মনে করি না। যিনি সমালোচকের উচ্চাসন গ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে বিশেষ সাবধানতার সহিত রোগীকে বাঁচাইয়া রোগ সারাইতে হইবে, আপনার প্রত্যেক বাক্যের সমালোচনা আপনাকেই করিতে হইবে। আবার এমনও দেখা গিয়াছে, যথেষ্ট শিষ্ট ভাষায় সমালোচনা করিলেও গ্রন্থকার বিরক্ত হন। এরূপ গ্রন্থকার

হয়ত মনে করেন, তিনি ভুল-ভ্রান্তি এবং সমালোচনার অতীত; কিন্তু যে প্রশংসা বই নিন্দার নাম শুনিতে পারে না, তাহার উন্নতি সমাপ্তি-বিন্দুতে দাঁড়াইয়াছে। সে বালকই হউক আর বৃদ্ধই হউক, তাহার আর চৈতন্যের পথে অগ্রসর হইবার আশা নাই। তাহার অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা থাকিলে, তাহাকে নিরাবিল প্রশংসা শুনাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, আর যদি ততদূর নীচে নামিবার শক্তি না থাকে, নীরব হইয়া থাকা ভিন্ন উপায় নাই।

ভাষার ওজন এবং ভাবের মাত্রা ঠিক রাখিয়া সমালোচনা করা বড় কঠিন ব্যাপার। অত্যন্ত সাবধান হইতে না পারিলে নিন্দার সময় সেই ওজন এবং মাত্রা লক্ষ্যের নিম্নে নামিয়া যায় এবং প্রশংসার সময়ে তাহার ঊর্দ্ধে উঠিয়া পড়ে। বহু বৎসর হইল কোন সাপ্তাহিক কাগজে একখানি কাব্যের সমালোচনা পাঠ করিয়াছিলাম, সে কথা এখনও মনে আছে। সমালোচক কবিকে একেবারে সপ্তম স্বর্গে তুলিয়াছেন, এবং তাঁহার উক্তির সমর্থনের জন্য কাব্যের অনেকগুলি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। সমালোচন পড়িয়া হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়, যাহা উপলক্ষ করিয়া সমালোচন লিখিত, অতি আগ্রহের সহিত সেই উদ্ধৃতাংশ পড়িতে যাই; কিন্তু পড়িয়া বুঝিতে পারি না, সমালোচক মহাশয় কেন এত বাক্যব্যয় করিলেন। একবার মনে করিলাম, বুঝি ইহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ আছে; কিন্তু দুই তিন বার প্রবন্ধটি পড়িয়া তাহারও কোন আভাস পাইলাম না; তখন এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলাম যে, ইহার মূলে হয় সমালোচকের লিপি-চাতুর্য্য-প্রকাশের অভিলাষ, আর না হয় কবি যতটা বড় নহেন তাঁহাকে ততটা বড় দেখাইবার প্রয়াস বর্ত্তমান। নিন্দাতেই হউক আর প্রশংসাতেই হউক, মাত্রা অতিক্রম করা কিছুতেই সঙ্গত নহে, অতিরঞ্জন কোন পক্ষেরই উপকার করে না। সুধীগণ অগ্রসর না হইলে, প্রতিভা-স্পর্শে ইহাকে পরিশোধিত না করিলে, সমালোচন কখনও সাহিত্যের উপকার করিতে সমর্থ হইবে না।

কেহ কেহ মনে করেন, কেবল দোষ ঘোষণা করিলেই সমালোচনের কার্য্য শেষ হইল, গুণকীর্ত্তনে লাভ কি? কিন্তু বাস্তবিক গুণেরও সমালোচনের প্রয়োজন আছে। কাব্যের সৌন্দর্য্যে সকলের হৃদয়ই আকৃষ্ট হয় বটে এবং কাব্যের প্রভাবে মানব-হৃদয় উন্নত হয় বটে, কিন্তু যে যে-পরিমানে বুঝে, সে সেই পরিমানেই আকৃষ্ট এবং উন্নত হয়। কেবল কাব্য কেন, সাহিত্যের অনেক অঙ্গই সকলে সমানভাবে এবং একরূপে বুঝেন না। বুদ্ধি অনুসারে বুঝিবার তারতম্য

ত আছেই, তা' ছাড়া শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি, প্রবৃত্তি, সংসর্গ, আলোচনা এবং অভিনিবেশের তারতম্যানুসারে একই কথা ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বুঝে। কোন কোন তীর্থযাত্রী স্বাধীনভাবে স্বৈরগতিতে নানা তীর্থে নানা দেশে ভ্রমণ করে, সাথীর অপেক্ষা রাখে না; কিন্তু অধিকাংশ যাত্রীই সাথীর উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, সাথী যেখানে লইয়া যায় সেখানেই তাহারা যায়, সাথী যাহা দেখায় তাহাই তাহারা দেখে, সাথী যাহা জানায় তাহাই তাহারা জানে,—সাথী ছাড়া একপদও তাহারা অগ্রসর হইতে সাহস পায় না। পাঠকদিগের মধ্যেও এইরূপ দুইটি শ্রেণী আছে; এক শ্রেণীর পাঠক আপনাআপনি সাহিত্য-কাননের সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া স্বাধীন ভাবে বিচরণ করেন, আর এক শ্রেণীর পাঠক সাথী না থাকিলে যেমন অধিকাংশ যাত্রীরই তীর্থদর্শন ঘটে না, কেহ বুঝাইবার না থাকিলে সেইরূপ এই দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠকের পক্ষেও সাহিত্য-সৌন্দর্য্য বুঝিবার চেষ্টা ঘটিয়া উঠে না; সুতরাং তাঁহারা সাহিত্য-পাঠের ষোল আনা ফল লাভ করিতে পারেন না। যাঁহারা ছাত্র-চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত আছেন তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, এক শ্রেণীর ছাত্র আছে যাহারা পাঠ্য-বিষয় আগেনিজেই বুঝিবার চেষ্টা করে, কেবল যেখানে বুদ্ধি একেবারেই প্রবেশ করে না সেইখানেই টীকাটিপ্পনী মিলাইয়া দেখে; আর এক শ্রেণীর ছাত্র আছে যাহারা প্রত্যেকটি বাক্য পড়িয়াই টীকার পুস্তক খুলে, নিজে নিজে বুঝিবার জন্য একবার চেষ্টা করিয়াও দেখে না। এইটি হইল অভ্যাসের কথা; আর বুদ্ধি এবং শিক্ষার অল্পতা যাহাদের আছে, তাহাদিগকে ত' কাযেকাযেই অন্যের উপরে নির্ভর করিতে হইবে; সুতরাং অর্থ, ভাব এবং সৌন্দর্য্য বুঝাইবার জন্য সমালোচনের বিশেষ প্রয়োজন। বঙ্গভাষায় কত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিত হয়; কিন্তু সমাজে তাহার আশানুরূপ ফল দৃষ্ট হয় না। বুঝাইবার লোকের অভাব—প্রকৃত সমালোচনের অভাবই কি তাহার একটা কারণ নহে?

দোষ-উদ্ঘাটন হইতে সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণ আরও কঠিন; আবার আদর্শ-নির্দ্দেশ সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। যে সমালোচনা এই সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে যতদূর সমর্থ, তাহা সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট।

আদর্শ-প্রদর্শন কেবল উপদেশে হয় না। সত্যবাদী হও, এ একটা নীরস নির্জ্জীব মাধুর্য্যবিহীন উপদেশ কাহারও প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে না, কাহারও হৃদয়ে স্থায়িত্ব লাভ করিয়া জীবনকে তাহার প্রভাবে গঠিত এবং পরিচালিত করিতে পারে না; কিন্তু ঐ উপদেশই যখন নল, হরিশ্চন্দ্র, দশরথ প্রভৃতির

চরিত্রে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, যখন সত্যকে উজ্জ্বল করিবার জন্য তাহার পশ্চাতে একটি রক্ত-মাংস-সৌন্দর্য্যময় জীবন্ত উদাহরণ আসিয়া দাঁড়ায়, তখন হৃদয় বাস্তবিকই মোহিত হয়, তখন বাস্তবিকই অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও সত্যের জন্য জীবন দিতে পারিলে জন্ম সার্থক বোধ হয়।

আদর্শ দেখাইবার, সুতরাং শিখাইবার দুইটি উপায় আছে;—প্রথমতঃ কাব্যাদিতে চিত্রিত চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ দ্বারা মনস্তত্ত্বের সূত্রগুলি, মানবীয় কার্য্যের উৎসগুলি, মানবীয় ভাব-কুসুমের-বৃন্তদল-কেশরাদি খুলিয়া পুঙ্খানুরূপে এক একটি চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া; আর দ্বিতীয়তঃ সেই সকল সামগ্রী উপাদানস্বরূপ গ্রহণ-পূর্ব্বক কাব্য, নাটক, উপন্যাসাদিতে আদর্শ বা লক্ষ্যের অনুরূপ চরিত্র চিত্রিত করিয়া। প্রথমোক্ত কার্য্য সমালোচকের, দ্বিতীয় কার্য্য কবির। সমালোচক বিষয়ের ঔচিত্য এবং অনৌচিত্য বিচার করেন, ভাবের পৌর্ব্বাপর্য্য, মাত্রা, অনুপাত এবং যোগ্যতা অবধারণ করেন; আর কবি এই বিচার এবং অবধারণকে কঙ্কালস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাহার উপরে ভাষারূপ রক্তমাংসের সাহায্যে আপনার শক্তি এবং রুচির অনুরূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। অতএব সাহিত্যের শীর্ষভূষণস্বরূপ কাব্যের কথাই যদি চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, সমালোচনা এবং কাব্য পরস্পর বিরোধী নহে, বরং সমালোচনা কাব্যের পুরোবর্ত্তী সাহায্যকারী। সমালোচক হইলেই কবি হওয়া যায়, একথা মিথ্যা; কিন্তু কবিকে সমালোচক হইতেই হইবে, একথা নিতান্তই সত্য। "নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ" একথা সর্ব্বত্র সমান-ভাবে খাটে না। কবি ইচ্ছা করিলে, অবশ্য তাঁহার সৃষ্ট তিন হস্ত দীর্ঘ সূর্পনখাকে সাত শত যোজন দীর্ঘ নাসা অনায়াসে দিতে পারেন; কিন্তু সে কুৎসিত মূর্ত্তি দেখিবামাত্র লক্ষ্মণের তীক্ষ্ণবাণ তাহার নাসা ছেদন করিবে।

সমালোচন যখন কাব্যের শত্রু নহে, বরং একটা প্রবল সহায়, তখন ইহাকে কি আর অধিক কাল উপেক্ষা করা উচিত? বিধিব্যবস্থাশূন্য রাজ্য যেমন, সমালোচনাশূন্য সাহিত্য-সমাজ কি সেইরূপ নহে? সূত্র এবং দৃষ্টান্ত, এই দুইটির সাহায্যে সকলপ্রকার শিক্ষা সম্পাদিত হয়। সূত্র বিষয়টা বলিয়া দেয়, দৃষ্টান্ত তাহার অর্থ বিশদভাবে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেয়। সূত্র বুঝিয়া দৃষ্টান্ত দেখা ছিল প্রাচীন প্রথা, দৃষ্টান্ত দেখিয়া সূত্র বুঝা হইয়াছে নূতন প্রথা। জীবনধারণ যেমন আহারের উদ্দেশ্য, তৃপ্তিবোধ তাহার আনুসঙ্গিক মাত্র; সেইরূপ আমি মনে করি কাব্যাদির প্রধান উদ্দেশ্যই শিক্ষা, আনন্দবোধ তাহার আনুষঙ্গিক অবস্থামাত্র; সমালোচনই এই শিক্ষার সূত্র, কাব্যাদি ইহার দৃষ্টান্ত। অলঙ্কার-শাস্ত্র এই শিক্ষার

শৃঙ্খলাবদ্ধ সূত্র-সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। অলঙ্কার-শাস্ত্রের নাম লইতে আমি সঙ্কুচিত হইতেছি। হয়ত কেহ মনে করিতে পারেন, আমাদের অলঙ্কার-গ্রন্থ অনেক আছে, তাহাইত পর্য্যাপ্ত। আমি এই ভয়েই আদ্যোপান্ত সমালোচন-শব্দের ব্যবহার করিতেছি। আজ আমরা যাহাকে সমালোচনা বলিতেছি, কালে তাহাই বঙ্গভাষায় অলঙ্কার-শাস্ত্র হইবে। যে অলঙ্কার আছে, তাহা আমাদের দিদিমার অলঙ্কার, মার গায়ে তাহা খাটিবে না, আমাদের নবযৌবনা মার অঙ্গে সেই অলঙ্কারই শোভা পাইবে, কিন্তু শোভা দিতে পারিবে না। আমাদের স্বভাব-সুন্দরী মার অঙ্গেঅঙ্গে সৌন্দর্য্যরাশি উথলিয়া পড়িতেছে; এই নবীন দেহের নবীন অলঙ্কার জ্ঞান-বিজ্ঞানে গঠিত হইবে, প্রেমভক্তিতে বিধৌত হইবে, শক্তি-সৌন্দর্য্যে মার্জ্জিত হইবে, তবেত শোভা পাইবে? জগদম্বার কৃপায় আজ বাঙ্গালী জাতির উপরে জগতের চক্ষুঃ পড়িয়াছে; যদি আমরা যত্নের সহিত, ভক্তির সহিত প্রাণের সহিত, একাগ্রতার সহিত, ঠিক উপাসনার মত পবিত্র নিঃস্বার্থ ভাবের সহিত মাতৃভাষার জন্য খাটিয়া প্রাণপাত করিতে পারি, তবে একদিন আমাদের মাতৃভাষার সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য দেখিয়াও জগৎ চমৎকৃত এবং মোহিত হইবে। প্রকৃত সমালোচনা না থাকাতে আমাদের জাতীয় ক্ষতি কতটা হইতেছে, আমাদের শক্তির কিরূপ অপচয় হইতেছে, সেই সম্বন্ধে গোটাদুই কথা বলিলেই আমার বক্তব্যের উপসংহার হয়।

কাব্যাদি সুকুমার সাহিত্যের বোধ হয় একটা আকর্ষণ, একটা মাদকতা, একটা সম্মোহিনী এবং উন্মাদিনী শক্তি আছে; নতুবা এ ফুলে এত ভ্রমর জুটিবে কেন,—ইহার দিকে এত বালক-বৃদ্ধ ছুটিবে কেন? তরুণ হৃদয় ত স্বভাবতই সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিবার কিছুই নাই; কিন্তু অনেক স্থলে দেখা যায়, বৃদ্ধকে পর্য্যন্ত কাব্যানুরাগে গ্রাস করিয়া ফেলে। শিক্ষা নাই, শক্তি নাই, কিন্তু অনুরাগে পাগল। সংসারের কত ক্ষতি হইয়া যাইতেছে, হয়ত অন্নাভাবও আছে; কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই, নিয়ত কাগজ-কলম লইয়া কবিতার ভাঙ্গন-গড়নে ব্যস্ত, নিজের রচনা উচ্চৈঃস্বরে পুনঃপুনঃ পাঠ করিয়া তাহারই মাধুর্য্যে বিভোর, তাহারই রসাস্বাদনে উন্মত্ত! কেহ সে রচনা শুনিতে চাহে না, তথাপি তাহাকে শুনাইতে হইবে; কেহ তাহাতে প্রশংসার কিছু পায় না, তথাপি তাহার মুখ দিয়া অন্ততঃ "বেশ হইতেছে" কথাটি বাহির করিতে হইবে। এ বিষয়ে অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই, রাজসাহীর নিকট স্বর্গীয় জয়নাথ বিশি মহাশয়ের নামোল্লেখই যথেষ্ট। স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত

মহাশয়ের কাব্যানুরাগ স্মরণ করিয়া পুঁঠিয়াবাসী অদ্যাপি আমোদ উপভোগ করিয়া থাকেন। এই সকল বৃদ্ধের কাব্যানুরাগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। কাব্যোপাসনায় যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা তাঁহারা নিজে পূর্ণমাত্রাতেই ভোগ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কতকগুলি অপরিহার্য্য ত্রুটির জন্য আমরা সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত। যাহা হউক, যাঁহাদের কর্ম্মলীলা শেষ হইয়া আসিয়াছে, এখন "হাতে বৈঠা ঘাটে না", কেবল নৌকায় চড়িয়া "বদর বদর" বলিয়া নৌকাখানি ছাড়িয়া দেওয়ার অপেক্ষা, তাঁহারা না হয় আপনার ভাবে ডুবিয়া, আপনার আনন্দে বিভোর হইয়া জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন কাটাইলেন, সমাজকে কিছু না দিলেন; কিন্তু যাহাদের শক্তি-সামর্থ্য, জ্ঞানগৌরব, কর্ম্মঠতা এবং উদ্যমশীলতার উপরে জাতীয় ভাগ্য নির্ভর করিতেছে, সেই সকল তরুণ যুবক যদি শিক্ষক এবং পথপ্রদর্শক না হইয়া, সাহিত্যের বিজ্ঞানস্বরূপ সমালোচনে অনভিজ্ঞ থাকিয়া, কেবল নিজের যত্ন, অনুরাগ এবং অপক্ক জ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্যে সুকুমার সাহিত্য লিখিতে থাকে, তবে তাহা অসার এবং অপাঠ্য ভিন্ন আর কি হইবে? অবশ্য বাঙ্গালীর সাহিত্য-ভাণ্ডারে এখন অনেকগুলি আদর্শ গ্রন্থও জমিয়াছে এবং তাহা যত্নের সহিত পাঠ করিলে নূতন লেখকদিগের প্রভূত উপকারও হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু সাহিত্যের বিজ্ঞানভাগ উপেক্ষা করিয়া কেবল আদর্শ গ্রন্থ পড়িয়া গ্রন্থপ্রণয়ন করিলে, বড় জোর তাহা সেই উৎকৃষ্ট গ্রন্থের অপকৃষ্ট অনুকরণমাত্র হইতে পারে; কিন্তু ইহাই কি তাহাদের চরম লক্ষ্য হইবে? বর্ত্তমান যাহা আছে, যথা-কালে তাহার উপরে যদি তাহারা না উঠিল, ভাষায়, ভাবে, সৌন্দর্য্যে এবং উদ্ভাবনী ও উদ্বোধিনী শক্তিতে বর্ত্তমানকে যদি তাহারা অতিক্রম করিতে না পারিল, তবে ভবিষ্যতে বঙ্গভাষা সমৃদ্ধি-শালিনী হইবে, বঙ্গীয় সাহিত্য বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিবে, এ আশা কেমন করিয়া করিব? বাঙ্গালী ভবিষ্যতে মাতৃ-ভাষার যে বিচিত্র এবং উন্নত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবে, তাহার ভিত্তিভূমির অতি নিম্নস্তরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়াও, যাঁহারা সেই গৌরব-পুঞ্জ পৃষ্ঠে বহন করিবার অধিকার পাইবেন, তাঁহারাও ধন্য, তাঁহারাও পূণ্যবান্।

এই উৎসাহী যুবকেরা যাহাতে সাহিত্য-সেবায় কৃতকার্য্য হইতে পারে, তাহার সুযোগ-দান এবং উপায় নির্দ্ধারণ সাহিত্যের বর্ত্তমান মহারথীদিগের চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা আছে কিনা জানি না—নাই বলিয়াই বোধ হয়; না থাকিলে অনতিবিলম্বেই কোনরূপ ব্যবস্থা করা একান্ত সঙ্গত। অতি নগণ্য বস্তুরও অপব্যয়-নিবারণ বর্ত্তমান যুগের একটা প্রধান লক্ষণ। ছেঁড়া ন্যাকড়া,

ভাঙ্গা বোতল, পরিত্যক্ত কেশনখ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান সভ্যতা কত বিলাসের উপকরণ নির্ম্মাণ করিতেছে; আর আমাদের উৎসাহী যুবকদিগের অমূল্য সময় এবং শক্তি এইভাবে বিনষ্ট হইতে থাকিবে, ইহা ভাবিতেও যে হৃদয়ে যন্ত্রণা বোধ হয়।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী।

নবীনচন্দ্র।

একি নিদারুণ বার্ত্তা—একি শুনি আজি—
আঁধারিয়া বঙ্গভূমি গিয়াছেন চলি'
বঙ্গের প্রোজ্জ্বল রত্ন কবিচূড়ামণি,
মনস্বী নবীনচন্দ্র চিরপুণ্যধামে;
পুণ্যবতী জননীর পুত্র পুণ্যবান;—
চট্টলগৌরববরবি চিরঅস্তাচলে!

দুঃখিনী বঙ্গ-জননী অপাঙ্গে ঝরিল
শোকাশ্রু,—স্মরি' সে সুকৃতী কবীশ-কীর্ত্তি;—
যাঁর কাব্যরাজি মাঝে স্ফুরিছে সতত
উচ্ছ্বসিত বিশ্বপ্রেম অমিয় নির্ঝর,—
পরিপ্লুত করি'নিত্য পূত বঙ্গভাষা,
বঙ্গনরনারী হৃদে স্থাপিতে যতনে,
সুবিশাল ধর্ম্মরাজ্য—ত্রিদিব দুর্ল্লভ;—
নিশান্ত চন্দ্রমা সম ম্লান যার কাছে
স্বরাজ, স্বদেশপ্রেম—উদার, মহৎ।

বাণী আর কমলার পুত্র প্রিয়তম
তুমি হে নবীনচন্দ্র! প্রবীণ বয়সে
সাধিয়া কর্ত্তব্য এই কর্ম্মক্ষেত্র হ'তে,
পুণ্যালোক দীপ্ত মহাপ্রয়াণের পথে
চলিলে গৌরবে—ত্যজি জীর্ণবাস সম
রোগ-শোক-জরাভরা এ দেহ নির্ম্মোক;—
ডুবায়ে আত্মীয় জনে শোক-পারাবারে।

নবীন অতিথিরূপে এবে দিব্যধামে
বিরাজিছ অমরায়। হে প্রবীণ কবি,
সর্ব্বশোক-নিবারণ শান্তি-প্রস্রবণ
নারায়ণ পাদপদ্মে অর্পিয়া জীবন—
গুঞ্জনিছ কৃষ্ণনাম সুখে ভক্তিমান।

আর শোকসমাচ্ছন্ন হৃদয়ে আমরা,
তোমার পবিত্রস্মৃতি প্রতিভাচরণে
শ্রদ্ধায় দিতেছি অর্ঘ্য ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি
এ শোকের শান্তি তরে তোমার উদ্দেশে ;—
হে অমর কবিবর এ মর জগতে।

শোক ? কেন, কিসের এ শোক ? তুমি পুণ্যবান,
—চির পুণ্যবান যথা কাশীরাম দাস—
শুনালে ভারত-গাথা সুধা-নিস্যন্দিনী।
মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝেছিলে হৃদয়-হৃদয়ে
মহাভারতের ধর্ম্ম বিশ্ব-প্রেমময় !
শোণিতের সহ তব এই ধর্ম্মনীতি
হয়েছিল প্রবাহিত শিরায় শিরায় !
এই ধর্ম্ম সেধেছিল—বুঝেছিলে তুমি—
আর্য্য অনার্য্যের শুভ মহাসম্মিলন ;
এ মিলন—সমগ্র মানব সহ এই
ধরাধামে ধাবিত প্রেমের পথে—উচ্চ
হতে অতি উচ্চে—জ্ঞানবুদ্ধি অগোচরে।
সকল ধর্ম্মের ভিত্তি অবতার-বাদ—
যুগে যুগে জন্মি' প্রভু দুষ্কৃতে বিনাশি'
পরিত্রাণি' সাধু,—ধর্ম্ম স্থাপেন মহীতে।
প্রাণের উচ্ছ্বাসে তাই হে অমর কবি,
সুভক্তি-বিহ্বল-চিত্তে তন্ময় হৃদয়ে
যে অমর গীত তুমি 'অমিতাভে' স্মরি'
গেয়েছিলে মুক্তাছত্রে রয়েছে প্রকাশঃ—

"যাও দেব লীলা শেষ। এসেছিলে তুমি
"একবার যমুনার তীরে পুণ্যবতী ;
"দেখিয়াছি সেই লীলা কোমল-কঠোর।
"আসিলে আবার তুমি কপিল নগরে
"শৈলপতি হিমাদ্রির পুণ্য পাদমূলে
"দেখিলাম এই লীলা আত্মবিসর্জ্জন
"রাজপুত্র মহাযোগী। আসিলে আবার
"সরল মানব শিশু জর্দ্দানের তীরে,
"দেখিয়াছি সেই লীলা আত্ম বলিদান !
"আরবের মরুভূমে—অমৃত নির্ঝর
"আবার আসিলে তুমি—নাহি ভাগ্য মম
"দেখিব সে লীলা তব। আসিয়া আবার
"পতিতপাবনী তীরে পতিতপাবন
"পাষাণ করিলে দ্রব প্রেমঅশ্রুজলে ;
"ভাসি' প্রেম-অশ্রুজলে বড় সাধ মনে
"দেখিবে কাঙ্গাল কবি সে লীলা করুণ
"প্রেমময় এই আশা করিও পূরণ।"

সিদ্ধ এ প্রার্থনা তব আজি সিদ্ধকাম,
পূর্ণ এ নিষ্কাম আশা। ভকতবৎসল,
নিয়েছেন ক্রোড়ে তুলি' প্রেম-আলিঙ্গনে
হে ভক্তপ্রবর কবি ভবলীলা শেষে,
পরিতৃপ্ত আত্মা তব দয়ালপরশে।
দুর্ভাগা আমরা হায়, হে অমর কবি,
তোমার মধুর কণ্ঠে নারিনু শুনিতে
প্রেমময় সে গৌরাঙ্গ-লীলা সকরুণ—
প্লাবিত ভারত যাঁর প্রেমের বন্যায়।

হে মুক্ত আরাধ্য দেব, তবু দুঃখ নাই ;
রেখে গেছ তুমি মহাভারত-জলধি
মথিয়া যে সুধারাশি, বঙ্গবাসী তরে—

"রৈবতকে," "কুরুক্ষেত্রে," "প্রভাসে" উদ্ভাসি'
সেই বিশ্বপ্রেমামৃত কণামাত্র যেবা
পিবে ভক্তি পাত্রে—হবে ধন্য চিরতরে
সেই নরকুলে। লভি' মানবত্ব, হবে
নরোত্তম, নির্ব্বিকার—অমরবাঞ্ছিত।
ধন্য হে প্রণম্য কবি, হে ভক্ত নিষ্কাম,
তব হরিনামে ব্যাপ্ত হোক্ শান্তিধাম।*

শ্রীরসময় লাহা। ১৫ মাঘ ১৩১৫

শিখ-বীর।

বীরবর বাবা বৈরাগী বান্দা প্রতিহিংসার অন্যায় বশবর্ত্তী হইয়া পঞ্জাবে যে সকল অকার্য্য সংঘটন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে শিখ-সমাজ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়। তুর্ক-সমাজের প্রতি তাঁহার আচরণ সর্ব্বথা সমর্থন-যোগ্য না হইলেও তৎসময়োচিত বলিয়া মার্জ্জনীয় সন্দেহ নাই। যে সময় তুর্কেরা ক্ষমতামদে মত্ত হইয়া হিন্দু-প্রজার জাতিধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য নানারূপ অন্যায় উপায় অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, সেই সময় যদি কোন হিন্দু ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া সেই পাপ তুর্ক-শক্তি চূর্ণ করিবার জন্য অকাণ্ডও করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাকে নিতান্ত নিন্দা করা যায় না। যে শান্ত, যে ধীর, শান্ত ব্যবহার তাহারই সহিত শোভা পায়; কিন্তু যে দুর্দ্দান্ত ও দুর্বিনীত এবং আত্মশক্তিতে মোহাচ্ছন্ন, তাহাকে বশীভূত করিতে হইলে,—তাহার গর্ব্ব নষ্ট করিতে হইলে, শান্ত ব্যবহার অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও ভুলিতে হইবে, তাহারই মত দুর্দ্দান্ত ব্যবহারে তাহাকে ত্রস্ত ও বিনীত করিয়া তুলিতে হইবে। যে যেমন, তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহারই যথার্থ শোভা পায়।

মোগলের পুনঃ পুনঃ চেষ্টা প্রতিহত করিয়াও যখন এই শিখবীর ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে তুরাণী-বীর আব্দুল সম্মদের শক্তির নিকট মস্তক নত করিতে বাধ্য হয়েন, তখন তাঁহাদের সহিত অসংখ্য শিখসৈন্যও ধৃত হইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দী-

* রামমোহন লাইব্রেরী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের শোক-সভায় লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

ভাবে দিল্লীতে প্রেরিত হয়েন। সেই বীরসৈন্যগণের আত্মদান-কাহিনীতে শিখ-ইতিহাস সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। যখন তাঁহারা মোগলের প্রলোভনময় সুখৈশ্বর্য্য-প্রদায়ী ইসলাম-ধর্ম্ম উপেক্ষা করতঃ আপনার ধর্ম্মবিশ্বাস অটল রাখিয়া যন্ত্রণাময় মৃত্যুকে বরণ করিয়া লয়েন, তখন মুগ্ধ তুর্কেরাও তাঁহাদের সে আত্ম-দান দর্শনে স্তম্ভিত হইয়াছিল।

এই শিখ-বন্দীগণের সঙ্গে চতুর্দ্দশ বর্ষীয় এক বালকও ধৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম আজ বিস্মৃতির তমোময় গর্ভে নিমজ্জিত; কিন্তু কীর্ত্তিই যাঁহার অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া সকলের শ্রদ্ধাকর্ষণ করে, তাঁহার নাম-বিস্মৃতিতে আসিয়া যায় কি?

একমাত্র জননী ব্যতীত বালকের আর কেহই ছিল না। বালক মাতার 'অন্ধের যষ্টি' ছিলেন। স্নেহময়ী মাতা এই পুত্র হইতে কত সুখৈশ্বর্য্যের আশা করিতেন; কিন্তু বিধির আশ্চর্য্য বিধানে তাঁহার সে স্নেহাকাঙ্ক্ষা সম্পূরণের পথে এক প্রবল বিঘ্ন উপস্থিত হইল। দেশরক্ষা করিতে যাইয়া বালক তুর্ক-হস্তে ধৃত হইলেন। মার কোমল প্রাণ তাহাতে কাঁদিয়া উঠিল; কিন্তু বীরমাতা তাহা নীরবে সহ্য করিলেন। তাঁহার আশা ছিল, মোগল-রাজ বালকের অর্ব্বা-চীনত্ব স্মরণ করিয়া তাঁহাকে ক্ষমা ও মুক্তি-দান করিবেন; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই যখন রাজ্যবাসী স্থিরকর্ণে শুনিতে পাইল যে, প্রতিদিন শতসংখ্যক শিখের মুণ্ড রাজার রক্ত-পিপাসা শান্তির জন্য ভূলুণ্ঠিত হইতেছে, তখন আর মাতা স্থির থাকিতে পারিলেন না, রমণী-সুলভ কাতরতায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। পুত্রের সংবাদ পাইবার জন্য এবং সম্ভব হইলে যে কোন উপায়েই হউক তাঁহাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে শিখমাতা উন্মাদিনীর ন্যায় দিল্লীযাত্রা করিলেন। যে দিবস বালকের মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সেইদিন প্রত্যুষে মাতা দিল্লী উপস্থিত হইলেন। কারাগারের দ্বারদেশে আসিয়া তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার স্নেহের পুত্রের সহিত দেখা করিবার জন্য তিনি দ্বারপালদের কত অনুনয়-বিনয় করিলেন; কিন্তু সে দ্বার ভিখারিণীর কাতর-ক্রন্দনে উন্মুক্ত হইল না। দ্বারপালেরা তাঁহাকে তাড়াইয়া দিল। কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি তথা হইতে সরিয়া গেলেন। শিখদিগের বধ্য-ভূমিতে উপস্থিত হইয়া মাতা প্রিয় সন্তানের আগমন অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন।

কিয়ৎকাল পরে প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া তাঁহার সেই প্রিয়পুত্র বধ্যভূমিতে

নীত হইলেন। ভীষণ মৃত্যুকথা স্মরণ করিয়াও বালক কিছুমাত্র বিচলিত হয়েন নাই। তাঁহার মূর্ত্তি প্রশান্ত ও হাস্যময়। এ বিপদে যেন তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই। সর্ব্বমঙ্গলময় গুরুর জয় গাহিতে গাহিতে অম্লানবদনে বীর মোগলের উন্মুক্ত কৃপাণের তলে মাথা পাতিয়া দিলেন। মোগল সে পূত মুণ্ড ছেদন করিবার জন্য তাহার রক্ত-লোলুপ অসি উত্তোলন করিল।

মাতা আর থাকিতে পারিলেন না; এক বিকট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সে চীৎকারে উপস্থিত জনসঙ্ঘ হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। সকলের দৃষ্টি সেই কাতর মাতার প্রতি আকৃষ্ট হইল। ঘাতকের অসিও তাহার হস্তেই রহিয়া গেল। মাতা নিকটস্থ কোন রাজকর্ম্মচারীর নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে সন্তানের জীবনভিক্ষা করিতেছেন;—তাহাকে বুঝাইতেছেন,—"ওগো, আমার ছেলে শিখ নয় গো! তোমরা উহাকে মারিও না। কয়েকজন দুষ্ট লোকে উহাকে ভুলাইয়া শিখ-দলে ঢুকাইয়াছে। ও প্রকৃত শিখ নয়। তোমরা উহাকে মারিও না। উহাকে ছাড়িয়া দাও।"

রাজকর্ম্মচারীর ইঙ্গিতে ঘাতকের অসি স্বকার্য্যসাধনে বিরত হইল। জনসঙ্ঘ অবাক্ হইয়া সে দৃশ্য দেখিতে লাগিল। কেহই কারণ কি ভাল বুঝিল না।

অচিরাৎ মোগলরাজের নিকট এই সংবাদ প্রেরিত হইল। রাজা রমণীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রমণী রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া কাতর ক্রন্দনে তাঁহার প্রাণ সিক্ত করিয়া তুলিলেন, তাঁহাকেও বুঝাইয়া দিলেন, তাঁহার সন্তান প্রকৃত শিখ নহে।

রাজা ফিরুখশিয়র তখন স্বয়ং সেই বধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া, সেই 'ভণ্ড' শিখকে মুক্ত করিবায় জন্য ঘাতককে আদেশ করিলেন। ঘাতক রাজাজ্ঞায় তাঁহাকে মুক্ত করিয়া বধ্যভূমি হইতে দূর করিয়া দিল। এরূপ অভাবনীয় কাণ্ডে বালক বিস্মিত হইয়া গেলেন, বুঝিতে পারিলেন না, কোন্ দোষে তিনি আজ ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতেও অধিকারী নহেন, কোন্ অজ্ঞাত পাপে আজ তাঁহাকে এরূপ বাঞ্ছনীয় মৃত্যুর দ্বার হইতে ফিরিয়া যাইতে হইল। বালক কাতরকণ্ঠে উপস্থিত রাজকর্ম্মচারীদের জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি এমন কি পাপ করিয়াছি যে, তোমরা আমাকে ধর্ম্মের জন্য মরিতে দিলে না? আমার জীবনের সকল আশা নষ্ট করিয়া দিলে!" বালকের সে কাতর ক্রন্দন শুনিয়া রাজা তীব্রস্বরে উত্তর করিলেন,—"বালক! তুমি নিতান্তই মূর্খ, নিতান্তই নির্ব্বোধ! তোমার মা বলিতেছেন যে, তুমি গুরুর শিষ্য শিখ নও। ঐসব হতভাগ্য কাফের

তোমায় উহাদিগের সহিত যোগ দিবার জন্য প্রলুব্ধ করিয়াছিল। সেইজন্যই আমরা তোমায় জীবনদান ও মুক্তি দিলাম। নির্দ্দোষের রক্তপাতে আমাদের ইচ্ছা নাই। যাও, মাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা কর। তিনি তোমাকে বুকে করিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছেন।"

রাজ-বাক্যে বালকের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"যে বলে আমি শিখ নহি, সে মিথ্যাবাদী। পুত্রস্নেহে অন্ধ হইয়া মা আমার ন্যায়ান্যায় ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি সত্য গোপন করিয়া আমায় বাঁচাইতে চাহেন; কিন্তু তাহা কখনই হইবে না। আমি সর্ব্বসমক্ষে ঘোষণা করিতেছি যে আমি শিখ, আমি—এই ভাগ্যহীনা মাতৃভূমির উদ্ধারকর্ত্তা ও তোমার ন্যায় অত্যাচারী ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তিদের নিধন-প্রয়াসী গুরুগোবিন্দ সিংহের প্রকৃত সন্তান। আমাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্রে আছে—আত্মা অমর এবং মৃত্যু কেবল দেহ-পরিবর্ত্তন মাত্র। মৃত্যুকে ভয় করা নিতান্ত কাপুরুষোচিত। আমি কাপুরুষ নহি। আমি আমার সঙ্গীদের ভাগ্য সমভাবে ভোগ করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত।"

এই বীরোচিত বাক্য বলিতে বলিতে বালক পুনরায় বধ্যভূমিতে ফিরিয়া গেলেন ও ঘাতকের নিকট মাথা পাতিয়া দিলেন। বালকের এই শিখ-সুলভ উত্তর শুনিয়া দর্শকমণ্ডলী বিস্মিত হইয়া গেল ও ভয়-ভক্তির সহিত সেই বালকের পানে চাহিয়া রহিল। মোগলরাজ ফিরুখশিয়রও অবাক্ হইয়া গেলেন। শিখ-বালকের তেজস্বিতা দেখিয়া তাঁহার ভয়-প্রবণ প্রাণ স্বতঃই কেমন কাঁপিয়া উঠিল। যখন ঘাতক পুনরাদেশের জন্য আবেদন করিল, তখন রাজা ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—"এই বালককে হত্যা করিতে আমি নিতান্তই অনিচ্ছুক। তাহার সাহস ও বীরত্ব আমাকে তাহার জীবনদান করিতে উত্তেজিত করিতেছে; কিন্তু আমি আমার কথার অন্যথা করিতে পারি না। দেশের সমস্ত শিখদের একেবারে মূলচ্ছেদ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। কাজেই আমাকে এই নির্ব্বোধ ও অবিবেচক বালককে হত্যা করিতে হইতেছে।"

অত্যাচারী রাজার মুখ হইতে আদেশবাক্য নিঃসৃত হইতে না হইতে নিষ্ঠুর ঘাতকের তৃষিত করাল কৃপাণ বালকের ক্ষীণকণ্ঠে পতিত হইল। বালক জগতে এক মহান্ আদর্শ রাখিয়া অনন্তধামে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সে স্বেচ্ছাকৃত আত্মত্যাগে শিখ-সমাজ ও ভারতবর্ষ গৌরবময় হইয়া উঠিল।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

উদ্ভিদের আহার।

প্রয়োজনীয় চলিত কথাগুলার মাঝে মাঝে পুনরুক্তি প্রার্থনীয়। উদ্ভিজ্জ-জীবনের কথার চেয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় কথা খুব কমই থাকিতে পারে। কারণ আমরা, বাঙ্গালীরা যে, যে অবস্থারই লোক হউক না কেন, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষিজীবী লোক। কৃষি ব্যতীত বাঙ্গালার অর্থাগমের আর কোনও উপায় নাই বলিলেও হয়। অতএব কৃষিকার্য্য-সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই কিছু না কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

জ্ঞান সাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হইলে উপকার। কৃষিবিদ্যা শিখিয়া যাহাকে ডেপুটী-মাজিষ্টরী করিতে হয়—বা উদ্ভিদ্-বিদ্যায় এম, এ, পাশ করিয়া যাহাকে কেরাণীগিরি করিতে হয়, তাহাদের একগাড়ি জ্ঞানের বোঝাতেও দেশের যে কল্যাণ না হইবে, যাহাকে নিজে দশ বিঘা জমির চাষের তত্ত্বাবধান করিতে হয়, কিম্বা যাহার পরীক্ষা করিবার উপযোগী সময় ও অর্থ এবং বাগান বা চাষের জমি আছে—তাহাদের অল্পজ্ঞানও পরীক্ষাসিদ্ধ হইয়া দেশের বহুবিধ উপকার-সাধনে সমর্থ হইবে।

আমাদের দেশে জমির উর্ব্বরতা শক্তি কমিয়া যাইতেছে, বৃদ্ধলোকদিগের নিকট শুনা যায়—যে আগে যেমন জমির ফলন ছিল, এখন আর সেরূপ ফলন নাই। আগেকার আম, ধান, বা অন্যান্য শস্য যেরূপ বড় হইত, এখন আর সেরূপ বড় হয় না, এখনকার আম গাছ আর আগের গাছের মত বেশী ফল দেয় না। এরকম বিলাপ বোধ হয় সকলেই শুনিয়া থাকিবেন। ভূমির এই অনুর্ব্বরতার কারণ কি? কারণ এই যে, এদেশের মানুষগুলার ন্যায় এদেশের উদ্ভিদ্‌গুলারও আহারের কষ্ট হইয়াছে।

আমাদের দেশে দিন দিন ভূমির এরূপ অবনতি হইলেও অন্যান্য সভ্যদেশের ভূমির কিন্তু অবনতি হয় নাই—বরং অনেক স্থলে তাহাদের উর্ব্বরতা বৃদ্ধিই পাইয়াছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা আদি সকল স্থানের জমিই এখানকার জমি হইতে অধিকতর উর্ব্বরা। আমাদের একজন ইউরোপীয় অধ্যাপক বলিয়াছিলেন যে, এদেশের জমির চেয়ে বিলাতের জমিতে অনেক বেশী ফসল পাওয়া যায়।

প্রাণিদিগের জীবনধারণের জন্য যেমন বায়ু, জল ও আহার্য্যের প্রয়োজন—

উদ্ভিদ্‌দিগেরও জীবনধারণের জন্য তেমনই বায়ু, জল ও আহার্য্যের প্রয়োজন। জীবগণ নিশ্বাসের দ্বারা বায়ুমণ্ডলস্থ অক্সিজেন গ্যাস গ্রহণ করে ও প্রশ্বাসের দ্বারা কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে শরীর হইতে বিদূরিত করিয়া দেয়। উদ্ভিদগণও প্রাণিদিগের ন্যায় বায়ুমণ্ডল হইতে অক্সিজেন গ্যাস গ্রহণ করে ও উহাতে কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস পরিত্যাগ করে। যে পদার্থ প্রাণের বাস্তব আধার—যাহা উদ্ভিদ ও জীব উভয় দেহেই স্থূলতঃ একবিধ পদার্থ; তাহা অক্সিজেনের অভাবে জীবনধারণ করিতে সমর্থ নহে। এই পরম পদার্থের মধ্যে প্রতিনিয়ত যে সকল রাসায়নিক ক্রিয়া, ইহার অন্তর্ভুক্ত কণা সমূহের যে বিবিধ ঘূর্ণন ক্রিয়া সংঘটিত হইতেছে, যে সমুদায় বিচিত্র ক্রিয়ার ফলকেই আমরা "জীবনীক্রিয়া" বলিয়া অভিহিত করি; সেই সমস্ত ক্রিয়াই অক্সিজেনের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয় এবং অক্সিজেনের অভাবেই বিলুপ্ত হইয়া যায়; কাজেই প্রাণও তাহার বাস্তব নিবাস পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে।

জীবের ন্যায় উদ্ভিজ্জ-জীবনের পক্ষে পরম প্রয়োজনীয় দ্বিতীয় পদার্থটী জল। যে পদার্থ প্রাণের বাস্তব আধার, সেই "প্রোটোপ্লাসম" জলের দ্বারা ওতপ্রোতভাবে পূর্ণ; জলের অভাবে জীবনের অস্তিত্ব অসম্ভব। উদ্ভিদের পক্ষে জলের প্রয়োজন আরও অধিক। উদ্ভিদের "প্রোটোপ্লাসম" জল হইতেই নিজের খাদ্য সংগ্রহ করে—জল হইতেই ইহা তাহার অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং জলেতেই ইহা নিজ দেহোৎপন্ন মলস্বরূপ কাজেই বিষবৎ পরিত্যজ্য কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস পরিত্যাগ করিয়া নিজ দেহের গ্লানি বিদূরিত করে।

জীবের ন্যায় উদ্ভিদেরও জীবনধারণার্থ তৃতীয় প্রয়োজনীয় পদার্থ আহার্য্য-দ্রব্য। জীব ও উদ্ভিজ্জদেহ যে বিবিধ জীবনী ক্রিয়ার ফলে নিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, আহার্য্য সামগ্রীর দ্বারা সেই ক্ষতি পূরণ হইলেই—তবে জীবনীক্রিয়ার স্থায়িত্ব সম্পাদন হইতে পারে।

সর্ব্ববিধ সজীব পদার্থের খাদ্য তিনশ্রেণীতে বিভক্ত—(১ম) প্রটীড—ডিম্বের শ্বেতাংশ সদৃশ পদার্থ (২য়) Carbohydrate শ্বেতসার বা চিনিসদৃশ পদার্থ (৩য়) তৈলময় পদার্থ। প্রথম শ্রেণীর পদার্থ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় কারণ "প্রোটোপ্লাসম" বা প্রাণ-পদার্থ প্রধানতঃ উহা দ্বারাই সংগঠিত হয়। অন্য দুই শ্রেণীর পদার্থও প্রয়োজনীয়; কারণ উহাদের অভাবেও অধিক দিন জীবনধারণ করা অসম্ভব। পূর্ব্বোক্ত খাদ্যসমূহ যে সকল মৌলিক পদার্থের সমবায়ে প্রস্তুত, সে সকল মূল পদার্থ জগতে প্রচুর পরিমাণে আছে; কিন্তু এমন ভাবে আছে,

যে তদ্বারা জীবের আহার্য্যের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে কোনও সুবিধা হয় না। কার্ব্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার, ফস্‌ফরাস্ এই কয় পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে প্রটীড প্রস্তুত হয়। কার্ব্বন, হাইড্রোজন ও অক্সিজেনের সংযোগে শ্বেতসার সদৃশ পদার্থ ও তৈলময় পদার্থ প্রস্তুত হয়। বায়ু-মণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্ব্বন আছে। জলে হাই-ড্রোজেন ও অক্সিজেন আছে, মাটি ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্যে সালফার ফস্‌ফরাস্ আদি অপর মূল পদার্থসকল প্রচুর পরিমাণে আছে; কিন্তু এসকলের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও পৃথিবীতে এতলোক অনাহারে মরে কেন, আহারের নিমিত্ত জীবে জীবে ঘোর জীবনসংগ্রাম চলিয়াছে কেন? তাহার কারণ এই যে, জীব ঐ সকল পদার্থ নিজে ব্যবহার করিতে সমর্থ নহে। রাসায়নিক পণ্ডিতগণের সর্ব্বোচ্চ আশা এই যে, তাঁহারা কালে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা বায়ু, জল ও মৃত্তিকার মূল পদার্থগুলিকে পরস্পরের সহিত রাসায়নিক সংমিশ্রনে মিশাইয়া বিবিধ খাদ্য প্রস্তুত পূর্ব্বক পৃথিবীর লোকের বুভুক্ষা নিবারণ করিতে সমর্থ হইবেন, জগতে বিজ্ঞানের উন্নতি দ্বারা ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিবেন। যাহা হউক, যতদিন না তাঁহারা এবিষয়ে কৃতকার্য্য হইতেছেন, ততদিন যে আমাদিগকে বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট উপায়ের দ্বারাই জীবিকার্জ্জন করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই অর্থাৎ ততদিন উদ্ভিদ্‌সমূহকে জীবের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করিতে হইবে। দুর্ব্বল উদ্ভিদ্ নিজের বা নিজের সন্ততিবর্গের নিমিত্ত যে খাদ্যসম্ভার সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা প্রবল জীবের ভোগে আসিবে; পরে সেও আবার তাহার নিজের পালার সময় কোনও প্রবলতর জীবের আহার্য্যে পরিণত হইয়া জগতে জীবনসংগ্রামের ভীষণতার সাক্ষ্য দিবে। উদ্ভিদ কি প্রকারে সরল অজৈব (Simple Inorganic Compounds) পদার্থের সংমিশ্রনে খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহা উদ্ভিদ্-বিদ্যা-সংক্রান্ত অতি ক্ষুদ্র পুস্তকও যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই অবগত আছেন। সবুজ উদ্ভিদ্-সকল, নিজেদের সবুজ রং ও সূর্য্যরশ্মির সহায়তায় প্রথমতঃ বায়ুমণ্ডলস্থ কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড ও জলের রাসায়নিক সংমিশ্রন করিয়া চিনি প্রস্তুত করে। চিনি হইতে শ্বেতসার ও তৎসদৃশ অন্য পদার্থ সহজেই প্রস্তুত হয়। এইরূপ সমস্ত দিন ধরিয়া উদ্ভিদের সবুজ পত্রাবলী সূর্য্যকিরণ-সাহায্যে চিনি প্রস্তুত করিতে থাকে। উক্ত চিনির কিয়দংশ শ্বেতসারে পরিণত হয়। উদ্ভিজ্জ-জীবনের বাস্তব আধার পদার্থ প্রোটোপ্লাসম কিয়দংশ চিনির সহিত মৃত্তিকা হইতে প্রাপ্ত সোরা, সাল্‌ফেট, ফস্‌ফেট আদি পদার্থ মিশাইয়া প্রটীড প্রস্তুত করিতেছে।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়, যে আমরা জমি হইতে যে ফসল লই তাহার কিয়দংশ বায়ু হইতে, কিয়দংশ জল হইতে, এবং অপর কিছু অংশ জমির দেহ হইতে সংগৃহীত হয়। উদ্ভিদের খাদ্য-মীমাংসার মধ্যে বাতাসের কথা আমাদের ধরিবার প্রয়োজন নাই—কারণ এই মহোপকারী পদার্থ জগতে এত প্রচুর মাত্রায় আছে, যে আমরা ইহার অসংখ্যবিধ ব্যবহারের কথা ভাবি-বারই অবকাশ পাই না। বাতাস বাদ দিলে, আমাদের আর দুইটী বিষয় ভাবিবার থাকে। একটী জমিতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা আর অপরটী জমির যে অংশ প্রতিবর্ষ বাহির হইয়া যাইতেছে তাহার ক্ষতিপূরণ করা। পদার্থ কেহ গড়িতেও পারে না, কেহ নষ্ট করিতেও পারে না। অতএব জমির যে ক্ষতি হইতেছে, কোনও রূপে তাহার পূরণ হওয়া আবশ্যক, নচেৎ উহা অনুর্ব্বরা হইবে।

জমির এই ক্ষতিপূরণ দ্বিবিধ উপায়ে হইয়া থাকে। এক প্রকৃতির দ্বারা, অপর মানুষের দ্বারা। প্রকৃতির দ্বারা নিম্নলিখিত উপায়ে জমির ক্ষতিপূরণ হইয়া থাকে:—

(ক) বায়ুমণ্ডলে বজ্রাঘাত ও বিদ্যুৎপাত-সময়ে অক্সিজেন ও নাইট্রেজেন বায়ু দ্বয় মিলিত হইয়া নাইট্রিকঅক্সাইডে পরিণত হয়। উহা বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হইয়া জমিতে নীত হয় ও তত্রত্য নাইট্রেটের অংশ বৃদ্ধি করে।

(খ) নিকটস্থ বা দূরস্থ জমির প্রয়োজনীয় লবণাক্ত অংশ বৃষ্টি বা বন্যার জলে দ্রবীভূত হইয়া আসিয়া অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর জমির উৎকর্ষসাধন করে। এই হিসাবে নাবাল জমির সুবিধাটাই অধিক। কারণ তাহাতে উচ্চতর জমী সকলের ধোয়ানীর জল আসিয়া উপনীত হয়। তবে বন্যা হইয়া যখন দেশ ভাসিয়া যায়, তখন উচ্চ জমিও নাবাল জমী হইতে সার-সংগ্রহে সমর্থ হয়।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জমির সারের স্বভা-বতই কতকটা অপব্যবহার হইবেই; কারণ পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নস্থল সমুদ্র। জমী-ধোয়ানীর জল নদী প্রভৃতির দ্বারা সমুদ্রে আসিয়া উপনীত হইতেছে। সমু-দ্রের লবণ পদার্থ বাড়িতেছে; কিন্তু জমির প্রয়োজনীয় লবণ পদার্থ ক্রমশই কমিতেছে। সমুদ্রের জলে সাধারণ নূনের তুলনায় অন্য লবন পদার্থের মাত্রা এত কম, যে সমুদ্র হইতে ঐ সকল পদার্থের পুনরুদ্ধারের আশা অতীব ক্ষীণ। এস্থলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সাধারণ লবণ উদ্ভিজ্জজীবনের খুব কম ব্যবহারেই লাগে, সুধু তাই নহে, অধিক লবণ উদ্ভিদের পক্ষে বিষবৎ অপকারী।

লবণ ছাড়া নাইট্রেট, ফস্‌ফেট আদি যে সকল পদার্থ উদ্ভিজ্জজীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, সেই সকল পদার্থও যদি প্রচুর জলমিশ্র অবস্থায় উদ্ভিদের নিকট না প্রেরিত হয়, তবে উহারাও বিষবৎ অপকার করে। এইজন্যই অতিরিক্ত মাত্রায় সার দিবার ফলেও জমি মাঝে মাঝে খারাপ হইয়া যায়।

যে সকল ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় সার দেওয়া হইয়াছে অথবা যে জমিতে বেশী লবণ আছে, বৃষ্টির জল দিয়া ধৌত করিয়া সে জমির লবণের অংশ না কমাইতে পারিলে তাহাতে আর কোনও ফসল হইবে না। সুন্দরবনের লবনাক্ত জমি এইরূপে ধৌত করিয়া লবণহীন করা হয়, পরে উহা চাসের উপযোগী হয়। সেখানকার জমি ধৌত করিবার প্রণালী বেশ শিক্ষাপ্রদ। বন কাটিয়া জমি উদ্ধারের পর জমির চারিদিকে বাধ দেওয়া হয়—যাহাতে নদীর লোণা জল জমির মধ্যে আর প্রবেশ করিতে না পারে। বর্ষার সময় যখন ক্ষেত্র বৃষ্টির জলে পূর্ণ হয়, তখন একদিন ভাটার সময় বাধের কপাট খুলিয়া জমির জল নদীতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। জোয়ারের পূর্ব্বেই আবার বাধের কবাট বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ প্রত্যেক ধোয়ানিতে অনেকটা লবণ জমি হইতে বাহির হইয়া যায়। কয়েক বর্ষ এইরূপ ধোয়ার পর জমি লবণশূন্য হইয়া কৃষিকার্য্যের উপযোগী হয়।

(গ) স্বাভাবিক অবস্থায় জীব বা উদ্ভিদের দেহাবশেষ, বিষ্ঠামূত্রাদি জীবদেহ নির্গত পদার্থ জমিতে পরিত্যক্ত, পচিত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া মাটীর সহিত মিশ্রিত হয়। অর্দ্ধ সভ্যাবস্থায় যখন লোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে বাস করিত ও নিজের জমি চসিত, তখন এই উপায় দ্বারা জমির যথেষ্ট লাভ হইত। তৎকালীন লোকের বিষ্ঠামূত্রাদি—এমন কি দেহাবশেষ পর্য্যন্ত ভূমিতেই নিক্ষিপ্ত হইত। ফলে ভূমি হইতে তখন যাহা কিছু আদায় করা যাইত, তাহার সমস্ত না হউক অধিকাংশ অংশ ভূমিতেই প্রত্যর্পিত হইত। ভারতবর্ষের অনেক স্থানের জমি যে বহুসহস্র বর্ষ হইতে কৃষ্ট হইয়াও এখনো একবারে অনুর্ব্বরা হইয়া পড়ে নাই—তাহার কারণ এই যে, তখন এত অধিকসংখ্যক নগর সৃষ্ট হয় নাই এবং খাদ্য দ্রব্যাদি একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইবার প্রথাও সুপ্রশস্ত হয় নাই। এক্ষণে নগরে বহুলোক বাস করে, যে জমি তাহাদের খাদ্য উৎপাদন করে, তাহা হইতে বহুদূরে তাহাদের খাদ্যসামগ্রী নীত হয়। তাহাদের দেহাবশেষ, তাহাদের বিষ্ঠামূত্রাদি জমিতে আর প্রত্যর্পিত হইবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। ঐ সকল পদার্থ নিকটবর্ত্তী নদীতে প্রেরিত হয় এবং তথা হইতে উহা সমুদ্রে নীত

হয়; এইরূপে সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত প্রতি বৎসর কোটী কোটী মুদ্রার সার জলসাৎ হইয়া যাইতেছে।

(ঘ) পূর্ব্বোক্ত উপায়সকল ব্যতীত আর এক উপায়ে জমির নাইট্রোজেনের অংশ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে এই বিষয়ে পণ্ডিতগণের সবিশেষ লক্ষ্য পড়িয়াছে। প্রাচীন পণ্ডিতগণের ধারণা ছিল যে, শুধু রসায়নবিদ্যার চর্চ্চার দ্বারাই কৃষিকার্য্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সম্পূর্ণ হইবে; কিন্তু এক্ষণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদগণের প্রকৃতি আলোচনায় আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, শুধু জমির রাসায়নিক অভাব পূরণ করিয়াই আমরা উহাকে উর্ব্বরা করিতে পারি না। জমিতে আমরা যে সকল দৃশ্যমান বড় বড় উদ্ভিদের চাস করিয়া থাকি, সেই সকল উদ্ভিদ ব্যতীত অনেক অতি ক্ষুদ্র দৃশ্য বা অদৃশ্য উদ্ভিদ আমাদের আমন্ত্রণের অপেক্ষা না রাখিয়াই জমি অধিকার করিয়া উহা পুরুষানুক্রমে ভোগদখল করিয়া থাকে। এই সকল অযাচিত অতিথির কেহ কেহ আমাদের পরম উপকারী, আবার কেহ কেহ আমাদের পরম শত্রু। আয়র্লণ্ড দেশে মাঝে মাঝে যে আলুর পীড়া (Potato disceasc) উপস্থিত হইয়া দুর্ভিক্ষ সমুপস্থিত করে, তাহা অনেকে সংবাদপত্রাদিতে পড়িয়া থাকিবেন। একবিধ ছাতা (Fungus) এই পীড়ার জন্মদাতা, এই ছাতা আলুগাছগুলিকে আক্রমণ করিয়া তাহার রস-গ্রহণপূর্ব্বক নিজের দেহায়তন ও বংশ বৃদ্ধি করে। ইহাদের বীজসকল অতি সূক্ষ্ম, চর্ম্মচক্ষের অগোচর ও অত্যন্ত লঘু বলিয়া সহজেই স্থানান্তরিত হইতে পারে। যদি কৃষক দুর্ভাগ্যক্রমে সারের সহিত বা অন্য কোনও উপায়ে উক্ত ছাতার [Fungus) বীজ নিজের জমিতে লইয়া উপস্থিত হয়, তবে তাহার আর ভদ্রস্থতা নাই। কয়েকবর্ষ ধরিয়া তাহাকে আলুর আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইবে; কিন্তু এই সকল উদ্ভিজ্জপীড়া-উৎপাদনকারী "ছাতার" বিবরণ সংগ্রহে আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধে স্থানাভাব। যে সকল ক্ষুদ্র উদ্ভিদ আমাদের ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা সাধনপূর্ব্বক আমাদের অশেষ উপকার করিতেছে, আমরা এক্ষণে তাহাদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

(১) জমিতে অতি ক্ষুদ্র সবুজ শেওলা দেখা যায়। ইহারা অতি ক্ষুদ্র বলিয়া, তাহাদের সম্বন্ধে কিছু জানিবার ইচ্ছা আমাদের সহজে হয় না। আমরা তাহাদের বিষয়ে কিছু জানিবার জন্য ব্যগ্র হই বা না হই, তাহারা যে বায়ুমণ্ডলস্থ নাইট্রোজেন গ্রহণ করিয়া নিজেদের শরীর নির্ম্মানপূর্ব্বক পরোক্ষভাবে আমাদের উপকারসাধন করিতেছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। নাইট্রোজেন উদ্ভিদ্-জীবনের

পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ। উদ্ভিদ্‌দেহ যে সকল মূল পদার্থের সহযোগে গঠিত, তাহাদের মধ্যে কার্ব্বন হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন সর্ব্বপ্রধান। এই সকল পদার্থ উদ্ভিদ্-দেহে পর্য্যাপ্ত মাত্রায় পাওয়া যায়। এগুলি ব্যতীত আরও কতকগুলি মূলপদার্থ অল্পমাত্রায় উদ্ভিদ্-দেহে পাওয়া যায়। সেগুলির নাম যথা পোটাসিয়ম, গন্ধক, ফস্‌ফরাস, ক্যালসিয়ম ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম। এ পদার্থগুলির প্রয়োজন সামান্য মাত্রায় হইলেও, ইহাদিগকে নগণ্য জ্ঞান করা যায় না; কারণ ঐ সকল পদার্থের অভাবেও কোন উদ্ভিদ্ বাঁচিতে পারে না। প্রথম শ্রেণীর মূল পদার্থগুলির মধ্যে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও কার্ব্বন এই তিনটী মূল পদার্থ উদ্ভিদ, বায়ু ও জল হইতে গ্রহণ করে। নাইট্রোজেন নামক মূল পদার্থ বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও (কারণ বায়ুমণ্ডলের ৪ ভাগ নাইট্রোজেন ও ১ ভাগ অক্সিজেন) বায়ুমণ্ডলস্থ এই বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন উদ্ভিদের কোনও কাজে আসে না। যেমন অনন্ত জলময় সমুদ্রের মধ্যে অবস্থান করিয়াও লোকে জলাভাবে প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তদ্রূপ অনন্ত নাইট্রোজেনের সাগরের দ্বারা আবৃত হইয়াও উদ্ভিদ যদি নাইট্রোজেন-যুক্ত রাসায়নিক পদার্থ না পায়, তবে তাহাকেও প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ক্ষুদ্র শেওলা ও ক্ষুদ্রতর উদ্ভিজ্জাণুগণ, যাহারা বায়ুমণ্ডলস্থ মৌলিক পদার্থ নাইট্রোজেনকে উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী রাসায়নিক পদার্থে পরিণত করিতেছে, তাহাদের কার্য্য উপেক্ষার যোগ্য নহে। ব্যাক্টিরিয়া বা উদ্ভিজ্জাণুগণের মধ্যে কতকগুলি বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন আহরণ করিতেছে। আর অপর কতকগুলি ব্যাক্টিরিয়া, বিষ্ঠামূত্র এবং জীব ও উদ্ভিদের দেহাবশেষস্থ জটিল নাইট্রোজেনময় জৈব পদার্থকে ভাঙ্গিয়া বড় বড় উদ্ভিদের উপযোগী নাইট্রেটে পরিণত করিতেছে। বড় বড় উদ্ভিদ্ সকলরকম নাইট্রোজেন-যুক্ত রাসায়নিক পদার্থও ব্যবহার করিতে সমর্থ নহে। অতএব দেখা যাইতেছে, যে, যে জমিতে উক্তরূপ নাইট্রোজেন ব্যাক্টিরিয়ার অভাব আছে, তাহাতে প্রচুর সার দিয়াও বিশেষ কোন ফললাভ হইবে না; কারণ সে সার বড় উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী হইবে না।

পূর্ব্বোক্ত ব্যাক্টিরিয়াসমূহ ব্যতীত মটর জাতীয় বৃক্ষের মূলদেশ-নিবাসী এক-জাতীয় ব্যাক্টিরিয়া বায়ুমণ্ডলস্থ নাইট্রোজেনকে সাররূপে পরিণত করিবার পক্ষে একান্ত উপযোগী। জমিতে চিরকাল ধান-গোধূমাদি ফসল না দিয়া যদি উহাতে মাঝে মাঝে মটর, কলাই, মুগ, ছোলা বা ধঞ্চে জাতীয় ফসল দেওয়া

হয়, তবে জমির উর্ব্বরতাশক্তি যে বর্দ্ধিত হয় তাহা বহুকাল হইতেই জানা ছিল বর্ত্তমান কালে উক্ত ঘটনার কারণ অবগত হওয়া গিয়াছে এবং পণ্ডিতগণের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট হইয়া এসম্বন্ধে বহুল পরীক্ষা হইয়াছে ও হইতেছে। এই সকল পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে, মটরজাতীয় উদ্ভিদের মূলে মুসুরের মত এক প্রকার ছোট ছোট গুটী থাকে। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা উক্ত গুটী পরীক্ষা করিয়া দেখিলে উহাতে বহুতর ব্যাক্টিরিয়ার অস্তিত্ব দেখা যায়। এই সকল ব্যাক্টিরিয়াই জমির উর্ব্বরতাশক্তি-বৃদ্ধির কারণ। বালুকাময় ভূমিকে নাইট্রোজেনময় রাসায়নিক পদার্থ-শূণ্য করিয়া, তথায় মটরজাতীয় বৃক্ষের চাস করায় দেখা গিয়াছে যে, ভূমিতে নাইট্রোজেনের অভাব সত্ত্বেও মটর গাছের বৃদ্ধির কোনও ব্যত্যয় হয় নাই—মটর গাছ ও তদুৎপন্ন মটর-ফলে যেরূপ নাইট্রোজেনের অংশ পাওয়া উচিৎ তাহা পাওয়া গিয়াছে। সুধু তাহাই নহে, যে জমিতে উক্ত গাছের চাস করা গিয়াছিল; যাহাতে চাসের পূর্ব্বে নাইট্রোজেন পদার্থের লেশমাত্রও ছিল না, তাহাতে এক্ষণে পর্য্যাপ্ত মাত্রায় নাইট্রোজেন পাওয়া যাইবে; কিন্তু পূর্ব্বের পরীক্ষা আরম্ভ করিবার আগে যদি জমি ও মটরের গাত্রসংলগ্ন যাবতীয় ব্যাক্টিরিয়া ও তাহার বীজ ধ্বংস করিয়া লওয়া হয়, তবে জমিতে যে মটরের অঙ্কুর হইবে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত গুটী আদৌ থাকিবে না এবং সেই অঙ্কুরও নাইট্রোজেনের অভাবে অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইবে। তবে নাইট্রোজেন-ময় পদার্থ দিয়া উহাকে বর্দ্ধিত ও ফলবান করা যাইতে পারে। এই পরীক্ষা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, গুটীমধ্যস্থিত ব্যাক্টিরিয়াই বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন আহরণের প্রধান কারণ।

প্রকৃতির অনুকরণ করিয়া মানুষও নিজেদের কৃষিকার্য্যের উন্নতিবিধান করিয়াছে ও করিতেছে। কৃষিকার্য্যের জন্য সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন—জল। দৈব-মাতৃক দেশে বৃষ্টির জলেই কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়; কিন্তু বৃষ্টির জল মানুষের সুবিধাঅসুবিধার কথা সব সময়ে ভাবিয়া চলে না। কাজেই যখন বৃষ্টি বেশী হয়, তখন বৃষ্টির জল সংগ্রহ করিয়া রাখা আবশ্যক; যেন তাহা অসময়ে ব্যবহার করা যায়। এই অভাব পূরণ করিবার জন্য পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা ও ডোবার সৃষ্টি; কিন্তু বৃষ্টি যখন বহুকাল না হয়, তখন উপায়? দেশের নদী-সমূহ যে প্রতিদিন জীব ও উদ্ভিদের জীবনদায়িনী সুস্বাদু অনন্ত সলিলরাশি বহন করিয়া সাগরে ফেলিতেছে, এই জলরাশির অপচয় নিবারণ কি সম্ভবপর নহে? দরিদ্র, নিস্তেজ, উদ্যমহীন জাতি যখন শুষ্কক্ষেত্রের শুষ্ক শস্যের পানে চাহিয়া আপ-

নার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে থাকে; অর্থবান, বলবান, উদ্যমী জাতি তখন নদীর জল খালে ফেলিয়া ও খালের জল ক্ষেত্রে ফেলিয়া শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রের পানে চাহিয়া যেন জগতকে মহিমাময় পুরুষকারের মাহাত্ম্য সন্দর্শনের জন্য আহ্বান করে। অনাবৃষ্টির সময় পশ্চিম ভারতের কৃষক সুগভীর কূপের জলে নিজেদের জমির তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া থাকে; বাঙ্গালার ক্ষেত্রের পিপাসা কি বাঙ্গালার অগভীর অনায়াসলব্ধ কুপের জলেও মিটিবে না?

বায়ুমণ্ডলে যে অনন্ত নাইট্রোজেনের ভাণ্ডার রহিয়াছে, সে নাইট্রোজেন কি নাইট্রেটে পরিণত হইয়া কৃষিকার্য্যের সহায়তা করিবে না? কৃষিবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ এক্ষণে এই প্রশ্নের মীমাংসায় ব্যস্ত। শুনিয়াছি, আমেরিকার বিখ্যাত তড়িৎবিদ্যাবিৎ পণ্ডিত টেস্‌লা সাহেব এক তড়িৎযন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার সহায়তায় বাতাসের ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক আলোকরেখা প্রেরণ করিয়া বায়ুমণ্ডলস্থ অম্লজান ও যবক্ষারজান বায়ুদ্বয়কে মিশ্রিত করিয়া নাইট্রিক অক্সাইড প্রস্তুত করা হয়। পরে তাহা হইতে নাইট্রিক অ্যাসিড ও নাইট্রেট প্রস্তুত হয়। এই যন্ত্র কতকালে যে এদেশের লোকের ব্যবহারে আসিবে, তাহা বলা যায় না। কারণ তড়িৎ-প্রস্তুত-ক্রিয়া এখনও এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

কিন্তু Leguminose Bacterea'র সহায়তায় বায়ু হইতে নাইট্রোজেনময় পদার্থের আহরণ সহজেই হইতে পারে। এ বিষয়ে এদেশে সর্ব্বত্র প্রভূত পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক। এই সকল পরীক্ষায় জমির অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আদৌ নাই। অনেক স্থলের কৃষকই অবগত আছে যে, ক্ষেত্রের ফসল মাঝে মাঝে বদলাইয়া দিলে ক্ষেত্রের উন্নতি হয়। পরিবর্ত্তন করিয়া যে ফসল দেওয়া হইবে, তাহা মটরজাতীয় হওয়া আবশ্যক। মটরজাতীয় সারের জন্য চাস করিবার উপযুক্ত কতিপয় ফসলের নাম, যথা:—মটর, মসুর, কলাই, মুগ, খেসারী, অরহর, ছোলা, বর্ব্বটী, সীম, শাঁকআলু, বাব্‌লা, অপরাজিতা, কালকাসিন্দা, আতসী, ধঞ্চে, জয়ন্তী, ইত্যাদি। জমির উন্নতি শীঘ্র করিতে হইলে, ঐ সকল গাছ যখন বেশ সতেজ হইয়া বাড়িয়া উঠিবে, তখনই ফসলের অপেক্ষা না করিয়া উহাদের কাটিয়া মাটীর সহিত মিশাইয়া দেওয়া উচিত। কোন কোন স্থলে দেখিয়াছি যে, ধান কাটিয়া লইয়া যাইবার পূর্ব্বে জমিতে খেসারীর বীজ ছিটাইয়া দেওয়া হয়। ধান উঠিয়া যাইবার পর জমিতে এক দফা খেসারীর ফসল হইয়া যায়। এই প্রথা বিশেষ উপকারী বলিয়া বোধ হয়; খেসাসীর গাছগুলিকে যদি জমির সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়, তবে আরও ভাল হয়। জমি খুব উর্ব্বর অথচ তাহাতে

বিশেষ কিছু সার দিতে হয় না; এমন কতিপয় স্থানের জমিতে আমি অনেক বাব্‌লাগাছ দেখিয়াছি। বাব্‌লা মটরসুটী জাতীয় বৃক্ষ; আর বাব্‌লার আর একটা সুবিধা এই যে, ইহার চিকন পত্রাবলীর ভিতর দিয়া সূর্য্যরশ্মি জমিতে অনায়াসেই প্রবেশ করিতে পারে। কাজেই বাব্‌লাগাছের আওতায় ফসলের কোন ক্ষতি হয় না, অথচ উহা দ্বারা সংগৃহীত নাইট্রোজেনময় পদার্থে শস্যের যথেষ্ট উপকার হয়।

দেশের যে সকল জমি অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বরা বলিয়া কৃষিকার্য্যার্থ এখনও ব্যবহার করা হয় নাই; সে সকল জমিকে কিপ্রকারে চাষের উপযোগী করা যাইতে পারে? জমি উচ্চ হইলে প্রথমেই তাহাকে কাটিয়া নীচু করিতে হইবে। নাবাল জমির বিবিধ সুবিধার কথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। জমি কাটিয়া যে মাটি পাওয়া যাইবে; তদ্দ্বারা বিবিধ প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধিত হইতে পারে। ইট প্রস্তুত হইতে পারে, গ্রামের রাস্তা প্রস্তুত হইতে পারে। ম্যালেরিয়ার জন্মভূমি—গ্রাম মধ্যস্থ ছোট খানা, ডোবা, গর্ত্ত আদি বুজান যাইতে পারে—অথবা বাসের জমিতে মাটী ফেলিয়া তাহা কতকটা উচ্চ করা যাইতে পারে। বাসের জমি যত উচ্চ হইবে, উহা ততই শুষ্ক হইবে ও বিবিধ রোগের মূলীভূত কারণস্বরূপ বিবিধ দূষিত ব্যাক্টিরিয়া-জনয়নের অনুপযোগী হইবে; কারণ ব্যাক্টিরিয়া সেঁতসেঁতে স্থান ব্যতীত শুষ্কস্থানে বাস করিতে পারে না। আমরা জমিতে যে সব সার দিই, তাহাতে অনেক অসার পদার্থও থাকে; সেই সকল পদার্থ প্রতিবৎসর জমিতে পতিত হইয়া উহাকে ক্রমশঃ উচ্চ করিয়া ফেলিতেছে। এ বিপদ হইতে ক্ষেত্রকে রক্ষা করিতে হইলে, মাঝে মাঝে ক্ষেত্রের মাটী কাটিয়া স্থানান্তরিত করা আবশ্যক।

জমি নাবাল হইলেও, উহাতে পর্য্যাপ্তমাত্রায় সার না থাকাতে উহা শস্য-জনয়নের অনুপযুক্ত হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় ক্ষেত্রের উপরের একস্তর মাটী বদলাইয়া, উহার স্থানে অন্যত্র হইতে আনীত একস্তর সারবান মাটী দেওয়া আবশ্যক। ডোবা, খানা, পুরাতন পুষ্করিণী, নদী, খাল বা বিলের তলদেশের মাটীতে সমস্ত দেশের সার গিয়া জমিয়া আছে এবং সর্ব্বত্রই এইরূপ মাটীও যথেষ্ট পাওয়া যায়। এই মাটী বদলাইবার কথায় কাহারও আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। ফরাসী দেশের কৃষকগণ কোনও জমি ছাড়িয়া যাইবার সময় উহার উপরের মাটী গাড়ি বোঝাই করিয়া লইয়া যায়; কারণ এই মাটী সে অনেক যত্নে ও পরিশ্রমে প্রস্তুত করিয়াছে, উহা সে পরের জন্য রাখিয়া যাইবে

কেন। এদেশের লোকেও জানে যে, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের পর পুষ্করিণীর পাড়ের জমির খাজনা উচ্চহারে বিলি হয়। জমির উপরের ১ হাত বা ১॥ হাত যদি ভাল উর্ব্বরা মাটী থাকে, তবে তাহার নীচে কাঁকর বালি বা পাথর থাকুক না কেন, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না।

আর একটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। দুঃখিত রহিলাম, 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করিতে পারিলাম না। অস্থি ও বিষ্ঠা এই দুই বস্তু যে ভাল সারের মধ্যে গণ্য, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। এই দুই সারের এক্ষণে বড়ই অপব্যবহার হইতেছে এবং কি প্রকারে এই অপচয় নিরাকৃত হইতে পারে; তদ্বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া প্রার্থনীয়। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ভিক্টর হুগো তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসে যদি পারি নগরীর বিষ্ঠাসার সম্বন্ধে এক অধ্যায় স্থান দিতে পারেন, তবে আমার এই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেও এ বিষয়ের উল্লেখ মার্জ্জনীয় হইবে বিবেচনা করি। পূর্ব্বপুরুষগণের আমলে যখন ড্রেন-পাইখানা, এমন কি পাইখানারই প্রচলন ছিল না—বা খাদ্যদ্রব্যাদি রপ্তানি হওয়ার প্রথা ছিল না, তখন এ সম্বন্ধে কোনও আলোচনার প্রয়োজন হয় নাই। এ প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, সার-সমস্যার দিক হইতে ধরিলে দেশ হইতে শস্যাদির রপ্তানি হওয়ার অপেক্ষা পাট তুলা প্রভৃতির রপ্তানি হওয়া অধিকতর বাঞ্ছনীয়; কারণ শস্যের সহিত দেশের জমির অনেক প্রয়োজনীয় সার বাহির হইয়া যায়; কিন্তু তুলা ও পাটে কার্ব্বন, হাইড্রোজেন অক্সিজেন এই তিন মূল পদার্থ আছে। বলা বাহুল্য, যে এই কয়টী মূল পদার্থ বায়ু ও জল হইতে সংগৃহীত হয়। অস্থিসারের সম্বন্ধেও পূর্ব্বে কিছু আলোচনা করিবার প্রয়োজন ছিল না; কারণ হাড় ভাগাড়েই পড়িয়া থাকিত—সেখানে বায়ু, জল ও ব্যাক্টিরিয়ার শক্তিতে উহা ক্রমে ক্রমে পচিত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া ভাগাড়ের মাটীর সহিত মিশ্রিত হইত, পরে বন্যা ও বৃষ্টির সময়ে উহার জমিতে প্রত্যর্পিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত; কিন্তু এখন কয়েকবর্ষ হইতে দেখিতে পাই যে, ভাগাড়ের হাড় সংগৃহীত হইয়া স্তূপীকৃত হইতেছে এবং পরে উহা গাড়ি ও নৌকা বোঝাই হইয়া স্থানান্তরে রপ্তানি হইতেছে। ফস্‌ফরাস্ নামক উদ্ভিদ্-জীবনের পক্ষে পরম উপকারী পদার্থসংবলিত এই উৎকৃষ্ট সারের দেশ হইতে অকারণ নির্ব্বাসন (?) যে দেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্যের কথা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হাড়ের গুঁড়া জমিতে ছিটাইয়া দিলে, উহা তথায় পচিত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া জমির সহিত মিশ্রিত হয় এবং উহার উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করে। এই পচন-ক্রিয়াতে কিছু সময় লাগে বলিয়া ও হাড়ের

গুঁড়া প্রস্তুত করা কষ্টসাধ্য বলিয়া যাঁহারা অস্থিকে শীঘ্র সাররূপে ব্যবহার করিতে চাহেন, তাঁহারা সালফিউরিক্ এসিডের সহায়তায় হাড়কে দ্রবীভূত করিয়া সুপার ফস্‌ফেট অফ লাইম-রূপে ব্যবহার করিতে পারেন। পূজনীয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী ও অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয়দ্বয় 'বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিকাল ওয়ার্কসে' সালফিউরিক্ এসিড প্রস্তুত-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া দেশবাসীর অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এক্ষণে আশা করি যে, তাঁহারা উক্ত এসিড আরও সুলভ ও সর্ব্বত্র সুপ্রাপ্য করিয়া বাঙ্গালার কৃষিকার্য্যে যুগান্তর আনয়ন করিবেন।

গোবর সম্বন্ধে একটী কথা না বলিলে প্রবন্ধটী অসম্পূর্ণ থাকিবে। ইন্ধনের জন্য গোবর ব্যবহার-প্রথা বন্ধ করিয়া যদি শুধু সারের জন্যই ইহা ব্যবহার করা হয়, তবে তদ্দ্বারা দেশের কৃষিকার্য্যের প্রভূত উন্নতি হইবে। গোবর ইন্ধনস্বরূপ ব্যবহার করিলে, উহার নাইট্রোজেনের অংশ তাপ দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া পুনরায় বায়ুমণ্ডলের সহিত মিশ্রিত হয়; কাজেই এই উৎকৃষ্ট নাইট্রোজেনের সার অন্যায়রূপে অপচয় প্রাপ্ত হয়। অতএব যাহাতে লোকে গোময় ইন্ধন-স্বরূপে ব্যবহার না করে ও যাহাতে উহার পরিবর্ত্তে কয়লার প্রচলন হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা দেশের কৃষির উন্নতিকামী ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

আত্মতৃপ্তি।

জানি আমি প্রিয়তম! ওহে প্রাণেশ্বর,
নিষ্ফলে করো নি বিধি আমারে সৃজন,
ক্ষুদ্র বারিকণা ল'য়ে গরজে সাগর,
কোটি কোটি পরমাণু—নিখিল ভুবন।
খদ্যোত ভাবে না মনে বারেকেরো তরে,
যে বিশ্বে তপন-চন্দ্র করে আলোদান,
অনন্ত জ্যোতিষ্ক শত গগন-মাঝারে,
সে বিশ্বে তাহার হায়! কতটুকু স্থান?

ছোট ফুল ফুটে থাকে পল্লব-ছায়ায়,
ছোট পাখী গান গাহে আপনার মনে,
জানে না সে কোন্ প্রাণে সৌরভ বিলায়,
কোন্ প্রাণে গাহে পাখী নিলাজ পরাণে ?
আমিও ত তাই ভাবি ওহে বিশ্বপ্রাণ,
বিফলে করো নি কভু এ জীবন দান।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

সম্পাদিকার পত্র।

ভগিনি,

তোমার প্রেরিত "আদর্শ ভারত-গৃহিণী" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি, তুমি বর্ত্তমান স্ত্রী-সমাজের অত্যাবশ্যকীয় কথারই অবতারণা করিয়াছ। তোমার ভাষার গাম্ভীর্য্য ও ওজস্বিতা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়, পাঠকপাঠিকাগণ পুস্তিকাখানির মধ্যে তোমার সূক্ষ্মদর্শীতার যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন, তুমি পুস্তকের মধ্যে বৈদিক যুগের যে সকল উচ্চশিক্ষিতা প্রাতঃস্মরণীয়া গার্গী মৈত্রেয়ী প্রভৃতি দেবীগণের নামোল্লেখ করিয়াছ, তাঁহারা শিক্ষার সর্ব্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়ের সম্প্রসারণ যেরূপ হইয়াছিল—তাঁহাদের শিক্ষার ক্ষেত্র যেরূপ বিস্তৃত ছিল—তাঁহাদের গৃহিণীপনার ক্ষেত্র সেরূপ প্রসারিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না, কারণ তাঁহারা অনেকটাই বনবাসিনী তপস্বিনী ছিলেন, তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র বিরল তপঃভূমি; সেখানে সকলেই পুণ্যানুষ্ঠান, বেদগান, ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানচর্চ্চায় নিরতা থাকিতেন, তাঁহাদের কারবার নানা প্রকার বিভিন্ন প্রকৃতির নরনারী অথবা ইতর শ্রেণীর লোক লইয়া করিতে হইত না, তাই বলিতেছি, যাঁহারা বিপুল বিচিত্র জনসমাজের অন্তর্গত বৃহৎ একান্নবর্ত্তী-পরিবারের গৃহিণী, যাঁহারা উক্ত কঠিন পরীক্ষাক্ষেত্রে গৌরবের সহিত উত্তীর্ণা হইয়াছেন, তাঁহারাই বাস্তবিক গৃহরাজ্যের রাণী, সেই সকল কল্যাণময়ীদের কথা এ দুর্দ্দিনে স্মরণ করিতেও বাস্তবিক আনন্দ হয়, আমি 'দুর্দ্দিনে' বলিলাম বলিয়া তোমার ক্ষুণ্ণ হইবার আবশ্যক নাই, তবে কিনা, এখন

"সবহু মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি,
সকল কণ্ঠে নাহি কোকিল বাণী।"

আছে; কিন্তু সহস্রের মধ্যে গড়ে তেমনটী একটীও যদি পাওয়া যায় ত যথেষ্ট, তেমনটী কেমনটী ?—যেমনটী তুমি বলিয়াছ ;—

"শৈশবে জননী কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া, যৌবনে শ্বশ্রূ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া ক্রমে প্রৌঢ়াবস্থায় যখন গৃহের সমস্ত দায়িত্ব তাহার উপর ন্যস্ত হয়; তখন সে যে ঔদার্য্য প্রাপ্ত হয়, তাহা বন্ধহীন আকাশের মত বিশাল, তখন সে যে সহিষ্ণুতা প্রাপ্ত হয়, তাহা সর্ব্বসহা ধরণীর ন্যায় অসীম, তখন সে যে স্নেহশীলতা প্রাপ্ত হয়, তাহা সদা বহমান নির্ঝরের ন্যায় শ্রান্তিহর! আপনার সঙ্কীর্ণ স্বার্থ হইতে তখন তাহার চক্ষু অপসারিত হইয়া গৃহের পরিজনের সুখস্বস্তির উপর ন্যস্ত হয়; তখন সে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ও গরিষ্ঠের পদতলে সেবাব্রতধারিণী মূর্ত্তিমতী সান্ত্বনার মত আপনার বিশ্রামক্লান্তি অবহেলে বিসর্জ্জন করে।" * * * সে "শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর, ননদ, এমন কি, বাটীর দাসদাসীর পর্য্যন্ত সেবার ভার স্বচ্ছন্দে আপন স্কন্ধে লইয়া সানন্দচিত্তে তাহার জীবনব্রত উদ্‌যাপন করিতেছে। দশভুজা দিক্‌পালিনীর মূর্ত্তির ন্যায় সে মূর্ত্তি সর্ব্বজন শ্রেয়োদায়িনী ও সর্ব্বমঙ্গলবিধায়িনী, তাহাতে কর্ম্মের অবসাদ নাই, পীড়নের অভিশাপ নাই—আছে শুধু সুপ্রসন্ন ক্ষমা ও স্নেহস্নিগ্ধ আশীর্ব্বাদ!" সে ধূপের মত—

আপনি হইয়া দগ্ধ অনলের পরে,
গৃহস্থের গৃহে সদা সুগন্ধ বিতরে,

হায় ভগিনি, তোমার প্রিয় সুগন্ধি কালো ধূপের ধূম, এখন বিংশ শতাব্দীর এসেন্স-বাসিত গৃহকে মলিন করিবার জন্য,—চক্ষুপীড়া উৎপাদন করিবার জন্য নিশ্চয় জ্বলিতে পারে না। (?) কেন, সে স্থান ত এখন যত্নসঞ্চিত কোমল কুসুমরাজি দ্বারা সুবাসিত, তাহাতে যদি তোমার মন না উঠে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, বিংশ-শতাব্দীর সভ্যতালোক নিশ্চয়ই তোমার গৃহাঙ্গন এখনও আলোকিত করে নাই! তোমার পুস্তকখানির অনেকটাই উদ্ধৃত করিয়া ফেলিলাম, আশা করি তাহাতে তোমার গ্রন্থের কাট্‌তি কম হইবে না! তুমি একস্থানে লিখিয়াছ ;—"মধ্যাহ্ন সূর্য্যের দিগ্বীদাহী তাপ যেরূপ পল্লবচ্ছন্ন তরুতলে প্রবেশ করিতে পারে না, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের উৎকট সুখলিপ্সা তেমনি ভারতবাসীর এই সুধাসিক্ত জীবনে প্রবেশ করিতে পারে নাই।" আমাদের মেয়েলী একটী প্রবচনে আছে,—'বল বল আবার বলো, ভাল কথার ঝুটাও ভাল'—"দৈন্যে তাহারা পীড়িত হইলেও, দুর্দ্দশায় তাহারা মৃত্যুবৎ হইলেও যে দুর্লভ শান্তি তাহারা

লাভ করিয়াছিল—তাহা সাধনার ধন বটে, ভারতবর্ষ সেইদিন তাহার চরম অধঃপতন সীমায় পঁহুছিবে, যেদিন ভারতরমণী গৃহিণীর এই উচ্চ আদর্শ হইতে চক্ষু ফিরাইবে, ভিক্ষার ক্ষুদকণা দশজনে বাঁটিয়া না লইয়া, ঐশ্বর্য্যের রাজসম্পদ্ যেদিন একাকী সম্ভোগ করিবার বাসনা বলবত্তর হইবে, গৃহের অবশ্য প্রতিপাল্য ছোটবড় কাজগুলি সমাধা করিতে সে হস্ত মহিমান্বিত বলিয়া বিবেচিত না হইয়া কলঙ্কিত বলিয়া কল্পিত হইবে,"—জানি না, বঙ্গের কোনও নিবিড় শ্যামল পল্লীগৃহ-তলে অতীতের উক্ত স্বর্ণময় দিবস আজিও লুক্কায়িত আছে কি-না? বলিতে কি, পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক-রশ্মি কি ধনী, কি মধ্যবিত্ত কি, হিন্দু কি অহিন্দু যাহার গৃহেই প্রবেশ করিয়াছে, সেইখান হইতেই সেদিন অন্তর্হিত হইয়াছে, ভারতে আর সেদিন নাই। এখন দেখিতে ক্ষতি নাই, ইহা কাহার দোষে হইয়াছে বা হইতেছে! আলোক উপভোগ করিতে গিয়া বাতায়নের সাহায্য না লইয়া, যদি আমরা মাঠের কাটফাটা রৌদ্রে গিয়া মাথা ফাটাইয়া ফেলি, তাহা যেমন আলোকের দোষে নহে, তেমনি পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণভাগ যদি আমরা গ্রহণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আর আজি ঐ 'উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে' চাপাইতে হইত না। তবে কি ইহা আমাদের মেয়েদের দোষেই হইতেছে? না ভগ্নি, তা নয়; যাঁহাদের তুষ্টিসাধন করিতে পারিলে, যাঁহাদের তৃপ্তি সাধন করিতে পারিলে, যাঁহাদের মনোমোহিনী হইতে পারিলে—নারী নারীজন্ম সার্থক বিবেচনা করে, ইহা তাঁহাদেরই সুরুচির ফল জানিবে। "কন্যাপেব পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" ঊনবিংশ শতাব্দীর পিতা কন্যার কিরূপ শিক্ষা চাহেন দেখা যাক্। নব্য হিন্দু-গৃহে একটু ইংরাজী, একটু বাঙ্গালা, একটু হার্ম্মোনিয়ম্, বাস্। ইদৃশ হোমিওপ্যাথিক ডোজের শিক্ষাকে কি শিক্ষার বিড়ম্বনা বলা যায় না? কিন্তু করেন কি? তাঁহাদের মেয়েদের ঐরূপ শিক্ষা হয় ত তাঁহাদের বাধ্য হইয়াই দিতে হয়,—কারণ ঊনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীর গ্রাজুয়েট্ বরগুলি ইহা ভিন্ন দারপরিগ্রহকে গলগ্রহই মনে করিয়া থাকেন, ঐরূপ শিক্ষা-বিড়ম্বনাগ্রস্থা পত্নী লইয়া তাঁহারা আন্তরিক তৃপ্ত হয়েন কিনা, তাঁহারাই জানেন। পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে বিবাহের পরে কিছুদিন 'হনি'মুনের প্রথা আছে; কিন্তু আমাদের স্থবিরের যষ্ঠী, পুত্ররত্নগুলি উদ্বাহের পরে চিরদিন হনিমুনে থাকিতে পারিলেই যেন জীবন কৃতার্থ বিবেচনা করেন, ইহাতে বধূমাতারা শ্বশ্রূ, ননন্দা, দেবর, ভাশুর প্রভৃতির প্রতি কর্ত্তব্যপালন করিয়া কি প্রকারে সুগৃহিণীপদে বরণীয়া হইবেন?

আসল কথা,—

এ সংসার ভোজের বাজী—
ঐযে বাজীকরের মেয়ে শ্যামা
যেমন নাচায় তেম্নি নাচি।

বাস্তবিক ইহার মধ্যে বিদ্রূপের কথা কিছুই নাই। এখন কথা হইতেছে, যাহা ছিল তাহা আর নাই। গতশ্চ শোচনা নাস্তি; কালস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। মেয়েদের উচ্চশিক্ষা জিনিষটা মন্দ নহে; কিন্তু আজকাল যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহা সাধারণের উপযোগী নহে। পূর্ব্বে স্কুলকলেজের সহিত মেয়েদের সংস্রব না থাকিলেও একমাত্র গৃহই তাহাদের প্রশস্ত শিক্ষাক্ষেত্র ছিল, ব্রতনিয়মের মধ্য দিয়া, পুতুলখেলার মধ্য দিয়া, রামায়ণ মহাভারতের মধ্য দিয়া, পৌরজনের আচারব্যবহার-কার্য্যকলাপের মধ্য দিয়া তাহাদের নৈতিক শিক্ষা, গৃহস্থালীর কাযকর্ম্মশিক্ষা বিনা আয়াসে তাহাদের অজ্ঞাতসারেই যেন সম্পন্ন হইয়া যাইত, তাহারা পৃথিবীর কোথায় কি আছে; এ সকল বিষয়ের তত্ত্ব না রাখিলেও, জ্ঞানের ধার বড় না ধারিলেও, সংসারের শান্তি-বিধায়িনী গৃহিণী-নামের অযোগ্যা হইত না। যেমন বাল্যকালের সেই চার কড়ায় একগণ্ডা, আট কড়ায় দু'গণ্ডা চীৎকার করিয়া পাঠশালের সেই শিক্ষা চিরকালের জন্য হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়,—সেইরূপ সাঁজুতী প্রভৃতি ব্রতের 'সীতার মত সতী হই', 'দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী হই', 'পৃথিবীর মত ধৈর্য্য হোক', এইমন্ত্রগুলিও কিশোর হৃদয়ে অনেকটা বদ্ধমূল হইয়া যাইত। ব্রত-নিয়মাদিকে কুসংস্কার বলিতে হয় বল; কিন্তু এই কুসংস্কারের মধ্য হইতেই তাহারা সার সংগ্রহ করিয়া লইত, এখন তাহার স্থলে বালিকাদের সম্মুখে আমরা কি আদর্শ ধরিতেছি ভাবিয়া দেখি না। ফলতঃ যেমন ব্যঞ্জন আলুনী হইলে তাহার আর সকল স্বাদগন্ধই ব্যর্থ, তেমনিই নৈতিক শিক্ষা, গার্হস্থ্য শিক্ষা প্রভৃতি না থাকিলে রমণীর উচ্চশিক্ষার জ্ঞান-গৌরবও বৃথা। আমার মনে হয়, বালিকাদের গার্হস্থ্য শিক্ষা, রন্ধন এবং সাংসারিক অন্যান্য কাযকর্ম্ম প্রভৃতি শিক্ষা স্কুল অপেক্ষা গৃহে গৃহে হাতে কলমে শিক্ষা করাই প্রশস্ত। এ বিষয়ে মাতা, খুড়ী-মা, জেঠাই-মা প্রভৃতি উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী। পূর্ব্বে ঋগ্বেদের সময় হইতে এখনও পল্লীবধূরা অনলসভাবে বিশ্রামসময় সুতাকাটা প্রভৃতি আবশ্যকীয় শিল্পে সময় অতিবাহিত করেন। আনন্দের বিষয় যে, সহরে ও সহরতলীতে আবার সেই মঙ্গলকর শিল্পে রুচি সন্নিবেশিত হইতে দেখা যাইতেছে। এখন শিক্ষা-সম্বন্ধে দু' একটী কথা বলা আবশ্যক। বালকবালিকারা স্বভাবত যেমন

আপনারা স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের খেলার বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া লয়, অর্থাৎ ছেলেদের খেলা ঘোঁড়াঘোঁড়া, মেয়েদের খেলা রাঁধাবাড়া, সেইরূপ বালক-বালিকার শিক্ষাপ্রণালী ও পাঠ্য পুস্তক স্বতন্ত্রভাবে নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। ইতিহাসের স্থলে রামায়ণমহাভারতের অংশবিশেষ নির্ব্বাচিত করিয়া বালিকাদের হস্তে দেওয়া কর্ত্তব্য। আর একটী বিষয়ে আমরা একেবারেই দৃষ্টি রাখি না, পরিণত বয়স না হওয়া অবধি কোন প্রকার নাটক নভেল ইত্যাদি পড়িতে দেওয়া উচিত নহে। কুসঙ্গীর ন্যায় কুপুস্তক-পাঠও বিশেষ অনিষ্টকর। মেয়েদের সাহিত্য-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পবিদ্যা, চিত্র, সঙ্গীত প্রভৃতি কলাচর্চ্চাও মন্দ নহে। সম্প্রতি কলিকাতাতে কতকগুলি বিদুষী মহিলার যত্নে একটী শিল্পবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। শিল্প-শিক্ষার্থিনীদের পক্ষে স্কুলটী সুবিধাজনক হইয়াছে।

নারী-হৃদয় দয়ামায়া প্রভৃতি সদ্‌গুণের আধার হইয়াও চিরদিন 'সঙ্কীর্ণ' অপবাদে কলঙ্কিত হিংসা, দ্বেষ, কলহপ্রিয়তা চিরদিন নারীনামের সহচরী। এখনও পুরুষেরা স্বীয় গৃহস্থিতা ছোট ছোট বালিকাদিগের প্রতি অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করিয়া রহস্যচ্ছলে বলিয়া থাকেন, 'এগুলি ভিন্ন ভিন্ন গৃহের জন্য এক একখানি পার্টিসন-প্রাচারের ইষ্টক।" ছি ছি! তাই মনে হয় এ কলঙ্ক কি রমণীর এতই অপরিহার্য্য? হায়! কবে সামগ্র নারীহৃদয় সুশিক্ষার প্রভাবে বারিধির মত উদারতা প্রাপ্ত হইয়া জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে? অধুনা যে সকল মহিলারা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা স্ত্রী-সমাজের তুলনায় মুষ্টিমেয় বলিলেই হয়। হিন্দু-বালিকাদের অল্প বয়সে বিবাহ উচ্চশিক্ষার একটী প্রধান অন্তরায়, এখন কর্ত্তৃ-পক্ষদের দেখা আবশ্যক কোন প্রণালী অবলম্বন করিলে ঐ সময়ের মধ্যে বালিকারা উচ্চশিক্ষা না হউক, অন্ততঃ সুশিক্ষা লাভ করিতে পারে।

প্রার্থনা।

অসীম অনন্তরূপে নিভৃতে গোপনে
থাক এ হৃদয় ভরি দয়াময় হরি,
পরিপ্লুত রব আমি রূপের কিরণে,
স্মিতশুভ্র ব্যাপ্তরূপ সতত নেহারি।
প্রভাতে পূরব ভাগে, গোধূলি বেলায়,
তোমার মধুর বিভা ক্ষরে উৎস ধারে,
এ বিশ্ব মণ্ডিত তব আলোকমালায়,
নানা রঙ্গে ঊর্দ্ধে নভে দোলে থরে থরে।
সত্যের বিচিত্র করে নাশি কুহেলিকা,
দেখাও সন্ধান তব অমর সম্পদ্,
তৃষিত মানস-ভৃঙ্গ হে অনন্ত সখা!
চুমিবে চরণ-পদ্ম বাঞ্ছার আস্পদ।
নিস্পন্দ তন্ময় চিতে মৌনমগ্ন হয়ে
রহিব জ্যোতিতে তব নীরবে ডুবিয়ে।

শ্রীবিন্দুবাসিনী দাসী।

কুমারসম্ভব।

সমালোচনা।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল এম্, বি, মহাশয় নিত্য-শ্রুত রোগীর যন্ত্রণা-চীৎকারের মধ্যেও কালিদাসের অতুলনীয় কাব্য কুমারসম্ভবের ভাবানুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদক ভূমিকাতেই আমাদের বলিয়া দিয়াছেন "ভাবানুবাদ হইলেও ইহাতে মূলের কোন কথাই বর্জ্জিত হয় নাই এবং ভাবাংশে ও ব্যাখ্যাংশে প্রায় সকল স্থলেই আমি মল্লিনাথের অনুসরণ করিয়াছি। তবে কোথাও কোথাও আবশ্যকবোধে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বিস্তার করিয়াছি মাত্র।" অন্যত্র তিনি আরও বলিয়াছেন "ভাব-প্রধান ও উপমাবহুল এই সংস্কৃত কাব্যখানি রচনা পারিপাট্যে সুন্দর হইলেও দুরূহ। মল্লিনাথের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যার সাহায্যেই ইহা সংস্কৃত-পাঠীদের কাছে সুখ-সেব্য হইয়াছে। এরূপ দুরূহ কাব্যের কেবলমাত্র শাব্দিক অনুবাদ বাঙ্গালাপাঠীদের কাছে আরও দুরূহ—ভাবগ্রহপক্ষে মোটেই যথেষ্ট নহে। এইজন্যই আমি সরল গদ্যে ইহার ভাবানুবাদ করিয়া তাহাকে ভাবোজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করিয়াছি।" ডাক্তার বাবু ব্যবসায়গত শিক্ষায় ব্যবচ্ছেদ-পটু; কালিদাসের কাব্যকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া তিনি তাহার অন্তর্নিহিত রস বাহির করিয়া আমাদিগকে উপভোগ করাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন, ইহা সুখের কথা। চিকিৎসকের কাব্য-বিশ্লেষণ-স্পৃহা অনেক হয় ত কর্ম্মকারের কুম্ভকারবৃত্তি বলিয়া মনে করিবেন; কিন্তু আমাদের দেশে এক্ষেত্রে সে কথা বলা চলে না। আমাদের দেশে আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়ী চিকিৎসকেরাই চিরকাল "কবিরাজ" হইয়া আসিতেছেন, "কবি-চিন্তামণি" "কবিকণ্ঠাভরণ" প্রভৃতি উপাধি তাঁহাদেরই একচেটে। এ বিষয়ে যদি কাহাকেও 'গমিষ্যামুপহাস্যতাম্' হইতে হয় তবে সে বাঙ্গালী-সমাজকে, কবিরাজ বা কবিত্বকে নহে। দীনবাবুর 'কুমারসম্ভবের' অনুবাদের ন্যায় গ্রন্থের আশা, আমরা বহুকাল হইতে করিতেছিলাম। ইংরাজীতে Shakespear's Beauties, Shakespear his mind and art, প্রভৃতি পুস্তকের ন্যায় কালিদাসের কাব্যঘটিত কোন পুস্তক নাই। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের "মেঘদূত" আমাদিগকে আশান্বিত করিয়াছিল; কিন্তু বিধি-বিড়ম্বনায় সে আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছে। দীনবাবু যে পন্থায় কুমারসম্ভব-বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা কালিদাসের কাব্য-লোলুপগণকে বিশেষ সাহায্য করিবে। দীন বাবুর নিকট ভবিষ্যতে আমরা আরও আশা করি। আর কেহ কি অন্যভাবে অন্য বিষয় লইয়া দীনবাবুর পথ অনুসরণ করিবেন না?

কাব্য ও দর্শনের সমস্যা।*

দর্শনের গতি ভিন্নপ্রকার। বিজ্ঞানের ন্যায় দর্শন স্থূল হইতে সূক্ষ্মে যাইবার জন্য প্রয়াস পাইতেছে না। পরন্তু সূক্ষ্মকে বুঝিয়া স্থূলকে তাহার আলোকে সরল করিতে চেষ্টা করিতেছে। দর্শন বিজ্ঞানের ন্যায় কঠোর কর্ম্মযোগী নয়। দর্শন জ্ঞানযোগী। দর্শন ধ্যানবলে এই স্থূলকে অতিক্রম করিয়া—সীমাকে অতিক্রম করিয়া সূক্ষ্ম অসীমকে পাইতে চেষ্টা করিতেছে। জ্ঞানের দৃষ্টিতে দর্শন অনন্তের অনন্ত রহস্যভেদের আয়োজন করিতেছে। তারপর সেই ধ্যানদৃষ্টি লইয়া—জ্ঞানচক্ষু দিয়া এই সান্তকে বুঝিতে চাহিতেছে। দর্শন তাহার মনশ্চক্ষুতে যাহাকে পাইতেছে—বুঝিতে চাহিতেছে তাহাই কিরূপে এই পরিদৃশ্যমান্ সমস্তের ভিতরে লীলা করিতেছে। সেই সূক্ষ্মই কিরূপে এই স্থূলের ভিতর দিয়া আপনাকে পরিব্যক্ত করিতেছে—সেই রূপহীনই কিরূপে অনন্ত রূপেতে আপনাকে বিভক্ত করিয়া দিতেছে। যখনই দর্শন সেই দ্বন্দ্বের অতীত বিষয়টীকে আপনার আয়ত্ত করিতে পারে, তখনই বুঝিতে পারে—এই আপাতবিরোধী ঘাতপ্রতিঘাতময় সৃষ্টিপ্রক্রিয়া কি সহজ-সরল, কি পরস্পরসম্বন্ধ—কি পরস্পরনিয়মিত; সেই যে গোমুখীর কথা বলিয়াছি;—যখনই সেই গোমুখীর মুখে দর্শন উপস্থিত হয়, তখনই গঙ্গার এই বিচিত্রগতি তাহার নিকট আর রহস্যময় বলিয়া বোধ হয় না। সূক্ষ্মের ভিতর দিয়াই দর্শন স্থূলকে বুঝিতে চাহে, অনন্তের ভিতর দিয়াই দর্শন শান্তকে ভেদ করিতে চেষ্টা করে।

সকল যুগের এবং সকল দেশের দর্শনই যে একইরূপে এই সমস্যার মীমাংসা করিয়াছে, একইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে, তাহা নয়। সাধারণতঃ দর্শন যেরূপে এই বিশ্বরহস্যের ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছে, তাহাকে দ্বৈতবাদ, জড়বাদ, অদ্বৈতবাদ, ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এই চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। দ্বৈতবাদ দুইটি বিভিন্ন সত্ত্বার দ্বারাই এই বিশ্বরহস্যের মীমাংসা করিতে চাহিয়াছে। স্থূল ও সূক্ষ্ম, জড় ও চৈতন্য এই দুইটীরই পৃথক্ অস্তিত্ব দ্বৈতবাদীরা স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহার একটী অপরটী হইতে হয় নাই—কেহ কাহারও পরিণাম নহে। ইহা অনাদি কাল হইতেই পৃথক্ সত্ত্বায় বর্ত্তমান ছিল। দুইই অনাদি। ইহাদিগেরই পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাতে ক্রিয়াপ্রক্রিয়ায় এই বৈচিত্র্যময় জগতের

*গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর।

উৎপত্তি হইয়াছে। ভারতীয় সাংখ্যদর্শন এই দ্বৈতবাদী। সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি—একটি নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়—অন্যটী লীলাময়ী ও গুণময়ী। ইহাদিগেরই পরস্পরসংযোগে জগৎক্রিয়া চলিতেছে। এই দুইটী ব্যতীত সাংখ্যকার অন্য কোন সত্ত্বা স্বীকার করেন না। ইহাদিগের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াতেই এই বিশ্বরহস্যের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। প্রাচীন পারসীকেরাও (Zoroastrians) দ্বৈতবাদী। তাঁহাদিগের মতে সৎ ও অসৎ এই দুই শক্তির অবিরাম সংগ্রামেই এই জগৎ-প্রণালী চলিতেছে। ইয়ুরোপের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক স্পিনোজা (Spinoza) ও তাঁহার অনুবর্ত্তীগণও দ্বৈতবাদী। স্পিনোজার দ্বৈতবাদ একটু বিশিষ্ট রকমের। তিনি দুইটি বিভিন্ন সত্ত্বার স্বীকার করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহার মতে এই বিভিন্ন সত্ত্বা এক মূল সত্ত্বারই দুই পার্শ্বমাত্র। ইহাদিগেরই পরস্পর সংস্থানে বিশ্বরহস্য ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

কিন্তু দ্বৈতবাদে মানুষের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয় না। দুইটী পরস্পর বিরোধী সত্ত্বা এই জগৎরচনার মূলে আছে—ইহা স্বীকার করিলে সমস্যা আরও গুরুতর হইয়া উঠে। মানব-জ্ঞান বহুর ভিতর। বহু হইতে একে যাওয়াই মানব-জ্ঞানের সাধারণ ধর্ম্ম। জগতের এই বিবিধ বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া একেরই অভাব মানব-জ্ঞান স্বভাবতঃ অনুভব করিয়া থাকে; সুতরাং দ্বৈতবাদের এই দুইটী বিভিন্ন সত্ত্বাকে মানুষের প্রকৃতি সহজে গ্রহণ করিতে চাহে না। ইহার পরিণাম দুই-প্রকার। জড়াদ্বৈতবাদ ও চৈতন্যাদ্বৈতবাদ—আমরা সংক্ষেপে জড়বাদ ও অদ্বৈতবাদ বলিব। জড়বাদী বলেন যে, এই জগতের মূলে অত্যাশ্চর্য্য, অতীন্দ্রিয় কোন ব্যাপারই বিদ্যমান্ নাই। মানুষ কেবল নিজের বুদ্ধির ভ্রমে এই জগৎরচনাকে রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে। একটী মাত্র সত্ত্বা আছে, যাহা জড়, একটী মাত্র শক্তি আছে, যাহা জড়শক্তি। তাহারই নানারূপ রূপান্তরে এই বিচিত্র জগতের উৎপত্তি। তুমি যাহাকে চৈতন্য বলিতেছ—সাধারণ জড়ের বাহিরে মনে করিতেছে—সেই তোমার মন বা আত্মা আর কিছুই নহে—কেবল কতকগুলি জড়শক্তির পরিণাম। কতকগুলি জড়শক্তির ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াতেই তোমার মননক্রিয়া চলিতেছে। তোমার মন বা আত্মাকে লইয়া গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই। সামান্য মৃৎপাত্র যে জড়শক্তির পরিণাম—তোমার গর্ব্বের বিষয় ঐ মনও তাহাই। সৃষ্টির মূলে কোন অনন্তজ্ঞান বা অনন্ত শক্তি (Infinite will) বর্ত্তমান নাই। এই বিশাল সৃষ্টি কেবল জড়শক্তিরই পরিণাম। তোমার সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, তোমার গর্ব্বিত অধ্যাত্মবিদ্যা—তোমার নিগূঢ় ধর্ম্মরহস্য—সমস্তই

কল্পনার সৃষ্টি। ভ্রমের তন্তুজালে সেগুলিকে বয়ন করা হইয়াছে। মানুষের গর্ব্বের বিষয় কিছুই নাই। সামান্য ধূলিমুষ্টিতে ও মানুষে কোন প্রভেদই নাই। যে জড়কে তুমি ঘৃণা করিতেছ, তাহা অন্য সমস্তের ন্যায় তোমারও আদি জননী। ভারতের চার্ব্বাক অতি প্রাচীনকালেই এই জড়বাদের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধদার্শনিকগণ নানারূপে এই কথাই বলিয়াছেন। ইয়ুরোপেও প্রাচীন ও আধুনিক অনেক দার্শনিকই জড়বাদের সমর্থন করিয়াছেন। বর্ত্তমান-কালে কোমত, ডারুইন, স্পেন্সার, মিল ও হক্সলি প্রভৃতি ইহার প্রবক্তা। ডারুইন ও স্পেন্সার আবার জড়বাদের ভিতর বিবর্ত্তনবাদ (Evolution) আনিয়াছেন। আদিম জড়শক্তি হইতে কিরূপে এই জগদ্ব্যাপারের ক্রমঃবিকাশ হইয়াছে, তাহা তাঁহারা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু জড়বাদে মানুষের জ্ঞান শান্ত হইবার নহে। ইহার স্বাভাবিক পরিণাম বিদ্রোহ। এই মানবমনের বিদ্রোহে জড়বাদের বিরুদ্ধে অদ্বৈতবাদের স্থাপনা। জড়বাদ যেমন জড়দ্বারাই এই জগদ্ব্যাপারের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছে; চৈতন্যকে একেবারেই স্বীকার করে নাই বা স্বীকার করিবার প্রয়োজন অনুভব করে নাই; অদ্বৈতবাদ তেমনই ঠিক তাহার বিপরীত পন্থা অবলম্বন করিয়া বসিয়াছে—এক চৈতন্যই আছে, অন্য সত্ত্বা নাই, জড় বলিতে কিছুই নাই। এই যাহাকে জড় বলিতেছ—তাহা ভ্রম, তাহা মায়া। এক অখণ্ড অনন্ত সত্ত্বাই কেবল আছে, আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। তোমার নিকট যাহা জড় বোধ হইতেছে—যাহা অপ্রকাশ বোধ হইতেছে—যাহা বিষয় (object) বোধ হইতেছে—তাহা আর কিছুই নহে, রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় তাহা তোমার বিভ্রমমাত্র। সৃষ্টি বলিতে কিছুই হয় নাই—বাহ্যজগৎ বলিতে কিছুই নাই, ছিল এবং আছে—কেবল—এক চৈতন্য। আমি ও তুমিই সেই চৈতন্য। আকাশ যেমন সীমাবদ্ধ হইয়া ঘটাকাশ বা পটাকাশের সৃষ্টি করে—তেমনি এক চৈতন্যই মায়ার আবরণে আবরিত হইয়া এই সমস্তের প্রকাশ হইতেছে। এইরূপ জড়বাদ যেমন চৈতন্যকেও জড়ত্বে উপনীত করিয়াছে—অদ্বৈতবাদ তেমনই তদ্বিপরীত পন্থা অবলম্বন করিয়া জড়কেও চৈতন্যময় করিয়া তুলিয়াছে। ভারতের শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যগণ এই অদ্বৈতবাদের প্রধান প্রচারকর্ত্তা। ইয়ুরোপের বার্কলে এবং আধুনিক ফিচ্‌টে (Fichte) শেলিং (Schelling) প্রভৃতিকে এই অদ্বৈতবাদের প্রধান সমর্থক ও ব্যাখ্যাকর্ত্তারূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কিন্তু অদ্বৈতবাদেই কি সকল প্রশ্নের সমাধান হইতে পারে? এই যে বাহ্য

জগতকে—জড়কে, অদ্বৈতবাদ মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে—তাহাতেই কি সকল তর্কের অবসান হয়? জড়কে আমরা যতই উড়াইয়া দিতে চাহি না কেন—যতই তাহার অস্তিত্বলোপ করিতে চাহি না কেন—সে থাকিবেই, কেননা তাহার প্রকৃত একটা সত্ত্বা আছে। অদ্বৈতবাদই কি জড়কে লোপ করিতে পারিয়াছে? মায়ার নামে অদ্বৈতবাদ জড়কে একপাশে বিতাড়িত করিয়াও স্বীকার করিয়াই লইয়াছেন। অদ্বৈতবাদের ব্রহ্মত নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, তবে এ জগৎবিকার কিরূপে হইল? উত্তরে—অদ্বৈতবাদী মায়ারূপে জড়কে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন; মায়াকে তাঁহারা কিছু নয় বলিয়াছেন বটে—কিন্তু তাহাতেই তাহার অস্তিত্বহীনতা প্রমাণিত হয় নাই, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এই সমস্যা বুঝিয়াছিল। তাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এই জড়কে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দেয় নাই। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মত—এ জগৎ মিথ্যা নয়—মায়া নয়। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য পদার্থ বটে—কিন্তু তাই বলিয়া জগৎ মিথ্যা নয়। জগৎ ব্রহ্মেরই বিধা বা প্রকার মাত্র। সেই ব্রহ্মই এই জগতের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছেন। সেই অনন্ত জ্ঞান বা শক্তিই এই বিচিত্র সৃষ্টির ভিতর আত্ম-প্রকাশ করিতেছেন। সেই এক স্বপ্রকাশই এই প্রকাশের ভিতর স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন। আপাতদৃষ্টিতে যাহা দ্বন্দ্ব বা বিরোধ বলিয়া বোধ হইতেছে—তাহা সেই মহান্ ঐক্যেরই বিচিত্র বিকাশ। যাহা দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়—যাহা অনন্ত, তাহাই এই সসীম জীব ও জগতের মধ্য দিয়া আপনাকে ব্যক্ত করিয়া তুলিতেছেন। ভারতের রামানুজ এই মতের ব্যাখ্যাকর্ত্তা। ইয়ুরোপের প্রাচীন দার্শনিক প্লেটোও প্রকারান্তরে এই কথাই বলিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক-প্রবর হেগেলও এই মতের সমর্থক—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। হেগেলের (Hegel) জগদ্বিকাশ প্রণালীর আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে * কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছি—সুতরাং এখানে তাহা বিস্তৃতরূপে বলিবার প্রয়োজন নাই।

আমরা বলিয়াছি যে বিজ্ঞান-আরোহণ-প্রণালী ও দর্শন অবরোহণ-প্রণালীতে এই বিশ্বরহস্যের অধ্যয়ন করিতেছে। বিজ্ঞান স্থূল হইতে সূক্ষ্মে এবং সূক্ষ্ম স্থূলে যাইতে চেষ্টা করিতেছে। এই দুই প্রণালী ছাড়া আরও একটি প্রণালী (Method) আছে। সেইটী হইতেছে কাব্যের প্রণালী, কাব্য যে প্রণালীতে জগদ্ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছে তাহা ইহাদিগের প্রণালী হইতে স্বতন্ত্র

* "কাব্যে সৌন্দর্য্যের বিকাশ"—জাহ্নবী, ১৩১৪,...

প্রকারের। কাব্য বিজ্ঞানের ন্যায় স্থূল হইতে সূক্ষ্ম বা দর্শনের ন্যায় সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে যাইতেছে না—পরন্তু এই সূক্ষ্ম ও স্থূল, অসীম ও সসীম, জড় ও চৈতন্যকে—সমস্তকে ছাড়াইয়া কাব্য এমন এক ঊর্দ্ধলোকে উঠিয়া যায় যে, সেখান হইতে এই সূক্ষ্ম-স্থূল-রহস্য, অসীম-সসীম-রহস্য তাহার নিকট অতি সরল সহজবোধ্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। বিজ্ঞানের ন্যায় কাব্য কঠোর শক্তির সাধনায় তিল তিল করিয়া নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতেছে না—স্থূল হইতে সূক্ষ্মে যাইতেছে না—অথবা দর্শনের ন্যায় জ্ঞান দ্বারা, যুক্তি দ্বারা, তর্ক দ্বারা সূক্ষ্মের ভিতর দিয়া স্থূলকে মীমাংসা করিতেও প্রয়াস পাইতেছে না; কিন্তু কাব্য তাহার ঐশী প্রতিভায়—আশ্চর্য্য শক্তি বলে এই সমস্ত অতিক্রম করিয়া অতি দূর—অতি ঊর্দ্ধে এমন একস্থানে দণ্ডায়মান হইতে পারে যে, সেখান হইতে এই জড় ও চৈতন্য, জগৎ ও ব্রহ্মের সমস্ত কূটতর্ক, সমস্ত গোপন রহস্য তাহার নিকট ধরা পড়িয়া যায়। পর্ব্বতচূড়ায় আরোহণ করিলে যেমন ঊর্দ্ধে, নিম্নে চারিপার্শ্বের সমস্ত বৈচিত্র্যই একই সময়ে দৃষ্টিপথে উপস্থিত হয়—তেমনই কাব্য তাহার প্রতিভার গিরি-শৃঙ্গে উঠিয়া—এই জগৎ-বৈচিত্র্য—এই নদনদী পর্ব্বতসমুদ্র—এই চন্দ্রতারা গ্রহনক্ষত্র—এই বিচিত্র জীবলোক—ইহাদিগের অতীত অতি দুর্জ্ঞেয় সেই অতীন্দ্রিয় সত্ত্বা সমস্তই একই দৃষ্টিতে দেখিতে পায়। বিদ্যুতালোকে যেমন অন্ধকারের সমস্ত জটিল রহস্যই স্পষ্ট হইয়া উঠে, কাব্যের দিব্য জ্যোতিঃর সম্মুখেও তেমনি জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের সমস্ত জটিলতাই পরিষ্কার হইয়া উঠে। সমস্তই তাহার নিকট একই ঐক্যের ভিতর, সমস্ত দ্বন্দ্ববিরোধই একই মহান্ আনন্দের ভিতর সুন্দর হইয়া উঠে। তাহার দৃষ্টি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমস্তকেই অতিক্রম করে—তাহার হৃদয় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের হৃদয়ের সঙ্গেই স্পন্দিত হয়—তাহার বীণার ঝঙ্কার বিশ্বের রহস্যময় সঙ্গীতেরই প্রতিধ্বনি মাত্র বলিয়া বোধ হয়। জড় ও চৈতন্য, সান্ত ও অনন্ত, আর তাহার নিকট বিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হয় না—তাহারা একই নিয়মের ভিতর সুসম্বদ্ধ হইয়া উঠে। স্বপ্রকাশ ও অপ্রকাশ, স্থূল ও সূক্ষ্ম তাহার নিকট আর রহস্যান্ধকারময় বলিয়া বোধ হয় না—একই আশ্চর্য্য জ্যোতিঃতে তাহারা কবির দৃষ্টির সম্মুখে আলোকিত হইয়া উঠে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কবির নিকট একই সূত্রে গ্রথিত, পৃথিবী ও আকাশ একই সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড কবির নিকট একই সৌন্দর্য্যের বিকাশ। বিজ্ঞানের প্রণালীকে আমরা বলিয়াছি আরোহণ-প্রণালী, দর্শনের প্রণালীকে বলিয়াছি অবরোহণ-

প্রণালী—কাব্যের এই প্রণালীকে কি নাম দিব, তাহা ভাষায় খুঁজিয়া পাইতেছি না। বোধ হয় সমদর্শন-প্রণালী (Synthetical method) এই নাম দিলে কিয়ৎ পরিমাণে ঠিক হইতে পারে।

মানুষের শৈশব-সাহিত্য এই কাব্যের প্রণালী ভাল করিয়া অনুসরণ করিতে পারে নাই। জীব, জগৎ ও ব্রহ্মকে আদিম সময়ের কাব্য স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারে নাই। তাহাদের পরস্পরের ভিতর যে একটা সম্বন্ধ আছে, তাহা তাহারা বুঝিয়াছিল—কিন্তু সে সম্বন্ধ যে কি প্রকার এবং তাহাদের প্রত্যেকের বিশেষত্বই বা কিরূপ, তাহা অনুধাবন করিতে পারে নাই। এইজন্য, জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম, সকলেই তাহাদের নিকট এক প্রহেলিকাময় বলিয়া বোধ হইত। তাহাদিগের রহস্যের মীমাংসা করিতে যাইয়া, তাহাদিগকে তাহারা আরও রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছিল। তাই শৈশব যুগের সাহিত্য অগণিত দেবদৈত্য পরিপূর্ণ—নন্দন কানন ও অপ্সরার অবিরাম লীলাক্ষেত্র। স্বর্গমর্ত্ত্যে বড় সুখের সম্বন্ধ—অনবরত যাওয়াআসা চলিতেছে। দেবগণের সঙ্গে মানুষের কুটুম্বিতার অন্ত নাই। দেবগণ নিমন্ত্রিত হইয়া মানুষের যজ্ঞক্ষেত্রে আসিতেছেন, আবার মানুষ নিমন্ত্রিত হইয়া দেবলোকে যাইয়া অপ্সরাদের নৃত্যগীতে আনন্দ উপভোগ করিতেছে এবং সময়ানুসারে যুদ্ধে দেবশত্রু অসুরকে হটাইয়া দিয়া স্বর্গের বিজয়-মাল্য লাভে ধন্য হইতেছে। প্রত্যেক প্রাচীন সাহিত্যই মানব-হৃদয়ের এই সরল কল্পনারচনায় পরিপূর্ণ। এই যুগের মানবজ্ঞান বিশ্বরহস্য সমাধান করিতে যাইয়া তাহাকে নিতান্তই আপনার মনের মত করিয়া গড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিল। তাহার নরক—তাহারই কঠোর শাস্তি ব্যবস্থার অনুকরণ; তাহার স্বর্গ—তাহারই সুখ-বিলাসের পূর্ণকল্পনা, তাহার ঈশ্বর—তাহারই নিজেদের মত নিয়ম-রচনা করিয়া এই বিশ্বরাজ্য চালাইতেছেন।

কিন্তু এই বালকসুলভ আনন্দে সাহিত্য চিরকাল পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে না। দর্শন, বিজ্ঞান যেমন ক্রমে ক্রমে এই বিশ্বব্যাপারের ব্যাখ্যা করিতে লাগিল—কাব্যও তেমনি তাহার বাল্যক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া এই জগৎ-রহস্যের প্রকৃত সমাধানে প্রবৃত্ত হইল। এই সমস্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া স্বভাবতঃ সেই দুর্জ্ঞেয় অনন্ত রহস্যই প্রথমে তাহার সম্মুখে পড়িল। তাই প্রথমতঃ এই জগৎ তাহার নিকট অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই গণ্য হইল। অদ্বৈতবাদ যেমন জড়কে উড়াইয়া একমাত্র চৈতন্যেরই স্থাপনা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, এই যুগের কাব্যও তেমনি জগৎকে পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ ব্রহ্মকে লাভ করিবার জন্যই

ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এই বিশাল বাহ্যজগৎ, এই বিচিত্র জীবলোক ইহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া, কেবলমাত্র অনন্তের উদ্দেশেই এই যুগের কাব্য যাত্রা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। তাই এই যুগের কাব্যকে জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ স্থাপনাতেই পর্য্যবসিত দেখিতে পাই। বাইবেলের প্রাচীন কবিগণ * এই শ্রেণীর কবি। বিশাল বৈষ্ণব কাব্যসাহিত্যের অধিকাংশই এই শ্রেণীর। বৈষ্ণব কবিগণ যে দুর্জ্ঞেয় ব্রহ্মরহস্য লাভ করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন, তাহার তুলনায় তাঁহাদের নিকট এই জগৎ গণনীয় বিবেচিত হয় নাই। যে বিশুদ্ধ জ্যোতিঃকে তাঁহারা দেখিতে চাহিয়াছিলেন, পশ্চাতের এই স্থূল ও জড় তাহার নিকট ম্লান বোধ হইয়াছিল। ব্রহ্মকে যেরূপভাবে তাঁহারা হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন, জগতে তাহা সম্পূর্ণ নূতন। সেই দুর্জ্ঞেয়কে যেমন সৌন্দর্য্যের ভিতর তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, অন্যকেহ তাহা দেখিয়াছে কিনা সন্দেহ। বেদান্তের নির্গুণ নিষ্ক্রিয়ই তাঁহাদের নিকট সমস্ত রসের আধার হইয়া উঠিয়াছিল—সাংখ্যের নিরীশ্বর প্রকৃতিবাদের ভিতর দিয়াই তাঁহারা বৃন্দাবনলীলার সমস্ত মাধুর্য্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের হৃদয়-যমুনার কূলে অনন্তসুন্দরের বংশীরবের যে প্রতিধ্বনি উঠিয়াছিল—জগতের কোন কবির বীণায় সেরূপ ঝঙ্কার উঠে নাই; বৃন্দের প্রতি রেণুকণায় তাঁহারা যে প্রেমপ্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কোন কাব্যেই তাহার তুলনা পাওয়া যায় না; কিন্তু তাঁহারা যে ভাবে দেখিয়াছিলেন তাহা যে কিয়ৎপরিমাণে অসম্পূর্ণ দর্শন, তাহা আমাদিগকে বলিতেই হইবে। রামানুজের অনুবর্ত্তী হইয়াও তাঁহারা অনন্তজ্ঞান ও অনন্তসুন্দরের কেবল এক পার্শ্বই দেখিয়াছিলেন। জীবহৃদয়ে অনন্তসুন্দরের যে লীলারহস্য তাহাতেই তাঁহারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই অনন্তজ্ঞানময়ের যে জ্ঞানলীলা জগতের মধ্যে প্রকটিত হইতেছে, তাহা তাঁহারা দেখিতে ইচ্ছা করেন নাই। সেইজন্য একপার্শ্ব দেখিয়াই তাঁহারা কুলমান তেয়াগিয়া সেই প্রেমযজ্ঞে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, একদিকে উচ্ছৃঙ্খল বন্ধতাহীন লৌকিক প্রণয়, অন্যদিকে শ্রদ্ধাহীন কপট বৈরাগ্য ও কর্ম্মহীন অলস জড়তা।

কিন্তু বলিয়াছি ত যে সমস্ত ক্রিয়ারই উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া আছে। জীব ও জড়কে তাড়াইয়া দিলেই ত চলিবে না—সে আবার দ্বিগুণ বেগে আমাদিগকে আক্রমণ করিবে। ইহলোককে মায়া বলিয়া ভুলাইলেই ত চলিবে না, সেই মায়া

---

* See "Psalms".

আমাদিগকে আরও প্রচণ্ড বেগে টানিয়া লইয়া যাইতে থাকিবে। যাহা সত্য, তাহাকে জোর করিয়া মিথ্যা বলিলেই সে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয় না। এক সময়ে সে তাহার সত্যতা আমাদিগের উপর প্রমাণ করিবেই। আঘাত যত বেগে হইবে, প্রতিঘাতও তত বেগেই হইবে। তাই ইহার পরে কাব্যের যে তৃতীয়াবস্থা উপস্থিত হইল, তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। এই যুগের কাব্যকে আমরা জড়বাদী কাব্য বলিতে পারি। এই যুগের কাব্য ব্রহ্মকে ভুলিয়াছিল। জীব ও জগতের সম্বন্ধ-সংস্থাপনাতেই প্রধানতঃ ইহাদিগের কাব্য নিয়োজিত হইয়াছিল। ব্রহ্মবাদী কবিগণ যেমন জড়কে তাড়াইয়া কেবল চৈতন্যের সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপনের চেষ্টায় ছিলেন, জড়বাদী কবিগণ তেমনি ব্রহ্মকে ভুলিয়া কেবল জগৎকে পাইবার জন্যই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহারা এই সসীমের পশ্চাতে যে অসীমের লীলা চলিতেছে, ব্যক্তের পরে যে অব্যক্তের রাজ্য আছে, তাহা যেন ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। মানবজীবনের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, আশাউল্লাস, কামনা ও প্রবৃত্তি, সমাজের উত্থানপতন, জয়পরাজয়—এক কথায় ইহজীবনের সমস্ত রহস্যই তাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু তাহাদিগের সঙ্গে অনন্তজীবনের কি সম্বন্ধ তাহা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন নাই। ধরণীর শ্যামল সৌন্দর্য্যে তাঁহারা মোহিত হইয়াছিলেন—কিন্তু অনন্তসুন্দরের কোন সংবাদই তাঁহারা আনয়ন করেন নাই। কামনার তীব্র সুরা-সঙ্গীতে তাঁহারা সকলকেই উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন; কিন্তু সর্ব্বকামনার সাগরের কোন তত্ত্বই তাঁহারা অবগত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। এই নাস্তিক কবিগণ জীব ও জগতের স্থূলসৌন্দর্য্যেকেই বুঝিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের অতীত সেই সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যসাগরের কোন আভাসই তাঁহাদের কাব্যে পাওয়া যায় না। ইয়ুরোপের অষ্টাদশ শতাব্দী ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের কবিতা ইহার পূর্ণ বিকাশ বলা যাইতে পারে। ইংলণ্ডের বায়রণ ও জর্ম্মণির হায়েন ইহার প্রধান কথক বলিলে, বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

ইহার ফল—তীব্র সুরাপানের পরে যেমন একটা অবসাদের উৎপত্তি হয়, তেমনি পৃথিবীময় একটা অবসাদের ছায়া পড়িয়াছিল। সারারাত্রি উচ্ছৃঙ্খল নৃত্য-গীতের পর, উৎসবাগারে যেমন সকলে ক্লান্ত হইয়া পড়ে—তেমনি অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিত্ব অলস জড়তায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। এই সময় নবযুগের কবিগণ তাঁহাদের বীণার তানে নূতন সঙ্গীত গাহিয়া উঠিলেন। নূতনপ্রভাতে তাঁহাদের কণ্ঠে ললিত রাগিণীর ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিল। জীব ও ব্রহ্মকে বিশেষরূপে

দেখিতে যাইয়া জগৎকে পরিত্যাগ করিলে ত চলিবে না; তাহাও যেমন অসম্পূর্ণতা,—জীব ও জগৎকে বিশেষভাবে দেখিতে যাইয়া ব্রহ্মকে পৃথক্ করিয়া ফেলাও তদ্রূপ অসম্পূর্ণতা। জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম ইহারা পরস্পরাপেক্ষী (Correlative); কেহ কাহারও হইতে পৃথক্ হইবার নহে। পরস্পর পরস্পরের ভিতর দিয়াই ইহারা পূর্ণ। এক সত্য ব্রহ্ম, তিনিই আবার জীব ও জগতের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ (Self-manifestation) করিতেছেন। জীব ও জগৎ, তাঁহারাই বিধা বা প্রকাশমাত্র। যে কবি ইহাদের সকলকে সমদর্শনে (Synthetical method) দেখিতে পারিবেন, তিনিই ইহাদের সমস্যার মীমাংসায় কৃতকার্য্য হইবেন—তিনিই এই বিশ্বরহস্যের গোপনবার্ত্তা আনিতে পারিবেন। নবযুগের কবিগণ ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন; তাই তাঁহাদের নিকট জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম আর অসংলগ্ন পৃথক্ ব্যাপার নহে,—তাহারা পরস্পরের ভিতর পরস্পরে সুসম্বদ্ধ। একই মহান্ জ্ঞান তাহাদের ভিতর দিয়া বিকাশ পাইতেছে—এক-মহান্ সৌন্দর্য্যই তাহাদের ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছে—এক মহান্ আনন্দই তাহাদের সমস্তের ভিতর লীলাপ্রকাশ করিতেছে। জগৎ আর তাঁহাদের নিকট শুধু জড়সমষ্টি নহে, তাহা অনন্ত শক্তির ক্রীড়ানিকেতন; জীবন আর শুধু উদ্দেশ্যহীন, ক্ষণভঙ্গুর নহে, তাহা অতীন্দ্রিয় দুর্জ্ঞেয় রহস্যের আভাস;—ব্রহ্ম আর শুধু নির্গুণ নিষ্ক্রিয় নহে—সর্ব্বত্র প্রকাশমান্ আনন্দস্বরূপ!

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

রমণী।

বালিকা।

সারল্য উল্লাস-শান্তি কোমল পরাণে
জীবনের পুণ্য-ঊষা করেছে সঞ্চার,
কোমল মধুর বাণী আঁনে যেন কাণে
স্বপ্ন-শ্রুত দেববীণা-জনিত ঝঙ্কার।
বিলাস আবেশ-হারা সুষমা জড়ায়ে
শোভিছে অনুপ তনু ফুল-সুকুমার;
কি পুণ্যে মানব বুঝি পেয়েছে কুড়ায়ে
ইন্দ্রাণীর কণ্ঠচ্যুত মন্দারের হার।
মায়ামুগ্ধ মাতাপিতা—সোদরাসোদরে
স্নেহ-মন্দাকিনী ধারা নিতি নিতি ছুটে,
ভিখারী আতুর অন্ধ পীড়িতের তরে
আছে দুটী অশ্রুবিন্দু আঁখি-পদ্মপুটে;
সংসারের শ্রান্ত পান্থ 'মা' বলে তোমায়,
সোণার শৈশব স্মরি' শিশু হতে চায়।

কিশোরী।

তরুণ তনুর তরু বসন্ত আবেশে
ফুটাইছে একে একে সুষমার ফুল,
বাসনা গড়িছে প্রেম কল্পনার দেশে
সুখের অপ্সর-স্বর্গ, উল্লাসে অতুল।

শৈশব দাঁড়ায়ে পিছে—সম্মুখে যৌবন,
অভিমানে শৈশবের আঁখি ছলছল
করে স্বর্ণদীপ, মুখে হাসি বিমোহন
আদরে যৌবন বলে চল চল চল।
মোহিতা চাঞ্চল্যময়ী যৌবনের ছলে,
সাধের সঙ্গিনীগণ খেলিবার ঘর,
শৈশবের স্নেহ-স্নিগ্ধ স্বজনসকলে
পূর্ণ নাহি হয় আর উদ্দাম অন্তর।
দূরে যেন বাজে বাঁশী—অলকার আলো,
কে যেন কহিছে কাণে কে বাসিবে ভালো।

যুবতী।

পূর্ণ যৌবনের তেজে প্রদীপ্তাসুন্দরী,
মধ্যাহ্ন ভানুর করে ফুল শতদল,
কি গাম্ভীর্য্য কি সৌন্দর্য্যে দিক্ আলো করি,
আপনার রূপগর্ব্বে আপনি চঞ্চল!
ভাদ্র মাসে ভরা নদী কূলে কূলে জল,
লাবণ্য-জ্যোছনা কিবা ঢল ঢল হাসে,
প্রণয়ের মৃদুভাষা ফুটে কল কল,
বাসনায় বহে যায় উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে।
উচ্চ হাসি উচ্চ ভাষা উচ্চ অভিলাষ,
পূর্ণ প্রেমাকাঙ্ক্ষা জাগে পবিত্র অন্তরে
সোহাগেতে বিগলিতা অসীম উল্লাস,
অভিমানে আত্মহারা ক্ষুদ্র অনাদরে।
অমিয়া মরমমাঝে—মদিরা অধরে,
লোচন-লীলায় কত ফুলশর ঝরে।

প্রৌঢ়া।

যৌবন-মধ্যাহ্ন শেষে আসিছে গোধূলি,
নাই সে লালসা তৃষা আছে ভালবাসা
জীবের কল্যাণে যেন আপনারে ভুলি
অন্নপূর্ণা অবতীর্ণা পুরাইতে আশা।
করুণা বাজায় বীণা—পূরবী রাগিণী!
মরমে মমতা-মাখা ধৈরয সংযম,
বুঝিয়াছে মাতৃ-স্নেহ পতি-সোহাগিনী
আত্ম-বিসর্জ্জনে কত স্বর্গ অনুপম!
বিমল হিয়ায় প্রেম—অমিয়ালহরী
প্রতিদিন প্রতিদানে শতধারে বয়
পবিত্র গোমুখীধারা গিরি পরিহরি
নাশিতে তৃষার তাপ দেশ যুড়ি রয়।
পতিপুত্র পরিজন প্রেমে আত্মহারা
পুণ্যময় স্বামিকুলে স্থির ধ্রুবতারা!

প্রবীণা।

জীবন-দিনান্তে কত সায়াহ্ন মধুর।
শ্রান্ত প্রাণে সান্ত্বনার অমিয় উচ্ছ্বাস;
সংসারের কোলাহল-পিছে, বহুদূর—
শত সুখদুঃখস্মৃতি—শত অভিলাষ।
মমতার গ্রন্থি ধীরে খুলিতেছে নারী,
সাঙ্গ জীবনের খেলা—মৌনতৃপ্ত প্রাণ
নিদ্রাতুর শিশু সম দু'বাহু পশারি,
অনন্তের স্নেহকোলে মাগিছে বিরাম।
আননে পুণ্যের ছায়া—সন্তোষের হাসি,
দিনান্তের আলো যেন সন্ধ্যার বয়ানে,
বিলায়ে করুণা-সিক্ত আশীর্ব্বাদ রাশি
উঠিছে সৌরভ-সম অনন্তের পানে।
সাধি আত্মত্যাগ-ব্রত—ভুলি আপনারে
কি স্বর্গ দেখিছ দেবি, মরণের পারে?

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

শেষ কাজ।

হীরালাল ও শ্যামলাল দুই ভাই, গ্রামের লোকের কাহারও কিছু অনিষ্ট না করিলেও তাহারা করিতে পারিত না—এমন কুকাজ জগতে ছিল না। অর্থের জন্য, নিজের সুখের জন্য, তাহারা চুরি, ডাকাতি, হত্যা আদি কোন পাপই বাকী রাখে নাই। গ্রামের লোকে জানিত, মাঝে মাঝে দুই ভাই দেশান্তরে ব্যবসা করিতে যায় এবং ব্যবসার অন্তে প্রচুর ধন লইয়া বাড়ী ফিরে। তাহাদের কুকীর্ত্তির কথা কাহারও নিকট প্রকাশ ছিল না। সকলে জানিত, তাহারা শান্তশিষ্ট সাধারণ লোক, কাহারও ভালমন্দয় থাকে না, নিজের কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকে, সময় সময় লোকের উপকারও করে; ব্রাহ্মণ অতিথিকে কিছু কিছু দান করে, তিলক কাটে, মালা জপে। কাজেই লোকে বুঝিত তাহারা নিতান্ত মন্দলোক নহে।

তখন মোগল ও মারহাট্টায় যুদ্ধ চলিতেছিল। মহারাজ শিবাজীর মৃত্যুর পর মোগলগণ তাঁহার গিরিদুর্গগুলি একে একে অধিকার করিতেছিল। সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত খিঞ্জির দুর্গ এক সুন্দর দুর্গম পর্ব্বত-শৃঙ্গের উপর অবস্থিত। মোগল তাহা কয়েকবার চেষ্টা করিয়া লইতে পারে নাই। পর্ব্বতের সানুদেশে দুর্গে উঠিবার পথে দুর্গ হইতে অর্দ্ধক্রোশ পরিমিত দূরে, একটী ক্ষুদ্র রক্ষা-মন্দির ছিল। মোগলের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য কয়েকজন প্রহরী এই মন্দিরে রক্ষিত হইত। মোগল আসিতেছে দেখিলে, তাহারা নিকটস্থ এক শুষ্ক খড়ের স্তূপে অগ্নিসংযোগ করিয়া দুর্গাভিমুখে পলায়ন করিত। দুর্গস্থ সৈনিকগণ অগ্নি দেখিয়া শত্রুর আগমন বুঝিয়া দুর্গরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইত।

সেদিন অমাবস্যা। সন্ধ্যার প্রাক্কালে রক্ষামন্দিরে দুইজন ভক্ত সাধু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মন্দিরস্থ সৈনিক কয়জন সানন্দে তাহাদের সহিত বার্ত্তালাপে প্রবৃত্ত হইল। সাধুগণ ধর্ম্মের কথা কহিয়া, তুকারামের ভজন গাহিয়া সৈনিক কয়জনকে মুগ্ধ করিল। সন্ধ্যাসমাগমে সাধুগণ দেবতার পূজা করিল, ও আহারাদি প্রস্তুত করিতে লাগিল। সৈনিকগণ তাহাদের হস্ত-নির্ম্মিত দেবপ্রসাদ পাইবার জন্য সমুদায় আয়োজন করিয়া দিল। দেবপ্রসাদ-ভক্ষনান্তে

সিপাহীগণ শীঘ্র শীঘ্র নিদ্রিত হইয়া পড়িল। তাহাদের সে নিদ্রা আর ভাঙ্গে নাই। চির-নিদ্রিত সিপাহীগণের দেহ ও গৃহ হইতে, অর্থাদি গ্রহণ করিয়া সাধুদ্বয় প্রস্থান করিল। তাহারা সেই হীরালাল আর শ্যামলাল।

বুঝি তাহাদের পাপের ভার পূর্ণ হইয়াছিল। সেই অন্ধকার রজনীতে পার্ব্বত্যপ্রদেশে তাহাদের পথ গোলমাল হইয়া গেল। অনেকক্ষণ ঘুরিয়া তাহারা মোগল শিবিরের নিকটে একজন মোগল প্রহরীর হস্তে পড়িল। তাহারা যখন ঘুরিতেছিল, সেই সময়ে একজন মোগলসেনাধ্যক্ষ পার্ব্বত্য দুর্গের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিয়াছিল। সে দূর হইতে রক্ষামন্দির আলোকশূন্য ও জনশব্দশূন্য দেখিয়া সাহসে ভর করিয়া সেখানে গিয়া প্রকৃত বিবরণ অবগত হইল। দুর্গ অতর্কিতভাবে আক্রমণ করার এই ত প্রকৃত অবসর। কিছুক্ষণ মধ্যে মোগলসেনা নিঃশব্দে দুর্গাভিমুখে উঠিতে লাগিল। এই সময়ে হীরালাল ও শ্যামলাল তাহাদের হস্তে পতিত হইল।

প্রথমে হীরালালকে সেনাপতির নিকট উপস্থিত করা হইল। ভয়ে সে শুকাইয়া গিয়াছিল। সে সেনাপতির পদতলে পতিত হইয়া অতি করুণস্বরে কহিল "ওগো আমায় মের না আমার সর্ব্বস্ব আমি তোমাকে দিব।" তখন যুদ্ধের সময়, উভয় পক্ষই পরস্পরের গুপ্তচর ধরিয়া বধ করিতেছিল। হীরালালের সন্দেহজনক আকৃতি দেখিয়া সেনাপতি তাহাকে গুপ্তচর বলিয়া স্থির করিলেন, তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল। অবিলম্বে জনৈক সৈনিকের বন্দুকের গুলি তাহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিল। শ্যামলাল কিছুদূর হইতে ভ্রাতার করুণ বিলাপ-ধ্বনি শুনিয়াছিল, এক্ষণে বন্দুকের শব্দে সব বুঝিতে পারিল। জীবনরক্ষার জন্য সে করিতে না পারিত, এমন কাজই ছিল না; কিন্তু এবার আর প্রাণ-রক্ষা হইবে না। সে বুদ্ধিমান ছিল, ভাবিল "কাঁদিয়া মিনতি করিয়া যখন কোনও ফললাভ হইবে না তখন কেন কাপুরুষের মত ক্রন্দন করিব। তার চেয়ে বীরের মত মরিব, কেন নিজের দুর্ব্বলতা দেখাইব।" এই ভাবিয়া সে নিজের মনস্থির করিল, তাহার মুখমণ্ডল দৃঢ় ও কঠোরভাব ধারণ করিল। সে মনের মধ্যে আরও একটা কি ঠিক করিয়া লইল।

সেনাপতির সমীপস্থ হইয়া সে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"আমি আপনাদেরই হাতে, যখন ইচ্ছা আমাকে হত্যা করিতে পারেন; কিন্তু যদি আমার জীবন-দান করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন, তবে আপনাদিগকে দুর্গ-জয়ের এক সুন্দর পথ দেখাইয়া দিতে পারি।" সেনাপতি কিছুক্ষণ ভাবিলেন, পরে তাহাকে

বলিলেন "আচ্ছা, তুমি যদি ভাল পথ জান, তবে তাহা দেখাইয়া দিলে প্রাণে বাঁচিবে।" অনন্তর তিনি দুইজন কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন "এই লোকের সঙ্গে গিয়া পথ জানিয়া আইস, পথিমধ্যে ইহার বিশ্বাসঘাতকতার লক্ষণ মাত্র দেখিলেই ইহার শিরশ্ছেদ করিবে।"

ধীরে ধীরে সেই গিরিদুর্গের পথ বাহিয়া তিনজন লোক অগ্রসর হইতে লাগিল। বন্দী মধ্যস্থলে এবং তাহার দুই পার্শ্বে দুইজন সৈনিক-কর্ম্মচারী একহস্তে বন্দীকে ধরিয়া এবং অপর হস্তে নিষ্কোশিত অসি লইয়া চলিতে লাগিল। অপর সৈন্যগণ কিছুদূরে ধীরে ধীরে তাঁহাদের অনুবর্ত্তন করিতে লাগিল। কিছুদূর যাইবার পর, পায়ে যেন ঠক্কর লাগিয়া বন্দী পড়িয়া গেল। মুহূর্ত্তমধ্যে এক শুষ্ক খড় ও কাষ্ঠের স্তূপ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া সমস্ত স্থান আলোকিত করিল। সৈন্যাধ্যক্ষদ্বয় বন্দীর বিশ্বাসঘাতকতা বুঝিতে পারিল। আলোকে উর্দ্ধোত্থিত অসি চমকিত হইল, বন্দীর মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অগ্নিকুণ্ডে পড়িল। পরমুহূর্ত্তেই প্রলয় কল্লোলসদৃশ ভীষণ শব্দের সহিত নিম্নস্থ ভূভাগ বিদীর্ণ হইয়া গেল।* বন্দীর রক্ষী-কর্ম্মচারীদ্বয় ও অগ্রগামী সৈন্য-গণের দেহ সেই ভীষণ দাহ্য পদার্থের শক্তিতে রেণুতে পরিণত হইল। অবশিষ্ট সৈন্যগণের উপর দুর্গ হইতে অবিলম্বে অজস্র গুলি বর্ষণ হইতে লাগিল। আলোকে পরিদৃশ্যমান তাহাদের দেহ সমুদায় দুর্গবাসী সৈন্যগণের লক্ষ্যভেদের সুবিধা করিয়া দিতেছিল। এই অতর্কিত ভূবিদারণ ও আক্রমণ মোগলদিগকে এত বিহ্বল করিল যেন এই আক্রমণে তাহাদের যত ক্ষতি হইয়াছিল, তেমন আর কোনও আক্রমণে হয় নাই।

খড়ের গাদার সহিত নিম্নস্থ এক বারুদের খনির সংযোগ ছিল। একটি যন্ত্রের সাহায্যে সেই সংযোগ বিচ্ছিন্ন বা সংযুক্ত করা যাইত। সচরাচর উহা সংযুক্ত অবস্থায় থাকিত। রক্ষীসৈন্য অতর্কিত অবস্থায় আক্রান্ত হইলে, এই

---

* তখনও দ্বীপশলাকা আবিষ্কৃত হয় নাই। মহারাষ্ট্রীয়গণ পোর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে শীঘ্র আলোক প্রস্তুত করিবার একটী উপায় শিক্ষা করিয়াছিল। বন্দী শ্যামলাল ঠক্কর খাইয়া পড়িবার সময় একটী কাজ করিয়াছিল: তাহাতেই মোগলগণের সর্ব্বনাশ হইল। খড়ের গাদার মধ্যস্থলে একটী সরায় করিয়া চিনিমিশ্রিত পোটাসিয়ম ক্লোরেট নামক দাহ্য পদার্থ রক্ষিত হইত, সেই সরার উপর হইতে একটী নল কিছুদূরে এক গৃহমধ্যস্থ একটী ছোট চৌবাচ্চার সহিত সংযুক্ত ছিল। বন্দী যেখানে ঠক্কর খাইয়াছিল, সেইখানেই নলের একটী কপাট বা ট্যাপ ছিল। বন্দী ইচ্ছা করিয়া ট্যাপটি খুলিয়া দেওয়াতে, চৌবাচ্চা হইতে সাল্‌ফিউরিক এসিড গিয়া উক্ত দাহ্য পদার্থের সরায় পতিত হইয়া অগ্নি উৎপাদন করিয়াছিল।—লেখক।

সংযুক্ত-অবস্থাতেই অগ্নিসংযোগ করা হইত। তাহাতে আক্রমনকারী ও আক্রান্ত—উভয় সৈন্যদলই যদিও বিনষ্ট হইত, তবে উহাতে যে বাধা পড়িত তাহাতে দুর্গস্থ সৈন্যগণ দুর্গরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিত। মোগলগণ এই খনির কথা জানিত না! পূর্ব্ব আক্রমণে তাহারা সৈনিকগণকে সুধু অগ্নি জ্বালিয়াই পলাইতে দেখিয়াছিল।

সে দেশের গাথায় শ্যামলালের কাহিনী এইরূপে লিখিত আছে—স্বদেশ-হিতৈষী শ্যামলালের যশে মহারাষ্ট্র পরিব্যাপ্ত হউক, কারণ সে আপন জীবন দিয়া স্বদেশ রক্ষা করিয়াছিল। দুরাত্মা মোগল যখন বিষপ্রয়োগ দ্বারা রক্ষী-সৈন্যের প্রাণনাশ করিয়া নিঃশব্দে খিঞ্জিদুর্গ অধিকার করিতে যাইতেছিল, সেই সময়ে শ্যামলাল তাহাদের সহিত মিলিত হইল। সে সেই বিপদে দুর্গরক্ষার কোনও উপায় না দেখিয়া আপন জীবন দিতে প্রস্তুত হইল; কিন্তু শুধু যদি জীবন দিলেই দুর্গরক্ষা হইত, তবে সহস্র সহস্র মহারাষ্ট্র সন্তান তাহার জন্য প্রস্তুত আছে। শ্যামলাল শুধু প্রাণই দেন নাই, এমন সুকৌশলে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াঃ ছিলেন, যাহাতে দুর্গ রক্ষা পাইয়াছিল।

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ফলিত রসায়ন।*

বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং দাসবৃত্তেন ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।"

এইরূপ একটি প্রবাদ আমাদের দেশে বহুপূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে। দেশের অবস্থা উন্নত করিতে হইলে, প্রধানতঃ বাণিজ্যের দিকে লক্ষ্য রাখা এবং মনোযোগী হওয়া বিশেষ আবশ্যক। তৎপরে কৃষিকার্য্যের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত। রসায়ন-বিজ্ঞানের সাহায্যে এই দুই বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে, সেই সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

পৃথিবীর যাবতীয় ব্যবসা বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ রসায়ন-বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত সুচারুরূপে চালিত হইতে পারে না। বাণিজ্য-জগতে প্রত্যেক পদে রসায়নের সাহায্য

* রাজসাহী-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

অনুভূত হয়। বিজ্ঞানের সাহায্যে বাণিজ্য-জগৎ যেরূপ উন্নত হইয়াছে, তাহা কল্পনারও অতীত। সত্যসত্যই আমেরিকা নব-অভ্যুদয়ে ভূমণ্ডলকে নূতন করিয়া গড়িতে অগ্রসর হইয়াছে। এদিকে জর্ম্মাণি এক এক করিয়া জগতের অধিকাংশ ব্যবসা নিজের করায়ত্ত করিতেছে। নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক উপায়ের দ্বারা অতি অল্প ব্যয়ে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া প্রতিযোগিতায় সমগ্র পৃথিবীকে পরাজিত করিয়া আপন প্রতিপত্তি স্থাপন করিতেছে। বিজ্ঞানচর্চ্চা যে কেবল ইউরোপ এবং আমেরিকা একচেটিয়া করিয়াছে তাহা নহে; এসিয়ার পূর্ব্বপ্রান্তে ভাগ্যলক্ষ্মী নিজ প্রভা বিকীর্ণ করিয়াছেন। যে জাপান ত্রিংশ বৎসর পূর্ব্বে সভ্য জগতে 'অসভ্য' বলিয়া পরিচিত ছিল, সেই জাপান আজ সভ্যজগতে প্রথমশ্রেণী অধিকার করিয়াছে। আর আমরা ভারতবাসী—জাতীয় উন্নতির প্রধান অবলম্বন বিজ্ঞান-উপাসনা ত্যাগ করিয়া বিদেশীয় প্রলোভনে ভুলিয়া ঘোর তিমিরে নিমগ্ন আছি; কিন্তু আর অধিক দিন আমাদিগকে পদানত থাকিতে হইবে না বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। স্বদেশী-আন্দোলনের সূচনার পর হইতে দেশের লোকের বিজ্ঞানশিক্ষার স্পৃহা জন্মিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্জিকা দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, বৈজ্ঞানিক ছাত্রের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। বাস্তবিক এখন বঙ্গীয় যুবকের জীবনের উদ্দেশ্য অন্যদিকে ধাবিত হইয়াছে। তাঁহারা পূর্ব্বে সরকারের চাকরী পাইলেই নিজেকে সার্থক জ্ঞান করিতেন এবং জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য সফল বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এখন অনেকে বিজ্ঞানশিক্ষার সাহায্যে স্বাধীন ব্যবসা স্থাপন করিয়া নিজের এবং দেশের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিতেছেন। চিরকালই যে ভারতের অবস্থা এরূপ শোচনীয় ছিল, তাহা নহে। পুরাকালে ভারতবর্ষে যে বিজ্ঞানচর্চ্চা ছিল, তাহার প্রমাণ স্বরূপ দুই একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করি।

(১) "দিল্লীর কুতবমিনার" সম্বন্ধে বিখ্যাত রাসায়নিক রস্কো যাহা বলিয়াছেন তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। তিনি বলিতেছেন—"হিন্দুরা যে লৌহ-প্রস্তুত সম্বন্ধে বিচক্ষণ ছিলেন, তাহা দিল্লীর কুতবমিনারের লৌহস্তম্ভ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। ইহা চল্লিশ হাত লম্বা। ইহার উপরিভাগে চতুর্থ শতাব্দীর খোদিত সংস্কৃত ভাষা এখনও বর্ত্তমান। এরূপ স্তম্ভ বর্ত্তমানকালের উন্নত কলকারখানার সাহায্যেও ঢালাই করা সুকঠিন। কি করিয়া হিন্দুরা তৎকালীন প্রথা অবলম্বন করিয়া এরূপ বৃহৎ স্তম্ভ প্রস্তুত

করিল, তাহার কারণ-নির্দ্ধারণে আমরা অসমর্থ।" উপরোক্ত বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, লৌহ-প্রস্তুত-প্রণালী আমাদের দেশে অতি উত্তমরূপে জানা ছিল। অবশ্য কেহ ইহাকে বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত বলিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষের উপরোক্ত জ্ঞান-সম্বন্ধে সন্দিহান হইবেন না।

(২) বিষ্ণুপুরের "দল" ও "মাদল" নামক তোপদ্বয়ের কথা অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। ইহার মধ্যে "মাদল" নামক তোপ এখনও বর্ত্তমান। শুনিতে পাওয়া যায়, এরূপ তোপ পৃথিবীতেও অতি অল্প। ইহার লৌহ এত উৎকৃষ্ট যে এ পর্য্যন্ত ইহা নূতনের ন্যায় রহিয়াছে।

(৩) আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় হিন্দু রসায়নের ইতিহাসে যাহা লিখিয়াছেন তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"আরব-লেখকগণের, প্রধানতঃ হাজিখলিফার গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হিন্দু-জ্যোতিষ, বীজগণিত এবং চিকিৎসাবিদ্যা আরবেরা হিন্দু বৈজ্ঞানিকের নিকট আগ্রহের সহিত শিক্ষা করিতেন এবং হিন্দু বৈজ্ঞানিকগণ কালিফদিগকে (Caliphs) শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহাদের সভায় থাকিতে বাধ্য হইতেন। মুসলমান ছাত্রগণ জ্ঞানলাভের জন্য ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান শিক্ষার স্থানে আসিয়া জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্তি করিতেন। ফলতঃ ভারতবর্ষে আসিয়া বিদ্যাশিক্ষা না করিলে, তাঁহাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ হইবে বলিয়া বিবেচনা করিতেন।" এই আরবদের নিকট পাশ্চাত্য জাতিসমূহ বিজ্ঞানশিক্ষা করেন এবং ক্রমশঃ উন্নত হইয়া আমাদিগকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়াছেন। আমার বোধ হয়, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যদি স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে বিজ্ঞানশিক্ষার ক্রমোন্নতির চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে এখন আমাদিগকে প্রত্যেক কার্য্যে এবং জীবনের প্রাত্যহিক ব্যবহার্য্য দ্রব্যের জন্য বিদেশীয়ের দ্বারস্থ হইতে হইত না। আমরা প্রত্যেক বিষয়ে বিদেশীয়ের সমকক্ষ হইতে পারিতাম। যাহা হউক, এখন অতীত বিষয় লইয়া অনুতাপ করিবার সময় আর নাই;—এখন কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাণিজ্য-জগতে রসায়নের অধিকার অতি বিস্তৃত। এখন দেখা যাউক, কিরূপে রসায়ন-শাস্ত্র বাণিজ্যজগতে এরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিল। যিনি "ফলিত রসায়ন" এবং "বৈজ্ঞানিক রসায়ন" পাঠ করিয়াছেন, তিনি দেখিতে পাইবেন—রাসায়নিক গবেষণার সাহায্যে রসায়ন-বিজ্ঞান বাণিজ্য-জগতে প্রবেশলাভ করিয়াছে। রাসায়নিক বিশ্লেষণের সাহায্যে ফলিত রসায়নের কার্য্য

সহজ হইয়াছে। অবশ্য যে ব্যক্তি গবেষণার সাহায্যে নূতন ব্যবসায় প্রণয়ন করেন বা পুরাতন ব্যবসা উন্নত উপায়ে এবং অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে চালনা করিবার পন্থা উদ্ভাবন করেন, তিনি প্রায়ই স্বকার্য্যের ফলভোগে বঞ্চিত হন। বৈজ্ঞানিকগণ বহুবর্ষব্যাপী গবেষণার দ্বারা এক নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিলেন, হয়ত ইহার জন্য অনেক স্থলে তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইল; কিন্তু তাঁহার উদ্ভাবিত পন্থা-অবলম্বনে বাণিজ্যজগৎ যে উপকৃত হইল তাহার ফললাভে তিনি বঞ্চিত হইলেন; কিন্তু যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে সরস্বতীর উপাসনায় ব্যস্ত তাহারা লক্ষ্মীর উপাসনা করিতে সময় পান না এবং তজ্জন্য নিজ উদ্ভাবিত পন্থা যাহাতে সমগ্র মানবসমাজের উপকারে আইসে তাহার চেষ্টা করেন। এইরূপে নূতন নূতন পন্থা প্রণয়ন করিয়া সমগ্র জনসাধারণকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রাখেন। তাঁহাদের এই নিঃস্বার্থ পরোপকারিতার জন্য স্বর্ণাক্ষরে তাঁহাদের নাম লিখিত থাকিবে। গবেষণার সাহায্যে বাণিজ্যজগৎ যে উপকৃত হইয়াছে, তাহার উদাহরণস্বরূপ দুই একটি বিষয় বর্ণনা করিব।

বিখ্যাত জর্ম্মান রাসায়নিক হোয়েলার (Wohcler) যখন জৈব রসায়নের একটী পদার্থ (Urea) কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করিলেন, তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে বৈজ্ঞানিক জগতে তাঁহার প্রণয়নবার্ত্তা এরূপভাবে আদৃত হইবে এবং ইহার সাহায্যে বৈজ্ঞানিক জগতে এবং ফলিত রসায়নের কার্য্যাবলীতে এরূপ বিপ্লব সাধিত হইবে। মানব চিরপূজিত প্রকৃতি দেবীকে উপেক্ষা করিয়া বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতির কার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। ফরাসী রসায়নবিৎ বার্থোলে (Bertholet) রাসায়নিক যন্ত্রাগারে মানবের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করিয়া কৃত্রিম বস্তুর তালিকা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন—বিজ্ঞানের সাহায্যে মানব এতদূর উন্নত হইবে যে, মানবের ব্যবহার্য্য যাবতীয় দ্রব্যের জন্য আর অনিশ্চিত প্রকৃতি দেবীর দ্বারস্থ হইতে হইবে না। মানব নিজ বিজ্ঞানশিক্ষার বলে সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া লইবেন। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত দ্রব্যাদির মধ্যে রঞ্জনশিল্পের দ্রব্যাদি, গন্ধদ্রব্যাদি উদাহরণ স্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে। পাথুরে কয়লা হইতে কোক্ প্রস্তুতকালে যে বায়বীয় পদার্থ নির্গত হয়, তাহার কিয়দংশ উৎপাতিত হইয়া আলকাত্‌রায় পরিণত হয়। পূর্ব্বে এই আলকাত্‌রা কোন বিশেষ কার্য্যে ব্যবহৃত হইত না; কিন্তু রাসায়নিক গবেষণার সাহায্যে এই উপেক্ষিত নষ্ট দ্রব্য হইতে জৈব রসায়নের (Organic Chemistry) অধিকাংশ দ্রব্য প্রস্তুত

হইতেছে। এই আলকাত্‌রা হইতে রঞ্জনদ্রব্যাদি প্রস্তুত জন্য জর্ম্মানিতে এক বিশাল কারখানা চলিতেছে। এই কারখানার বিস্তার শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। প্রায় দুই শত রাসায়নিক এইস্থানে কার্য্য করিতেছেন; কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষে দুই শত রাসায়নিক আছেন কিনা সন্দেহ। এই কারখানার প্রস্তুত কৃত্রিম রঞ্জন দ্রব্য ভারতবর্ষের নীলচাষের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এই সমস্ত দ্রব্য প্রণয়নের জন্য রাসায়নিক গবেষণা কি পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে, তাহার প্রমাণস্বরূপ একটি কথা বলা প্রয়োজন বিবেচনা করি। মহাত্মা কেকুল (Kekule) যখন বেঞ্জিনের আকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাহার রাসায়নিক অবয়ব (Chemical Formula) নির্দ্ধারণে সমর্থ হইলেন, তাহার পূর্ব্বে কেহ ভাবেন নাই যে, আলকাত্‌রা হইতে আমাদের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে পারিবে। উপরোক্ত বর্ণনা হইতে রসায়ন-শাস্ত্রে জ্ঞান এবং রাসায়নিক গবেষণার একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। এখন আমাদের দেশে রাসায়নিক ব্যবসা কি প্রকারে চালিত হইতেছে, তাহা দেখা যাউক।

পাশ্চাত্য জগতে যেরূপভাবে রসায়নের সাহায্যে ব্যবসা চলিতেছে, আমাদের দেশে সেরূপ ব্যবসা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহা আছে তাহাতে দেশের অভাব কণামাত্রও পূরণ হয় না। যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদি আমাদের ব্যবহারে আসে, তাহার মধ্যে গন্ধকদ্রাবক (Sulphuric acid) প্রধান। এমন অতি অল্পই রাসায়নিক দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার প্রস্তুতপ্রণালীতে এই দ্রাবক কোন না কোন আকারে ব্যবহৃত হয় নাই। এই গন্ধকদ্রাবক প্রস্তুত জন্য মিশ্রিত গন্ধক (Sulphides) বা অমিশ্রিত গন্ধক (Native Sulphur) প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে গন্ধকদ্রাবক প্রস্তুতের জন্য দুইটি মাত্র কারখানা আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় বিক্রয়াভাবে ইহাদিগকে প্রায়ই কারখানা বন্ধ রাখিতে হয়। যেদেশে গন্ধকদ্রাবকের বিক্রয় নাই, সে দেশে রাসায়নিক ব্যবসা নাই বলিলেও ক্ষতি হয় না। পাশ্চাত্য জগতে ইহার বিক্রয়াধিক্যই জাতীয় সভ্যতার পরিমাপক বলিয়া গণ্য হয়। আমাদের দেশীয় কারখানায় ইতালী হইতে অমিশ্রিত গন্ধক আমদানী হইয়া থাকে। যদিও আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে মিশ্রিত গন্ধক পাওয়া যায়, তথাপি আমাদিগকে বিদেশী অমিশ্রিত গন্ধকের দ্বারস্থ হইতে হয়। তাহার দুইটি কারণ;—(১) ইহার ব্যবহার অতি সহজ। (২) মিশ্রিত গন্ধক ব্যবহার করিতে হইলে, প্রথমতঃ খনিজ পদার্থকে উত্তাপ দ্বারা দুই অংশে বিভক্ত করিতে হয়। এক অংশ

গন্ধক ধাতুতে পরিণত হয়। অন্যাংশ দগ্ধ গন্ধকে পরিণত হয়। এই দগ্ধগন্ধক অন্যান্য দ্রব্যের সহিত মিলিত হইয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা গন্ধকদ্রাবকে পরিণত হয়। অপর অংশদগ্ধ ধাতু হইতে ধাতু প্রস্তুত হইতে পারে। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ মিশ্রিত গন্ধক ব্যবহার করিয়া উভয় দ্রব্যই প্রস্তুত করেন এবং প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে সমর্থ হন। আমাদের দেশীয় ব্যবসায়ীগণ প্রচুর মূলধনের অভাবে বা রীতিমত শিক্ষার অভাবে মিশ্রিত গন্ধক ব্যবহার করেন না। কাজেই তাঁহাদিগকে বিদেশীয় গন্ধকের আশ্রয় লইতে হয়।

সাবানের ব্যবসা আমাদের দেশে কিরূপ চলিতেছে, দেখা যাউক। সাবান প্রস্তুত জন্য বঙ্গদেশে ৫।৬টি কারখানা আছে; কিন্তু ইঁহারা কেহই স্বদেশী উপকরণ ব্যবহার করেন না বা করিবার চেষ্টা করেন না। যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রয়োজন হয়, সমস্তই আমদানী হইয়া আসে। কাজেই এই সমস্ত দ্রব্যের আমদানী বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকারী বিবরণীতে সাবানের উপকরণের আমদানীর বিশেষ তালিকা নাই, তবে যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদি সাবান প্রস্তুতে এবং অন্যান্য কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, তাহার আমদানীর তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	১৯০৬-০৭ টাকা	১৯০৭-০৮ টাকা
সমগ্র রাসায়নিক দ্রব্যাদি	৬৮.৭ লক্ষ	৭৯.৩ লক্ষ
সাবানের প্রধান উপকরণ		
সর্জ্জিক ক্ষার (Caustic Soda)	৭.০৩ লক্ষ	৮.৯৪ লক্ষ
সাজিমাটীর পরিবর্ত্তে সোডা	১.১৮ লক্ষ	৬.৫৩ লক্ষ

এই শেষোক্ত দ্রব্যের আমদানীর মধ্যে ৫.৪৯ লক্ষ টাকার সোডা কেবলমাত্র বঙ্গদেশে ব্যবহৃত হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত এই সমস্ত দ্রব্য স্বদেশে প্রস্তুত না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত সাবানের ব্যবসা প্রকৃতপক্ষে দেশী বলিয়া ধরা যাইতে পারে না।

এখন কিরূপে অনেক দ্রব্যের রপ্তানির দ্বারা আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই, তাহা দেখা যাউক। সরকারী বিবরণীতে আমদানী অপেক্ষা রপ্তানির পরিমাণ বেশী দেখাইয়া আমাদিগকে সমৃদ্ধিশালী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু অনেক দ্রব্য এখানে ব্যবহার না করিয়া রপ্তানি করিয়া দিয়া আমাদিগকে দুই দিকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। একটী বিশেষ উদাহরণ দ্বারা ইহা বুঝাইবার

চেষ্টা করিব। ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর নিম্নলিখিত পরিমাণে হরিতকী রপ্তানি হইয়া থাকে ;—

১৯০৫-০৬	১৯০৬-০৭	১৯০৭-০৮
টাকা	টাকা	টাকা
৪৪৬১০০০	৪৩৯৭০০০	৫৮৯৫০০০

এই হরিতকী হইতে Tannic acid বলিয়া একটী পদার্থ প্রস্তুত হয়। ইহাকে হরিতকী-অম্ল বলা যাইতে পারে। এই অম্ল কালী-প্রস্তুত কারণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং কাঁচা চামড়ার শোধনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই কাঁচা চামড়াও প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইয়া যায়। তাহার পরিমাণ নিম্নে দিলাম।

১৯০৫-০৬	১৯০৬-০৭	১৯০৭-০৮
১৩৭৫৭১১৪০ টাকা	১৫৩৪৫২৫০৮ টাকা	১০৯৫১৫৩৪১ টাকা

আমাদের দেশে কালী প্রস্তুতকারী ব্যবসায়ীগণ বিদেশীয় হরিতকী-অম্ল ব্যবহার করেন। সরকারী বিবরণীতে দেখিলাম একস্থানে লেখা আছে "হরিতকী হইতে Tannic acid অর্থাৎ হরিতকী-অম্ল প্রস্তুত ভারতবর্ষে লাভজনক হয় নাই।" অথচ এই হরিতকী লইয়া গিয়া বিদেশীয়েরা অম্ল প্রস্তুত করিয়া পুনরায় আমাদিগের নিকট বিক্রয় করিতেছেন, ইহার কারণ কি? আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক উপায় অনবলম্বন এবং বিদেশীয়ের বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন ব্যতীত আর অন্য কোন কারণ দেখা যায় না। নাটোর হইতে রাজসাহী যাইবার পথে অনেক বাবলা বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। ইহার ছালে প্রচুর Tannic acid পাওয়া যায়। ইহাতে লাভজনক ব্যবসা চলে কিনা, রাজসাহীবাসীর দেখা কর্ত্তব্য।

এইরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, যাহা হইতে বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বনে, অনেক লাভজনক ব্যবসার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে।

এ প্রবন্ধে ফলিত রসায়ন সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই থাকিল। কেবলমাত্র ফলিত রসায়ন কিরূপে এতদূর উন্নত হইল, তাহার আভাস মাত্র দিবার চেষ্টা করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে ফলিত রসায়নচর্চ্চার আবশ্যকীয়তা প্রতীয়মান করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য এবং তাহা যদি আংশিকভাবেও পূরণ হয়, তবে লেখকের শ্রম সার্থক বলিয়া পরিগণিত হইবে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কাল্পনিক কথা। *

[মালব অধিপতি রাজ বাহাদুর যুদ্ধে নিহত হইলে, আকবর-সেনাপতি আদম খাঁ তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। রাজ বাহাদুরের এক হিন্দু পত্নীর উপর তাহার আসক্তি জন্মে, তাহাতে উক্ত রমণী তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান।]

চন্দ্রদেবী সজ্জিতা হইয়া আপন কক্ষে উপবিষ্টা।

চন্দ্রদেবী। মৃত্যু! তুমি মৃত্যু, সুন্দর, না—ভয়াবহ? ঐ একটী শব্দে বিশ্বপ্রাণ শিহরিয়া উঠে। নরকপুষ্ট, বিভীষিকাচ্ছায়াময়—তুমি মৃত্যু! সংসারের সকল সুখসৌন্দর্য্য আপনার অনন্তগর্ভে গ্রাস করিতেছ! ঐ করাল কালিমাছায়ায় জগতের সমস্ত আলোক ডুবিয়া যায়। মনুষ্যজ্ঞানাতীত দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় মৃত্যু তুমি কে? তুমি কোথায় আছ, কোথায় নাই? লোকে বলে সংসারে সুখ নাই, দুঃখ অনন্ত, যদি তাহাই হয়, তুমি তার চিরনেতা; কিন্তু তোমাকে আমি ভয় করি না। তুমি বড় বিশ্বাসঘাতক! মানবের মান, গর্ব্ব একদিনে চূর্ণ করিয়া দাও; বিশ্বাসহন্তাকে ঘৃণা করি মাত্র। না, না, আমি মনুষ্য জ্ঞানগর্ব্বকে ঘৃণা করি, সে তোমার চাতুরী বুঝে না। না—বুঝে, ভুলিয়া যায়—আলো দেখিয়া বিস্মৃত হয়! কিন্তু আলোর সঙ্গে ছায়া থাকে, বুঝে না কেন? আমি বুঝি নাই কেন? তুমি দুঃখীর আরাধ্য দেবতা, দীনের আকাঙ্খার বস্তু! ক্লান্ত জীবনের বিশ্রাম নিদ্রা, তবু কি তোমায় ডাকিয়া আনা পাপ? জানিনা এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? তুমি মৃত্যু, তুমি অন্তরের অংশ, তাই অনন্ত মঙ্গলাকর; তোমায় আমি প্রণাম করি! দেখ, আশার আলো, সুখের কিরণ উষার ন্যায় ফুটিয়া উঠে। প্রতি প্রভাতে মানবের নূতন জীবন, নূতন গতি, নূতন শৈশব! আর ঐ পশ্চিমে সকল সুষমা ডুবিয়া যায়। তমিস্র নিশির হিমস্পর্শে বিশ্বের চঞ্চল ধমনী শিথিল হইয়া আইসে; ঐ বিশ্বগ্রাসী অন্ধকার মৃত্যুর অনুরূপী। পশ্চিমেই তোমার চির-তমোময় রাজত্ব, আর ঐ সূর্য্যকরপ্রফুল্ল পূর্ব্বাকাশই বুঝি স্বর্গ! তাই কি তুমি সুন্দর নও? তুমি বড় সুন্দর; উষা অপেক্ষাও মনোমোহিনী। তুমি স্ত্রী? তা বইকি; অমন স্নিগ্ধ মধুরকান্তি আর কার? কে এমন স্নেহময়ী? এস মা মহিমাময়ী, তোমার ক্লান্ত দুহিতাকে ঐ চির-শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয়

* এই কথোপকথনগুলি সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক ওয়াল্‌টার স্যাভেজ ল্যাণ্ডরের "ইম্যাজিনারী কন্‌ভারসেশন্" গ্রন্থের অনুকরণে রচিত।

দাও। ঐ নিদ্রা, ঐ নীরবতা যেন ভাঙ্গে না। ঐ মেঘস্তরঙ্গে ফেন্ পুষ্পমালিনী জ্যোতির্ম্ময়ী কে? ঐ রক্তাম্বরধারিণী সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তি কি নিশির সহচরী? মুদিত কমলবাস তারই অঙ্গসৌরভ; বিহঙ্গম ক্লান্ত কণ্ঠে বনেবনে তাহারই আরতি বাজিতেছে! সন্ধ্যা যদি এত সুন্দর, মানবজীবনের দিবা-অবসান তবে কত মুগ্ধকর? মৃত্যু কল্পনা যদি এত মোহময়, মৃত্যু তবে কত সুন্দর! ঐ নিশি আসিতেছে, ঐ মানবজীবনের মহানিশির অণুরূপী। ঐ অচ্ছেদ্য অন্ধকারেও কি এমনি চাঁদের আলো ফোটে; এমনি নক্ষত্রমালা শোভা পায়? তবে আমি আর বাঁচিতে চাহি না। এস আমায় গ্রহণ কর। উল্লাসের লোহিতোজ্জ্বল মূর্ত্তি উর্ব্বশী উষার হাস্যময়ী কনকচ্ছটা বহুবার দেখিয়াছি। কুসুমকুন্তলা ধরণীর ন্যায় আমিও সোহাগস্পর্শে শিহরিয়া উঠিতাম, মৃদুমলয় ফুৎকার আমারও মানসকুসুমের দলরাজি ধীরে ধীরে খুলিয়া দিত। আনন্দশিশিরে আমারও দুকূল ভিজিয়া উঠিত; আমারও বীণায় একদিন ভ্রমর-ঝঙ্কার বাজিত। আমি আর কখনও রূপে মুগ্ধ হই নাই, কিন্তু আজ তোমার স্নিগ্ধ-মহিমাময় অঙ্কে সোহাগ-নিদ্রার জন্যে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। তোমার পরে কি আছে জানিনা, তবু তোমাকে আলিঙ্গন করিতে চাই; আমি তোমায় বড় ভালবাসি। আমি সংসারে আর কাহাকেও কি ভালবাসি না? আপনার প্রিয়জন, আপানার দেহ, আপনার সুখ? বাসি, কিন্তু তারও অপেক্ষা তোমায় ভালবাসি— কেন না তুমিই আমার সুখসৌন্দর্য্য রক্ষা করিবে। এই রূপযৌবন লইয়া মৃত্যুতে কি সুখ নাই? আপনার মান, গর্ব্ব, চূর্ণ না হইতে, আপনার অনুরাগ স্বাস্থ্য শক্তি লইয়া মরাতে কত সুখ! বার্দ্ধক্যের অবসাদ না আসিতে আসিতে চলিয়া যাওয়া বড় সুখ! যে সুখী, সে মরিতে চায় না, কিন্তু তার মরাই ভাল, দুঃখ আসিয়া তার ছায়া মাত্র স্পর্শ করিতে পারে না; কিন্তু তখন তো ইচ্ছা হয় না, মনে হয় ঐ সুখস্বপ্ন আর ভাঙ্গিবে না। মৃত্যু তবে বড় সুখের! কিন্তু মানুষের ইচ্ছাধীন নহে বলিয়াই বুঝি দুঃখময়? তবে এস! স্বর্গনরক সুস্বপ্ন-দুঃস্বপ্নদর্শিনী অনন্ত নিশিথিনি! আমাকে ঐ স্নিগ্ধ আবরণে আবৃত কর। এই নিদ্রাতুর নয়নপক্ষ আপনি আজ নিমীলিত হইয়া আসিতেছে।

(আদম্ খাঁর প্রবেশ।)

আদম্। কাফের এত সুন্দর?

চন্দ্রদেবী। খাঁ সাহেব আমি বড় সুন্দর, না?

আঃ। তুমি আমার পরীবানু!

চঃ। সাহেব, তুমি বুঝি কখনও সুন্দরী দেখ নাই? আরও দেখ, স্থির হইয়া বসো, এই দেখ আমার নয়ন জ্বলিতেছে, এই দেখ শরতের নদীর মত অঙ্গে মৃদু তরঙ্গ উঠিয়াছে, লাবণ্যের লীলা খেলিয়া যায়, আরও দেখিতে চাও?

আঃ। আর না, আর না, আমার নয়ন ঝলসিয়া যায়, বড় তীব্র, শিরায় শিরায় রক্ত ছুটিতেছে, দারুণ উত্তাপে হৃদ্‌পিণ্ড গলিয়া যায়।

চঃ। এখনও বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায় নাই, কিন্তু দেখ আমি তোমায় দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছি। দেখ, আনন্দ ধারায় আমার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিতেছে।

আঃ। আমার মাথা ঘুরিতেছে, বুঝি পদতল হইতে পৃথিবী সরিয়া যায়।

চঃ। দেখ, চাঁদের আলোতে কেমন ঘর ভরিয়া গিয়াছে, আমি একবার শয়ন করি। দেখিও নিদ্রিতা রূপসী কত সুন্দর।

আঃ। পিয়ারি! একি? মুখে ঐ কালিমা কেন? ওষ্ঠাধর পাণ্ডু কেন? ভয় হয় তুমি হিন্দু, তুমি বড় ছলনা জান; তোমরা মৃত্যুকে অতিথির ন্যায় ডাকিয়া আন! ঐ হাসি—ঐ যেন মৃত্যুর পাণ্ডুনিশান কাঁপিয়া উঠিল!

(ছুটিয়া আমিনার প্রবেশ।)

আমিনা। বিবি! বিবি! একি করিলে?

চঃ। কি আমিনা?

আমিনা। সাহেব, বিবি তীব্র বিষপান করিয়াছে।

আঃ। এঁ্যা একি?

চঃ। কেন সাহেব, তুমি আমার রূপ দেখিতে চাহিয়াছিলে,—আরও রূপ দেখ। মৃত্যুর পরে আমাকে আরো সুন্দর দেখাবে, ঘৃণা—অভিমান—তাচ্ছিল্য হাসি—কান্না—কিছুতেই আর হৃদি উত্তেনায় রূপ বিকৃত হইবে না। প্রাণ ভরিয়া অবিকৃত রূপ দেখ—তারপর এই প্রাণবিহীন তুষার প্রতিমার পূজা করিও।

আঃ। বিষ খাইলে কেন? মরবে কেন? মরবে মর, প্রাণ থাকিতে একবার স্বর্ণপ্রতিমা হৃদয়ে তুলিয়া লই। (অগ্রসর হওয়া।)

আমিনা। সাবধান, এই তরবারি-ফলকে তোমার প্রেমকাহিনী তোমারই হৃদয়ে লিখিয়া দিব।

চঃ। সাহেব, রক্তে স্নান করিয়া এই দেবীর পূজা করিতে হয়, এই শক্তি-পদে রক্ত জবা চাই।

আঃ। আমিনা,—আমিনা—একবার ছাড়। একবার—একবার ঐ কুসুম-কোমলকান্তি স্পর্শ করি, তারপর আমার প্রাণ লইও।

আমিনা। ছায়া মাত্র নহে।

চঃ। আমিনা, (হার উন্মোচন করিয়া) এই লও শেষ পুরস্কার।

আঃ। হিন্দু, তুমি এত সুন্দর!

চঃ। তার মৃত্যু আরও সুন্দর।

আঃ। একবার—

চঃ। আ—মি—না।

আমিনা। বেগম সাহেব!

আঃ। ঐ দীপ নিবিল, একি হাসি, একি বিদ্যুৎ।

সমাপ্ত।

শ্রীমাখনলাল সেন।

শাখীনামা

৪০শ শাখী।

এই গ্রাম ত্যাগ করিয়া গুরু ভুগত গ্রামে উপস্থিত হইলেন। গ্রামটি এক্ষণে ফরিদকোট রাজ্যান্তর্ভুক্ত। কূপসন্নিকৃষ্ট একটি পিপ্পলী বৃক্ষের তলদেশে উপবেশন করিয়া গুরু কূপটির খননকর্ত্তা কে তাহার অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, ভুগত ইহার খননকর্ত্তা। তখন গুরু বলিলেন যে, (এরূপ লোকহিতকর কার্য্যে) রাজৈশ্বর্য্যের গর্ব্বাপেক্ষা (সামান্য) সাবানওয়ালার নাম-মাহাত্ম্য সমধিক। শিখেরা কথাটি আরও পরিস্কার করিতে বলিতে বলিলে, গুরু এই ঘটনাটির বর্ণনা করেন।

রাজা মদনের প্রধান মন্ত্রী রমুনের একটি কন্যা ছিল। কন্যাটি ভূতগ্রস্থা হইয়াছিল। রমুন কন্যাকে নিরোগা করিবার জন্য গুরুর নিকট উপস্থিত হন। এই সময় ভুগত গুরুর পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। গুরু মন্ত্রীকে ভগতের পদতলে আশ্রয় লইতে বলিলে মন্ত্রী তাহাই করেন। 'আপনার কন্যা নিরোগা হইয়াছেন'—এই বলিয়া ভুগত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎক্ষণাৎ ভুত সেই কন্যাকে ত্যাগ করিল ও তথা হইতে অন্যত্র গমনের জন্য ভুগতের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া বলিল, যখনই তাহার সাহায্যের কোন প্রয়োজন হইবে, তখনই সে তাঁহাকে সাহায্য করিবে' তাহার প্রার্থনামত ভুগত তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

(এরূপ উপকার লাভে প্রীত হইয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য) রমুন ভুগতকে পুরস্কার দিতে চাহিলে তাঁহার গ্রামের ব্যবহার্থ একটি কূপ খনন করাইয়া দিতে বলিলেন। কথামত রমুন একটি কূপ খনন করাইলেন; কিন্তু খনন-কার্য্য শেষ হইতে না হইতেই কল্যান দাস বৈরাগীর যাদুকরী শক্তির প্রভাবে তাহা পুনরায় বুজিয়া গেল। বৈরাগী পূর্ব্বে এই গ্রামে একটি কূপ কাটাইয়াছিলেন। (স্বীয় কূপের কল্পিত মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই বোধ হয় তিনি এরূপ কার্য্য করিলেন।) (যাহা হউক) তখন ভুগত পূর্ব্বপরিচিত ভুতকে ডাকিয়া কূপটি উদ্ধার করিয়া দিবার জন্য তাহাকে আদেশ করিলেন। অধীনস্থ অপরাপর ভুতের সাহায্য লইয়া সে দিল্লী হইতে প্রস্তর ও লাহোর হইতে চূর্ণ সংগ্রহ করিয়া এক রাত্রি মধ্যে কূপটি পুনরায় প্রস্তুত করিয়া দিল। ভাই ভুগত তখন একটি দুর্গ প্রস্তুত করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, সেই দুর্গের একাংশ ভুতটির নিবাসের জন্য নির্দিষ্ট হইল। ভুতকে প্রত্যহ পাঁচ মণ ছোলা দিবার জন্য তিনি গ্রামবাসীদিগকে আদেশ করিলেন। সেগুলি চূর্ণ করিবার শব্দ গ্রামবাসীরা প্রত্যহই শুনিতে পাইত। ভুতেরা প্রতিরাত্রেই বহাস থাক সুতা প্রস্তুত করিত।

এই সব ঘটনা ভুগতের সকল প্রতিবাসীই জ্ঞাত আছে।

৪১শ শাখী।

ভুগত গ্রামে অবস্থান-কালে একটি সশস্ত্র শিখ তাহার শিশুপুত্র সমভিব্যাহারে গুরু দর্শনে আগমন করে। গুরুকে সে এককুড়ি ভর্জ্জিত শস্য উপহার দান করে। গুরু বালকের নাম জিজ্ঞাসা করিলে, পিতা বলিল, এখনও তাহার নামকরণ হয় নাই। তাহার নামকরণের জন্য গুরুকে অনুরোধ করিলে, গুরু বালকের পহল (দীক্ষা) কার্য্য সমাধা করিয়া তাহার নাম রাখিলেন—খুঁজা সিংহ। শিশুর নামটি আনীত ভর্জ্জিত শস্যের নাম সম্পর্কেই রাখা হইল। বালক গুরুর সহগামী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাহার পিতা বলিল—'তুমি এখন অত্যন্ত ছোট। গুরুর সেবা করিবার বয়স এখনও তোমার হয় নাই।' অবশেষে (শিশুর আগ্রহাতিশয্য দর্শনে প্রীত হইয়া) সে বলিল, শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই তাহাকে সে গুরুর সেবার জন্য নিয়োগ করিবে। * সার্দ্ধ দুই

* এই ঘটনার পুরোহিতাচার্য্য ভাই মনি সিংহের কাহিনী স্মরণ পথে উদিত হয়। তিনিও পঞ্চম বর্ষ বয়সে পিতার সহিত গুরুর দর্শনে আসিয়া গুরুর একান্ত ভক্ত হইয়া উঠেন ও গুরুর সহবাস ত্যাগে কিছুতেই সম্মত হন নাই। অবশেষে পিতা বাধ্য হইয়া তাঁহাকে গুরুর শ্রীপাদপদ্মে প্রদান করেন। তাঁহার কাহিনী আমরা অন্যত্র বর্ণনা করিব।

মুদ্রা উপহার দিয়া শিখ গুরুর নিকট বিদায় গ্রহণান্তর (প্রীতমনে) গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

৪২ শ শাখী।

অতঃপর গুরু ভুগত গ্রাম ত্যাগ করিয়া ফরিদকোট রাজ্যান্তর্গত বাঁদরওগ্রামে উপস্থিত হইয়া তথায় বাস করেন। গুরুর সহযাত্রী শিখেরা গ্রামের এই বাঁদর নাম শুনিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিল, গ্রামে বাঁদরেরাই বাস করে। কিন্তু গুরু তাহাদের বলিলেন, বাঁদর নামীয় এক জমীদার বংশ হইতে গ্রামের এইরূপ নাম হইয়াছে।

গুরু যতদিন তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন, গ্রামবাসীরা ততদিন তাঁহার আহারাদি যোগাইয়াছিল।

৪৩শ শাখী।

অতঃপর গুরু ফরিদকোট রাজ্যের বঙ্গারি গ্রামে তাবু খাটাইলেন। গ্রামবাসীরা তাঁহাকে আহারাদি প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার করে। তাঁহার অনুচরেরা গ্রামবাসীদিগের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখিয়া সন্দিগ্ধ হয়; (তাহারা) সে কথা গুরুকে জানাইলে তিনি বলিলেন—ইহারা দস্যু। ইহারা কোন বিধিরই বশবর্ত্তী নহে। ইহারা স্বেচ্ছাচারী। লুটপাট করিয়া ইহারা জীবিকার্জ্জন করে; কিন্তু এখন যখন তিনি স্বয়ং ইহাদের নিকট আসিয়াছেন, তখন (তাঁহার বিশ্বাস) ইহারা আপনাদিগের আচারব্যবহার সংশোধন করিবে ও ভবিষ্যতে শিখদের কিছু উপকারে আসিবে।*

ক্রমশঃ

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* দস্যুদের শিখধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাদের প্রাণে কতকটা সংযত ভাব জন্মাইয়া দেওয়া ও শিখসৈন্যমধ্যে তাহাদের অন্তর্নিবিষ্ট করা, শিখেদের চিরন্তন-প্রথা। ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের আমলের শিখেদের ইতিহাস আলোচনা করিলে এরূপ অনেকগুলি ঘটনা দেখা যায়।

দুঃখিনী।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

এ দিকে দিনে দিনে দুঃখিনীর স্কুলে বালক এবং বালিকার সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। প্রথম প্রথম কেহ বালিকা পাঠাইত না; কিন্তু দুঃখিনী প্রত্যেক বাড়ীতে যাইয়া বালিকা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন; দুঃখিনীর চরিত্র সকলেই জানিতেন, ক্রমে ক্রমে অনেক বালিকা স্কুলে আসিল। প্রাতঃকালে এবং অপরাহ্ণকালে বালকেরা পড়িতে আসিত, বালিকারা মধ্যাহ্নকালে পড়িতে আসিত। দুঃখিনী নূতন প্রণালীতে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। বালকবালিকারা যে কেবল বই পড়িতে শিখিবে, তাহা দুঃখিনীর অভিপ্রেত নহে। বালকদিগের মধ্যে অনেকেই কৃষকের ছেলে,—তাহারা যাহাতে বাবু হইয়া না যায় দুঃখিনী এমন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দুঃখিনী নিজে হিসাব পত্র খুব ভাল জানিতেন না, যাহা জানিতেন বালকদিগকে তাহা শিখাইতেন। কিন্তু দুঃখিনী একটী কাজ করিয়া বালকদিগের বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণকালে বালকেরা আসিলে দুঃখিনী তাহাদিগকে বই পড়িতে দিতেন না। সে সময়ে দুঃখিনী তাহাদিগকে হিসাব, নামতা এবং সহজ সহজ পদ্য মুখে মুখে শিখাইতেন এবং নানাপ্রকার উপদেশপূর্ণ গল্প বলিতেন, তাঁহার নিকট হইতে গল্প শুনিবার জন্য বালিকারা পর্য্যন্ত ছুটীর পরে বসিয়া থাকিত; বালিকারা কেহ হয় ত হা করিয়া বসিয়া গল্প শুনিত; কেহ বা সেলাই করিত আর গল্প শুনিত;—বালকেরা এক পার্শ্বে বসিয়া গল্প শুনিত। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই বালিকারা বাটীতে চলিয়া যাইত; তখন দুঃখিনী বালকদিগকে আর এক কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেন। দুঃখিনীর বাটীতে অনেকখানি জমি ছিল। দুঃখিনী সেই জমি বালকদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। বালকেরা ৩।৪ জনে এক এক ভাগ জমি লইয়াছিল। প্রত্যেক বালক বাটী হইতে এক একখানি কোদালী আনিয়া দুঃখিনীর বাড়ীতে রাখিয়াছিল, প্রায়ই দৈর্ঘ্যে দশ হাত, প্রস্থে দশ হাত করিয়া এক এক খণ্ড জমি এক একদল বালকের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা ছিল। ৩।৪টী বালকের এক এক খণ্ড জমি ছিল। বালকেরা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কোদালি লইয়া জমিতে যাইত; তাহারা নির্দ্দিষ্ট জমিতে মাটী প্রস্তুত করিত।

এই আমোদ দেখিবার জন্য সন্ধ্যার সময় কত লোক দুঃখিনীর বাটীতে আসিত। সকলেই চাষার ছেলে; চাষাদের বিশ্বাস ছিল, ছেলেপিলে লেখাপড়া শিখিলে বাবু হইয়া যায়, দুঃখিনী সে বিশ্বাস নষ্ট করিবার জন্য এই উপায় করিয়াছিলেন। উহাতে বালকদিগের শরীরও খুব সবল হইত। বড় বড় বালকেরা মাটী কাটিত এবং চাপ ভাঙ্গিত, ছোট বালকেরা ঘাস বাছিত। আর দেবী দুঃখিনী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই সকল কার্য্য দেখিতেন; যাহাদের একটু অধিক পরিশ্রম হইয়াছে বলিয়া তাঁহার মনে হইত, তিনি তাহাদের কার্য্যের সাহায্য করিতেন। মাটী ঠিক হইলে, চাষারাই নানা প্রকার বীজ আনিয়া দিত, বালকেরা সেই সমস্ত বীজ জমিতে বপন করিত। ইহার পরে দুঃখিনীকে একটু বেশী খাটিতে হইত। দুঃখিনী কূপ হইতে জল তুলিয়া দিতেন, আর বালকেরা সেই জল বহিয়া লইয়া জমিতে দিত। দুঃখিনীর বাগান গ্রামের মধ্যে একটা দেখিবার জিনিস হইয়াছিল।

এই প্রকারে প্রায় ৮।৫ মাস গেল। এই চার পাঁচ মাসের মধ্যে দুঃখিনীর নাম গ্রামের মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া উঠিল। দুঃখিনী আরও একটী কাজ করিতেন; মধ্যে মধ্যে মহোৎসবের আয়োজন করিতেন। বাগানে বেশ আয় হইতে লাগিল। দুঃখিনীর ইচ্ছা যে সে সমস্তই বালকবালিকাদিগের জন্য ব্যয় করেন; তাহারা মাহিয়ানা বাবদে যাহা দেয় তাহাই নিজে গ্রহণ করেন; কিন্তু বালকদিগের অভিভাবকেরা তাহাতে সম্মত নহেন। তাঁহারা সমস্তই দুঃখিনীকে লইতে বলেন।—গ্রামের মধ্যে যে, যে ভাল জিনিস পাইত, তখনই তাহা দুঃখিনীকে আনিয়া দিত; দুঃখিনীকে না দিয়া বালকবালিকারা কিছুই খাইতে পারিত না। দুঃখিনী এখন দেখিলেন যে, তাঁহার বেশ আয় হইতে লাগিল। বাটীতে যত তরকারী এবং অন্যান্য দ্রব্য উৎপন্ন হইত তাহা তিনি বাজারে বিক্রয় করিতে পাঠাইয়া দিতেন। এই সব দ্রব্য বিক্রয় করিয়া মাসে প্রায় ২৫।৩০৲ টাকা হইতে লাগিল; ইহা ব্যতীত বেতন আছে। দুঃখিনী মহাজনের টাকা শোধের উপায় করিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া মহা আনন্দিত হইলেন। তিনি প্রতি মাসে মহাজনকে ৩০৲ টাকা করিয়া দিতে লাগিলেন। মহাজন দুঃখিনীর গুণে এত মোহিত হইয়াছিলেন, যে তিনি সুদের টাকা একেবারে ছাড়িয়া দিলেন।

এ দিকে গ্রামের ভদ্রলোকেরা দুঃখিনীর এই গুণের কথা জেলার উপরে যাইয়া যাহার তাহার নিকট গল্প করিত। মহেন্দ্রপুর হইতে যে লোক জেলায় যাইত সেই দুঃখিনীর কথা বলিত। এই সমস্ত কথা শুনিয়া, ডিপুটী বাবু এবং

স্কুলের সবইনেস্পেক্টর বাবু একদিন মহেন্দ্রপুর আসিবেন বলিয়া সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। মহেন্দ্রপুরের লোকেরা সব ডিবিজনকেই জেলা বলিত। গ্রামের সকলেই শুনিল যে, ডিপুটীবাবু এবং স্কুলের বাবু দুঃখিনীকে খেতাব দিতে আসিবেন। দুঃখিনী এই কথা শুনিয়া একেবারে লজ্জায় মরিয়া গেলেন। গ্রামের লোকের সম্মুখে যাহা হয় তিনি করিতে পারেন; ইঁহারা বড় লোক, হাকিম, তাঁহাদের সম্মুখে তিনি কেমন করিয়া বাহির হইবেন। কিন্তু উপায় নাই।

রামকৃষ্ণের বাটীতে যথাসময়ে বাবুরা আসিলেন। তাঁহারা যে সময়ে পৌঁছিলেন তখন সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছিল, কাজেই সে দিন আর স্কুল দেখা হইল না। রামকৃষ্ণ বিশেষ আগ্রহ সহকারে তাঁহাদের আহারাদির আয়োজন করিতে লাগিলেন; গ্রামের চৌকিদার রামকৃষ্ণের বাটীতে মোতাইন থাকিল। রাত্রিতে ডেপুটী এবং ইনেস্পেক্টর বাবু রামকৃষ্ণের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন।

পরদিন, প্রাতঃকালে সকলে মিলিয়া দুঃখিনীর বাটীতে গেলেন। তাঁহারা যাইয়া দেখেন, বালকেরা বড় ঘরের বারান্দায় এবং ঘরের মধ্যে চাটাই পাতিয়া বসিয়া পড়া-শুনা করিতেছে। দুঃখিনী তাঁহাদিগকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই, একটু জড়সড় হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। তাঁহারা ঘরে আসিবেন কি, বাহিরে বাগানে যে কাণ্ড দেখিলেন, তাহাতেই তাঁহারা অবাক্ হইয়া গেলেন। সমস্ত বাগান ঘুরিয়া তাঁহারা ঘরে আসিলেন।

ডেপুটী বাবুর বয়স প্রায় ৫০ বৎসর হইবে; সবইনস্পেক্টরবাবুর বয়সও প্রায় ৪০ বৎসর। তাঁহারা ঘরের ভিতরে আসিয়া দুই জনে দুইখানি টুলের উপর বসিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা দুঃখিনীর সঙ্গে কথা বলেন। প্রথমে বালকদিগকে পাঠ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এ সময়ে দুঃখিনীকে উপস্থিত হইতে হইল। দুঃখিনী পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, বাবুরা উভয়েই ব্রাহ্মণ। রামকৃষ্ণ দুঃখিনীর হাত ধরিয়া আনিলেন, এবং দুঃখিনী সম্মুখে আসিয়া উভয়কেই প্রণাম করিলেন এবং লজ্জাবনত মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু বাবুদিগের মুখের দিকে চাহিয়াই দুঃখিনী বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা অতি ভদ্র এবং দয়ালু। বাবুরা সমস্ত ছেলেকেই দুই একটী পড়া জিজ্ঞাসা করিলেন; দুঃখিনীকেও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। দুঃখিনী গৃহস্থের মেয়ে বটে কিন্তু যখন বড় দয়ার স্বরে বাবুরা তাঁহাকে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন তখন তাঁহার প্রাণের মধ্যে কেমন এক মধুর ভাব উপস্থিত হইল; তিনি ধীরে ধীরে নিজের সমস্ত দুঃখের কথা খুলিয়া

বলিলেন ; কেবল রামনাথের ব্যবহারের কথা বলিলেন না। দুঃখিনী যখন রসিকের কথা বলিতে লাগিলেন, সে সময়ে ডেপুটী বাবুর চক্ষু দিয়া দরদর ধারে জল পড়িতে লাগিল ; সত্য সত্যই বাবুরা কাঁদিয়া ফেলিলেন। বেলা অধিক হইতে দেখিয়া তাঁহারা বালকদিগকে তখনকার মত যাইতে বলিলেন ; দুঃখিনী বালক-দিগকে অপরাহ্ণকালে আসিয়া বাগান দেখাইবার কথা বলিয়া দিলেন। বাবুরা মনে করিয়াছিলেন সেই দিনই তাঁহারা ফিরিয়া যাইবেন, কিন্তু বাগানের শোভা না দেখিয়া তাঁহারা যাইতে পারিলেন না ; অপরাহ্ণকালে বালিকাদিগের পড়া শুনিলেন, সেলাইয়ের কাজ দেখিলেন। দুঃখিনী নিজে অতি সুন্দর কয়েকটী পীরাণ সেলাই করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং দুইখানি আসনও প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া-ছিলেন। তিনি বাবুদ্বয়কে তাহা দিলেন ; বাবুরা মহানন্দে সেই দান গ্রহণ করি-লেন। তাহার পর দুঃখিনী বালিকাদিগকে লইয়া বাগানে গেলেন, বাবুরাও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। বালকেরা নিজ নিজ জমির নিকট যাইয়া দাঁড়াইল ; বাবুরা সমস্ত জমি দেখিলেন। কোন জমিতে শাক, কোন জমিতে অন্য তরকারী। দুঃখিনী সমস্ত জমি হইতেই কিছু কিছু তরকারী তুলিয়া ভিন্ন ভিন্ন পাতে বাঁধিতে লাগি-লেন। ডিপুটী বাবু সন্ধ্যার সময় বালকবালিকাদিগকে ৫০৲ টাকা পুরস্কার দিলেন এবং দুঃখিনীকে ডাকিয়া বলিলেন "মা দুঃখিনি! তোমাকে মা বলিয়া ডাকিলাম। আমি তোমাকে কি দিব, ভগবান তোমার মঙ্গল করিবেন ; আমার সাধ্য নাই, তোমার পুরস্কার করি। তোমার যাহাতে মঙ্গল হয় তাহা আমি করিব ; গবর্ণমেণ্ট হইতে তোমার স্কুলের জন্য টাকা বন্দোবস্ত করিয়া দিব। আমি তোমার একটী উপকার করিতে চাই।" এই বলিয়া রামকৃষ্ণকে দুঃখিনীর মহাজনকে ডাকিতে বলিলেন। মহাজন সেইখানেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি মহা-জনকে ডাকিয়া বলিলেন "শুন! তুমি আর ১২ দিন পরে আমার কাছারীতে তোমার খাতা লইয়া যাইবে, দুঃখিনীর নিকট হইতে তুমি যত টাকা পাইবে, আমি সেই দিনে তোমাকে সেই সমস্ত টাকা দিব ; দুঃখিনীর নিকট হইতে আর একটী পয়সাও লইও না।" মহাজন যে আজ্ঞা বলিয়া নমস্কার করিল। দুঃখিনী অবাক্ হইলেন, বলিলেন "দেখুন্, সে যে অনেক টাকা। আপনি দিবেন কেন? আমি ত দিতে পারিব।"

ডিপুটী। তুমি আমার সন্তানের তুল্য ; তোমাকে আমি আমার মেয়ের মত মনে করিতেছি। দুঃখিনী আর কথা বলিতে পারিলেন না।

ডিপুটী বাবু বলিতে লাগিলেন "দেখ মা! তোমার যাহা যাহা দরকার হইবে

আমাকে লিখিও। আর আমি তোমাকে এই দশটী টাকা দিয়া যাইতেছি, তুমি ইহার দ্বারা তোমার বাড়ীর চারি পাশে উঁচু করিয়া একটা বেড়া দেওয়াও। আমি মধ্যে মধ্যে সপরিবারে আসিয়া তোমার এখানে বাস করিব, আমার বাটীর মেয়েদের এই সমস্ত দেখাইতে হইবে। মা! আর বেলা নাই, আমরা এখন প্রস্থান করি। সব ইনেস্পেক্টর বাবু শীঘ্রই তোমার মাসিক সাহায্য গবর্ণমেণ্ট হইতে মঞ্জুর করিয়া দিবেন, আমি জেলার সাহেবকেও লিখিব."

বাবুরা গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তখন দুঃখিনী বলিলেন "আমাদের ত চাকর নাই ; তা আপনি যদি বলেন তবে আপনার পেয়াদার হাতে এই তরকারী গুলি দিই। আমাদের আর কি আছে।"

ডিপুটী। কেন, তুমি যে সুন্দর আসন এবং পীরাণ দিয়াছ তাহার অপেক্ষা বেশী মূল্যের জিনিষ আমার মত ডিপুটীর ভাণ্ডারে নাই। মা! আমার ঘরে সোনা রূপা অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু তুমি আজ যাহা আমাকে দিলে তাহা আমার ঘরে কেন, অনেক রাজার ঘরেও নাই। মা, আমরা এ জিনিষের মূল্য কেমন করিয়া বুঝিব।"

এই বলিয়া ডেপুটী বাবু তিন চারিজন চৌকীদারকে এ সকল দ্রব্য তুলিয়া লইবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন।

ডেপুটী বাবুরা যতক্ষণ বাগান দেখিতেছিলেন ততক্ষণ সদানন্দ তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিল ; জেলার হাকিম, অপরিচিত লোক, দেখিয়া সে এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই, কিন্তু যখন সে দেখিল হাকিম বাবু দুঃখিনীকে মা বলিয়া ডাকিলেন, আদর করিয়া কত কথা বলিলেন, তখন আর তাহার ভয় থাকিল না, সে প্রথমে গুণ গুণ করিয়া পরে উচ্চৈঃস্বরে গান ধরিল

"মন রে কৃষিকাজ জান না।
এমন মানব-জমি রইল পতিত আবাদ কোরলে
ফোল্‌তো সোনা॥
কালী নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তসরূপ হবে না ;
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া তার কাছে ত
যম ঘেসেনা।"

ডেপুটীবাবু সদানন্দের গান শুনিয়া বলিলেন "এ আবার কে?"

দুঃখিনী বলিলেন "এ আমার সদা কাকা, সকলে পাগল বলে। সদা কাকা আমার রক্ষক।" সদানন্দ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল—

"এসে এক রসিক পাগল
বাধালে গোল
নদের মাঝে দেখ্‌সে তোরা,
পাগলের সঙ্গে যাবো, পাগল হবো,
দেখ্‌বো রসের নব গোরা।"

ডেপুটীবাবু তখন সদানন্দকে বলিলেন "সদানন্দ, তুমি তোমার মায়ের খবর লইয়া মধ্যে মধ্যে জেলায় যাইবে; আমার বাড়ীর সকলে তোমার গান শুনিবে।"

সদানন্দ কোন উত্তর না দিয়া গান ধরিল—

"কাজ কি আমার কাশী।
এই মায়ের পদ কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি।"

এব বলিয়া সে দুঃখিনীকে প্রণাম করিল; তাহার পর ডেপুটী বাবু ও সব-ইন্‌স্পেক্‌টর বাবুকেও প্রণাম করিল। ডেপুটী বাবুরা চলিয়া গেলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীজলধর সেন।

নব বসন্তে।

কোকিলের কুহরণে ভ্রমর গুঞ্জনে
বসন্তের আগমন জানায় আবার!
চূত মুকুলের নব মধুর সৌরভে
অশোক চম্পকে বকে তাই কি ঝঙ্কার?
শ্যামল সুষমা মাখা বিটপীর শোভা,
বিনীতা কুসুমলতা মাধবী বিতান,
কিঙ্কিনী-শিঞ্জিনী-রোলে ওকি মনোলোভা
মুখর-চপল-মধু প্রিয়ার আবাহন?
মুকুট পরেছ শিরে হে প্রকৃতি রাণি!
ফুলে ফুলে ফলে ফলে রচিয়ে ভাণ্ডার,
সাধ যার একবার ওলোলো ভামিনি!
অর্পিতে তোমারে,—তব অঞ্জলি শোভার।
হে চির বসন্ত সখা! নিখিল-রঞ্জন,
আপন সৌন্দর্য্যে মগ্ন সৌন্দর্য্যমোহন!

ভারতের প্রাচীন আর্য্যসমাজ।

অধুনা আমাদের দেশের সুশিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ রাজনীতির আলোচনায় মগ্ন হইয়াছেন। দেশে রাজনৈতিক আলোচনা ভিন্ন আর কোন কথা নাই। আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায় শুদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন দ্বারা দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করা বিশেষ সন্দেহস্থল। অনেকের মতে রাজনৈতিক আন্দোলনের পূর্ব্বে সমাজের কুরীতি ও কুসংস্কার সমূহের নিরাকরণ করা নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের মত এই যে দেশের শক্তিশালী সুসন্তানদিগের মধ্যে শিক্ষা, অভ্যাস ও স্বভাবানুযায়ী কোন কোন ব্যক্তির রাজনীতি এবং কাহারও কাহারও পক্ষে সমাজনীতির আলোচনা করা আবশ্যক। কেবল বিশুদ্ধ রাজনীতি আলোচনায় সম্যক্ ফললাভের সম্ভাবনা নাই।

পুনশ্চ—দেশ, কাল, পাত্র বুঝিয়া কার্য্য করিতে না পারিলে তাহা কখনই সফল হয় না। সম্প্রতি রাজনীতির আলোচনা করা আর খরধার অসিলতাবলে নৃপদে বিচরণ করা সমান বিপজ্জনক। পক্ষান্তরে, সমাজ-সংস্কার-বিষয়িনী আলোচনা কি কর্ত্তৃপক্ষের কি দেশের লোকের সমান প্রিয় ও উপকারী। বিশেষতঃ অনেকেরই রাজনীতি আলোচনার অধিকার নাই; সমাজনীতি সকলেরই উপজীব্য। এরূপ অবস্থায় প্রাচীন আর্য্যসমাজের সম্বন্ধে দুইচারি কথা বলিলে সময়োচিত হইবে বলিয়া মনে করি।

প্রাচীন কালে আর্য্যদিগের সমাজের অবস্থা অতিশয় উন্নত ছিল। বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলীর উপর সামাজনীতির ভিত্তি স্থাপিত ছিল এবং সেইহেতু সমাজ মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিবাদবিসম্বাদাদি উপদ্রব ছিল না; প্রত্যুত জাতীয় উন্নতির দিকেই সকলের লক্ষ্য ছিল। আধুনিক য়ুরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে সমাজের অবস্থানুসারে জাতীয় ধন কতিপয় অল্পসংখ্যক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে এবং জনসঙ্ঘ দরিদ্রতার কঠোর চক্রতলে নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে নিষ্পেষিত হইতেছে। তথায় শ্রমজীবিদিগের দুরবস্থা এক প্রধান জাতীয় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাচীন ভারতে এরূপ বিশৃঙ্খলতা ছিল না; জাতীয় ধন সমস্ত প্রজার মধ্যে সুবিভক্ত ছিল। সকলেই স্ব স্ব প্রতিভার উচ্চ বিকাশ সাধন করিয়া জাতীয় উন্নতি অধিকতর উন্নত করিবার সুবিধা পাইত।

প্রাচীন আর্য্যসমাজে জনসমূহের মধ্যে এরূপ সুশৃঙ্খল ও সুনীতি-সঙ্গত শ্রেণীবিভাগ ছিল যে, কোনও শ্রেণীর অন্যায্য বা অপরিমিত সুবিধা বা অসুবিধা ছিল না; অভাব, দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ দেশে স্থান পাইত না, সকলেই সুখশান্তিতে প্রফুল্লচিত্তে নিজ নিজ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত। সকলেই নিজ নিজ ব্যবসায়ে অতিশয় নিপুণ হইয়া উঠিত। এক কথায় দেশে অশান্তি, অত্যাচার, বিপদ একপ্রকার অজ্ঞাত ছিল।

এই যে শ্রেণীবিভাগ,—যাহার ফলে দেশে সকলপ্রকার অশান্তি ও অসুখ নিরাকৃত হইয়া চিরস্থায়ী সুখ, শান্তি ও সভ্যতা আনীত হইয়াছিল, প্রাচীনকালে তাহাকে "বর্ণাশ্রমধর্ম্ম" বলিত। ভারতের প্রাচীন সমাজে আর্য্য ও অনার্য্য দুই শ্রেণী ছিল। আর্য্যেরা সভ্য ও অনার্য্যেরা অসভ্য ছিল। আর্য্যগণ প্রধানতঃ নিম্নলিখিত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন।—

(১) ব্রাহ্মণ,—এই শ্রেণী সমাজের মস্তক বা জ্ঞানস্বরূপ ছিলেন। জ্ঞানবিজ্ঞানাদির অনুশীলন এই শ্রেণীর প্রধান কার্য্য ছিল। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন ইঁহাদিগের কর্ত্তব্য-কার্য্য ছিল।

(২) ক্ষত্রিয়,—এই শ্রেণী সমাজের বাহু বা শক্তিস্বরূপ ছিলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজ্যের শাসনপালন এই শ্রেণীর কর্ত্তব্য ছিল।

(৩) বৈশ্য,—এই শ্রেণী কৃষি ও বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া প্রধানতঃ দেশের ধনসঞ্চয়ে নিযুক্ত থাকিতেন।

(৪) শূদ্র,—ইঁহাদিগের জ্ঞান ও বুদ্ধি নিম্নস্তরের থাকায় উক্ত তিন শ্রেণীর সেবা ও সাহায্য করা ইঁহাদিগের কর্ত্তব্য ছিল। বিবিধ শিল্পকার্য্য এই শ্রেণীর (অনেক মিশ্রিত জাতির লোকও এই শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল) হস্তগত ছিল।

প্রত্যেক সভ্য সমাজে এইরূপ কোন না কোন শ্রেণীবিভাগ আবশ্যক এবং সকল সমাজেই ইহা কোন না কোনও প্রকারে বর্ত্তমান আছে। তবে প্রাচীন হিন্দুদিগের গৌরব এই যে, তাঁহাদের শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণ যুক্তি এবং বিজ্ঞানসম্মত ছিল। এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রচলিত থাকায় অনেক বিষয়ে লোকে বংশানুক্রমে চেষ্টা করিত এবং সেই বিষয়ে নিতান্ত আশ্চর্য্যরূপ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা লাভ করিত। ভারতের প্রাচীন সূক্ষ্ম শিল্পবিদ্যার নানাবিধ বিভাগ এরূপ অসাধারণ উন্নতিলাভ করিয়াছিল যে, এখনও য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ উহার রহস্যভেদে সমর্থ হন নাই। পুরোহিত,

ধর্ম্মযাজক, সাহিত্যসেবক, গণিত-ব্যবসায়ী, সৈনিক, চিকিৎসক, আইন-ব্যবসায়ী, বণিক ও সেবক কি ইংলণ্ড, কি ফ্রান্স কি আমেরিকা, সকল দেশেই বর্ত্তমান আছে;—প্রাচীন ভারতেও তাহারা বর্ত্তমান ছিল। প্রভেদ এই যে, ভারতের শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণ, সহজ ও সুশৃঙ্খল এবং অন্যত্র অসম্পূর্ণ, বিশৃঙ্খল ও অশান্তিময়।

তবে আজিকালিকার জাতিভেদ ও তখনকার বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এক নহে। এক ত নহেই, উভয়ে স্বর্গনর্ত্ত্য প্রভেদ। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ছিল—উন্নতির প্রধান সহায়, এক্ষণে জাতিভেদ হইয়াছে—আমাদের অবনতির প্রবল কারণ। তখন আর্য্যগণ নামমাত্র চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন, এমন কঠোর অচ্ছেদ্য জাতিভেদের বন্ধন ছিল না। এখন আমরা ৩৬০০ শত বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত, কেহ কাহারও অন্ন দূরে থাকুক—জলমাত্র স্পর্শ করি না। তখন তাঁহারা পরস্পর অন্নগ্রহণ ও কন্যাদানাদি করিতেন। প্রবলপরাক্রান্ত সম্রাট্ তনয় রামচন্দ্র একজন চণ্ডালের সহিত মিত্রতা করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। কর্ণেল অলকট যথার্থই বলিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতে আর্য্যদিগের মধ্যে আধুনিক জাতিভেদের মত কোন নিয়ম ছিল না, এক শ্রেণীর লোক নিজ গুণ ও কর্ম্মানুসারে অপর শ্রেণীতে উন্নীত অথবা অবনত হইত। স্মৃতির বাক্য এই—

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্-দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠী ভবেদ্-বিপ্রঃ ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥"

তখন সকলেই মান্য করিত। মহাভারতাদি শাস্ত্রে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষকে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় মুমুক্ষু ভক্ত, নিষ্কাম যোগী ও ব্রহ্মবিদ্ জ্ঞানীর যে সকল লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ "ধর্ম্মপাদ" ব্রাহ্মণ বর্গ নামক অধ্যায়ে সেই সেই লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। মহাভারতে শান্তি পর্ব্বে আছে;—

"ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥"

কি উদার মত!—ইহাপেক্ষা সাম্যবাদের কথা জগতে কোথায় পাওয়া যাইবে? ভাল কার্য্য কর, ব্রাহ্মণ হইবে, নিকৃষ্ট কার্য্য কর নিকৃষ্টজাতি হইবে,—নিজের হাতেই তাহার সব। মোক্ষ পর্য্যন্ত যখন পুরুষকারের করতল-গত, তখন আর ব্রাহ্মণ্যের কথা কি? হীনবর্ণের লোক যে ব্রাহ্মণ্যলাভ

করিতে পারিতেন, প্রাচীন ভারতে তাহার দৃষ্টান্ত দুর্লভ নহে। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও যে ব্রাহ্মণত্বলাভ করিয়াছিলেন; রাম, কৃষ্ণ, বলরাম, বুদ্ধদেব প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজকুমারগণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও উচ্চপদ—ঈশ্বরাবতারত্ব পাইয়া গিয়াছেন, তাহা রামায়ণ মহাভারতের পাঠকপাঠিকামাত্রেই অবগত আছেন। ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়কুমারী বিবাহ এবং সেই বিবাহের সন্তান, ব্রাহ্মণ-মধ্যে গণ্য হইবার,—পক্ষান্তরে ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণকন্যা ও শূদ্রকন্যা বিবাহ এবং সেই বিবাহের সন্তান ক্ষত্রিয়মধ্যে গণ্য হইবার দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। মহাভারতে তাহাও পাওয়া যায়। বাল্মিকী ও বশিষ্ঠ এই দুইজন রামায়ণের প্রধান ঋষি—"জন্মনা ব্রাহ্মণঃ" ছিলেন না। মনুসংহিতা, আপস্তম্ব সূত্র প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে আমরা কার্য্যগুণে বা কার্য্যদোষে শূদ্রের ব্রাহ্মণত্বলাভের ও ব্রাহ্মণের বৃষলত্বপ্রাপ্তির বিধান দেখিতে পাই।

বৈদিক সাহিত্যে এ সম্বন্ধে আর কতকগুলি মহা-মূল্যবান প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের (দ্বিতীয়, ৩, ১৯) মধ্যে এক নীচ জাতীয় স্ত্রীলোকের পুত্র শূদ্র 'কবষ ঐলুষ' নামক ব্যক্তির উপাখ্যান আছে। কবষ ঐলুষ নীচ জাতীয় হইলেও নিজবিদ্যা ও জ্ঞানবলে সর্ব্বজন-মাননীয় ঋষিত্ব পাইয়াছিলেন; ব্রাহ্মণত্ব তো সামান্য কথা। ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ৩০-৩৪ ঋক ঐ কবষ ঋষির নামে প্রচলিত,—তিনিই ঐ সকল ঋকের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ছান্দোগ্যউপনিষদে জাবালা নাম্নী এক দাসীর পুত্র সত্যকামের উপাখ্যান আছে। সত্যকামের পিতার বা গোত্রের কোন নিশ্চয় ছিল না, তথাপি তিনি ঋষিত্ব পাইয়াছিলেন; যজুর্ব্বেদের একাংশ তাঁহার নামে প্রচারিত হইয়াছিল।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এইরূপ উদার ধর্ম্ম ছিল। কতশত শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণত্বলাভ করিয়া গিয়াছেন, কত শত ব্রাহ্মণ কর্ম্মদোষে অধঃপতিত ও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। আজি ব্রাহ্মণের জননী প্রণব উচ্চারণে ও শালগ্রাম স্পর্শ করিতে অধিকারিণী,—আমাদের এতই অধঃপতন হইয়াছে! সেকালে ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা সকলেরই বেদে, হোমে, যজ্ঞে সমান অধিকার ছিল। "ইমং মন্ত্রং পত্নী পঠেত" এরূপ বিধি প্রত্যেক যজ্ঞে দেখা যায়। যজ্ঞে সাহায্য করেন বলিয়াই তাঁহার নাম "পত্নী" এখনও ব্যাকরণ আমাদিগকে বলিতেছে; অথচ আমরা বলি যে রমণীর বেদে, মন্ত্রে, অধিকার নাই! হায়! সেকালের কথা মনে হইলে হর্ষে

শরীর পুলকিত হয়,—যেকালে রমণী বেদমন্ত্র রচনা করিতেন, ব্রহ্মচর্য্য করিতেন, দেশ হইতে দেশান্তরে বিদ্যাউপার্জ্জনের জন্য গমন করিতেন।

ফলতঃ তখন এরূপ জাতিভেদ ছিল না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কল্যাণে একদিকে পুত্রের পৈতৃক গুণের অধিকারী হইবার সুবিধা ছিল; কিন্তু পুত্রকে পিতার শ্রেণীতে বাধ্য হইয়া থাকিতে হইত না। অধুনা "বিকাশ সিদ্ধান্ত" অথবা Evolution Theory'র কল্যাণে য়ুরোপ ও আমেরিকায় পৈতৃক গুণধর্ম্ম-সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে—বোধ হয়, নিকট ভবিষ্যতে প্রাচীন আর্য্যশ্রেণীবিভাগ তথায় সামাজিকগণ কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইবে। এখনও যে সমাজে একটা সর্ব্বব্যাপী সার্ব্বভৌম সন্তোষ দেখা যায়, বিলাতী সমাজের মত মারামারি, কাটাকাটি অশান্তি, লোকের নিকট আদৃত হয় নাই,—পুনঃ পুনঃ স্বদেশী বিদেশী ধর্ম্মান্দোলনে ও সহস্রাধিক বৎসরের অধীনতায় হিন্দুসমাজ এখনও টিকিয়া আছে, ইহা সেই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ফল। হিন্দুসমাজ নাকি অতিশয় দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত, তাই এখনও টলে নাই। বিদেশী ধর্ম্ম ও সভ্যতা ইহাকে যেরূপ অনবরত আঘাত করিতেছে এবং আমরা যেরূপ এতৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, তাহাতে আর ইহা কতদিন টিকিবে, তাহা বিধাতাই জানেন।

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

স্বদেশে।

কোন্ দেশে হাসে উদার আকাশে
উজল তপন ইন্দু,
সিত তটভূমি উচ্ছ্বাসে চুমি'
উথলে সুনীল সিন্ধু।
গঙ্গা কোথায় শতপথে ধায়
মিশিতে সাগর সঙ্গে?
সে যে আমারি স্বদেশে—
বঙ্গে।

কোথায় শ্যামল ছায়া সুশীতল
বিহগ-কূজিত কুঞ্জ,
কোথা মনোহর সৌরভাকর
অমল কুসুমপুঞ্জ ?
কোন্ দেশে ধীর মলয় সমীর
অমিয় বরষে অঙ্গে ?
সে যে আমারি স্বদেশে—
বঙ্গে।

কোথা অবারিত স্বর্ণ-হরিত
শস্যপূরিত ক্ষেত্র,
—ইন্দিরা মা'র আঁচল সোণার—
সতত জুড়ায় নেত্র !
নব নববেশে আসে কোন্ দেশে
প্রতি ঋতু সাজি রঙ্গে ?
সে যে আমারি স্বদেশে—
বঙ্গে।

কোন্ দেশে ভাষা নব সাধ, আশা,
বিকাশে মধুর ছন্দে,
কোথা ভাইবোনে 'মা' বলি' বদনে
জননী-চরণ বন্দে !
বাণীর বীণায় রাগিণী কোথায়
নাচে সুললিত ভঙ্গে ?
সে যে আমারি স্বদেশে—
বঙ্গে।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

কাল্পনিক কথা।

মেহের উন্নিসা ও সেলিম।

(সের-আফ্‌গানের সঙ্গে মেহেরের পরিণয় স্থির হইবার পর।)

মেহের। এক্ষণে আমার এই প্রার্থনা,—আপনি সুখী হউন।

সেলিম। সুখে বোধ হয় আমার আর অধিকার নাই।

মেহের। যিনি দিল্লীশ্বরের প্রিয়পুত্র, যিনি হিন্দুস্থানের ভবিষ্য সুখদুঃখের নিয়ন্তা, যাঁর রত্ন সিংহাসন সমগ্র ভারতবাসীর শিরে স্থাপিত, তিনি সুখী নন ?

সেলিম। না মেহের, রাজমুকুটে সুখের বিমল জ্যোতিঃ ফোটে না, উহা বৃথা-রত্নে খচিত।

মে। এক্ষণে বুঝিলাম সংসারে কেহই আপন অবস্থায় সুখী নয়।

সে। সত্যই এ সংসারে কাহারও অদৃষ্টে সুখ নাই, সকলেরই অভাব আছে, সুখের আকাঙ্খা আছে, কিন্তু তৃপ্তির আশা নাই। আজ আমার মনে হয়, যদি এই অসিতে শক্তি থাকিত, তবে কেহ সেলিমের জীবন থাকিতে, তাহার হৃদয়-দর্পণ চূর্ণ করিয়া এই চিত্র কাড়িয়া লইতে পারিত না।

মে। সেলিমের অসিতে শক্তি নাই, এ নূতন কথা।

সে। না মেহের, এই রত্নখচিত তরবারি রাজপরিচ্ছদের অলঙ্কার মাত্র, বীরসজ্জা আমাকে উপহাস করে। এই তরু কেবল বিলাসবারি সিঞ্চনেই বর্দ্ধিত হইয়াছে, কখনও ঝঞ্ঝাবৃষ্টি সহ্য করে নাই। কিন্তু তথাপি শুন, যদি পিতৃস্নেহে এই অসি কোষবদ্ধ না থাকিত—

মে। ছি ! সামান্য দাসীর জন্য পিতৃদ্রোহী হইবেন ?

সে। বুঝি সে শক্তিও আমার নাই, নতুবা সংসারে এমন কি পাপ আছে যাহা তোমার জন্য করিতে না পারি ?

মে। কেন ?

সে। হায় নিষ্ঠুরা ! আমি এতদিন জানিতাম, ঐ শিল্পপারিজাত মধ্যে প্রাণ আছে, কিন্তু এক্ষণে বুঝিলাম তুমি চিত্রকরের আলেখ্য মাত্র !

মে। (স্বগতঃ) সেলিম, আমি পাষাণী নই, এই পাষাণেরও ক্ষুধাতৃষ্ণা আছে, পাষাণে ছায়া পড়ে না, কিন্তু অস্ত্রের দাগ বসে, তবে কেন ঐ তরবারির ফলকে ঐ চিত্র আঁকিয়া দিলে ?

সে। রাগ করিও না মেহের, বড় দুঃখে বলিয়াছি, আমায় ক্ষমা কর। যে কাহারও কাছে মস্তক অবনত করে নাই, সে আজ তোমারি চরণে—

মে। আমাকে এইরূপে লজ্জা দেওয়া আপনার উচিত নহে। আপনার আজ্ঞায় আমার ন্যায় সহস্র কিঙ্করী আপনার পদসেবা করিবে।

সে। মেহের, তোমার ন্যায় সহস্র রমণী আছে? তবে কে বলে স্বর্গ সুন্দর? কে ইচ্ছা করিয়া এ সংসার ছাড়িতে চায়? কিন্তু মেহের, ঐ পারিজাত কি মনুষ্য-ভাগ্যে নাই?

মে। যে-রূপ-মন্দিরে স্বর্গের অপ্সরাও লজ্জিত হয়, সেইস্থানে মেহেরের দ্বিতীয়া নাই? দিল্লীশ্বরের পুষ্পোদ্যানে এই ক্ষুদ্র কুসুমই কি একমাত্র আদরনীয়?

সে। সত্যই মেহের, তোমার ন্যায় এত সুন্দর আর দেখি নাই, জীবনে একবার বসন্তে সূর্য্যোদয় দেখিয়াছিলাম। দেখিলাম, নীল সমুদ্রতুল্য নীলগগন আলো করিয়া মেঘস্তরঙ্গের নবীন আলোকরাশি ভাসিতেছে। পূর্ব্বসিন্ধুর সুবর্ণ সৈকতে সেই রূপের তরঙ্গ আসিয়া পড়িল, যেন দিগ্বধূ স্বর্ণধূলিতে ঊষার নীলবেণী রঞ্জিয়া দিল, নিম্নে চাহিয়া দেখিলাম, কেবল স্তবকে স্তবকে ফুল ফুটিয়া আকুল, বাতাসের গায়ে যেন কস্তুরী-মাখা; কেবল পাপিয়ার মৃদুকণ্ঠধ্বনি কর্ণে পৌঁছিল। আমি পূর্ব্বে কখনও এত রূপ দেখি নাই। ত্রিদিবের নীল যবনিকা সরাইয়া আমারও যেন নব ঊষা দেখা দিল। যমুনার হৃদয়ের ন্যায় আমারও হৃদয় হাসিয়া উঠিল। মনে হইল, যেন আলোক সমুদ্রে সমস্ত চরাচর ডুবিয়া গিয়াছে। যদি সৌন্দর্য্যের পূজা থাকে, তবে ঐ ঊষারই পূজা করা কর্ত্তব্য। সে আজ কতদিন! কিন্তু মেহের, যেদিন তোমাকে দেখিলাম, সেদিন বুঝিলাম সংসারে ঊষা অপেক্ষাও মনোমোহিনী আছে; আমি সেই দিন হইতে ঐ রূপরাশির উপাসক।

মে। (স্বগতঃ) সেলিম, এ হৃদয়ও তোমাকে দিয়াছি, কিন্তু আজও তাহা জানিতে দিব না, একদিন এই রূপরজ্জুতে দিল্লীশ্বরকে আপন সিংহাসন পার্শ্বে আবদ্ধ করিব—এই সাধ ছিল। সমগ্রভারত আপনার রূপবলে শাসন করিতে পারিব না? বিদ্রোহীর হৃদয় ইহার বলে

বশীভূত হইবে না? যিনি আমাকে এত রূপ দিয়াছেন, তিনিই আমাকে এই উচ্চাকাঙ্খা দিয়াছেন, আমার দোষ কি? কিন্তু আজিও নিরাশার অন্ধকারে আশার ক্ষীণালোক আছে। আজ তোমার হৃদয় বুঝিব। হয় ঐ ক্ষুদ্রদীপ চিরতরে নির্ব্বাপিত হইবে, নতুবা আবার উজ্জ্বল শিখায় উজলিয়া উঠিবে। (প্রকাশ্যে) বুঝিলাম, আমাকে লজ্জা দেওয়াই আপনার উদ্দেশ্য।

সে। বিস্মিত হইও না মেহের, সত্যই ইরাণের দ্রাক্ষাকুঞ্জে তোমার অধরের বিন্দুমাত্রেরও রস নাই, বসরার গোলাপ এত সুবাসিত নয়। মেহের এতরূপ পাইয়াছিলে, ভালবাসিলে না কেন?— ঐ হাসি ভুবন সৌন্দর্য্যহারী, বুঝি সমস্ত হৃদয় গলিয়া গিয়া তরল সুধার উৎস ছুটিতেছে, ঐ হাসি যেন প্রেম-জ্যোৎস্নার শুভ্র জমাট খেলা। ঐ চাঁদের আলো নলিনী-পত্রে হাসিতেছে! একবার হৃদয়ে এস!—

মে। আপনি কি আমার রূপেরই উপাসক?

সে। শুধু আমার নও, তুমি সমগ্র জগতের আরাধ্যাদেবী। তথাপি যে আমি কেন ভালবাসি, তাহা বুঝাইয়া উঠিতে পারি না। বোধ হয় আমি কেন, কেহই বলিতে পারে না যে, কেন ভালবাসে। মেহের, কখনতো আপন রূপ ভাল করিয়া দেখ নাই। সরসীর জল তোমার রূপে জ্বলিয়া উঠে; সূর্য্যকর-প্রতিফলিত দর্পণের ন্যায় ঐ রূপের আলোতে মুকুর ঝলসিয়া যায়। আমিও ভাল করিয়া দেখিতে পারিলাম না, হৃদয়-তরঙ্গে ঐ চাঁদ কাঁপিয়া উঠে।

মে। দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া এই কথা মনে থাকিবে কি?

সে। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ভুলিব না। একবার যে প্রতিবিম্ব হৃদয়ে পড়িয়াছে, তাহা আর মুছিতে পারিব না। মেহের, যদি ভালবাসিতে!

মে। তবে জানিবেন, সের আফ্‌গান কখনও মেহের উন্নিসার চিত্ত অধিকার করিতে পারিবে না;—দুরাকাঙ্খাই তার অবলম্বন।

সে। আজ সেলিমের অসিতে শক্তি হইল।

শ্রীমাখনলাল সেন।

বিষ্ণুপ্রিয়ার বিদায়-দান।

যেদিন প্রথম নাথ, হেরেছি ও মুখ-চাঁদ,
হারায়েছি আমি সমুদায়,
সব করি সমর্পণ, পেয়েছিনু ও-চরণ,
আজ তুমি মাগিছ বিদায়।
যত কিছু পৃথিবীতে, কিছু লাগিত না চিতে,
তব আগে কিবা কোন্ ছার,
পৃথিবীতে কোন্ ধনি, আমা সম আছে ধনী
শ্রীচরণ সম্পত্তি আমার।
নাথ, গৃহকাজে রহি, মনে জাগে রহি-রহি,
বিধি দিয়াছেন যেই ধন,
সে মোর নিধির কাছে, কিবা এ জগতে আছে ?
আমার সম্পত্তি শ্রীচরণ !
নাথ, তুমি নিদ্রা গেলে, বসি তব পদতলে,
হেরিতাম চরণযুগল,
অতুল গৌরবে মোর, নয়নে বহিত লোর
এ সম্পত্তি আমারি কেবল।
নাথ, তুমি নিতি নিতি কীর্ত্তনে পোহাও রাতি
একা গৃহে, আমি ভাবি মনে,
তব পদসেবা-ভার আমারই অধিকার
চিরদিন তোমার চরণে।
আমারি তো আছে নিধি, দিন যবে দেন বিধি
পুরাইব সাধ সমুদায় ;
হেরি তব পদতলে, সবে ভাগ্যবতী বলে,
আজ তুমি মাগিছ বিদায়।
নাথ, তুমি মাগিছ বিদায় !
গতি তুমি, তুমি স্বামী, কি আর বলিব আমি,
এই ভিক্ষা তোমার ও পায়,—
যেন ওই শ্রীচরণ আমার সর্ব্বস্ব ধন,
কভু না হারাই প্রাণেশ্বর !
তোমার চরণ-দাসী তুয়া পায় অভিলাষী
দুঃখিনীরে আশীর্ব্বাদ কর।

শ্রীসরলাবালা দাসী।

দ্বিতীয় বেহালা।

সাসেক্সকাউন্টিস্থিত কস্মোপোলিটান থিয়েটারে মহলার খুব ধূম পড়িয়া গিয়াছে। আগামী সপ্তাহে "মেরিয়া" নামক নূতন নাটিকা অভিনীত হইবে। মিস্ নোরা তাঁহার অতুলনীয় সঙ্গীতস্রোতে রঙ্গমঞ্চ ভাসাইয়া দিবে—তাহারই এই আয়োজন!

অতি সুন্দরভাবে কন্সার্ট বাজিতে লাগিল। গভীর মেঘগর্জ্জনের মত শুনা যাইতে লাগিল, কখন তরঙ্গায়িত সমুদ্রের ভীষণ গর্জ্জনের মত বোধ হইল, আবার কখন মনে হইল কে যেন প্রেম এবং প্রাণের সুমিষ্টতার বিষয় অতি চুপে চুপে সতর্কতার সহিত মৃদুস্বরে বলিয়া গেল। যেন ঝটিকার মধ্য হইতে সুরস্রোতের নির্ম্মল শান্তিটুকু ধীরে ধীরে জন্মগ্রহণ করিল, যাহার উপর সুখের অপার্থিব স্বপ্ন বিদ্যুতের মত ক্ষণেকের জন্য খেলিয়া গেল। যেন যাহা কিছু মহান্, যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু সুন্দর তাহাই বুঝাইবার জন্য কে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল। মিস্ নোরা গান আরম্ভ করিলেন। সে সঙ্গীত প্রথম মৃদুসমীরণের মত ধীরে ধীরে উত্থিত হইয়া ক্রমে প্রবল বাত্যার মত রঙ্গমঞ্চকে তোলপাড় করিয়া দিল, যেন আবেগ ভরে তাহার প্রত্যেক স্থানকে বার বার আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া তাহার পদতলে লুটিয়ালুটিয়া পড়িতে লাগিল। আর সে যে জীবনের এই বিরোধরাশিকে একসুরে গ্রথিত করিয়া তুলিতেছিল, তাহারো আকৃতি এবং প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহার ক্ষুদ্র সুন্দর মুখখানি চিত্র-লিখিতা অপ্সরীর মত শোভা পাইতে লাগিল। ঘন কৃষ্ণবর্ণ অলকগুচ্ছ তরঙ্গে তরঙ্গে ঘুরিয়া ফিরিয়া নানাভঙ্গীতে পৃষ্ঠের উপর পড়িয়াছে এবং কোমল অনুরাগ ও তেজ-পরিপূর্ণ নেত্রদ্বয় প্রশস্ত ললাটের নিম্নে যৌবনগর্ব্বালোকে আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে।

কন্সার্টের অধ্যক্ষ বেত্রহস্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সকলেই প্রাণপণে উৎকৃষ্ট সুর বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে। ভুল হইলে আর রক্ষা নাই। সমস্তই বেশ চলিতেছিল ;—হঠাৎ কন্সার্টের মধ্য হইতে একখানা বেহালা বড়ই বেসুরো বাজিয়া উঠিল। বিরক্ত হইয়া মিস্ নোরা গান বন্ধ করিলেন। রোষকষায়িত লোচনে অধ্যক্ষ ডাকিলেন "জেম্‌স্!"

সুন্দর ফুটফুটে একজন যুবক ললাটের উপর হইতে কুঞ্চিত কেশদাম সরাইয়া সলজ্জভাবে রক্তবর্ণ-মুখে উত্তর করিল, "একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম, প্রভু!" অধ্যক্ষ সে কথায় বিশেষ কর্ণপাত না করিয়াই বলিলেন, "রোল্যাণ্ড, তুমি দ্বিতীয় বেহালাখানির কাছে যাও! তোমার বেহালাটি আমি বাজাইতেছি! জেম্‌স্ তুমি উঠিয়া যাও! সজ্জাগৃহে আমার জন্য অপেক্ষা করিও!"

সঙ্কুচিত জেম্‌স্ আসন ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত স্থিরভাবে দাঁড়াইল। সেই একমুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার হৃদয়ে কত কথা জাগিয়া উঠিল। সেই যখন প্রথম সে বেহালা শিখিতে আরম্ভ করে, তাহার পর কত সুর কত গাথা, কত রাগিনী, কত চাতুরী, কত কৌশলই সে শিখিয়াছিল! হায় হায়, আজ তাহার সকলই বৃথায় গেল! এতদিন ধরিয়া সে যে এত সাধনা করিয়াছে, দারুণ ক্ষোভে এবং অভিমানে আজ তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল। মনে হইল, তাহার হস্ত তাহাকে বড় প্রবঞ্চিত করিয়াছে—প্রয়োজনের সময় ঠিক সুর বাহির করিতে পারে নাই। একটু ক্রোধও হইল। ভাবিল, গৃহে ফিরিয়া তাহার সাধের যন্ত্রগুলি ভাঙ্গিয়া জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে; কিন্তু তাহাতেই কি তাহার লাঞ্ছনার শেষ হইবে? তাহার স্মরণ হইল, তাহাকে সজ্জাগৃহে অপেক্ষা করিতে হইবে। সেখানে হয়ত তাহার পৃষ্ঠে অধ্যক্ষের বেত্রের দৃঢ়তা পরীক্ষিত হইবে। হয়ত কেন, নিশ্চয়—ইহাই নিয়ম। লজ্জায় তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে দেখিল, মিস্ নোরা তাহার দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। তাহাই দেখিতে দেখিতে সে সেখান হইতে চলিয়া আসিল।

সজ্জাগৃহে আসিয়া জেম্‌স্ একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে যে খুব উৎকৃষ্ট বেহালা বাজাইতে পারে, তাহার যশে যে সাসেক্সকাউণ্টি মুখরিত ছিল, সে কথা সে একেবারেই ভুলিয়া গেল—কেবল মনে জাগিতে লাগিল নিদারুণ সন্ধ্যার অগৌরবের কথা—যখন সে সামান্য শিক্ষার্থীর মত অন্যমনস্ক

হইয়া বেসুরা বাজাইয়াছিল। কেবল স্মরণে জাগিতে লাগিল—অধ্যক্ষের সেই কঠোর আদেশে যখন তাহাকে অবমানিত করিয়া কন্সার্ট পার্টি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পার্শ্বগৃহ হইতে কন্সার্টের সুর তাহার বক্ষপঞ্জর ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া বাজিতে লাগিল। কন্সার্ট কখন থামিয়াছে, তাহা সে জানিতেও পারিল না—হঠাৎ পৃষ্ঠদেশে কাহার করস্পর্শে সে চমকিয়া উঠিল। ভাবিল, এইবার অধ্যক্ষ তাহার শাস্তি দিবার জন্য আসিয়াছেন। হায়, হায় কি লাঞ্ছনা! কি অবমাননার কথা! তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত জল হইয়া গেল! মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল! ভয়ে ভয়ে সে ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, পশ্চাতে স্মিতমুখে মিস্ নোরা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! মিস্ নোরা কহিল, "জেম্‌স্ তুমি দুঃখ কর কেন? সাসেক্সকাউণ্টিতে তোমার মত কে বেহালা বাজাইতে পারে?"

জেম্‌স্ কি বলিতে যাইতেছিল—আবেগের ভরে বলিতে পারিল না।

মিস্ নোরা তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া বলিলেন "আমি অধ্যক্ষকে বলিয়াছি, তুমি বেহালা না বাজাইলে আমি গান গাহিতে পারিব না। তিনি তোমার এ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন!"

জেম্‌স্ কোন কথা বলিল না—কিন্তু এমন একটী ভাব তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল, যাহা হইতে স্পষ্ট বোঝা গেল, কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে।

পর সপ্তাহে মেরিয়ার অভিনয় আরম্ভ হইল। মিস্ নোরার গানে শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ-বিহ্বল হইয়া পড়িল। আর মুগ্ধ হইল—কন্সার্টের মধ্য হইতে একখানি বেহালার সুরে। গানে যাহা অস্পষ্ট ছিল, বেহালা তাহা সুস্পষ্ট করিয়া দিতেছিল। গানে যাহা সম্যক বোধগম্য হইতেছিল না, বেহালা তাহা সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিতেছিল। অভিনয় শুনিতে আসিয়া লোকের মনে হইতে লাগিল, বুঝি জগতে আছে কেবল একটিমাত্র গান, আর একটি বেহালা, আর সব শূন্য—অন্ধকার—যাহা বুঝিবার কাহারও আগ্রহ নাই—অবসর নাই—প্রয়োজন নাই।

(২)

একদিন অভিনয় শুনিতে আসিয়া সকলে দেখিল কন্সার্ট বাজিতেছে; কিন্তু মিস্ নোরা নাই। কন্সার্টের মধ্য হইতে জেম্‌সের বেহালাটা সেই পরিচিত সুরে আজ যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। প্রতিদিন জেম্‌স্

যেমন বাজায়, আজ আপনার অজ্ঞাতে তাহা অপেক্ষা বেহালার সুরে একটু অধিক করুণতা মিশ্রিত করিয়া ফেলিয়াছিল—তাহাতে তাহা আরো মধুর—আরো মনোহর শুনাইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ আসিয়া শ্রোতৃবর্গকে সম্বোধন করিয়া করযোড়ে কহিতে লাগিলেন "আজ আপনারা মিস্ নোরার গান হইতে বঞ্চিত হইতেছেন—সে জন্য ত্রুটিস্বীকার করিতেছি। এইমাত্র সংবাদ পাইলাম, মিস্ নোরা হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন—তাঁহার জীবন সংশয়। আশা করি, ইহা জানিয়া আপনারা আমাদের ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।"

চারিদিকে একটা বিষাদের ছায়া পড়িয়া গেল। মিস্ নোরার গানের মাধুর্য্য যেন সকলেরি আপনার লোকের মত হইয়া পড়িয়াছিল, আজ সেই আত্মীয় বিয়োগাশঙ্কায় সকলেই কাতর হইয়া উঠিল। তখনো জেম্‌সের বেহালা বাজিতেছিল। কি সুন্দর মধুর ভাবেই না বাজিতেছিল; বুঝি মিস্ নোরার গানের অভাব সে আজি একাই পূরণ করিতে চাহে! অল্পক্ষণ পরে বেহালাও থামিয়া গেল!

বেহালাটি রাখিয়া অধ্যক্ষের নিকট আসিয়া জেম্‌স্ কহিল, "আমার শরীর বড় অসুস্থ—আমি আজ আর বাজাইতে পারিব না।" তাহার মুখে রক্তের চিহ্নমাত্র নাই—চক্ষু হইতে উন্মত্ততার অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। তাহা দেখিয়াই অধ্যক্ষ তাহাকে ছুটি দিলেন। সে রঙ্গমঞ্চ হইতে বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় দ্বাররক্ষকের নিকট মিস্ নোরার ঠিকানাটি জানিয়া লইল।

রঙ্গালয় হইতে বাহির হইয়া জেম্‌স্ প্রথম আপনার গৃহে গমন করিল। সেখান হইতে বাছিয়া বাছিয়া একটি উৎকৃষ্ট যন্ত্র বাহির করিল। সেইখানাতেই তাহার প্রথম শিক্ষা হয়। বাজাইয়া দেখিল, সেটা বেশ ভালই আছে। তন্ত্রীগুলিকে টানিয়া টুনিয়া সুর বাঁধিল এবং অবশেষে যন্ত্রটী লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। অনেক পথ ঘুরিয়া শেষে মিস্ নোরার বাটির বহির্দ্বারের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে আসিতেই সে একজন লোককে সেই বাটি হইতে নির্গত হইতে দেখিল। তাঁহাকে দেখিলেই ডাক্তার বলিয়া মনে হয়। অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতভাবে জেম্‌স্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, মিস্ নোরা কেমন আছেন? তাঁহাকে একবার দেখিতে যাইতে পারি কি?"

ডাক্তার স্থিরভাবে তাহার মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া অবশেষে কহিলেন, "না, এ সময়ে সামান্য উত্তেজনাই তাঁহার প্রাণহানিকর হইতে পারে; সুতরাং এখন কাহাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিতে পারি না।"

ইহা বলিয়াই তিনি তাড়াতাড়ি গাড়ী করিয়া চলিয়া গেলেন। জেম্‌স্ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। চারিদিক নিস্তব্ধ—যেন জনপ্রাণী নাই। একটি কক্ষের দ্বার রুদ্ধ ছিল, জেম্‌সের বোধ হইল সেই কক্ষেই নোরা রুগ্নশয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে—হয়'ত বা মৃত্যুশয্যায়!

জেম্‌স্ আর ভাবিতে পারিল না। সেইখানে বসিয়া পড়িল—বেহালাটি তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাজাইতে লাগিল। সেই সুর—সেই চিরপরিচিত সুর সেই রমনীয়-কমনীয় সুর! গৃহপ্রাঙ্গণ, আকাশবাতাস ভরিয়া গেল—আনন্দের খরস্রোত কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

নোরা অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়াছিলেন; হঠাৎ চক্ষু চাহিয়া কহিলেন, "জেম্‌স্ আসিয়াছে? ঐ যে তাহার বেহালার সুর শোনা যায়!" তাহার পর স্থিরভাবে শুনিতে লাগিলেন। যখন একটি সুর শেষ হইয়া গেল, তখন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নোরা আপনার মনে কহিলেন, "এত কৌশল কোথায় শিখিয়াছিলে, জেম্‌স্?" জেম্‌স্ আর একটা সুর ধরিল। এমনি বাজাইতে লাগিল, যেন মনে হইল স্বর্গ হইতে অপ্সরীগণ কোন স্বর্গীয় যন্ত্র বাজাইতে বাজাইতে নামিয়া আসিতেছে। মিস নোরার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

হঠাৎ খট করিয়া তন্ত্রী ছেঁড়ার মত একটা আওয়াজ হইল। তাহার পর সব নিস্তব্ধ! মিস্ নোরা কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কি করিলে জেম্‌স্?" তাহার পরমুহূর্ত্তে সব নীরব!

সেবা-নিরতা পরিচারিকাগণ যখন ধরাধরি করিয়া মিস্ নোরার মৃতদেহ কক্ষ হইতে বাহিরে আনিল, তখন তাহারা দেখিল একটি ছিন্নতন্ত্রী-বেহালা বক্ষে চাপিয়া এক তরুণবয়স্ক যুবক দ্বারের সম্মুখে হতচেতনের মত পড়িয়া আছে! *

শ্রীনলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়।

---

* ইংরাজী হইতে অনূদিত—লেখক।

বঙ্গরাজ দেবখড়্গের তাম্র-শাসন।

আজকাল বাঙ্গালার ইতিহাস-নামে যে সকল ইতিহাস প্রচলিত আছে, সেগুলিতে মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় যে সকল হিন্দু বা বৌদ্ধরাজ-বংশ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে পাল ও সেনরাজগণের বিবরণ ব্যতীত আর কোন রাজবংশের বিবরণ পাওয়া যায় না। বঙ্গের জাতীয়-ইতিহাস-লেখক সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর "রাজন্যকাণ্ড" কবে প্রকাশিত হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। তাঁহার "ব্রাহ্মণকাণ্ড"ই এখনও শেষ হয় নাই। শুনিয়াছি "রাজন্যকাণ্ডে" তিনি অনেক অশ্রুতপূর্ব্ব রাজবংশ ও রাজন্যবংশের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার "ব্রাহ্মণকাণ্ড" প্রথমভাগ হইতে স্বনামখ্যাত বাঙ্গালার ইতিহাসগুলির অজ্ঞাত কয়েকটি তথ্য অধিক এবং নূতন জানা গিয়াছে। তিনি প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন, 'আদিশূর' কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে। তাঁহার নাম পঞ্চগৌড়াধিপ মহারাজ জয়ন্ত। এই জয়ন্ত স্বীয় জামাতা কাশ্মীরাধিপতি ললিতাদিত্য জয়াপীড়ের সাহায্যে পঞ্চগৌড় জয় করিয়া, তাহার চক্রবর্ত্তী সম্রাট হন এবং শূরবংশীয় নৃপতিগণের আদিপুরুষ বলিয়া 'আদিশূর' নামে খ্যাত হন। আদিশূর জয়ন্তের বংশে ভূশূর, ক্ষিতিশূর, ধরাশূর, প্রভৃতি নয় জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশের শেষ রাজার নাম রণশূর। শূরবংশের সকলেই চক্রবর্ত্তীরাজ ছিলেন না। ইঁহাদের অধিকার কালেই পাল ও সেনবংশীয়েরা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। উক্ত দুই বংশের অধিকারকালে ইঁহারা (শূরবংশীয় রাজগণ) স্থানে স্থানে অর্দ্ধস্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। নগেন্দ্রনাথ বসু এই সকল তথ্য রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রকুলগ্রন্থ হইতে আবিষ্কৃত করিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই আবিষ্কারে উৎসাহিত হইয়া অনেকেই এখন বাঙ্গালার ইতিহাসের এই অংশে গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার ফলে আরও অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে।

সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত গঙ্গামোহন লস্কর এম্, এ মহাশয় 'খড়্গবংশ' নামে বাঙ্গালার আর একটি রাজবংশের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। ঢাকা জেলায় রায়পুর থানার অধীনে আশরফ্‌পুর নামে একটি গ্রাম আছে। * গ্রামে একটি

* এই গ্রাম ঢাকার উত্তর-পূর্ব্বে ৩০ মাইল এবং শীতললক্ষ্যা নদীর ৫ মাইল দূরে অবস্থিত।

প্রাচীন বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণীর ধারে বহুকাল হইতে মৃত্তিকার একটি উচ্চ স্তূপ ছিল। ১৮৮৪।৮৫ খৃষ্টাব্দে উহা ভাঙ্গিয়া সমভূম করিবার সময় উহার মধ্য হইতে একটি পিত্তলের চৈত্য (ক্ষুদ্রাকৃতি মন্দিরাকার বস্তু) ও দুইখানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। উহা এখন এসিয়াটিক সোসাইটিতে আছে। সোসাইটির ১৮৮৫ সালের কার্য্যবিবরণে ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ঐ দুইখানি তাম্রশাসনের মধ্যে একখানির বিবরণ প্রকাশ করেন। † অপর তাম্রশাসনখানির বিবরণ উক্ত সভার ১৮৯০ সালের কার্য্যবিবরণীতে ‡ প্রকাশিত হয়। পরবৎসর ডাক্তার হরণ্‌লি উক্ত চৈত্যটির বিবরণ, ছবি ও তাম্রশাসন দুখানির বিষয় আগষ্ট মাসের কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ করেন। § ইহার পর আর উহার কোন আলোচনা কেহ করেন নাই। গত ১৯০৪ সালের নভেম্বর মাসে উক্ত সভার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত গঙ্গামোহন লস্কর উহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহা ১৯০৬ সালের নব-প্রকাশিত Memoirs নামক উক্ত সভার নূতন পুস্তিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। * গঙ্গামোহন বাবু এই প্রবন্ধে বঙ্গের আর একটি পুরাতন হিন্দুরাজবংশের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালার ইতিহাস-প্রিয় পাঠকগণের জন্য আমরা গঙ্গামোহন বাবুর প্রবন্ধ হইতেই ইহার বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিতেছি। পূর্ব্বোক্ত তাম্রশাসন দুইখানির পাঠ পূর্ব্বে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, গঙ্গামোহন বাবু গবেষণাবলে তাহাতে অনেক ভ্রম-প্রমাদ এবং অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করিয়াই এই প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদিত তাম্রশাসনখানিকে আমরা অতঃপর 'ক' শাসন ও অপরখানিকে 'খ' শাসন বলিয়া নির্দ্দেশ করিব।

উভয় শাসনেই শীর্ষস্থানে ঢালাই করা বা ছাঁচে তোলা স্বতন্ত্র রাজমুদ্রা সংলগ্ন আছে। এই রাজ-মুদ্রায় একটি করিয়া বৃষাসন ও এক পংক্তি লেখা আছে। এই চিহ্ন ও লেখা খুব স্পষ্ট উচ্চ অক্ষরে ঢালা। 'খ' শাসনের লেখাটি স্পষ্ট আছে এবং 'শ্রীমদ্দেবখড়্গ' বলিয়া পড়া যায়। 'ক' শাসনের লেখাটি কালক্ষয়ে ক্ষয়িত হইয়া অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। 'ক' শাসনখানি মোটের উপর সর্ব্বত্র ক্ষয় হইয়া যাওয়াতে বহুস্থলে বিশেষতঃ প্রান্তগুলিতে পাঠ

† Report A. S. B. 1885—pp. 49—52.
‡ ,, ,, 1890—pp. 242.
§ ,, ,, 1891—pp. 119—128.
* Memoirs of A. S. B. vol I. No. 6. pp. 81—91.

একবারে অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইহার সম্পূর্ণ ও সংলগ্ন পাঠোদ্ধার করা অসম্ভব। শাসনখানির মর্ম্ম এইরূপ,—এই শাসন দ্বারা নয় পাটক, দশ দ্রোণ ভূমি কোন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর আশ্রমে দান করা হইয়াছে, সম্ভবতঃ রাজা দেবখড়্গই এই দানকর্ত্তা। দাতা স্বীয় পুত্র রাজরাজভট্টের দীর্ঘায়ু কামনায় এই ভূমি দিয়াছেন। এই সন্ন্যাসাশ্রমাদি সম্ভবতঃ আক্ষায্য বন্দ্য সঙ্ঘমিত্র নামক ব্যক্তির হস্তে ছিল। রাজরাজ ও দেবখড়্গ ব্যতীত এই শাসনে মহাদেবী প্রভাবতী নামে এক রাজ্ঞীর নাম পাওয়া যায়। ইহাতে '১৩ বৈশাখ ১৩ সম্বৎ' এই তারিখ দেওয়া আছে।

'খ' শাসনেও সঙ্ঘ মিত্রের আশ্রমে ছয় পাটক, দশ দ্রোণ জমীদানের কথা আছে; দাতা সম্ভবতঃ যুবরাজ রাজরাজ। এই শাসনখানির তারিখ ২৫শে পৌষ ১৩ সম্বৎ। ইহাতে রাজরাজ ও দেবখড়্গের নাম ব্যতীত খড়্গোদ্যম ও জাতখড়্গ নামে আর দুই রাজার নাম পাওয়া যায়। খড়্গোদ্যম দেবখড়্গের পিতা এবং জাতখড়্গ তাঁহার পিতামহ। এতদ্ব্যতীত 'খ' শাসনে এই রাজবংশজাত উদীর্ণখড়্গ নামে আর এক ব্যক্তিরও নাম পাওয়া গিয়াছে। উভয় শাসনই জয়কর্ম্মান্তবাসক নামক স্থান হইতে প্রচারিত হইয়াছে। উভয় শাসনেই বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া দানপত্র আরম্ভ করা হইয়াছে; উভয় শাসনেরই লেখক পূরদাস, এ ব্যক্তিও বৌদ্ধ। ইতিহাস-বিষয়ে এই দুইখানি শাসনের মূল্য অতি অধিক। ইহা হইতে পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সম্ভবতঃ পাল-রাজগণের পূর্ব্বকালে এক নূতন বৌদ্ধ রাজবংশের বিবরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। শাসন দুইখানির ভাষা সংস্কৃত এবং যে আকারের অক্ষরে ইহা খোদিত হইয়াছে, তাহা পাল ও সেন রাজগণের শাসনাদিতে ব্যবহৃত অক্ষর অপেক্ষাও পুরাতন কুটীল-শ্রেণীর অক্ষর। এই অক্ষর দেখিয়া এই দুইখানিকে খৃষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীর উৎকীর্ণ-লিপি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

এই দুইখানি শাসনে তলপাটক, দরপাটক, মর্কটাসিপাটক প্রভৃতি 'পাটক' শব্দযুক্ত যে সকল গ্রাম-নাম পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, টি, র্যান্‌কিন্ রাইপুর থানার অন্তর্গত তলপাড়া নামক গ্রামকেই 'তলপাটক' বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। গঙ্গামোহন বাবু 'পাটক' শব্দ হইতে 'পল্লী'-বোধক বাঙ্গালা 'পাড়া' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। সংস্কৃত 'পাটক' শব্দের অর্থ গ্রামাংশ।

'ক' শাসন হইতে জানা যায়, রাজবংশীয়া কামিনীরা নিজ নিজ ব্যবহারের জন্য গ্রাম বা গ্রামাংশের উপসত্ব ভোগ করিতেন। রাজ্ঞী প্রভাবতী ও শুভাংসুকা নাম্নী কোন মহিলার ঐরূপ অধিকৃত গ্রাম-মধ্য হইতে এই শাসনের দানের জমীর কিয়দংশ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এই দুই তাম্র-শাসনে সম্বৎ ১৩ ও ২৫শে পৌষ এবং ১৩ই বৈশাখ বুঝাইতে অঙ্কগুলির এককের বামে দশক অর্থাৎ ১৩' ২৫' এইরূপ লেখা হয় নাই। ১০+৩, ২০+৫ এইরূপভাবে লেখা হইয়াছে। শাসন দুইখানি প্রচারের ভার ছিল—শ্রীযজ্ঞ বর্ম্মন্ নামক কোন কর্ম্মচারীর উপরে। যে সঙ্ঘ মিত্র নামক বৌদ্ধাচার্য্যকে এই সকল ভূমি দান করা হইয়াছে, তাঁহার পরিচয় স্থলে কেবলমাত্র এক শিষ্যের নাম 'খ' তাম্রশাসনে লিখিত আছে; তাঁহার নাম শালীবর্দ্ধক।

এই দুইখানি তাম্রশাসন হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও স্থানের নাম পাওয়া গিয়াছে।

স্থানের নাম।	ব্যক্তির নাম।
অটল্যোত্থানিকাতরলা	খড়্গোদ্যম
ককোদারক্ষোরক	জাতখড়্গ
শ্রীমিত্রাবলী	দেবখড়্গ
রেলতলক	উদীর্ণখড়্গ
পরানাটননাদ	রাজরাজ
পলশাত	পূরদাস
শিবহ্রদিকাশোগ্নবর্গ	শ্রীযজ্ঞবর্ম্মণ্
শ্রীমেত	রাজ্ঞী শ্রীপ্রভাবতী
রোল্লবায়িকা উগ্রবোরক	শুভাংসুকা
ভীসজয়দত্তকটক	সামন্ত বণ্টিয়োক
দ্রোণিমঠিকা	নেত্রভট
পাটক	শর্ব্বান্তর
তলপাটক	মহত্তর
দরপাটক	শিখর
মিদিকিল্লিকাশালীবর্দ্ধক	বন্দ্য জ্ঞানমতি
মর্কটাসীপাটক	শক্রক।

ব্যসনাগপাটক	উপাসক
নবরোপ্য	স্বস্তিয়োক
পরনাটননীল	সুলব্ধ
দারোদক	রাজদাস
ব্বারমুগ্‌গক	দুর্গট

উপরে যে সকল নাম লিখিত হইল, তন্মধ্যে বন্দ্যজ্ঞানমতি ও শ্রীযজ্ঞ বর্ম্মণ্‌ এই দুই নামে উপাধি সংযুক্ত আছে বলিয়া মনে হয়। বর্ম্মণ্‌ ক্ষত্রিয়ের সাধারণ উপাধি, জ্ঞানমতির 'বন্দ্য' উপাধি রাঢ়ীয় বন্দ্যোপাধ্যায় কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ আছে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাঢ়ীয়-বারেন্দ্রের আদি পুরুষ কাণ্যকুব্জীয় বৈদিক ব্রাহ্মণগণ এদেশে আসিয়াছিলেন; কিন্তু খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে বা নবম শতাব্দীর প্রথমে আদিশূরের পুত্র ভূশূর বা পৌত্র ক্ষিতিশূরের সময়ে রাঢ়ীয়-বারেন্দ্রের গাঞী বিভাগ হয়। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বল্লাল সেন রাঢ়ীয়-বারেন্দ্রের মধ্যে কৌলীন্যের ব্যবস্থা করেন। যাঁহারা বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের বিবাদে গাঞী বিভাগের কল্পনা করেন, তাঁহারা ভুল করিয়া থাকেন। ভূশূরের সময়ে গাঞী বিভাগ হয়; কিন্তু রাঢ়ীয়-বারেন্দ্র বিভাগ বল্লাল সেনের পূর্ব্বেই হইয়াছিল। তাহা কোন সময়ে হয়, তাহা এখনও নিশ্চিত রূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সেইজন্যই আমরা এই বন্দ্যজ্ঞানমতিকে জ্ঞানমতি বন্দ্যোপাধ্যায় বলিতে ঈষৎ সঙ্কুচিত হইতেছি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আজকাল বাঙ্গালা নাম-রহস্যের আলোচনা করিতেছেন। বাঙ্গালীর এখনকার নামগুলির সহিত এইসকল নামের তুলনা করিলে ইহাদিগকে নিতান্ত পৌরাণিক জীব বলিয়া মনে হইবে। এ বিষয়ে এখনও অনেক গবেষণা প্রয়োজন।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

ব্যর্থ।

আমার মঙ্গল-ঘট ঠেলিয়া চরণে
জননি! যেদিন তুমি হ'লে অন্তর্হিত
সেই দিন স্থির আমি বুঝেছিনু মনে
জীবনের আলো মোর চির-নির্ব্বাপিত।
মাঝে মাঝে ক্ষরে আশা ঝলসি' নয়নে
আলো নহে—আলেয়া সে বুঝেছি নিশ্চিত
সে কোন কল্যাণ তরে তবু প্রাণপণে
ছুটিয়া চ'লেছি হায়! সতত তৃষিত।

সহস্র অভাব যদি ঘুচে গো এখনি
কোনো এক মায়া-দীপ কুড়াইয়া পাই
তোমা-হারা গৃহ তবু রহিবে এমনি,
কিসের কল্যাণ সেথা তুমি যেথা নাই।
কোন কাজে তবে হায় দিবস রজনী
একান্ত নিমগ্ন রহি' ঘুরিয়া বেড়াই?

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

দুঃখিনী।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

তাহার পর অল্পদিনের মধ্যেই দুঃখিনীর বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক ১৫৲ টাকা সাহায্য গবর্ণমেণ্ট হইতে মঞ্জুর হইয়া আসিল। মহাজনের ঋণ ডেপুটী বাবু পরিশোধ করিয়া দিয়াছিলেন; সুতরাং এখন বিদ্যালয়ের যে আয় হইতে লাগিল, তাহা দুঃখিনীর হাতে জমিতে লাগিল।

দুঃখিনী চিরদুঃখিনী—তাহার টাকার প্রয়োজন কি? সংসারের এক বন্ধন ছিল—ভাই রসিক; সে এই কয় বৎসর নিরুদ্দেশ—বাঁচিয়া আছে কি-না কে জানে! গ্রামের সকলে বলিত, রসিক বাঁচিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই একবার না একবার গৃহে ফিরিত; সে যে অবস্থায় দুঃখিনীকে ফেলিয়া গিয়াছিল, তাহাতে নিতান্ত পরপিশাচ না হইলে এতদিন কেহ নিরাশ্রয়া

বিধবা ভগিনীকে ভুলিয়া থাকিতে পারে না; কিন্তু দুঃখিনীর মনে হই রসিক বাঁচিয়া আছে। রসিক নাই, এ কথা দুঃখিনী ভাবিতে পারিত না।

সদানন্দেরও বিশ্বাস রসিক বাঁচিয়া আছে। সে যখনতখনই বলি "মা, তুই ভাবিস্ না, রসিক বেঁচে আছে। একদিন সে বাড়ী আস্‌বেই সদানন্দের এই কথা দুঃখিনীর নিকট দৈববাণী বলিয়া মনে হইত, তি রসিকের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া দিন কাটাইতেন। প্রতিদিন প্রাতঃকাল তিনি মনে করিতেন 'আজ রসিক আসিবে।' সন্ধ্যার সময় যখন তি দেখিতেন রসিক আসিল না, তখন তিনি কাতরহৃদয়ে বলিতেন "সদা কাব কৈ রসিক ত এল না?" সদানন্দ তখন কাতরকণ্ঠে গান করিত—

"আসার আশায় দীন দরদি!
আমি আর কতদিন রবো।"

এদিকে একদিন ডেপুটী বাবু সদর হইতে সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, বিদ্যালয়-বিভাগের ইনস্পেক্টর সাহেব অতি সত্বর মহকুমায় আসিতেছেন, তিনি দুঃখিনীর বিদ্যালয় পরিদর্শনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া দুঃখিনী ভয়ে আড়ষ্ট হইলেন। ডেপুটী বাবু বাঙ্গালী ভদ্রলোক, সদাশয় ব্যক্তি, তাঁহার সম্মুখে দুঃখিনী বাহির হইতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু সাহেবের সম্মুখে তিনি কেমন করিয়া যাইবেন। দুঃখিনী সেই কথা ডেপুটী বাবুকে বলিয়া পাঠাইলেন; ডেপুটী বাবু তাহার উত্তর পাঠাই-লেন যে, দুঃখিনীর কোন ভয় নাই, ইনস্পেক্টর সাহেব যেদিন মহেন্দ্রপুরে যাইবেন, ডেপুটী বাবু তাঁহার সঙ্গে যাইবেন এবং যাহা বলিতে কহিতে হয়, তিনিই করিবেন। দুঃখিনী আশ্বস্ত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি ভাবনা ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

সদানন্দ যখন শুনিল যে, সাহেব দুঃখিনীর স্কুল দেখিতে আসিবেন, তখন সে বলিল "মা, ভয় কি? আমি সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সওয়ালজবাব করিব। আর সাহেবকে এমন গান শুনাইয়া দিব যে, তাহার আর কথা বলিতে হইবে না।"

যথা সময়ে ডেপুটী বাবুকে সঙ্গে লইয়া ইনস্পেক্টর সাহেব মহেন্দ্রপুরে আসিলেন। তিনি বালকবালিকাদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। তাহার পর ডেপুটী বাবু যখন ইনস্পেক্টর সাহেবকে লইয়া বাগান দেখাইলেন, তখন সাহেব একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তিনি

বলিলেন "আমি আজ ১৭ বৎসর ভারতবর্ষে আসিয়াছি; এই ১৭ বৎসর আমি শিক্ষাবিভাগে কাজ করিতেছি; কিন্তু এমন দৃশ্য কখনও দেখি নাই। শিক্ষা-প্রদানের এমন সুন্দর পণ্ডিতও আমি এদেশে কোন স্থানে দেখি নাই। এই প্রণালীতে শিক্ষাদানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।"

তাহার পর ইনস্পেক্টর সাহেব একটি প্রস্তাব করিলেন; তিনি বলিলেন "বিলাত অঞ্চলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এক স্কুলে পড়িয়া থাকে বটে, কিন্তু এদেশে এ ভাবে শিক্ষাদান কর্ত্তব্য কিনা তাহা আমি এখনও স্থির করিতে পারি নাই। আমার মত এই যে, ছেলেদের জন্য স্বতন্ত্র একটা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক এবং মেয়েদের জন্য আর একটি বিদ্যালয় হউক। যদি শিক্ষয়িত্রী মহাশয়ের ইহাতে আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে পৃথক পৃথক বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় আমি সরকার হইতে দিতে প্রস্তুত আছি এবং বিদ্যালয়ের জন্য যে মাসিক ১৫৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর হইয়াছে, তাহা বালক-বিদ্যালয়ের জন্য থাকুক, বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক ৩০৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুরের জন্য সরকারে পত্র লিখিব এবং আমার বিশ্বাস আমি এ সাহায্য আদায় করিয়া দিতে পারিব।

ডেপুটী বাবু এই কথা দুঃখিনীকে বলিলে, দুঃখিনী আনন্দের সহিত সম্মত হইলেন। এ দিকে গ্রামের যে সমস্ত লোক সেইস্থানে সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন যে, গ্রাম হইতে গৃহনির্ম্মাণ সম্বন্ধে যাহা কিছু দিতে হইবে, এমন কি মজুরের বেতন পর্য্যন্ত সরকার হইতে দিতে হইবে না, গ্রামের লোকেরাই সমস্ত করিয়া দিবে; তবে তাহাদের একটা নিবেদন আছে যে, এই দুইটি বিদ্যালয়েরই "দুঃখিনী-বিদ্যালয়" নামকরণ হইবে, ইনস্পেক্টর সাহেব বিশেষ আনন্দের সহিত এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন।

তাহার পর দুই মাসের মধ্যেই দুঃখিনীর বাড়ীর সম্মুখে রাস্তার অপর পার্শ্বে বালক-বিদ্যালয় নির্ম্মিত হইল; দুঃখিনীর বাড়ীর এক পার্শ্বেই বালিকা-বিদ্যালয়ও নির্ম্মিত হইল। বালক-বিদ্যালয়ের জন্য দুইজন শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন; বালিকা-বিদ্যালয় দুঃখিনীরই হাতে রহিল, শিক্ষক মহাশয়েরা দুঃখিনীর পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্য্য করিতেন না।

দুঃখিনীর কথা এইস্থানে শেষ করিতে পারিলেই ভাল হইত, কিন্তু তাঁহার ভাই রসিকের সম্বন্ধে দুইচারি কথা না বলিলে দুঃখিনীর জীবন-কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

রসিক একটা যাত্রার দলের সহিত গ্রামত্যাগ করিয়াছিল, একথা আমরা অনেক পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রসিক সেই যাত্রার দলের সহিত নানাস্থানে কিছুদিন ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল। একবার যাত্রা উপলক্ষে সে ময়মনসিংহ জেলার কোন গ্রামে গমন করিয়াছিল। সেখানে গান শেষ হইলে অধিকারী মহাশয় যখন গৃহস্বামীর নিকট বিদায় লইবার জন্য তাঁহার বৈঠকখানায় গমন করেন, তখন রসিকও অধিকারীর সঙ্গে গিয়াছিল। বৈঠকখানার যে পার্শ্বে অধিকারী ও রসিক আসন গ্রহণ করিয়াছিল, সেইস্থানে ফরাসের উপর একটা সোনার ডিবা পড়িয়াছিল, রসিক লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া সেই ডিবাটী চুরী করে। অধিকারী ও রসিক বৈঠকখানা হইতে বাহির হইয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরেই ডিবার সন্ধান হয়, তখন সকলেই মনে করিল যাত্রার দলের লোকেরাই ডিবা চুরী করিয়াছে। ভদ্রলোকের ভৃত্যেরা তখন যাত্রাওয়ালাদিগের বাসায় গমন করিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিল, রসিকের নিকট হইতে ডিবাটি বাহির হইল। অধিকারী মহাশয় রাগে অধীর হইয়া রসিককে তখনই পুলিশে দিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন; কিন্তু যে ভদ্রলোকের দ্রব্যটি অপহৃত হইয়াছিল, তিনি রসিকের বয়স অল্প দেখিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। তখন যাত্রার দলের লোকেরা রসিককে যথেষ্ট প্রহার প্রদানপূর্ব্বক তাড়াইয়া দিল।

মাতালই হউক, আর গাঁজাখোরই হউক ভদ্রলোকের ছেলে ত বটে, একটু লেখাপড়াও শিখিয়াছিল; সুতরাং এইভাবে প্রহৃত ও অবমানিত হইয়া রসিকের হৃদয়ে বড়ই ব্যথা লাগিল। ভগবান কখন কেমন করিয়া কাহাকে কোন্ পথে লইয়া যান তাহা আমরা অল্পবুদ্ধি মানুষ, কেমন করিয়া বুঝিব। রসিক যাত্রার দল হইতে বাহির হইয়া গ্রামপ্রান্তে এক বৃক্ষতলে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। এতদিন সে যেকথা ভাবে নাই, আজ সেই কথা তাহার মনে হইল। পিতার কথা, স্নেহময়ী অনাথিনী ভগিনীর কথা এতদিন পরে তাহার মনে হইল; বালক অনেকক্ষণ বসিয়া কাঁদিল; ক্রমে তাহার হৃদয় শান্ত হইল, তাহার মনে বল আসিল।

সে সেই রাত্রিতেই গ্রামত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। দুইদিন চলিয়া অবশেষে সে ময়মনসিংহ সহরে উপস্থিত হইল; কিন্তু এই অপরিচিত স্থানে সে কোথায় যায়। দুইদিনের অনাহারে বালক রসিক ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার আর চলিবার শক্তি ছিল না। সে রাস্তার পার্শ্বে

একটি বৃক্ষতলে বসিল, শেষে শয়ন করিল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই নিদ্রাভিভূত হইল।

কতলোক পথ দিয়া চলিয়া গেল, কেহই রসিকের দিকে ফিরিয়া চাহিল না। অবশেষে কাছারীর পোষাক-পরিহিত একটি বৃদ্ধ ঐ পথে যাইতে যাইতে দেখিলেন, একটি বালক বৃক্ষতলে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। তাঁহার মনে দয়ার উদ্রেক হইল। বৃদ্ধ ময়মনসিংহের কালেক্টরীর নাজির। তিনি বালককে ডাকিলেন, রসিকের তখন নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে চক্ষু মেলিয়া দেখিল, একটি বৃদ্ধ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। বৃদ্ধ তখন রসিকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রসিক যখন অকপটে তাহার জীবনের কথা বলিতে আরম্ভ করিল, তখন বৃদ্ধ তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন "আর শুনিয়া কাজ নাই, তুমি আমার সঙ্গে এস।" রসিক অকূলে কূল পাইল; সে বৃদ্ধ নাজির বাবুর সহিত তাঁহার বাসায় গেল।

নাজির বাবু দুই চারি দিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন যে, রসিক পূর্ব্বে যাহাই করুক না কেন, এখন সে প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। তিনি তখন তাহাকে আদালতে লইয়া গিয়া কাজকর্ম্ম শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। রসিকও বিশেষ যত্নের সহিত কার্য্য শিক্ষা করিতে লাগিল। এক বৎসর পরেই রসিকের ২০৲ টাকা বেতনের একটি চাকুরী হইল।

ইতিমধ্যে একদিন তাহারই দেশের একটি লোকের সহিত রসিকের ময়মনসিংহে সাক্ষাৎ হইল। এই লোকটী যে দুঃখিনীর দেবর রমানাথের দেশের লোক রসিক তাহা জানিত না। রাসক তাহাকে বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে সেই পাষণ্ড তাহাকে বলিল যে, তাহার ভগিনী কুলত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, এই কথা শুনিয়া রসিক মনে বড়ই ব্যাথা পাইল, সে বাড়ী যাওয়ার বাসনা একেবারে ত্যাগ করিল। কাহার জন্য সে দেশে যাইবে? অতঃপর কেহ তাহার আত্মীয়স্বজনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত, এ জগতে তাহার কেহই নাই। এই কারণেই রসিক বাড়ীতে যায় নাই বা দেশের কোন সংবাদ লয় নাই।

এদিকে যে ডেপুটী বাবুর অনুগ্রহে দুঃখিনীর দুঃখ দূর হইয়াছিল, তিনি বদলী হইয়া ময়মনসিংহের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া গেলেন। ময়মনসিংহে তাঁহার উপর কালেক্টরীর ভার পড়িল। রসিকও কালেক্টরীতেই চাকুরী করিত।

একদিন রসিক কতকগুলি কাগজপত্র স্বাক্ষর করাইবার জন্য ডেপুটী বাবুর নিকট উপস্থিত হইল। ডেপুটী বাবুর হাতে তখন অধিক কাজ ছিল না; তিনি রসিককে দেখিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রসিক তাহার নাম, পিতার নাম, বাসস্থানের কথা ডেপুটী বাবুকে বলিল। ডেপুটী বাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার আর কে আছে?" রসিক বলিল "এ সংসারে আমার আপনার বলিবার কেহ নাই।" ডেপুটী বাবু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর রসিক যখন কার্য্য শেষ করিয়া গমনোন্মুখ হইল, তখন ডেপুটী বাবু বলিলেন "দেখ বাবু, তুমি আজ সন্ধ্যার পর একবার আমার বাসায় যাইও।" রসিক "যে আজ্ঞা" বলিয়া নমস্কার-পূর্ব্বক চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর রসিক ডেপুটী বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলে, ডেপুটী বাবু দুঃখিনীর কথা পাড়িলেন। তিনি যখন দুঃখিনীর গুণবর্ণনা করিতে লাগিলেন, তখন রসিক আর স্থির থাকিতে পারিল না, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। সে তখন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা ডেপুটী বাবুর নিকট নিবেদন করিল। ডেপুটী বাবু বলিলেন "রসিক, তোমার কোন অপরাধ নাই; ঐ প্রকারের কথা শুনিলে আমরাও তোমারই মত কাজ করিতাম। যাহা হইবার হইয়াছে; আগামী কল্যই তুমি কালেক্টর সাহেবকে বরাবর একখানি ছুটীর দরখাস্ত লিখিয়া আমার নিকট দিও, আমি সাহেবকে বলিয়া তোমার দুই মাসের ছুটী মঞ্জুর করাইয়া দিব। ছুটীর শেষে দুঃখিনীকে এখানে লইয়া আসিও।" তাহার পর পরম সমাদরে রসিককে আহারাদি করাইয়া বিদায় দিলেন।

রসিকের ছুটী মঞ্জুর হইল। পাঁচ বৎসর পরে রসিক বাড়ী চলিল। একদিন অপরাহ্ণকালে রসিক গৃহে উপস্থিত হইয়া ডাকিল "দিদি!"

দুঃখিনী তখন বাড়ীতেই ছিলেন। এতকাল পরে "দিদি" সম্বোধন শুনিয়া দুঃখিনী তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখেন, সম্মুখে রসিক দাঁড়াইয়া আছে। তখন আর তাঁহার কথা বলিবার শক্তি রহিল না; তিনি দৌড়াইয়া গিয়া রসিককে কোলের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন।

সদানন্দ দাবায় বসিয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল, সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, একলম্ফে প্রাঙ্গণে নামিয়া গান ধরিল—

"তুই কি ঘরে এলিরে রামধন।"

তাহার পর। তাহার পর আর কি। হারানিধি ঘরে আসিল। দুই মাসের মধ্যেই দুঃখিনী একটী সর্ব্বসুলক্ষণা মেয়ে দেখিয়া রসিকের বিবাহ দিলেন। বিবাহ শেষ হইলে ডেপুটী বাবুর অনুরোধ জানাইয়া রসিক দুঃখিনীকে ময়মনসিংহে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল; দুঃখিনী তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন "ভাই, আমার সংসারের কাজ শেষ হইয়াছে; আমি জীবনের অবশিষ্ট কয়টী দিন কাশীতে বাস করিতে চাই।"

নিকটেই সদানন্দ দাঁড়াইয়াছিল, সে তখন গাহিয়া উঠিল—

"কাজ কি আমার কাশী,
ঐ মায়ের পদ-কোকনদ তীর্থ রাশিরাশি।"

কিন্তু সদানন্দের কথা রহিল না। দুঃখিনীর কাশীবাসই স্থির হইল। বিদ্যালয়ের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া সদানন্দকে সঙ্গে লইয়া দুঃখিনী কাশী-যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। সদানন্দ মহেন্দ্রপুর-ত্যাগের পূর্ব্বে দুইদিন ভরিয়া কেবলই ছুটিয়া বেড়ায় আর গায়—

"ওরে, কাজ কি আমার কাশী।
ঐ যে মায়ের পদ-কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি।" *

সমাপ্ত। শ্রীজলধর সেন।

---

* ঘটনাক্রমে অগ্রজপ্রতিম জলধর বাবুর কাগজপত্র ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে অনেক দিনের পুরাতন জীর্ণ কীটদষ্ট দু'খানি খাতা পাই। দুইখানিই উপন্যাস, তাঁহার পনেরো বৎসর বয়সের লেখা (১৮৭৫ খৃঃ অঃ) এবং সর্ব্বপ্রথম রচনা।

একদিন যাঁহার ছোট গল্পের প্রশংসা করিতে যাইয়া শ্রদ্ধেয় চন্দ্রশেখর বাবু 'বঙ্গদর্শনে' লেখেন "যিনি এমন সুন্দর করিয়া ছোট গল্প লিখিতে পারেন, তিনি উপন্যাস লেখেন না কেন?" আমি তাই তাঁহার "দুঃখিনীকে" অকালে কীটদষ্ট ও লুপ্ত হইবার হাত হইতে রক্ষা করিলাম। অপর উপন্যাসখানি আগামী বৈশাখ হইতে ধারাবাহিকরূপে জাহ্নবীতে বাহির হইবে।

ঔপন্যাসিকভাবে আমরা তাঁহাকে জোর করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে এই প্রথম নামাইলাম; আশা করি এবার তিনি তাঁহার পাকা হাতের উপন্যাস রচনায় বাঙ্গালী পাঠকপাঠিকাকে পরিতৃপ্ত করিবেন।—সহঃ সম্পাদক, জাঃ।

সমালোচনা।

পরলোক-রহস্য।—শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত, মূল্য ।৴০ আনা। বেদান্তবাগীশ মহাশয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। ইতিপূর্ব্বে তিনি সাংখ্য-জ্ঞান ও বেদান্ত-জ্ঞান এখনকার অল্পবুদ্ধি অল্প-ধারণাশক্তি-বিশিষ্ট বাঙ্গালীর জন্য অতি সহজ-সরল বাঙ্গালায় প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার সাংখ্যমতভাষ্য ও বেদান্তের অনুবাদ বাঙ্গালাভাষার দু'খানি অপূর্ব্ব ও অমূল্য রত্ন। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে পরলোকের রহস্য-কথা বেদান্তবাগীশ মহাশয় আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। পরলোক আছে কিনা, পরলোক হইতে ফিরিয়া আসা যায় কিনা; বাস্তবিক মৃত্যুর পর মানুষকে পরলোক বলিয়া কোথাও যাইতে হয় কিনা, বেদান্তবাগীশ মহাশয় সেই সকল রহস্যময় কথা শাস্ত্রীয় প্রমাণ, যুক্তি, তর্ক, লৌকিক প্রমাণ, লিখন, পঠন, অভিভাষণ প্রভৃতি শঠ-সংবাদ দ্বারা প্রমাণীকৃত করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা সাধারণতঃ বিশ্বাস করি যম পরলোকের অধিষ্ঠাতা, সেই যমকে ধরিয়া নচিকেতা নামে এক জ্ঞানপিপাসু ঋষি-বালক এই পরলোকের রহস্য জানিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন। পরলোকের অধিষ্ঠাতা তাঁহাকে বলেন, "পরলোক সম্বন্ধে দেবতারাও পূর্ব্বে সন্দিগ্ধ ছিলেন। উহা সুজ্ঞেয় নহে, অর্থাৎ সহজে সকলের বুঝিবার জিনিষ নহে। উহা জানিবার জন্য আমাকে উপরুদ্ধ করিও না।"—যম নিজের রাজত্বের সংবাদ সেই বৈদিক যুগ হইতে এইরূপে গোপন রাখিয়া আসিতেছেন, যাহার ধন সে গোপন রাখে; কিন্তু তস্করে তাহা অপহরণ করিয়া থাকে। বেদান্তবাগীশ মহাশয় শঠ-সংবাদের সাহায্যে সেই যমের ঘরে সিঁদ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সে রাজত্বের সংবাদ জানিতে হইলে যে দিক দিয়া যাওয়া আবশ্যক তাহার পথ এবং পাথেয়-সম্বন্ধে বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের এই ক্ষুদ্র 'গাইড'খানি অনেক 'দিক্‌ভ্রান্তের' ভ্রান্তি এবং সন্দেহ দূর করিবে। উপদেশ ও প্রত্যক্ষের দ্বারা সন্দেহ দূর হয়, কিন্তু ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য অভ্যাস বা অনুশীলন আবশ্যক। বেদান্তবাগীশ মহাশয় এই সত্যের পথ দিয়া পরলোক-ভ্রান্ত পথিকের সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত মনুষ্যসমাজে স্বপ্ন-দৃষ্ট অনেক পরলোক-কথার কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। বেদান্তবাগীশ মহাশয় সে সকলও প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 'জাহ্নবী'তেও স্বপ্নতত্ত্বের আলোচনা হইতেছে.

পরলোক-তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকেরা এই পুস্তিকাখানি পাঠ-কালে সেগুলিও একবার অনুধাবন করিবেন। মৃত্যুর পর পরলোক, জীবৎমানে পরলোকের যদি কিছু জানা [illegible] যদি পরলোক থাকে, আমরা সকলেই-[illegible] পথিক। বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের 'গাইডখানি' লইয়া যদি [illegible] পথের জন্য প্রস্তুত হইতে পারা যায়, তবে "পরলোক-রহস্য"খানি নিশ্চয়ই [illegible] কার্য্য করিবে।

[illegible]মালা।—শ্রীবলাইচাঁদ গোস্বামী ও শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুপাদদ্বয় [illegible] সম্পাদিত। স্বর্গীয় পিতা প্রভুপাদ মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর আদেশে তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় ভক্তমণ্ডলীকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্লোকমালার এই বিশুদ্ধ সংস্করণখানি বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন। এই একটী কার্য্যসাধনে তিনি তিনটী উদ্দেশ্যসাধন করিতেছেন—পিতৃ-আজ্ঞাপালন,—বৈষ্ণব-সমাজের মহোপকারসাধন এবং শাস্ত্রবিতরণ; ইহজগতে ইহাপেক্ষা পুণ্যকর্ম্ম আর কি আছে? বৈষ্ণব-সমাজ ও বৈষ্ণব-সাহিত্য গোস্বামী মহাশয়ের নিকট বহু ঋণী। তাঁহার সম্পাদিত শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত, শ্রীলঘুভাগবতামৃত, শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী—আর সর্ব্বোপরি বৈষ্ণব-সমাজের কণ্ঠমণিস্বরূপ তাঁহার শ্রীচৈতন্য-ভাগবত বৈষ্ণব সাহিত্যের অনুপমেয় অক্ষয়রত্ন। আলোচ্য গ্রন্থশেষে শ্লোকনিচয়ের একটা বর্ণক্রমানুগত অনুক্রমণিকা সংযোজিত দ্বারা তিনি পাঠের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থকার মহাশয়ের নিকট আমাদের একটী প্রার্থনা আছে—তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতের ন্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একটী বিশুদ্ধ ও সুলভ সংস্করণ তিনি গৌড়ীয় দরিদ্র বৈষ্ণব-সমাজের জন্য প্রণয়ন করুন। ৪০ নং মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেনে গ্রন্থকারের নিকট পত্র লিখিলে একখানি শ্লোকমালা বিনামূল্যে পাওয়া যাইবে।

অজামিল-চরিত—শ্রীঅম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল্ প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত অজামিলের উপাখ্যান লইয়া বর্ত্তমান পুস্তক রচিত। গ্রন্থকার কেবল সুকবি নহেন, ভাবুক ও প্রেমিক; কবিত্বের সহিত এই দুইটী মহারত্ন সম্মিলিত হইয়া গ্রন্থখানিকে সমুজ্জ্বল করিয়াছে। গ্রন্থ-বর্ণিত "ভাগবত-ধর্ম্ম-কীর্ত্তন" "যমরাজ কর্তৃক অধীশ্বরের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন" প্রভৃতি অধ্যায়গুলি দার্শনিক ও ভক্তিতত্ত্বে পরিপূর্ণ। প্রার্থনা করি,

গ্রন্থকার এইরূপে আমাদের ভক্তিগ্রন্থ-নিচয়ের এক একটী চরিত্র না বাঙ্গালা-সাহিত্যের পুষ্টি ও সৌন্দর্য্যসাধন করিবেন।

কুন্দ—শ্রীকালিদাস রায় প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। কতকগুলি ছোট কবিতা লইয়া গ্রন্থকার কুন্দ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার আস্বাদ জাহ্নবীর পাঠকপাঠিকা পূর্ব্বে কিছু কিছু পাইয়াছেন। বয়সে হইলেও তাঁহার লেখায় যথেষ্ট প্রবীনত্ব বর্ত্তমান। ভাষা ও ভাবসম্পদে গ্রন্থখানি সুন্দর হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য এই উদীয়মান তরুণ কাব্যসম্ভারে সম্পদান্বিত হইবে।

প্রতিজ্ঞাপালন—শ্রীপাঁচকড়ি দে প্রণীত, মূল্য ১।০ আনা। ইহা এ খানি ডিটেক্‌টিভের উপন্যাস। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস-প্রণয়নে পাঁচকড়ি ব প্রথিতনামা। এ বিষয়ে তাঁহার নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না প্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ গোবিন্দরাম বৃদ্ধ বয়সে যে কার্য্যতৎপরতা ও প্রতিভা পরিচয় দিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞাপালন পূর্ব্বক নিজ নির্দ্দোষী পুত্রকে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক বিস্ময়কর। গ্রন্থবর্ণিত সুহাসিনী ও লীলা চরিত্র বেশ মনোরম।

সরলা—শ্রীমতী ঊষাপ্রমোদিনী বসু প্রণীত মূল্য ॥০ আনা। বহুদিন পরে স্ত্রীপাঠোপযোগী একখানি উপন্যাস আমরা পাঠ করিলাম। হিন্দু মহিলাই যে হিন্দুরমণীর চরিত্রাঙ্কণে অধিকতর সুপটু, তাহার প্রমাণ সরলা নবীনা গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার "সরলায়" হিন্দু-বিধবার যে পূতোজ্জ্বল ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা খাঁটী এবং দেবোপম। হিন্দুর গৃহে যে হিন্দু-বিধবা দেব আশীর্ব্বাদ; তাহা সরলার চরিত্র হইতে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই সরলার ছায়াপাতে প্রমীলা ও শিশিরের চরিত্রও বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে আমাদের প্রত্যেক পাঠক ও পাঠিকাকে সরলা পাঠ করিতে বিশেষ অনুরোধ করি।

নরবলি—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য ৸০ আনা। বিক্রমাদিত্যের ঘটনা লইয়া বর্ত্তমান উপন্যাসখানি রচিত। গ্রন্থকার প্রাচীন এবং সুলেখক। বহুপূর্ব্বে তাঁহার রচনায় "জাহ্নবী" ও "সহচরী" পরিপুষ্টা হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রণীত "দেওয়ান গোবিন্দরাম" "শকদুহিতা" এবং বর্ত্তমান উপন্যাস বাঙ্গালা-সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়া দিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি

...না। "বিক্রমাদিত্য" "বেতাল" "কুহেলী" প্রভৃতি চরিত্রগুলি অতি সুন্দর ...রে চিত্রিত হইয়াছে। গ্রন্থকার-রচিত গানগুলি বড় সুন্দর। ...সার-উপন্যাস পাঠের দিনে ...মান গ্রন্থের আদর হইবে কি?

...শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী দাসী প্রণীত, মূল্য ॥৴০ আনা। বড় সুসময়ে ...কা শ্রীমদ্ভাগবতের এই প্রেমভক্তিময় চরিত্রটী ... বাঙ্গালা-সাহিত্যকে উপহার দিয়াছেন। বিষয়ের গুণে, ... এবং প্রেম ও ভক্তির ...শ্রনে গ্রন্থখানি পুণ্যপূত ত্রিবেণী ... শ্রীভগবানের ... হইলে ভক্তির কথা কেহ বলিতে সক্ষম হয় না, গ্রন্থকর্ত্রী সেই বিষয়ে কৃতকাম হইয়া তিনি যে ভগবদনুগ্রহপাত্রী, তাহার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন।

ভগবানের কাছে ভক্তের আবদার বা প্রার্থনা কত সুন্দর এবং সেই সৌন্দর্য্য লেখিকা কেমন প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করিয়াছেন দেখুন—

আমার কামনা বিফল হইলে
তোমার কলঙ্ক বড়।

যখন আমরা তাঁহার

নিরখি ব্রাহ্মণে কৃতাঞ্জলিপুটে
বিনয়ে কেশব দাঁড়াইলা উঠে

পাঠ করি, তখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় ব্রাহ্মণের পাদধৌতকারী—অপিচ ব্রাহ্মণের মর্য্যাদারক্ষাকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ছবিই আমাদের মানসপটে উদিত হয়। দ্বিতীয় সর্গে লেখিকা প্রকৃতি-বর্ণনায় প্রত্যেক পুষ্প, লতা, তরু প্রভৃতিতে শ্রীকৃষ্ণের ভুবনমোহন চিত্রস্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়াছেন। রঙ্গমতীর চরিত্র বিশ্বাসে-ভরা, রুক্মপত্নী হৈমবতী ভক্তির আর একটী ক্ষুদ্র ধারা; এই দুইটী চরিত্রকে পাশাপাশি পাইয়া রুক্মিণীর চরিত্র বিশেষ সমুজ্জ্বল হইয়াছে। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ, বাঁধাই এবং আকার সুন্দর; মূল্যও অল্প;—বিশেষভাবে অনুরোধ করি প্রত্যেক বঙ্গরমণী রুক্মিণী পাঠ করুন, আর ইহার পুণ্যালোকে হিন্দুগৃহকে প্রেমভক্তিপূর্ণ করুন।

বিদায়।

চলিলে কি ভাগ্যবতি! রমণী-বাঞ্ছিত
সধবার বেশে সাজি', হাস্য-বিজড়িত
চ'খে চাহি পতি, পুত্র, কন্যা, বধূ-মুখ;
ভুলিয়া এ সংসারের চিন্তা, সুখ, দুখ।
যাও সতী-যোগ্যধামে; যশের মন্দির,
গৌরবের হৈমরাগে সুকীর্ত্তি-মিহির
করিয়াছে আলোকিত; চিরদিন তরে
বিতরিবে স্নিগ্ধরশ্মি সংসার ভিতরে!
চিরশান্তিধাম মাঝে পুণ্য-নিকেতন,
কর্ম্মগুণে তথা তব স্বর্ণ-সিংহাসন
সজ্জিত কুসুম দামে—মণি-মুক্তা-হারে;
পুষ্পাবৃত পদ্মাসন এ মনোমাঝারে!
যাও দেবি! থাকি ল'য়ে আঁখিভরা জল,
সন্তপ্ত মানসে মাত্র স্মৃতিই সম্বল!